অন্তর্ভারতীয় গ্রন্থ-মালা

পুরনো লখনউ

[গুযিশ্‌তা লখনউ]

অনুবাদক :

গুরুদাস ভট্টাচার্য

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়া দিল্লী

ভূমিকা

ব্যক্তিত্ব

আবদুল হলীম 'শরর্' ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হকীম তফজ্জুল হুসেন আরবী ও ফারসীতে পণ্ডিত এবং প্রসিদ্ধ বৈদ্য ছিলেন। ন বছর বয়সে 'শরর্' যান কলকাতা-মেটিয়াবুরুজে, যেখানে সিংহাসনচ্যুতির পর ওয়াজিদ আলী শাহকে রাখা হয়েছিল। শাহী খানদানের (বংশের) সঙ্গে যোগাযোগের ফলে 'শরর্'-এর খানদানও ওইভাবে গড়ে উঠেছিল। আরবী, ফারসী এবং তর্কশাস্ত্র ছাড়া কিছু ইংরেজী তিনি পড়েছিলেন, এবং লখনউয়ের বিখ্যাত 'অওধ অখবার'-এর সংবাদদাতারূপে খবর পাঠাতেন। উনিশ বছর বয়সে তিনি লখনউ ফিরে আসেন, এবং এখানকার পত্রিকা 'অওধ কে পঞ্চ্'-এর প্রসিদ্ধ লেখক এহমদ আলী কসমণ্ডভীর সান্নিধ্য লাভ করেন। এঁর কাছ থেকেই তিনি গদ্য-রচনার প্রেরণা লাভ করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মুনশী নওলকিশোর তাঁকে 'অওধ অখবার'-এর সম্পাদক-মণ্ডলীতে গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে বন্ধু আবদুল ওয়াসিতের নামে তিনি প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক পত্র 'মহশর'। এর সুন্দর গদ্য-শৈলী খুব প্রসিদ্ধ হয়।

'অওধ অখবার'-এর বিশেষ সংবাদদাতারূপে 'শরর্' কয়েক মাস হায়দরাবাদে ছিলেন। শেষে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আলাদা হয়ে যান। সেই সময়ে তিনি প্রথম উপন্যাস 'দিলচস্‌প্' লেখেন, যেটি দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এর দুবছর পরে 'শরর্' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম অনুবাদ করে উর্দূ-ভাষীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সাধন করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজ পত্রিকা 'দিলগুদায' প্রকাশ করেন। এই শ্রেণীর পত্রিকার মধ্যে এটিই প্রথম। এতে সরল, প্রবাহময়, এবং সুন্দর গদ্যে

রচনাদি প্রকাশিত হত এই। পত্রিকায় তিনি নিজের লেখা উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মলিকুল অজীজ ভর্জিনা', 'হাসান-এঞ্জিলনা', 'মনসুর-মোহনা' ইত্যাদি এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেন 'মুহয্যব' পত্রিকা। এতে, ইসলাম ধর্মের বিদ্বান ব্যক্তিদের জীবনী প্রকাশিত হত। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'শরর্' দ্বিতীয়বার হায়দরাবাদ গমন করেন। ওখানেই চাকুরি গ্রহণ করেন, এবং জনৈক নবাবজাদার গৃহশিক্ষক হয়ে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যণ্ডে যান। সেখানে ছিলেন চৌদ্দ-পনেরো মাস। সেই সময়ে তিনি ফরাসী গবেষক মঁশিয়ে কোরবাঁর কাছ থেকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন। ফিরে এসে, ১৮৯৮-এ হায়দরাবাদ থেকে দ্বিতীয়বার 'দিলগুদায' প্রকাশ করেন। কিন্তু পত্রিকাটি অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লখনউ ফিরে এসে পত্রিকাটি তিনি তৃতীয়বার প্রকাশ করেন।

'শরর্' সাংবাদিক, উপন্যাস-লেখক ও গদ্যকার, সমাজ-সংস্কারক এবং সত্যনিষ্ঠ লেখক। প্রচলিত পক্ষপাত এবং বিশ্বাসের পরোয়া না করে তিনি ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহে যত্নশীল ছিলেন। এই কারণেই তিনি যখন ইমাম হোসেনের কন্যা সাকীনার জীবনী প্রকাশ করেন, তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয়রা অত্যন্ত মুখর হয়ে উঠেছিল। মুসলমান রমণীদের মধ্যে থেকে পর্দা-প্রথা বিলোপের সপক্ষে তিনি 'ইস্মত' নামে একটি পত্রিকা বার করেন। এটি ছিল তাঁর সমাজ-সেবার অঙ্গ। এর জন্যে তাঁকে প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল; কিন্তু তিনি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। ১৯০৪-এ হিন্দু-মুসলিম একত্ব সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি পাক্ষিক পত্র 'ইজিহাদ' প্রকাশ করতে থাকেন গদ্যলেখক, সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক হিসেবে 'শরর্'-এর ব্যক্তিত্ব যুগান্তকারী।

সাংবাদিকরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা এতো অসীম ছিল, ১৯১২-য় খিলাফৎ আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা মৌলানা মুহম্মদ আলী তাঁর

উর্দু দৈনিক 'হমদর্দ'-এর সম্পাদক-রূপে প্রথমে 'শরর্'-কেই নির্বাচন করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রচনার সংখ্যা একশো দুই-এরও বেশি। তার মধ্যে বেশির ভাগই অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, এবং তাদের একাধিক সংস্করণও হয়েছিল।

উপন্যাস ছাড়া 'শরর্'-এর অপর গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট উপলব্ধির ফসল 'মশরিকী তমদ্দুন কা আখিরী নমূনা ইয়া গুযিশ্তা লখনউ'[1]—যার অনুবাদ আপনারা দেখতে পাবেন পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে। মূল রচনায় অতিশয় মূল্যবান এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানের (যা এই পুস্তকে একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে) অতিরিক্ত আছে 'শরর্'-এর সরল ও আকর্ষণীয় গদ্যের নিদর্শন, যাতে গদ্যের পক্ষে আবশ্যকীয় প্রবহমানতা, শৃংখলা এবং অমোঘতার গুণ স্বতঃ-বিদ্যমান।

শররকালীন লখনউ

যে-কালকে আবদুল হলীম 'শরর্' দেখেছিলেন, সে ছিল আমোদ-প্রমোদ, রঙ্গ-তামাসার অন্তিমকাল। দেশ তখন ইংরেজের অধিকারে। নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্যকে স্থায়িত্ব দেবার জন্যে দেশের ভেতরে ও বাইরে তারা তখন প্রচার করছে যে ইংরেজরা আসবার আগে হিন্দুস্তানের অধিবাসীরা খুবই অসভ্য আর জংলী ছিল, এবং ইংরেজরা তাদের সভ্য ও সুসংস্কৃত করে তোলার চেষ্টা করছে। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক-আলমারী বইয়ের সঙ্গে হিন্দুস্তান ও প্রাচ্য সাহিত্য-শিল্পাদির ভাণ্ডারের তুলনা করাটাও একটা হেয় কাজ বলে লর্ড মেকলে মনে করতেন। এবং লর্ড ড্যালহৌসীর সময়ে অওধ অধিকারের জন্যে যে উপলক্ষ খোঁজা হচ্ছিল, তাতে নবাবী অওধকে কেবলমাত্র বিলাসিতার কেন্দ্র বলে দেখানো হয়েছিল এবং লখনউ-সভ্যতার একটি মিথ্যা ও ভ্রমপূর্ণ চিত্র আঁকা হয়েছিল।

'শরর্' ছিলেন সেই দলের লোক, যাঁরা ভারতীয় সভ্যতার গর্বে

[1] "পূর্বী সংস্কৃতির শেষ নিদর্শন বা পুরনো লখনউ।"

গর্বিত, এবং দেশবাসীর মধ্যে আত্মগৌরব জাগাতে সচেষ্ট ছিলেন। যাতে তাদের আত্মবিশ্বাস জন্মে এবং তারা আপন অতীতকে স্বরূপে দেখতে পায়, এই উদ্দেশ্যে একদিকে তিনি লিখলেন ঐতিহাসিক উপন্যাস—যেখানে প্রাচীন ঘটনার সূত্রে এই ধরণের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করার চেষ্টা বিদ্যমান। অন্যদিকে তিনি লিখলেন এই গ্রন্থ, যেটি এখন আপনাদের সামনে উপস্থিত। এর নাম 'গুযিশ্‌তা লখনউ' বা 'মশরিকী তমদ্দুন কা আখিরী নমুনা'। এই পুস্তকে 'শরর্' লখনউ-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয় ও দিকের বর্ণনা করেছেন, যে কারণে এটি শুধু হিন্দুস্তানে নয়, সমগ্র প্রাচ্যেই সমাদর ও শ্রদ্ধা লাভ করেছে।

সংস্কৃতি

মানব-সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে, সে কখনও দেশ-কালের সীমায় আবদ্ধ থাকে না। দীপ থেকে দীপ জ্বলে উঠতে থাকে। যদিও একটি স্থানের সভ্যতা ওই স্থানবিশেষের নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে, অন্য অন্য স্থানের সভ্যতার কাছ থেকেও সে অনেক-কিছু গ্রহণ করে। এবং এইভাবেই বিশ্বসভ্যতা রূপ গ্রহণ করতে থাকে। ঠিক একইভাবে, একটি বিশেষ যুগের সভ্যতাকে ওই যুগবিশেষেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়; আসলে তার সম্বন্ধ থাকে প্রাচীনকালের সঙ্গেও; এবং সাময়িক হওয়া সত্ত্বেও এই যুগ-সভ্যতা অন্তরে অন্তরে শাশ্বতকালীন।

লখনউয়ে যে সভ্যতা বেড়ে উঠতে-উঠতে একদা শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিল, তার মধ্যেও এই দুটি বৈশিষ্ট্য ওতঃপ্রোত। এর মূল আমাদের দেশে অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। যেসব লোক লখনউ-সভ্যতাকে কেবল 'তকল্লুফ' বা 'পহলে আপ'-এর মতো অগভীর বাক্যের সমষ্টি বলেই জানে, তাদের দৃষ্টি পড়ে না এর সৌন্দর্য সুকুমারতা শিষ্টতার দিকে। কোন সভ্যতাকে নিয়ে পরিহাস করা সহজ; কিন্তু সেই সভ্যতাকে পরতে-পরতে চেনা, তার আত্মাকে

স্পর্শ করা অতো সহজ নয়। নিরাপত্তা, অভিবাদন, অনুষ্ঠান, রেওয়াজ শিষ্টাচারের নাম সভ্যতা নয়; বেশভূষা, খানাপীনা, মনোরঞ্জনের উপায়, মেলা, এরাও সভ্যতা নয়। এগুলি সভ্যতার বাহ্য লক্ষণ মাত্র, যাদের মাধ্যমে কোন যুগের সভ্যতার কেন্দ্রে পৌঁছনোর চেষ্টা করতে হয়।

লখনউয়ে এসে পৌঁছেছিল যে-সভ্যতা, তা ভারতের শত-শত শতকের প্রয়াস-ফল। তাতে ছিল আর্যদের সৌন্দর্য, এবং স্থানীয় বৈশিষ্ট্যও। পরে আরব, ইরানী ও তুর্কীরা যখন এখানে এল, সঙ্গে করে নিয়ে এল তাদের নিজস্ব-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার। এর মধ্যে ইরানী সভ্যতার লয়ই ছিল বেশি জোরাল; দাক্ষিণাত্য ও দিল্লী এই স্থানদ্বয় ভারতীয় সভ্যতাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে, শিখেছেও তার কাছ থেকে অনেক। এই যুগেই অতঃপর ভারতীয় সভ্যতার স্বরসংগতিতে আরবী লয়ও এসে মিলেছে। এ-কারণে, সভ্যতা বা সংস্কৃতির যে কোন অঙ্গই হোক বা ললিতকলার যে কোন শাখাই হোক, এই সাংস্কৃতিক মিশ্রণ সর্বত্র একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্যে অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। এর সর্বোত্তম প্রকাশ তাজমহলের স্থাপত্য যেটি আরব ও হিন্দুস্তানী শিল্পকলার এক অনুপম নিদর্শন হয়ে আছে।

এই সভ্যতা যখন লখনউয়ে উপনীত হল, হিন্দুস্তানে তখন ইংরেজরা আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে, এবং স্থানীয় সভ্যতার গৌরবময় যুগ অবসিত হবার মুখে। চতুর্দিকে রাজনৈতিক দুরবস্থা, আর্থিক সংকটের কালো ছায়া। এই পরিস্থিতিতে মিশ্র-সভ্যতার কোমল কিশলয়টি দিল্লী থেকে এল লখনউ। অওধে তখন অস্থায়ী শান্তি। তবু, কিশলয় অম্লান। অন্য সমস্ত সভ্যতার মতো এ-সভ্যতাও যৌবনে উপনীত হল একদিন। হিন্দুস্তান ও ইরানের যুগ্ম অবদানে গড়ে-ওঠা এই সভ্যতা লখনউয়ে পেল নতুন জীবন, নবীন সৌন্দর্য। সুতরাং এই সভ্যতার যে-কোন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই পুরনো প্রথা-পদ্ধতি, দিল্লীর রীত-কানুন, বিশেষ ক'রে মুহম্মদ শাহের শাসনকালের উল্লেখ পাওয়া যাবেই। উদাহরণত, এই গ্রন্থে বেশভূষা

প্রসঙ্গে পাবেন 'নীমা' ও 'আংগ্‌রাখা'র বর্ণনা এবং আমোদ-প্রমোদ প্রসঙ্গে দেখবেন 'ইন্দর সভা'র বিবরণী।

কোন একটি বিশেষ সভ্যতার সঙ্গে শ্লিষ্ট ছিল না এই সভ্যতা। বরং এজাতীয় আত্মীয়তা-সূত্রে এর ওপর কোনরকম কট্টর ধার্মিক সংকীর্ণতার ছায়া যাতে না পড়ে, সেই প্রয়াসই ছিল নিরবধি। এ কথার প্রমাণ মেলে অভিবাদন প্রসঙ্গে—'সেলাম আল্যায়ক' বা 'সেলাম আল্যায়কুম'-কে লখনউয়ী সভ্যতা 'আদাব', 'তসলীম', এবং 'কুর্‌নিস'-এর মতো ধর্মবিরুদ্ধ অভিবাদনে বদলে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রথাদি এবং সংস্কারকেও ধর্মবিশ্লিষ্ট ও সর্বজনীন করে তোলায় সচেষ্ট ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'মহর্‌রম' মুসলমানদের এবং 'বসন্ত' হিন্দুদের উৎসব ; এই উৎসব দুটি এমনভাবে পালিত হত, মনে হত, এগুলি যেন সাধারণ সামাজিক সমারোহ। সুরক্ষণ ও সৌকুমার্য সভ্যতামাত্রেরই গুণ বলে মনে করা হয়। এই দুই গুণেই লখনউয়ী সভ্যতা স্মরণীয় ছিল এবং আজও তা আদর্শ স্বরূপ। এরই সুন্দর, বিস্তৃত চিত্র এঁকেছেন 'শরর্‌'।

এই সভ্যতা কেমন ছিল এবং কোথা থেকে এল ? এ বিষয়ে আলোচনা করার আগে একথা মনে রাখা দরকার, যে মানুষের মতো সভ্যতারও জন্ম হয়, বিকাশ হয় এবং মৃত্যু ঘটে। যতো ভব্যই হোক, কোন সভ্যতাই চিরকাল ধ'রে সকল যুগের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। এ-কারণে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, আজকের যুগের উপযোগী ও কার্যকরী হবে কিনা, এই দৃষ্টিকোণ থেকে কোন সভ্যতাকেই বিচার করা যায় না। স্বকীয় বিশিষ্ট যুগাবর্তেই প্রতিটি সভ্যতা বেড়ে ওঠে ; তদনুযায়ী নির্দিষ্ট হয় তার পরমায়ু ও বৃত্তসীমা—একমাত্র এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে পারে।

এই পটভূমিকায় লখনউ-সভ্যতাকেও দেখা দরকার। প্রথম থেকে আরম্ভ করে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এই সভ্যতার যে একটি বৈশিষ্ট্যের সাক্ষাৎ আপনারা বারবার পাবেন, তা হল : এতে দেশী ও বিদেশী উপাদানের সংগম ঘটেছে। কোন সভ্যতাই কখনও বিশুদ্ধ হয় না।

এখানেও আলো থেকেই আলো জ্বলে উঠেছে প্রতিবার। বিভিন্ন আলো এসে এক হয়ে মিশেছে তার প্রদীপে। এমনিভাবে আলো জ্বালিয়েছে লখনউয়ের সভ্যতা। এখানকার বেশ, এখানকার খাদ্য, পানীয়, প্রথা, অনুষ্ঠান, জীবনযাপন-পদ্ধতি, সভ্যতার এমন কোন্ বিষয় আছে, যাতে দেশী-বিদেশী উপাদান-উপকরণ মিলে-মিশে এক আশ্চর্য রূপ সৃষ্ট হয়ে ওঠে নি! বলা হয়, ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদ নিয়ে আসে। কিন্তু এখানে সংস্কৃতি ও প্রতীক—যে কোন ধর্মেরই হোক না কেন—গোটা সভ্যতার অঙ্গ হয়ে গেছে এবং ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছে। যেমন, 'মাতমদারী' (মহর্‌রম) ও 'তাজিয়া'র ব্যাপারে সারা লখনউ এক রংয়ে রাঙ্গিয়ে ওঠে। ঠিক এইভাবে 'বসন্ত-উৎসব' পালনের প্রশ্নই হোক অথবা হিন্দু পৌরাণিক কথামালার রাজা ইন্দ্রের বর্ণনাই হোক, কোনরকম ধার্মিক বা সাম্প্রদায়িক ভেদভাবের প্রশ্রয় না দিয়ে, লখনউয়ের সমস্ত লোক মেতে ওঠে। উর্দুর প্রথম পর্বের নাটকের মধ্যে 'ইন্দর সভা' গণনীয়। এর বিভিন্ন রূপ আছে। কিন্তু প্রত্যেক 'ইন্দর সভায়' রাজা ইন্দ্রের যে ছবি উপস্থিত করা হয়েছে, তা আমাদের সমন্বয়ী ভারতীয় সভ্যতার যথার্থ প্রতিনিধি। নাম ইন্দ্র, সিংহাসন পুরনো রীতির, কিন্তু পোষাক অওধ-নবাবের মতো। তাঁর দরবারে পরীরা গায় ব্রজের ঠুম্‌রী। সবাই কথা বলে সুন্দর ও সাবলীল উর্দুতে। আমাদের মিশ্র-সভ্যতার এ এক যথার্থ রূপ।

এই মিলন সুন্দর হয়েছে এই জন্যে যে, মিলনমুখী এই সভ্যতাগুলি জন্মসূত্রেই পরস্পরের খুব কাছাকাছি। ইরানী সভ্যতাও আর্য সভ্যতা ছিল। তাই ইরানী সভ্যতার প্রভাব যখন ভারতের ওপর পড়ল, এবং এখানকার আর্য সভ্যতার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল, তখন সে মিলন দুই অপরিচিতের মিলন ছিল না, ছিল দীর্ঘদিন অদর্শনের পর দুই আত্মীয়ের মিলন—এমন আত্মীয়, যারা প্রজন্মের দিক থেকে ছিল অভিন্ন এবং যারা স্ব-স্ব ঐতিহাসিক বিবর্তন-পথে অনেক মূল্যবান ঐশ্বর্য সংগ্রহ করেছিল। এই যোগাযোগে, ভারতে প্রাচীন সভ্যতার

সঙ্গে মধ্য-এশীয় সভ্যতার সুন্দর উপকরণগুলি সমাবিষ্ট হয়ে গেল। দুয়ে মিলে তখন এক রূপ।

Twilight of Mughals গ্রন্থে অধ্যাপক স্পিয়র লিখেছেন যে, শেষ মুগল সম্রাট য়োরোপের যেকোন ছোট রাজ্যের বৈধানিক শাসক হবার পক্ষে উপযুক্ততম ব্যক্তি ছিলেনঃ "Akbar Shah II would have been a very worthy country gentleman relying chivalrously on ladies' advice. Bahadur shah II would have been an excellent constitutional King. Delhi, then, was Indian Weimer with Ghalib as its Goethe. Zafar would have been a dignified ruler of a minor German state with his love of poetry and philosophy, with his excursions to Jamuna...his monsoon visits to Mehrauli, his patronage of Salona and Pankha festival and fondness for doves and love of mysticism."

একথা অওধ প্রসঙ্গে অধিকতর প্রযোজ্য। ইতিহাস অওধকে দিয়েছিল স্বায়ত্ত রাজ্যের দায়িত্ব। আর্থিক দুর্বলতা এবং জংধরা তলোয়ারের শক্তির ওপর ভর করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আক্রমণের মুখোমুখী হওয়া উনবিংশ শতকের পরিস্থিতিতে সম্ভব ছিলনা। এই রাজনৈতিক অক্ষমতার কথা যদি ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে বলতেই হবে, অওধে যে সাংস্কৃতিক উপলব্ধি স্বতঃ উৎসারিত হয়েছিল, তার জন্যে যেকোন জাতির সভ্যতা অহংকার করতে পারে। এই সভ্যতার আত্মা হচ্ছে "কোমলতা" ও "শিষ্টতা"। এতে সর্বক্ষণ অন্যের ভাবনার কথা মনে রাখা হয়, এবং জীবন-যাপন পদ্ধতির সেই রূপটিই গ্রহণ করা হয়, যাতে জীবনানন্দ ও শিষ্টতা প্রেরণা লাভ করে। বাইরে থেকে এই সভ্যতার গভীরতা ও শক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না; অনেকে একে সংকীর্ণ, অগভীরতর বলে থাকেন। কিন্তু স্বগত বিশিষ্ট বৃত্তে স্থির হয়ে এই সভ্যতা কেমন ফুল ফুটিয়েছে, তাকে

জানা, তার পরিচয়লাভ এক নতুন জগতের সন্ধানলাভের চেয়ে কম নয়। প্রাচীন সভ্যতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এ এমন এক নতুন জগৎ, যার সঙ্গে পরিচয় ঘটলে জীবন অনেক সুখের, অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

'শরর্' তাঁর গ্রন্থকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ভাগে, অওধ ও লখনউয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তার পরে অওধের নবাবদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। বুরহান-উল-মুল্‌ক্ থেকে আরম্ভ করে তাঁর বংশের শেষ বাদশাহ ওয়াজিদ আলী শাহ পর্যন্ত ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। স্পষ্টতই, ওয়াজিদ আলী শাহর জীবন বৃত্তান্ত বিস্তৃততর ; এবং এই বিষয়টি তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে, অত্যন্ত দরদ দিয়ে লিখেছেন: ইংরেজ ও তাদের এজেণ্টদের ষড়যন্ত্র, ওয়াজিদ আলী শাহর অসহায়তা ও অবশেষে এক রুগ্ন বিলাসিতার শিকার হয়ে যাওয়া, এবং সভাসদদের পাল্লায় পড়ে আপোষ রফা করে বসা —খুব সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। তৃতীয় ভাগ, যা এই পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য, লখনউয়ে সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গের প্রগতি-বিষয়ক আলোচনা। এখানে 'শরর্' বিভিন্ন শীর্ষকের মাধ্যমে মানব-জীবনের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংকলনের প্রয়াস পেয়েছেন। বেশভূষা, আহার-পান, শালীনতা, চালচলন, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধার্মিক বিশ্বাস ও অনুসরণ, মেলা-মেশা, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, অস্ত্রশস্ত্র, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিষ্টাচার ইত্যাদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপকরণ সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য প্রস্তুত করেছেন। এদের গুরুত্ব কেবলমাত্র ইতিহাসগতই নয় ; এ থেকে আমরা জীবন-নির্বাহের পদ্ধতি শিখে নিতে পারি। যেহেতু, এই "কোমলতা" ও "সুকুমারতা" যেকোন সংস্কৃতিরই গর্বের বিষয় হতে পারে।

'শরর্'-এর আরও দুটি রূপ আছে। একটি হল: ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ওয়াজিদ আলী শাহকে বন্দী করে লখনউ থেকে মেটিয়াবুরুজে পাঠিয়ে ছিল, তখন লণ্ডনে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের কাছে তাঁর মোকদ্দমা পেশ করার জন্যে আবদুল হলীম 'শরর্'-এর মাতামহ লণ্ডন গিয়েছিলেন। এ থেকেই বোঝা

যায়, তাঁদের বংশ অওধের নবাবদের কতো ঘনিষ্ঠ ছিল। যে দরদী ও প্রভাবসঞ্চারী শৈলীতে 'শরর্' অওধের শেষ দিনগুলির কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তা একটি ক্লাসিক হয়ে আছে। গ্রন্থের ওই অধ্যায় ঐতিহাসিক বিবৃতি মাত্র নয়, একটি মহৎ ট্র্যাজেডীর অংশ। তাঁর প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'দিলগুদায' দীর্ঘদিন উর্দূ সাহিত্যের সেবা করেছে — সে সেবা অসাধারণ মহত্ত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থধৃত আলোচনাও প্রথমে ছোট ছোট রচনা-রূপে এই পত্রিকাতেই কিস্তীতে-কিস্তীতে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখক হিসেবেও ইতিহাসে তাঁর গভীর আসক্তি ছিল। এই পুস্তকে ঐতিহাসিকের ব্যাপক দৃষ্টি, সাংবাদিক রসশৈলী এবং সংস্কৃতির তাবৎ বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী এক সভ্য ব্যক্তির সুকুমার কোমলতা স্বতঃ প্রকাশিত হয়েছে।

আর এক দিক থেকেও আলোচ্য গ্রন্থটির মহত্ত্ব উল্লেখযোগ্য— ভারতীয় সংস্কৃতির কোন অংশ নিয়েই এমন পরিপূর্ণ ও বিস্তৃত চিত্র আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। একথা সত্য, যে আহার-পান, বেশভূষা, শিষ্টাচার, আমোদ-প্রমোদ, বিবাহ-মৃত্যুর প্রথা-অনুষ্ঠান ইত্যাদির নাম সভ্যতা ও সংস্কৃতি নয়; কিন্তু এইসব বিষয়ের বর্ণনা না করলে সংস্কৃতি ও সভ্যতার ছবিটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আজকের যুগের মানুষ শুদ্ধ বেঁচে থাকার উদ্বেগেই এতো বিব্রত যে, জীবনের মৌল আনন্দকেই হারিয়ে বসে আছে; তীব্রগতি জীবনে পাক খেতে খেতে, আর দ্রুত ব্যস্ততায়, না পাচ্ছে একটু অবকাশ, না এই ঘূর্ণীপাক থেকে মুক্তি।

এই গ্রন্থের মহত্ত্ব তাই আরও বেশি। বেশ কিছুদিন হল, লিন য়ু টাং-এর প্রসিদ্ধ পুস্তক Importance of Living প্রকাশিত হয়েছে। তাতে, জীবনানন্দের এই দিকের ওপর আলোচনা করা হয়েছে। 'শরর্'-এর গ্রন্থ এর চেয়েও প্রাগ্রসর; এতে এমন এক সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যার জনক হিন্দুস্তানেরই একটি প্রদেশের অধিবাসীগণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে পুস্তকটি এক মহান

সভ্যতার এক মহান ইতিহাসমাত্র নয়, আমাদের জাতীয় উত্তরাধিকারের একটি মহত্ত্বপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ দলিলও।

আবদুল হলীম 'শরর্' স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর লোকপ্রিয় ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির জন্যে। এর মধ্যে 'ফিরদুসে-বরী', 'মনসুর-মোহনা', 'মলিক-উল-অজীজভর্জিনা', ফ্লোরা-ফ্লোরিণ্ডা' ইত্যাদি তাঁর জীবিতকালেই প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'শরর্' স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর যুগপ্রবর্তক পত্রিকা 'দিলগুদায'-এর সম্পাদক রূপে, যিনি উর্দু সাংবাদিকতাকে দিয়েছেন নতুন দৃষ্টি, উর্দু সাহিত্যকে নতুন দিশা। তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর সুন্দর রচনার জন্যে, যেগুলি উর্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। বিস্ময়রস উদ্‌বোধক নিবন্ধের জন্যে তিনি বেঁচে থাকবেন। তবে, তাঁকে অমর করে রাখার জন্যে 'গুযিশ্‌তা লখনউ'-ই যথেষ্ট। এটি এমন এক গ্রন্থ যা ইতিহাসের উত্তপ্ত ও কলমুখরিত রক্তপ্রবাহের মতোই বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ পর্যন্ত জীবন ও আনন্দের সংবাদ বয়ে নিয়ে চলেছে; অতীত সংস্কৃতিকে দান করেছে নবরূপ এবং ভবিষ্যৎকে নতুন দিব্যদৃষ্টি। এই দিক থেকে এই গ্রন্থের ওপর অধিকার শুধু উর্দুভাষীদের নয়, সমস্ত ভারতের। প্রত্যেক ভারতবাসী এর মধ্যে দেখতে পাবেন আপনার সুন্দর অতীতের ছবি, এবং এর অঙ্গে অঙ্গে পাবেন জীবননিষ্ঠ সুখ ও আনন্দের দীপ্তি।

অতএব, 'শরর্'-এর এই গ্রন্থটি মুদ্রিত শব্দের সংগ্রহ মাত্র নয়, এটি একটি তাজা জীবন্ত অনুভব, যা মানুষকে দেয় নতুন দৃষ্টি. তাকে সমৃদ্ধতর-সুন্দরতর করে তোলে।

অনুবাদ-প্রসঙ্গে

উর্দু-ফারসী-আরবী শব্দের ভাষান্তরণে বঙ্গীকরণের প্রচলিত প্রথা অনুসৃত হয়েছে;

মূল আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ উদ্ধৃত হয়েছে যেখানে, সেখানে 'য'-এর উচ্চারণ ইংরেজী 'জেড্'-এর মতো, 'অ-কারান্ত' শব্দের উচ্চারণ 'হ্রস্ব-আকারান্ত', এবং 'ওঅ'-'ওআ'-'ওঈ' ইত্যাদি 'অন্তস্থ ব'-এর বিবিধ উচ্চারণ-রূপ ;

স্থানবিশেষে, মৌল ভাষা-ধ্বনি এবং বঙ্গীকৃত-ধ্বনি উভয়ের আত্মীয়তাও ঘটানো হয়েছে ॥

সূচীপত্র

ভারতবর্ষে পূর্বী সভ্যতা ও সংস্কৃতির[1] শেষ নিদর্শন : অওধের প্রাচীন দরবার। এ-সিদ্ধান্তে হয়তো কেউ আপত্তি করবেন না। অবশ্য, অতীতের স্মৃতিবাহী আরও কয়েকটি দরবার আজও সশরীরে বিরাজমান। কিন্তু যে-দরবারের সঙ্গে-সঙ্গে পুরাতনী সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিঃশেষে অবসিত, এটি হল সেই দরবার। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল অনেক পরে ; এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিবিধ উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বিনষ্টও হয়েছিল অত্যন্ত দ্রুত। এ-কারণে আমি সংক্ষেপে এই দরবারের বর্ণনা করতে চাই এবং তুলে ধরতে চাই এর বৈশিষ্ট্যগুলি।

পুনশ্চ, একথাও মেনে নিতে হয়তো কারও আপত্তি হবে না, যে, যে প্রদেশে বিগত যুগের এই দরবার স্থাপিত হয়েছিল, তার প্রাধান্য ভারতের অন্য সব অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশিই ছিল।

পুরাকালীন চন্দ্রবংশ-পরিবার, বিশেষত রাজা রামচন্দ্রের মহান ও অতুলনীয় কীর্তিকলাপ এতো বেশি, যে, ইতিহাস তাদের বিবৃত করতে পারে না। তার কারণ, ইতিহাসের সীমান্ত পেরিয়ে তিনি সংস্থাপিত হয়েছেন ধার্মিক পবিত্রতার অসীমে। আজ, এই বিশাল ভারতে এমন একটিও গ্রাম বোধ হয় নেই, যেখানে প্রতি বছর রামলীলা ধর্ম-নাট্যের মাধ্যমে তাঁর পুণ্যস্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা না হয়। সর্বোপরি, অওধের এই প্রাচীনতম রাজসভার এবং অযোধ্যার তৎকালীন বৈভবের বর্ণনা বাল্মীকি এতো সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন, প্রত্যয়ী ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে সেগুলি গভীর-ভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে। সুতরাং, এখানে আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না।

1 উত্তর প্রদেশ তথা উত্তর-ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি : অনু

যাঁরা বাল্মীকির মহাকাব্যে অযোধ্যার সেই ঐশ্বর্যমুখর যুগের ছবি দেখেছেন, তাঁরা, সেই পুণ্যস্থানেই, 'দিল-গুদায'[1]—এ আজ দেখবেন ফয়জাবাদের চিত্রশালা।

আমাদের ঘটনা বৃত্তান্তের আরম্ভ সেইদিন থেকে, যেদিন এই প্রাচীন দরবারটির গোড়াপত্তন। এর পতন হয়েছে—খুব বেশি দিন নয়—আজ থেকে কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বছর আগে।

দিল্লীর বাদশাহী দরবারের পক্ষ থেকে অওধের সুবেদার নিযুক্ত হয়ে এলেন "নওআব বুরহান-উল-মুল্‌ক্ অমীনউদ্দীন খাঁ ন্যশাপুর।" লখনউয়ের 'শেখজাদা' তথা শেখবংশীয়দের পরাস্ত করে তিনি এসে পৌঁছলেন অওধের প্রাচীন রাজধানী পবিত্র নগরী অযোধ্যায়, এবং জনপদ থেকে দূরে, ঘাঘরা নদীর তীরে একটা উঁচু টিলার ওপর শিবির সন্নিবেশ করলেন। রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকতেন অধিকাংশ সময়; বিশাল অট্টালিকা নির্মাণের সময় তাঁর ছিল না। তার ওপর, স্বভাবেও ছিলেন সরল। অর্থাৎ, কোনরকম মিথ্যা আড়ম্বর দেখানোর শখও তাঁর ছিল না। তাই তিনি অনেকদিন পর্যন্ত তাঁবুতেই থেকে গেলেন। কিছুদিন পরে, যখন বর্ষা এল, অসুবিধা হতে লাগল, তখন আর একটু দূরে সরে গিয়ে, ভালো জায়গা দেখে, নিজের জন্য একটি কুটির তৈরী করালেন।[2] কুটিরের চারপাশ ঘিরে নিলেন একটা খুব লম্বা-চওড়া চতুষ্কোণ কাঁচা দেয়ালের বেড়া দিয়ে; তার চার কোণে—কেল্লায় যেমন থাকে—চারটে কাঁচা

[1] লেখক সম্পাদিত পত্রিকা, যাতে এই রচনাটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল। (1887-1935 খ্রীষ্টাব্দ)।

[2] ফয়জাবাদের যাবতীয় বৃত্তান্ত গৃহীত হয়েছে মুনশী মুহম্মদ ফ্যায়েজবখ্‌শ লিখিত 'তারীখ্‌-এ-ফরহবখ্‌শ' থেকে। মূল পুস্তকটি আমি দেখি নি। তবে, এর ইংরেজী অনুবাদ (অনুবাদক : উইলিয়ম হুই), যেটি 1889 খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ গভর্ণমেণ্ট প্রেসে মুদ্রিত হয়েছে, আমার কাছে আছে।

গম্বুজ বানিয়ে দিলেন, যাতে আশপাশের এলাকার ওপর নজর রাখা যায়। এই ঘেরা-জায়গাটার চৌহদ্দী এতো বড়ো ছিল, যে তার মধ্যে অগুন্তি ঘোড়সওয়ার, পদাতিক, তোপখানা, আস্তাবল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দফ্‌তর অনায়াসেই ধরে যেত। বুরহান-উল-মুল্‌ক্‌-এর প্রাসাদের শখ ছিল না ; তাই তিনি বেগমদের এবং অন্যান্য মহিলাদের বসবাসের জন্যেও কাঁচা বাড়ী তৈরি করিয়েছিলেন। জেলায় জেলায় ছুটোছুটি এবং সরকারী কাজে সফর, এর মধ্যে যখনই অবকাশ মিলত, এই কাঁচা বাংলোতেই অওধ-নরপতি বেশ আরামে আয়েশেই থাকতেন। কোন কিছুর বিরুদ্ধেই তাঁর কোনো অভিযোগ ছিল না। ফলত, তাঁর এই শাসন-কেন্দ্রটি কিছুদিনের মধ্যেই 'বাংলো' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেল।

বুরহান-উল-মুল্‌ক্‌-এর মৃত্যুর পর নবাব সফদরজংগের রাজত্বকাল। বসতিটি তখন 'ফয়যাবাদ' (ফয়জাবাদ) নামে ভূষিত।

এই হল পত্তন শহর ফয়জাবাদের, উত্থান ও পতনের দীপ্তিতে যে লখনউকেও মাত করে দিয়েছিল। তখনকার দিনে ফৌজের মুগল সরদাররা আত্মবিনোদনের জন্যে কাঁচা চারদেয়ালের আশে-পাশে তৈরি করিয়েছিল বাগান এবং আলোবাতাসময় আনন্দ-বিধায়ক রংমহল। শহরের শোভা বেড়ে যেতে লাগল। চৌহদ্দীর পশ্চিম দিকের ফটকটিকে বলা হত 'দিল্লী দরওয়াযা'। তার বাইরে একটা বড়ো বাজার বসিয়েছিল দেওয়ান আত্মারামের ছেলেরা, এবং এই সূত্রেই, বসবাসের জন্যে বাড়িও তৈরি করিয়েছিল। ইসমাইল খাঁ রিসালদারও এমনি একটা বাজার বসিয়েছিলেন। 'খওআজা-সরা' (মহল-রক্ষক খোজা)ও বিভিন্ন ফৌজী লোকদের জন্য চারদেয়ালের ভেতরে অনেক বাড়িও তৈরী হয়ে গেল।

নবাব সফদরজংগের মৃত্যুর পরে এই নতুন বসতির ওপরেও মৃত্যু নেমে এসেছিল কিছুদিনের জন্যে। যেহেতু, তাঁর পুত্র নবাব শুজাউদ্দৌলা লখনউকেই বেশি পছন্দ করতেন এবং থাকতেনও সেখানেই। এতোদিন ধরে যা-কিছু গড়ে উঠেছিল, সবই নষ্ট হবার

উপক্রম হল। অবশ্য, বছরে দু-এক রাত তিনি বাপ-দাদার এই পুরনো ভিটেয় নিশ্চয়ই কাটাতেন। অতঃপর 1746 খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের লড়াইয়ে তিনি হেরে গেলেন ইংরেজের কাছে। একেবারে সর্বস্বান্ত, রিক্ত। সেই অবস্থায় পালাতে-পালাতে এসে উপনীত হলেন ফয়জাবাদে। সেখানে কেল্লায় যা-কিছু জিনিষপত্র পেলেন, হাতিয়ে নিয়ে, রাতারাতি রওনা দিয়ে লখনউ পোঁছে গেলেন। এখানেও এক রাত্রির বাস। হাতের কাছে যা পেলেন, সঙ্গে নিয়ে দিল্লীর পথ ধরলেন। উদ্দেশ্য : রোহিলাখণ্ডের পাঠানদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ। অবশেষে, যুদ্ধের ন' মাস পরে ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি হল। শর্ত : শুজাউদ্দৌলা রাজ্যের আয় থেকে টাকায় পাঁচ আনা হারে খাজনা দেবেন ইংরেজদের।

সন্ধি হবার আগে, ইতস্ততঃ দৌড়োদৌড়ি করার সময়ে শুজাউদ্দৌলা অকস্মাৎই ফর্‌রুখাবাদ শহরে ঢুকে পড়েছিলেন। সেখানে তাঁর দেখা হয়েছিল এহমদ বংগশের সঙ্গে। তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ ও সম্মানিত বয়স্কদের অন্যতম। তিনি শুজাউদ্দৌলাকে পরামর্শ দিলেন : 'এখন যদি ফিরে গিয়ে রাজ্যের শাসনভার নিজের হাতে নিতে হয়, তাহলে আমার এই দুটো কথা ভুলো না। এক : মুগলদের কখনও বিশ্বাস কোরো না ; অন্য চাকর ও মহলরক্ষক খোজাদের দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নিও। দুই : লখনউয়ের বাস উঠিয়ে দিয়ে ফয়জাবাদকে তোমার রাজধানী করে গড়ে তোলো।'

কথা দুটো শুজাউদ্দৌলার মনে গেঁথে গিয়েছিল। ইংরেজদের সঙ্গে বোঝাপড়ার পর 1779 খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন স্বরাজ্যের অভিমুখে পা বাড়ালেন, সোজা চলে এলেন ফয়জাবাদ, এবং এখানেই রাজধানী স্থাপন করলেন। ফৌজে নতুন লোক নিলেন, নতুন করে অশ্বারোহী-বাহিনী গড়লেন, এবং নতুন-নতুন অট্টালিকা নির্মাণ করালেন। পুরনো প্রাচীরকে মজবুত করে নিলেন দুর্গের মতো —যাকে এখন 'কিলা' (কেল্লা) বলা হয়। চৌহদ্দীর ভেতরে মুগলদের যে ঘর-বাড়ি ছিল, সব ভেঙ্গে দিলেন ; এবং মুষ্টিমেয়

কয়েকজন বাদে, বাকি সমস্ত কর্মচারীদের হুকুম দিলেন দুর্গের বাইরে বসতবাড়ি তৈরী করতে। সীমানার চারদিকে দু মাইল করে জায়গা ছেড়ে দিয়ে গভীর খাদ কাটা হল, দুরস্ত করা হল কেল্লার মতো। সরকারী কর্মচারী ও সেনাবাহিনীর 'অফসর'দের অনুমতি দেওয়া হল: তারা স্ব-স্ব সংগতি অনুযায়ী উপযুক্ত জমি বেছে নিয়ে ওই খোলা ময়দানের ওপর বাড়ি তৈরি করতে পারে।

শুজাউদ্দৌলা ফয়জাবাদে রাজধানী স্থাপন করেছেন, এখবর যেমনি প্রচারিত হল, অমনি সকলের মুখ ফিরে গেল এই দিকে। হাজারে হাজারে লোক আসতে লাগল। জনপদ গড়ে উঠতে লাগল। শাহজাহানাবাদের অবস্থা এমন দাঁড়াল, যার সঙ্গে দেখা হয়, ফয়জাবাদ যাবার জন্যে তৈরি। খাস দিল্লীর শিল্পকাররাও আপন দেশ ছেড়ে পূর্ব-মুখে চলল। দিনরাত লোক-যাত্রা স্রোতের মতো। যাত্রীর দল আসছে তো আসছেই। হয় ফয়জাবাদে থেকে যাচ্ছে, কিংবা তার আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে এসে ভিড় করল সুখী-সম্পন্ন সাহিত্যিক, বীর যোদ্ধা, ব্যবসায়ী, শিল্পী—সর্ব ধর্ম ও জাতির, সকল শ্রেণীর ও বর্গের লোক। যারাই আসে, সকলেরই একমেব লক্ষ্য: কিছু জমি সংগ্রহ ক'রে বাড়ি তুলে ফেলা।

বছর কাটে। প্রথম পাঁচিলের পর আরও দুটো নগর-প্রাকার তৈরি হয়। একটা গিয়ে মিলিত হয় পুরনো চতুষ্কোণ চৌহদ্দীর দক্ষিণ দিকের সঙ্গে ; এটা লম্বায়-চওড়ার দু-মাইল ক'রে। দ্বিতীয়টা কেল্লা ও বহিপ্রাচীরের মাঝখানে, এক মাইল চওড়া। এই সময়েই গড়ে ওঠে—'ত্রিপোলিয়া' ও 'চক-বাজার'—এর রাস্তার শুরু কেল্লার দক্ষিণী ফটক থেকে, শেষ এলাহাবাদগামী সড়ক ছুঁয়ে। এটা এতো চওড়া ছিল, পাশাপাশি দশটা ছ্যাকরা গাড়ি অনায়াসে যেতে পারত। নগর-প্রাচীরের বিস্তার, ভিত্তির কাছে যা-ই হোক, মধ্যিখানে ছিল দশ গজ বা তারও বেশি, একেবারে ওপরে পাঁচ গজের মতো। এর ওপর, স্থানে স্থানে, পাহারা দিত দক্ষ ও অদক্ষ দুরকম সেনাদল, রাতভর্

রোঁদ দিত। দক্ষ সিপাইদের উর্দী ছিল লাল, অদক্ষ সিপাইদের কালো। বর্ষাকালে, এদের জন্যে, জায়গায়-জায়গায় 'ছপ্‌পর' (খড়-বাঁশের ছাউনী) পড়ত। বর্ষা-অন্তে, আগুন লাগার ভয়ে, সব খুলে ফেলা হত। এটা ছিল বাধ্যতামূলক, ব্যতিক্রম হবার উপায় ছিলনা। অর্থাৎ, প্রতি বছর প্রাচীরগাত্র ঢাকা হত লাখখানেক 'ছপ্‌পর' দিয়ে, আর চার মাস পরে তাদের নামিয়ে ফেলা হত টেনে-হিঁচড়ে-খাম্‌চে !

শিকারের জন্যে, শহরের আশপাশে দুটো 'চরাগাহ' (পশুচরণ-ভূমি) নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। এর একটা ছিল পশ্চিম দিকের 'গুরজী বেগ খাঁর মসজিদ' থেকে সুদূর 'গুপ্তুর ঘাট' পর্যন্ত বিস্তৃত। দুদিকে কাঁচা দেয়াল, তৃতীয় দিকে বহমানা ঘাঘরা নদী। এতে অনেক রকম শিকার ছাড়া থাকত; হরিণ, চিতা, নীলগাই, 'বারসিংঘা' (অ্যান্টিলোপ) সব স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করত, আর, চমকে উঠলেই দৌড় দিত চার পা তুলে। দ্বিতীয় শিকারক্ষেত্রটি ছিল 'গ্রাম-জনৌরা' ও 'গোঁসাই-ছাউনী' থেকে নদীর তীর পর্যন্ত প্রায় ছ'মাইল বিস্তৃত। এর আয়তনের মধ্যে এগারোটা গ্রাম ও তার জমি-জেরাত এসে গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি অসমাপ্তই থেকে যায়, জংলী জানোয়ার আর ছাড়া হয়নি কোনদিন।

খাস শহরের ভেতরের দিকে তিনটে সুন্দর বাগান ছিল। আমীর ও শাহজাদারা এখানে বেড়াতে আসতেন, আনন্দ পেতেন এর সবুজ-সৌন্দর্য উপভোগে। কেল্লার অভ্যন্তরে প্রায় চতুর্থাংশ জায়গা নিয়ে ছিল 'অঙ্গুরীবাগ'। চকের মধ্যে ছিল 'মোতীবাগ'। সবচেয়ে বড়ো 'লালবাগ'। এর মধ্যে খুব সুন্দর করে গাছ-গাছালি লাগানো হয়েছিল, সুবিন্যস্ত ছিল নানান জাতের মনকাড়ানিয়া নাজুক ফুল। গোটা দেশ জুড়ে ছিল এর খ্যাতি। তাই দূর-দূর প্রান্তে যারা থাকত, তাদের মনে একটি বাসনার জন্ম হয়েছিল : 'ওই আনন্দবিধায়িনী উদ্যান-স্বর্গে যেন কয়েকটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করতে পারি !' প্রত্যহ তৃতীয় প্রহরে শহরের শরিফজাদারা আসতেন এখানে, মেলে দিতেন নওজোয়ান-মনকে। তখন এই বাগিচা কতো সুন্দর ও রমণীয় ছিল।

এর প্রসিদ্ধি এতোদূর ছড়িয়ে গিয়েছিল, যে, দিল্লীর শাহানশাহ শাহ আলম পর্যন্ত এই বাগানে ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। একবার, এলাহাবাদ থেকে ফেরার পথে ফয়জাবাদে এসে কিছুদিন থেকে তারপর দিল্লী গিয়েছিলেন। এই তিনটি বাগান ছাড়া আরও দুটি বাগান ছিল শহরের ইতি-উতি, লখনউয়ের রাস্তায় অবস্থিত। সে দুটি হল ঃ 'আসফবাগ' ও বুলন্দবাগ'।

নবাব শুজাউদ্দৌলা বাহাদুরের শহরকে সুসজ্জিত করে তোলার সখ ছিল প্রচণ্ড। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যে তিনি ঘোড়ায় চড়ে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি পর্যবেক্ষণ করতে বেরোতেন। সঙ্গে থাকত লোকজন কোদাল-শাবল নিয়ে। কোথাও যদি চোখে পড়ত—কোন বাড়ি বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা সীমানার বাইরে চলে এসেছে, অথবা কোন দোকানদার রাস্তার জমির ওপর চড়াও হয়েছে, তখনই ভেঙ্গে দিয়ে সব সিধে ও সমান করে দিতেন।

সৈন্যবাহিনীর সংস্কারের দিকেও শুজাউদ্দৌলার নজর ছিল। বাহিনীর বড়ো সরদার ছিলেন মুর্তজা খাঁ বরীজ, হিম্মত বাহাদুর, এবং উমরাওগীর। সর্বাধিক সেনা ছিল এই তিনজনেরই অধীনে। ছোট ছোট জমাদার ছিল অনেক। তাদের সমস্ত ফৌজকে যোগ করে মোট যে সংখ্যা, তার চেয়েও বেশি ছিল সর্দার-ত্রয়ীর এক-একটি ব্যাটেলিয়নের সৈন্য সংখ্যা। অন্যান্য সরদার যাঁরা ছিলেন ঃ এহসান কঁবোহী, গুরজী বেগ খাঁ, গোপাল রাও মারাঠা, মীর জুমলার জামাতা নবাব জামালউদ্দীন খাঁ মুজফ্‌ফরউদ্দৌলা, বহুর জংগ বখ্‌শী, আবুল বরকত খাঁ কাকোরীনিবাসী, এবং লখনউয়ের জনৈক শেখজাদা মহম্মদ মুইজউদ্দীন খাঁ। এঁদের প্রত্যেকের অধীনে পাঁচশো থেকে হাজার সিপাইয়ের পলটন ছিল। এছাড়া ছিল মহল-রক্ষক খোজা ও তাদের অধীনে শিক্ষানবীশ অল্পবয়সী খোজা, চাকর-বাকর-সাকরেদের দল। বসন্তআলী খাঁ খোজার অধীনে দু-ডিভিশন ফৌজ অর্থাৎ চোদ্দ হাজার দক্ষ সিপাই ছিল যাদের উর্দী লাল। আর একজন বসন্ত খোজা ছিলেন, যাঁর অধীনে ছিল এক হাজার সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার ও

একটি পলটন। অম্বর আলী খাঁ খওআজা-সরার অধীনস্থ পাঁচশো সওয়ার ও একটি পলটনের উর্দী ছিল কালো। মহবূব আলী খাঁ খওআজা সরার কাছে শিক্ষা পেত পাঁচশো অশ্বারোহী এবং চারটে পলটন। লতাফত আলী খাঁর অধীনেও এইরকম সেনা ছিল। রঘুনাথ সিংহ ও প্রসাদ সিংহ, এদের প্রত্যেকের অধীনে তিনশো করে সওয়ার এবং চারটে করে পলটন ছিল। এইভাবে মকবুল আলী খাঁ (প্রথম ও দ্বিতীয়), ইয়ুসুফ আলী খাঁ, প্রত্যেকের সঙ্গে পাঁচশো করে মুগল অশ্বারোহী এবং পদাতিকের ব্যাটেলিয়ন ছিল। আর 'তোপখানা'র তো না ছিল কোন হিসেব, না কোন সীমা।

সব মিলিয়ে, শুজাউদ্দৌলার অধীনে, ফয়জাবাদে যতো সৈন্য ছিল, তার মোট সংখ্যাটা এইরকম : লাল উর্দী-পরিহিত দক্ষ সিপাই ত্রিশ হাজার, কালো উর্দীধারী অদক্ষ সিপাই চল্লিশ হাজার। 'সিপাহ সালার' (সৈন্যাধ্যক্ষ) ছিলেন সৈয়দ এহমদ, যিনি 'বাঁসীওআলা' উপনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি এতো তাড়াতাড়ি বন্দুকে বারুদ পুরে ফায়ার করতে পারতেন, তাঁর মারমুখো বন্দুকের সামনে ইংরেজ সেনার বন্দুকের বড়াই টিকত না।

এই বাহিনী ছাড়া শুজাউদ্দৌলার ছিল বাইশ হাজার 'হরকার' (হরকরা বা সংবাদদাতা) এবং 'মুখবির' (গুপ্তচর)। এরা পুণা থেকে সপ্তাহে-সপ্তাহে এবং পনেরো দিন অন্তর কাবুল থেকে খবরাখবর নিয়ে আসত। দূর-দূর অঞ্চলের শাসকদের নায়েবরা দরবারে হামেশা উপস্থিত থাকত। মারাঠাদের এক নায়েব ছিল ; একজন ছিল দাক্ষিণাত্যের শাসক নিজাম আলী খাঁর প্রতিনিধি ; একজন জাব্‌তে খাঁর, এবং একজন নায়েব-প্রতিনিধি জুলফিকারউদ্দৌলা নজফ খাঁর। এদের নিজস্ব দফতর এবং সিপাইও ছিল। এছাড়া, নিজ-নিজ পলটন নিয়ে অনেক ফৌজী অধ্যক্ষও এখানে থাকত। এইরকম একজন ছিলেন মীর নঈম খাঁ। তাঁর পতাকার নীচে জড়ো হয়েছিল সাবিতখানী, বুন্দেলখণ্ডী, চন্দেলা ও মেওয়াটী যোদ্ধার দল।

দুর্গাধিপতি ছিলেন মুহম্মদ বশীর খাঁ। শহরের তোরণে ও প্রাচীরের

ওপর এঁরই পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা পাহারা দিত। এঁর বসত-বাড়ি, দফতর এবং অধীনস্থ সৈন্যদের ব্যারাক ছিল কেল্লার ভেতরে। যখন বাহির-প্রাচীরেও স্থানাভাব ঘটল, তখন সৈয়দ জামালউদ্দীন খাঁ এবং গোপাল রাও মারাঠা, বাইরে বেরিয়ে, 'নওরাহী' গ্রামের পাশে বসবাস করতে লাগলেন এবং ওখানেই নিজেদের বাড়ি ও 'ক্যাম্প' বানালেন। স্থান সংকুলান না হওয়ায় নবাব মুর্তজা খাঁ বারীজ, মীর এহমদ বাঁসীওআলা, মীর আবুল বরকাত ও শেখ এহসান অযোধ্যা-ফয়জাবাদের মাঝখানে তাঁবুতেই থাকতেন।

জনবাহুল্যে, সৈন্যদের ভিড়ে শহরের ভেতরটা, বিশেষ ক'রে চক এলাকা, এতো জমজমাট ছিল, তার মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করা দায় হত, অসম্ভব ছিল বিনা বাধায় সোজা হেঁটে যাওয়া। ফয়জাবাদ তো নয়, যেন লোকারণ্য! বাজারে স্তূপীকৃত বিভিন্ন দেশের জিনিস। ফয়জাবাদে বাস করে উচ্চরুচিসম্পন্ন রইস ও শৌখীন আমীরদের বাছাইকরা গোষ্ঠী, এখবর শুনে চারদিক থেকে ব্যাপারীরা ছুটে এল মালবোঝাই হয়ে। দাম যা-ই হোক, হাতে-হাতে সব বিক্রী হয়ে যায়। আরও ভালো-ভালো জিনিসপত্র আসতে থাকে। ঈরাণী, কাবুলী, চীনে ও ফিরিংগী সওদাগররা দামী-দামী ভারী মাল নিয়ে হাজির হয়। যতো মুনাফা ওঠে, ততো লালসা বাড়ে, ততোই অনেক মেহনতে ও চেষ্টায় নতুনতর মালের আমদানী। মঁশিয়ো জঁা তেল, মঁশিয়ো সোন সোন, মঁশিয়ো পেত্রোজ প্রভৃতির মতো শ'ছুয়েক 'ফ্রাঁসীসী' (ফরাসী) এখানে থাকতেন। তাঁরা ছিলেন সরকারী 'মুলাজিম' (কর্মচারী)। এঁরা সৈন্যদের যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা দিতেন, তোপ, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের তত্ত্বাবধান করতেন, এবং শুজাউদ্দৌলার রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতেন এইসব ক'রে।

'তারীখ্-এ ফরহবখ্শ্'-এর লেখক মুনশী ফ্যায়েজবখ্শ্, যাঁর অনুগ্রহে এইসব বৃত্তান্ত আমি জেনেছি, এই সময়েই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁর লিখিত ইতিবৃত্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। তিনি লিখছেন: "আমি যখন প্রথম ঘর ছেড়ে ফয়জাবাদে গেলাম, এবং শহরের

পশ্চিমী ফটক থেকে চার মাইল দূরে মুমতাজনগরে পৌঁছলাম, দেখলাম কি—একটা গাছের তলায় থরেথরে মিঠাই, গরম-গরম খাবার, কাবাব, তরকারী, রুটি, পরোটা ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে। 'সবীল'[1] রয়েছে। 'নান-খাতাই', নানারকম শরবত, 'ফালুদা'ও বিক্রী হচ্ছে। সওদার জন্যে প্রায় শতখানেক লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছে দোকানের ওপর। মনে হল ঃ আমি বুঝি শহরের মধ্যেই এসে গেছি এবং খাস চকেই দাঁড়িয়ে আছি! কিন্তু শহরের ফটকই তো এখনও আসেনি, তবে ভেতরে এসে গেলাম কেমন করে?—এ রহস্যের কোন কূলকিনারা পেলাম না। লোকদের জিজ্ঞাসা করলাম তো, একজন পথচারী বললেন ঃ "জনাব, শহরের ফটকটা এখান থেকে এখনও চার মাইল। কোন্ খেয়ালে আছেন?" জবাব শুনে আমি তো থ!

"তারপর এলাম শহরে। আজব ব্যাপার! যেদিকে তাকাই, রংগিনী ও মনোরঞ্জিনী, নাচ। 'মাদারী'[2] তামাশা দেখাচ্ছে। লোকজন বেড়াচ্ছে এদিক-ওদিক, মজা করছে। ইত্যাকার শোভা আর হৈচৈ দেখে আমি হাঁ! সকাল থেকে রাত, রাত থেকে সকাল, ফৌজ পলটনের নাকাড়া বাজছে তো বাজছেই। 'পহর' ও 'ঘড়ী' জানাতে 'ন্যওবত' (নহবত) বেজে-বেজে উঠছে। ঘড়ির ওপর মুগুর পড়ছে; তার আওয়াজে কান ফেটে যাবার যোগাড়। আর, রাস্তায় রাস্তায় কতো-যে ঘোড়া, হাতি, উট, খচ্চর শিকারী কুকুর, গরু, মোষ, বলদ, ছ্যাক্‌রা আর তোপ চব্বিশ ঘণ্টা ধরে চলেছে তো চলেছেই, তার হিসেব নিকেশ নেই। রাস্তা চলাই দায়।

"আমার দৃষ্টির সামনে এক অপূর্ব শোভার ও দব্‌দবার শহর। দিল্লীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি থেকে শুরু করে সুবেশ শরিফজাদা, ইয়ুনানী 'হকীম',[3] অভিজাত নরনারী, বারবনিতা, দেশবিদেশের খ্যাত ও দক্ষ গায়ক—সকলেই এখানে সরকারের অধীনে কর্মরত। প্রচুর বেতন, ভোগবিলাসে ভাসমান জীবন। ছোটো বড়ো, সকলের 'জেব' ভর্তি টাকা, 'আশরফী'। দেখেশুনে মনে হয়, এখানে বুঝি কেউ কোনদিন

---

[1] জলসত্র। [2] সাপ-বাঁদর-ভালুক খেলায় যারা। [3] চিকিৎসক।

দারিদ্র্য ও ভিক্ষাবৃত্তিকে স্বপ্নেও দেখেনি। 'নওআব ওঅযীর' (নবাব উজীর) শুজাউদ্দৌলা বাহাতুর শহরের বাগ-বাগিচা, শোভা এবং প্রজাদের উন্নতিবিধানের জন্যে সর্বক্ষণ ব্যস্ত-সচেষ্ট। মনে হতে লাগল ঃ কয়েকদিনের মধ্যেই ফয়জাবাদ দিল্লীর প্রতিস্পর্ধী হয়ে উঠবে।"

যে জাঁকজমকের সঙ্গে নবাব শুজাউদ্দৌলা থাকতেন, সেরকম আর কোন রাজ্যের বা আর কোন শহরের রইসকে থাকতে দেখা যেতনা। সেই সঙ্গে লক্ষণীয়, আর কোন জায়গার লোকই, যেকোন সুযোগে সর্ব ব্যাপারে এমন বেপরোয়া অর্থব্যয়ও করতে পারত না। এই জন্যে নানা স্থানের নানান শ্রেণীর বড়ো-বড়ো 'দস্তকার' (শিল্পী), কারিগর, বিদ্যার্থীর দল স্ব-স্ব দেশ ছেড়ে ফয়জাবাদকেই স্বদেশ করে নিয়েছিল। ঢাকা, বাংলা, গুজরাট, মালব, হায়দারাবাদ, শাহজাহানাবাদ, লাহোর, পেশোয়ার, কাবুল কাশ্মীর ও মুলতানের একটা বড়োরকম ছাত্রগোষ্ঠী এখানে সব সময় থাকত, পণ্ডিতদের মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত, এবং ফয়জাবাদে বিদ্যমান জ্ঞান স্রোতে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়ে ঘরে ফিরে যেত। নবাব উজীর আর বছর দশ-বারো যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে ঘাঘরার তীরে এক নতুন শাহজাহানাবাদ গড়ে উঠত, সারা তুনিয়া দেখতে পেত নতুন, সজীব জিন্দা দিল্লীকে।

নবাব শুজাউদ্দৌলার ন বছর কার্যকালের ফলশ্রুতি ঃ ফয়জাবাদ। এই ন বছরের মধ্যে বর্ষার মাত্র চার মাসই তিনি শহরে থাকতেন ; বাকি সময় কাটত সরকারী কাজের দৌড়ঝাঁপে, ভ্রমণে ও শিকারে। স্বভাবতই, শুজাউদ্দৌলার আসক্তি ছিল সুন্দরী রমণীতে, নাচেগানে। ফলে, বারবনিতা ও নর্তকীদের খ্যাতি-পশার বেড়ে গেল, ভরে গেল অলিগলি। নবাবের অনুগ্রহ, 'ইনাম' (পুরস্কার) ইত্যাদির দৌলতে এরা এমন ধনবতী ও 'খুশহাল' (সংগতিসম্পন্না) হয়ে উঠল, যে প্রায়ই বেশ্যাদের ডেরা লেগে থাকত, তার সঙ্গে তুটো-তিনটে ক'রে বিশাল-বিশাল তাঁবু। নবাব সাহেব যখন জেলা পরিদর্শনে বা শুধুই ভ্রমণে বেরোতেন, নবাবী তাঁবুর সঙ্গে এদের তাঁবুও ছ্যাকরা গাড়িতে চাপিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে রওনা হত। পাশে পাশে থাকত দশজন

কি বারোজন তেলেংগী পাহারাদার। স্বয়ং শাসনকর্তারাই যখন এইরকম রীতি-আচার, তখন আমীর আর সরদাররাও যে নির্দ্বিধায় এর অনুসরণ করবে, তাতে আর সন্দেহ কী! সফরে ভ্রমণে সকলেরই সঙ্গে থাকত বারনারী-মণ্ডলী। বলা বাহুল্য, এর ফলে অনৈতিকতা ও নির্লজ্জতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। তবে, এও ঠিক যে, আমীরদের শৌখিনতায়, জনপদবধূদের বহুলতায়, শহরের শোভাও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। ফয়জাবাদ ধারন করেছিল বধূর বেশ।

1773 খ্রীষ্টাব্দে শুজাউদ্দৌলা চললেন পশ্চিমে। এই যাত্রায়, শাহী তাঁবুর শোভা ও প্রমোদের ধূম অনির্বচনীয়। মনে হচ্ছিল, নবাবী পতাকার সঙ্গে-সঙ্গে একটা বড়ো গোটা শহরই বুঝি সফর করতে বেরিয়েছে। লখনউ হয়ে পৌঁছলেন এটাওয়ায়, এটি তখন মারাঠাদের অধিকারে ছিল। একটি আক্রমণেই তিনি এটাওয়াকে মারাঠাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিজের দখলে নিয়ে এলেন। তারপর এহমদ খাঁ বংশের রাজ্যে প্রবেশ করে কাসগঞ্জ ও কৌড়িয়াগঞ্জে শিবির সন্নিবেশ করলেন। সেখান থেকে পত্র লিখে পাঠালেন বেরিলীর শাসক হাফিজ রহমত খাঁ বরাবরেষু :

"গত বছর আমি এক কোটি টাকা দিয়েছিলাম মহাদজী সিন্ধিয়া মারাঠাকে, যিনি আপনার সেই দুই অর্বুদ মূল্যের এলাকাটা আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। ওই টাকা দিয়ে আমি ওঁর কাছ থেকে জায়গাটা ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম এবং আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। অতএব, এই বাবদে আপনার কাছ থেকে যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আমার পাওনা, তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।"

হাফিজ রহমত খাঁ সমস্ত আফগান সরদার ও ভাই-বন্ধুদের একত্রিত করে বললেন :

"শুজাউদ্দৌলা যুদ্ধের জন্যে বাহানা খুঁজছেন। উনি যে অর্থ চেয়ে পাঠিয়েছেন, সেটা দিয়ে দেওয়াই বোধহয় ভালো। নিজের কাছ থেকে আমি কুড়ি লাখ দিচ্ছি; বাকি ত্রিশ লাখ তোমরা জোগাড় করে দাও।"

"অদূরদর্শী পাঠান সরদাররা জবাব দিল : শুজাউদ্দৌলার সৈন্যবল দেখতেই ওইরকম; আমাদের সঙ্গে কী আর লড়াইটা করবে? বাকি থাকে শুধু ওঁর ইংরেজ ফৌজ। কিন্তু আমরা যখন তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে ওদের তোপের ওপর গিয়ে পড়ব, সক্‌কলের যুদ্ধ-সাধ একেবারে মিটে যাবে। লেন-দেনের কোন প্রয়োজনই নাই।"

শুনে, হাফিজ রহমত খাঁ বললেন: "তোমাদের শক্তিসামর্থ্যে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবু, আমি বলে রাখছি, লড়াইয়ের রং যদি বদলে যায়, তাহলে আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসব না, জেনো। এবং পরিণাম যা কিছু হবে, তোমাদেরই তার ফলভোগ করতে হবে।"

বলা বাহুল্য, পত্রের উত্তর শুজাউদ্দৌলার মনঃপূত হল না। সৈন্য নিয়ে তিনি আক্রমণ করলেন। লড়াই হল। এবং যুদ্ধের ফলাফল —সে দুর্ভাগ্যের বিবরণ তো হাফিজ রহমত খাঁর কণ্ঠে পূর্বাহ্ণেই উচ্চারিত। তিনি শহীদ হলেন, শেষ হল তাঁর শাসন।

তবু শুজাউদ্দৌলা বিজয়ফল ভোগ করতে পেলেন না। যুদ্ধ হয়েছিল 13 সফর[1] 1188 'হিজরী' (1774 খ্রীষ্টাব্দ); 11 'শাবান'[2]-এ বেরিলী থেকে যাত্রা করে শুজাউদ্দৌলা এলেন লখনউ; 'রমযান'[3] মাসটা এখানেই রইলেন; 8 'শব্বাল'[4] লখনউ থেকে যাত্রা করে 14 তারিখে ফয়জাবাদ পৌঁছলেন। জয়লাভের পর মাত্র 9 মাস 10 দিন কেটেছে, এবং ঘরে ফিরে দেড় মাসও বিশ্রামের সুযোগ মিলল না। 23 'যীকাদ'[5] 1188 হিজরী (1774 খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর মৃত্যু হল। সেই সঙ্গে রুদ্ধ হয়ে গেল ফয়জাবাদের প্রগতিও।

তৎকালে অওধের শাসন ব্যাপারে সর্বাধিক প্রভাব ছিল নবাব শুজাউদ্দৌলা বাহাদুরের স্ত্রী 'বহূবেগম সাহিবার'। তিনি প্রচুর ধনবতী ছিলেন বলে মনে করা হত। তাঁর সমর্থন নিয়ে রাজগদীতে বসলেন নবাব আসফউদ্দৌলা। কিন্তু তাঁর নৈতিক চরিত্র বলে কিছু

[1-5] ইসলামী মাসের নাম: সফর—দ্বিতীয় মাস; শাবান—অষ্টম মাস; রমযান—নবম মাস; শব্বাল—দশম মাস; যীকাদ—একাদশ মাস।

ছিলনা। তাই দেখে, 'মুসাহিব'রা (সভাসদরা) মাতা ও পুত্রকে আলাদা রাখাই উচিত বলে মনে করলেন। নবাব আসফউদ্দৌলা বাহাদুর কিছুদিন কাটালেন ভ্রমণে ও শিকারে। তারপর লখনউয়ে বাস করতে আরম্ভ করলেন। এবং ওখান থেকেই মাকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে ও বারবার টাকা চেয়ে পাঠাতে লাগলেন।

বহুবেগম সাহিবা যতোদিন বেঁচে ছিলেন, ফয়জাবাদের শোভা অল্পবিস্তর বজায় ছিল। নবাব আসফউদ্দৌলার 'না-লায়কী' তথা অযোগ্যতায় তিনি সারা জীবন কষ্ট পেয়েছেন, বিঘ্নিত হয়েছে ফয়জাবাদের শাসন ও শান্তি। তবু, এই শ্রদ্ধেয়া মহিলার সারা জীবনব্যাপী এই ঝগড়া ও হাংগামা একদিক থেকে এর শোভা বাড়িয়েই দিয়েছিল। তাঁর দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল ফয়জাবাদের স্বল্পায়ু ইতিহাস। অতঃপর লখনউয়ের সম্মুখ-যাত্রারম্ভ। তার বর্ণনা করব পরবর্তী অধ্যায়ে।

॥ 2 ॥

লখনউয়ের জনপদ কবে গড়ে উঠল? কে এর সংস্থাপক? এই নামইবা কেন হল?—এ সব প্রশ্নের সঠিক জবাব কেউ দিতে পারেন না। তবে, বিভিন্ন রাজবংশের ঐতিহ্য এবং অনুমানের ওপর নির্ভর করে যেটুকু বলা যায়, তা হল এই—

কথিত আছে: লংকা বিজয় ও বনবাস অন্তে রাজা রামচন্দ্র যখন রাজসিংহাসনে উপবেশন করলেন, তখন বনবাসের সঙ্গী প্রাণাধিক ভাই লক্ষ্মণকে এই অঞ্চলটি জায়গীর হিসেবে দান করে-ছিলেন। লক্ষ্মণ এখানে এসে বসতি স্থাপন করলেন; নদীর তীরে একটা উঁচু টিলার ওপর জনপদ গড়ে উঠল। টিলাটি 'লক্ষ্মণটিলা', এবং জনবসতিটি 'লক্ষ্মণপুর' নামে প্রসিদ্ধ হল। এই টিলায় একটা খুব গভীর কূপ ছিল, তার তল ঠাহর করা যেতনা; লোকপ্রসিদ্ধি ছিল,

ওটা নাকি পাতাল পর্যন্ত চলে গেছে। এই ভাবনা থেকে জাত হল বিশ্বাস। হিন্দুরা ওর মধ্যে সভক্তি ফুল-জল অর্ঘ্য দিতে লাগল।

আরেকটি প্রবাদ: মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পৌত্র রাজা জনমেজয় এই স্থানটি জায়গীর দিয়েছিলেন মুনি-ঋষি তপস্বীদের। ইতস্তত: আশ্রম রচনা করে তাঁরা মগ্ন ছিলেন ঈশ্বর আরাধনায়। কিছুদিন পরে, তাঁদের শক্তিহীনতার সুযোগ নিয়ে, হিমালয়ের তরাই থেকে দুটি নতুন জাতি এসে প্রদেশটি অধিকার করে নিল। জাতি দুটি পরস্পর মেলা-মেশা করত। মনে হয়, এরা একই নৃগোষ্ঠীর দুই শাখা: একটি 'ভর', অন্যটি 'পাঁসী'।

এদেরই সঙ্গে 1030 খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ সালার মাসুদ গাজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। এবং 1202 খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজী সম্ভবত এদেরই ওপর চড়াও হয়েছিলেন। বস্তুত, এই দুই আক্রমণকারীর, বিশেষত সৈয়দ সালার মাসুদ গাজীর সঙ্গে যেসব পরিবার এসেছিল, তারাই এই প্রদেশের প্রথম মুসলমান বাসিন্দা।

'ভর' ও 'পাঁসী' ছাড়া এখানে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরাও ছিল প্রথমাবধি। এরাই সবাই মিলে এখানে একটা ছোটখাট শহর গড়ে তোলে এবং সুখে-শান্তিতে বাস করিতে থাকে। কিন্তু এই বসতির নাম 'লক্ষ্মণপুর' থেকে বদলে কবে যে 'লখনউ' হল, তা বলা কঠিন। 'লখনউ' নামের উল্লেখ সম্রাট আকবরের আগে পাওয়া যায় না। তবে, একথা অনস্বীকার্য, যে, এখানে প্রথম থেকেই হিন্দু-মুসলমানের বসবাস ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় লখনউয়ের শেখদের পারিবারিক ইতিবৃত্তে। তা থেকে জানা যায়: 1540 খ্রীষ্টাব্দে জৌনপুরে বাদশাহ হুমায়ুঁ যখন শেরশাহের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন, তখন তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সুলতানপুর, লখনউ ও পীলীভীতের মধ্যে দিয়ে পালিয়েছিলেন। বাদশাহ মাত্র চার ঘণ্টার জন্যে লখনউয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তখন তিনি পরাজিত, ক্ষমতাচ্যুত, প্রভুত্ববিরহিত। তবু লখনউবাসীরা শুধু সহৃদয় মান-

বিকতা ও অতিথিপরায়ণতার বশে, ওই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই, তাঁকে সংগ্রহ করে দিয়েছিল দশ হাজার টাকা ও পঞ্চাশটি ঘোড়া। অতো অল্প সময়ে ওগুলি সংগৃহীত হয়েছিল দেখে মনে হয়, এখানে তখন বর্ধিষ্ণু জনবসতি ছিল, এবং তখনকার অধিকাংশ নগরীর তুলনায় তৎকালীন লখনউয়ের শোভা ও সমৃদ্ধি ছিল অনেক বেশি।

সেই পুরনো জমানায় যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে শাহ মীনার পরিবারও ছিল, যাঁর 'মযার' (সমাধি) আজও সর্বসাধারণের শরণ-স্থল। বোধহয় এই সময়েই শাহ পীর মুহম্মদও এসেছিলেন। তিনি ঘর বেঁধেছিলেন খাস লক্ষ্মণটিলার ওপর, এবং ওখানেই দেহরক্ষা করেন। তাঁর অবস্থানের জন্যে পুরনো 'লক্ষ্মণটিলা' নাম বদল হয়ে যায় 'শাহ পীর মহম্মদ কা টিলা। কালক্রমে, গভীর কূপটিও বুজে যায়। পরবর্তীকালে শাহানশাহ অ্যাওরংগজেব যখন এখানে এসেছিলেন, ওই জায়গায় একটা ভালো, মজবুত, সুন্দর, সুশোভন মসজিদ তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন।

1590 খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর যখন হিন্দুস্তানকে বারোটি প্রদেশে বিভক্ত করলেন অওধের 'সুবেদার' তথা শাসকের রাজধানী হবার সৌভাগ্য লখনউই প্রথম অর্জন করল। ঠিক ওই সময়েই, যোগাযোগ বশতই বলা যায়, শেখ আবদুররহীম নামে বিজনৌরের এক হত-দরিদ্র ক্লান্ত বৃদ্ধ জীবিকার সন্ধানে দিল্লীতে উপনীত হয়েছিলেন। ক্রমে, রাজসভার আমীরদের সঙ্গে ভাব করে তিনি পৌঁছলেন সম্রাটের দরবারে। অবশেষে, শাহী মনসবদারী ও লখনউয়ে জায়গীর লাভ। খুব ধুমধাম ও জাঁকজমকের সঙ্গে তিনি এলেন নিজের জমিদারীতে, এবং এখানেই থেকে গেলেন। খাস লক্ষ্মণটিলা তথা শাহ পীর মহম্মদের টিলায় বসতি স্থাপন করে সেখানে পাঁচটি 'মুহল্লা' (মহল্লা) বানালেন। লখনউয়েই তাঁর 'দফন' (সমাধি) হয়। তাঁর 'মকবরা' (সমাধিভবন) আজও 'নাদান মহল' নামে বিখ্যাত। তাঁর বাড়িটি পছন্দ হওয়ায় ভারত সরকার কিছুদিন হল, স্বাধিকারভুক্ত করেছেন।

শেখ আবতুররহীম লক্ষ্মণটিলার পাশে আর একটা উঁচু জায়গায় একটা কেল্লাও তৈরী করিয়েছিলেন। ছোট, কিন্তু আশপাশের গড়গুলির তুলনায় অনেক মজবুত। স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর এর প্রভাব পড়েছিল গভীরভাবে। তার কারণও ছিল। শেখ আবতুর-রহীম শাহী দরবার থেকে 'আলমে-মাহী মরাতিব' (মৎস্য-ধ্বজা) দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। তাঁর কেল্লার একটি বাড়িতে ছাব্বিশটা 'মেহরাব' (খিলান) ছিল ; তার প্রত্যেকটিতে তুটো-তুটো করে মোট বাহান্নটা মাছ খোদাই করে দিয়েছিলেন শিল্পী। ফলে, কেল্লাটির নাম হয়ে যায় 'মচ্ছী ভওঅন', মৎস্য-ভবন। এই 'ভওঅন' শব্দ কেল্লা-অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে ; কিংবা, 'বাওঅন' (বাহান্ন) এর বিকৃত রূপও হতে পারে। যে-শিল্পী এই কেল্লাটি তৈরি করেছিলেন, তিনি ছিলেন জাতিতে আহীর, নাম : লখ্না। জনশ্রুতি : এ'র নামের সঙ্গে নাম মিলিয়েই শহর-লখনউ। কিছু লোকের ধারণা : 'লক্ষ্মণপুর' থেকেই বিকৃত 'লখনউ'। এর মধ্যে যেটাই হোক, এই জনপদের নামকরণ শেখ আবতুররহীমের আগমনের পরেই হয়।

কিছুদিন পরে, শেখ আবতুররহীমের বংশধর অর্থাৎ শেখজাদারা ছাড়া পাঠানদের আর একটা দলও এখানে এসেছিল। এরা বেছে নিল দক্ষিণ দিক এবং 'রামনগরের পাঠান' নামে পরিচিত হল। এখন যেখানে 'গোল দরওআযা,' সেই পর্যন্ত ছিল এদের জমিদারীর সীমা। এখান থেকে নদীর দিকে এগোলে শেখজাদাদের জমিদারীর এলাকা। পাঠানদের পরে শেখদের আর-একটা নতুন দল এসে পূব্ দিকে 'শুইয়ুখ-নবহরা'-য় বাস করতে লাগল। এখন যেখানে রেসিডেন্সীর ভাঙ্গা ঘরদোর পড়ে আছে, সেখানেই ছিল এদের জমি।

তিন দলেরই, নিজ-নিজ এলাকায়, প্রতিপত্তি ছিল। তবে, শেখজাদাদের প্রভাব ছিল সর্বজনীন, আশপাশের লোকেদের ওপর প্রভুত্বও ছিল অনেক বেশি। তার একাধিক কারণও ছিল। দিল্লী দরবারের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল ; এদেরই মধ্যে থেকে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি গোটা অওধ-প্রদেশের সুবেদার নিযুক্ত হয়েছিলেন ;

এবং এদের গড় 'মচ্ছী-ভওঅনে'র মজবুতী এতো প্রসিদ্ধ ছিল, যে প্রবাদই তৈরি হয়ে গিয়েছিল : 'জিস্‌কা মচ্ছী ভওঅন উস্‌কা লখনউ' — 'মচ্ছী-ভবন যার, লখনউ তার।'

আকবরের রাজত্বকালে লখনউয়ের উন্নতি হতে থাকে। জনবসতি বাড়তে ও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। একথা সত্য যে শেখজাদাদের মধ্যে থেকেই অওধের সুবেদার নির্বাচিত হতেন। তবু, সাধারণ প্রথা অনুসারে এই কাজে দিল্লীরই কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নিযুক্ত হতেন। তিনি বছর-ভোর ঘরেই বসে থাকতেন। কেবলমাত্র, রাজস্ব ইত্যাদি আদায়ের সময় একটু-আধটু দৌড়-ঝাঁপ করতেন। এখানে তখন থাকতেন তাঁর সহকারী। এ-কারণে, এঁদের দ্বারা শহরের উন্নতির কোন আশা-ভরসাই ছিল না। তবে হ্যাঁ, এখানকার যে দু-একজন শেখজাদা সুবেদার হয়েছিলেন, তাঁদের নিযুক্তির সুফল নিঃসন্দেহে লখনউ ভোগ করেছিল।

মনে হয়, লখনউয়ের দিকে আকবরের বিশেষ নজর ছিল। স্থানীয় ব্রাহ্মণদের বাজপেয়-যজ্ঞের জন্যে তিনি এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। এরপর থেকেই লখনউয়ের 'বাজপেয়ী ব্রাহ্মণ'দের খ্যাতি। এই সূত্রেই জানা যায়, এখানকার যেসব প্রাচীনতম হিন্দু পাড়া আকবরের সময়ে বর্তমান ছিল, সেগুলি হল : বাজপেয়ী টোলা, কাটারী টোলা, সোন্‌ধি টোলা, বাজারী টোলা এবং আহীরীটোলা। সবগুলিই চকের আশেপাশে।

মির্জা সেলিম, যিনি সিংহাসনে বসে নূরউদ্দীন জহাঁগীর নাম গ্রহণ করেছিলেন, পিতা বর্তমানে এবং নিজে যুবরাজ থাকাকালীন 'মির্জা-মণ্ডীর' পত্তন করেন। এটি 'মচ্ছী-ভওঅনের' পশ্চিমে অবস্থিত। আকবরের সময়ে এখানে সুবেদার ছিলেন জহর খাঁ। তিনি তো থাকতেন দিল্লীতে। তাঁর নায়েব কাজী মহমুদ বিলগ্রামী চকের দক্ষিণে, ডানদিক ঘেঁষে পত্তন করলেন মহমুদ-নগর ও বাঁদিক ঘেঁষে শাহগঞ্জ, এবং এদের ও চকের মাঝখানে বাদশাহর নামচিহ্নিত 'আকবরী দরওআযা'।

আকবরের শাসনকালে লখনউ ছিল বড়ো বাণিজ্য-কেন্দ্র। বিশাল বিশাল অট্টালিকার নির্মাণ, মহল্লার পর মহল্লার পত্তন তখন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। উন্নতির রেখা উর্ধ্বমুখী। একজন ফরাসী বণিক ঘোড়ার ব্যবসায় করতেন; এখান থেকে মুনাফা লোটবার আশায় কোন চেষ্টাই তিনি বাকি রাখেন নি। এমনকি, লখনউয়ে বাসের জন্যে তিনি শাহী দরবার থেকে 'মুস্তামিনী সনদ'[1] পর্যন্ত সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর আস্তাবল বানালেন। প্রথম বছরেই এমন ফুলে-ফেঁপে উঠলেন, চকের পাশে চারটে বড়োবড়ো বাড়িই তৈরি করে ফেললেন। বছর শেষ হল। বণিক 'মুস্তামিনী পরোয়ানার' নবীকরণের জন্যে আবেদন করলেন। কিন্তু অনুমতি মিলল না। তিনি জোর করে থাকতে চাইলেন। তখন শাহানশাহর হুকুমে নগরপাল তাঁর ঘরবাড়ি বাজেয়াপ্ত করে সরকারে জমা দিলেন এবং বণিককে বার করে দিলেন শহর থেকে। এই বাড়ি চারটে বহুদিন সরকারের দখলে ছিল। পরে শাহানশাহ অ্যাওরংগজেব আলমগীরের শাসনকালে, যখন মুল্‌লা নিজামউদ্দীন সিহালভী স্ব-নগরীর উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে লখনউয়ে বসবাসের সংকল্প করলেন, তখন সরকারের তরফ থেকে এই বাড়ি চারটে উপহার স্বরূপ তাঁকে দেওয়া হল। পরিবারের সকলকে নিয়ে এসে তিনি এখানে বাস করতে লাগলেন। এগুলি এবং আশপাশের আরও অনেক বাড়ি মিলে 'ফিরংগী মহল' নামে আজও পরিচিত। মুল্‌লা সাহেবের শুভাগমন সুফলবতী হয়েছিল—লখনউ অচিরেই পরিণত হল জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্দ্র ও

---

[1] 'মুস্তামিন'-এর অর্থ: শান্তিকামী। সে সময়ে, হিন্দু ও মুসলমানদের কাছ থেকে য়োরোপীয়দের বিপদের ভয় ছিল। তাই, তারা যেখানে থাকতে চাইত, সেই বিশেষ স্থানের জন্যে দিল্লীর দরবার থেকে 'মুস্তামিনী সনদ' নিয়ে আসত—যাতে, শাসকবর্গ ও জনগণ তাদের বিরক্ত না ক'রে শান্তিতে থাকতে দেয়। এই সনদ প্রসঙ্গে রাজ্যের ওপর একটা দায়িত্ব এসে যেত। হয়তো সেইজন্যেই এক বছরের চেয়ে বেশি সময়ের জন্যে সনদ সাধারণত দেওয়া হত না।

বিত্থার্থীদের আশ্রমে। বিত্থাবৈশিষ্ট্যে এই জ্ঞানপীঠ এতো উন্নতি করেছিল, দূর দূর থেকে ছাত্ররা এসে জমায়েৎ হত লখনউয়ে ; এবং মুল্‌লা নিজামউদ্দীন প্রণীত পাঠ্যক্রম 'সিলসিলা-এ নিজামিয়া' বহুদিন পর্যন্ত, শুধু হিন্দুস্তান নয়, সমগ্র এশিয়ার পাঠ্যক্রম ছিল। একে একটা অবদানই বলা যেতে পারে।

য়োরোপীয় পর্যটক ল্যাকেট 1631 খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ শাহজাহাঁ বাদশাহর শাসনকালের গোড়ার দিকে হিন্দুস্তান পরিভ্রমণ করেছিলেন। লখনউ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : 'শানদার মণ্ডী' (জাঁকাল বাজার)। শাহজাহাঁর সময়ে এখানে সুবেদার ছিলেন সুলতান আলী শাহ কুলী খাঁ। তাঁর তুই ছেলে : মির্জা ফাজিল ও মির্জা মনসুর। তুজনের নামে—মহমুদনগরের দক্ষিণে, একটু এগিয়ে—তুটো নতুন নগরীর পত্তন হয় : ফাজিলনগর ও মনসুরনগর।

আশরফ আলী খাঁ নামে একজন রিসালদার ছিলেন। তিনি গড়লেন আশরফাবাদ। তাঁর ভাই মুশর্‌রফ আলী খাঁ খালের অন্যদিকে বাড়ি তৈরি করে আর এক মহল্লার স্থাপনা করলেন : মুশর্‌রফাবাদ—নাম বদলে-বদলে বর্তমানে 'নও বস্‌তা'। পীর খাঁ ছিলেন ফৌজী অফিসার ; তিনি এর পশ্চিমে, কিছুটা দূরে গিয়ে নিজের গড় বানালেন। স্থানটি আজও 'পীর খাঁ কী গঢ়ী' নামে পরিচিত।

একদা কোন বিশেষ প্রয়োজনে শাহানশাহ অ্যওরংগজেব আলমগীর গিয়েছিলেন অযোধ্যায়। ফেরার পথে লখনউ হয়ে দিল্লী যান। এই সময়েই তিনি শাহ পীর মুহম্মদের টিলার ওপরে সেই মসজিদটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। লক্ষ্মণটিলার ঠিক ওপরে, অনেক উঁচুতে এটি অবস্থিত। বস্তুত, সারা লখনউয়ে, মসজিদের জন্যে এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর নেই। সম্ভবত: এই সময়েই ফিরিংগী মহলের বাড়ি তিনি পণ্ডিত মুল্‌লা নিজামউদ্দীনকে উপহার দিয়ে থাকবেন।

মুহম্মদ শাহ রংগীলার সময়ে লখনউয়ের সুবেদার ছিলেন গিরধা নাংগা নামে এক হিন্দু বীর রিসালদার। তাঁর কাকা ছবীলে রাম

দিল্লীর তরফ থেকে এলাহাবাদের শাসক নিযুক্ত ছিলেন। ছবীলে রামের মৃত্যুর পর গিরধা নাংগা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, যেমন করে হোক, কাকার জায়গায় এলাহাবাদের শাসক হবেন। কিন্তু পরে নিজেই সাত-পাঁচ ভেবে বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন। দরবার থেকে তাঁকে অওধের সুবেদারীর 'খিলঅত'[1] দেওয়া হল। অতঃপর তিনি এখানেই বাস করতে লাগলেন। তাঁর বিবি—যাঁকে 'রাণী' বলা হত—রাণী-কাটরার পত্তন করেছিলেন।

এখানে তখন শেখজাদাদের প্রবল প্রতাপ। 'হাকিম'[2] বা সুবেদার, যিনিই হোন, যতো জবরদস্তই হোন এবং সরকারের কাছ থেকে যে সনদই নিয়ে আসুন, এদের এলাকায় পা বাড়ানোর সাহস কারও হত না। 'মচ্ছী ভওঅন' আমীরী মহলের মর্যাদা লাভ করেছিল; শেখেরা তাকে নিজেদের মৌরুসী সম্পত্তি করে নিয়েছিল। দিল্লী থেকে যে কর্তাব্যক্তিই আসুন না কেন, এদের কাছে তাঁর ফড়্ফড়ানি চলত না। এরা 'মচ্ছী-ভওঅনে'র পাশে আরও দুটো অট্টালিকা তৈরি করিয়েছিল; একটার নাম 'মুবারক মহল' অন্যটির 'পঞ্চ মহলা'। কেউ বলে, 'পঞ্চ মহলা' ছিল পাঁচতলা; কেউ বলে পাশাপাশি পাঁচটা মহল। সে যাই হোক, এর দক্ষিণ দিকে একটা বড়ো 'মেহরাবদার ফাটক' (খিলানওয়ালা তোরণ) ছিল, যাকে বলা হত 'শেখন দরওআযা'। শহরের যারা শেখজাদাদের বাড়ি যেতে চাইত তাদের সকলকে এই ফাটক দিয়েই যেতে হত।

দুঃসাহসী শেখজাদারা এই ফটকে একটা খোলা তলোয়ার ঝুলিয়ে রাখত। হুকুম দেওয়া ছিল: যে-কেউ এখানে আসতে চাইবে—সে যে-ই হোক আর যত বড়ো লোকই হোক—আগে তলোয়ারকে নীচু হয়ে সেলাম জানাবে, তারপর পা বাড়াবে। এ-আদেশ অমান্য করার

[1] খিলাত বা খেলাত: বাদশাহের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মানজনক বা অনুগ্রহজ্ঞাপক বস্ত্র।

[2] বিভাগীয় শাসক।

সাহস কারও ছিল না। এমন কি, দিল্লী থেকে যে-শাসক নিযুক্ত হয়ে আসতেন, শেখেদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে, তাঁকেও ওই তলোয়ারের সামনে মাথা নীচু করতেই হত।

এই ছিল লখনউ। অতঃপর 1732 খ্রীষ্টাব্দে নবাব সাদত আলী খাঁ বুরহান-উল-মুল্‌ক্‌ দিল্লী দরবার থেকে অওধের সুবেদার নিযুক্ত হয়ে এলেন। ইনিই ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছিলেন হিন্দুস্তানের এই অন্তিম পূর্বী দরবারের, যার চূড়ান্ত ঔৎকর্ষ্যকেই পূর্বী-সংস্কৃতির শেষ নিদর্শন বলে মেনে নিয়ে আমি এগোতে চাইছি। এর আগে আমি ফয়জাবাদের বিবরণ দিয়েছি। সেটি হল এই সংস্কৃতির প্রথম পর্ব; লখনউ দরবার তার পরিশিষ্ট।

বর্তমান অধ্যায়ে আমি এই দরবারের প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী লখনউয়ের ছবি তুলে ধরেছি। পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে বর্ণনা করব ন্যশাপুর বংশের শাসন-ইতিবৃত্ত। তার পরে দেখাব ঃ এই সংস্কৃতির স্বরূপ কী ছিল, কেমন ছিল ॥

॥ 3 ॥

নবাব বুরহান-উল-মুল্‌ক্‌ মাত্র ছ বছরই অওধ ও লখনউয়ে থাকতে পেরেছিলেন। 1735 খ্রীষ্টাব্দে নাদিরশাহ হিন্দুস্তান আক্রমণ করলেন। দিল্লী থেকে নবাবকে জোর তলব পাঠানো হল। এখানে সহায়ক ও প্রতিনিধি হিসেবে নবাব রেখে গেলেন তাঁর ভাগ্নে ও জামাই সফদরজংগকে। এ ছাড়া, নাদিরশাহী হামলার সঙ্গে লখনউয়ের কোন সম্পর্ক ছিলনা। নাদির দিল্লী লুট করলেন, 'কত্‌লে আম' (গণহত্যা) করলেন। দিল্লীতেই নিহত হলেন নবাব বুরহান-উল-মুল্‌ক্‌। তাঁর ভাইপো শেরজংগ অওধের সুবেদারীর জন্যে সুপারিশ করলেন নাদিরশাহর কাছে। এদিকে, বুরহান-উল-মুল্‌ক্‌-এর বিশ্বাসভাজন কর্মচারীদের অন্যতম রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ

নাদিরশাহ সকাশে একটি আবেদনপত্র পাঠালেন। তাতে বললেন : 'নবাব বুরহান-উল-মুল্‌ক্ শেরজংগের ওপর আদৌ প্রসন্ন ছিলেন না। এবং ছিলেন না বলেই, আত্মজাকে ওঁর হাতে না দিয়ে সফরদরজংগের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। এখানে, সফদরজংগই নবাবের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, এবং এখনও করছেন। বুরহান-উল-মুল্‌ক্-এর সম্পত্তির মালিক এখন সরকার, যাকে ইচ্ছে দিতে পারেন ; যেহেতু তাঁর কোন ওয়ারিস নেই। আর একটি নিবেদন এই যে, সফদরজংগ গম্ভীর-স্বভাব, ঈশ্বরভক্ত, যোগ্য এবং প্রতিজ্ঞা পালনে তৎপর। ফৌজও তাঁর অনুগত। এছাড়া হুজুরের জন্যে বুরহান-উল-মুল্‌ক্ দুকোটি টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ; সে টাকা আদায় দেবার ব্যবস্থা সফদরজংগ করে রেখেছেন। যখনই হুকুম হবে, পৌঁছে দেওয়া হবে। ইত্যাদি কারণে, আশা করছি, হুজুর এঁকেই সুপারিশ করবেন।'

আবেদনপত্রপাঠে নাদিরশাহ নিজেই মুহম্মদ শাহর কাছ থেকে সফদরজংগের জন্যে সুবেদারীর খেলাত নিয়ে নিলেন এবং নিজের একজন সভাসদ ও একশো অশ্বারোহীর সঙ্গে রওনা করিয়ে দিলেন অওধে, সফদরজংগের কাছে। সেই খেলাত পরিধান করে সফদরজংগ দুকোটি টাকা নজরানা পাঠিয়ে দিলেন নাদিরের কাছে। তারপর প্রবৃত্ত হলেন স্বরাজ্য-শাসনে।

সফদরজংগের পুরো নাম ছিল ; 'মির্জা সকীম অবুল মনসুর খাঁ, সফদরজংগ।' বুরহান-উল-মুল্‌ক্ এর বীরত্ব, সরলতা, উদ্যমশীলতা ও 'ইমানদারী' (বিশ্বস্ততা), কোনটাই তাঁর ছিলনা। তবে সাহস ছিল। দানধ্যান করতেন। দয়ালু, প্রজাবৎসল ও সুশাসক ছিলেন। শহর থেকে তিন মাইল দূরে জালালাবাদের দুর্গ গড়লেন ; 'মচ্ছী-ভওঅনের' মধ্যস্থিত পঞ্চ মহলের পুরনো অট্টালিকাটি নিয়ে নিলেন শেখজাদাদের কাছ থেকে ; বিনিময়ে, শেখদের বসবাসের জন্যে দিলেন 700 একর জমির দুটি গ্রাম। এটা শেখজাদাদের ওপর অত্যাচারই ; তবু, এরই ফলে, লখনউয়ের জানপদসমৃদ্ধি ও বিস্তার ঘটল।

সফদরজংগ 'মচ্ছী ভওঅনের' সংস্কার করে তাকে সুন্দরতরও করে দিলেন।

মাত্র পাঁচটি বছর সফদরজংগ নিজ সুবায় থাকতে পেরেছিলেন। দিল্লী থেকে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। রাজা নওল রায়কে আপন প্রতিনিধি করে লখনউয়ে রেখে তিনি দিল্লী চলে গেলেন। নওল রায় ছিলেন একাধারে বীর ও বিদ্যাপ্রেমী, সময়নিষ্ঠ ও পরিশ্রমী, এবং উচ্চবিত্ত শাসক। এর সঙ্গে খুদা তাঁকে তাঁর প্রভুর মতোই উৎসাহ ও দানশীলতা গুণ দিয়েছিলেন। তিনি 'মচ্ছী ভওঅনের' সামনে নদীর ওপর একটা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করলেন। ভিতের থাম বসাবার জন্যে গভীর কূপ খনন করা হল। কিন্তু থাম আর হলনা। তার আগেই মালিকের নির্দেশে তাঁকে যেতে হল এহমদ খাঁ বংগশের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে। বিশাল ও জবরদস্ত বাহিনী নিয়েই তিনি অভিযানে গিয়েছিলেন ; কিন্তু জীবিত ফিরতে পারলেন না। সেতুর প্রারব্ধ কাজ অসমাপ্তই থেকে গেল।

এহমদ খাঁ বংগশ অত্যন্ত পরাক্রমশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্যে প্রয়োজন ছিল একজন বুরহান-উল-মুল্‌ক্‌এর। সফদরজংগ তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না। এহমদ খাঁর ও তৎসহ আফগানদের শক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল। সফদরজংগ সবরকম চেষ্টাই করেছিলেন, খোদ দিল্লীর শাহানশাহকে পর্যন্ত নিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন ; কিন্তু এহমদ খাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারেন নি। তাঁর নির্দেশে, হাফিজ রহমত খাঁ খয়রাবাদ দখল করলেন, অওধের শহরে-নগরে লুটতরাজ আরম্ভ করে দিলেন ; এবং তাঁর পুত্র মহমুদ খাঁ ফৌজ নিয়ে চললেন লখনউ দখল করতে।

1750 খ্রীষ্টাব্দে পাঠানরা মলীহাবাদ নিয়ে নিল। 1751 খ্রীষ্টাব্দে মহমুদ খাঁর জনৈক আত্মীয় কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে লখনউ অভিমুখে যাত্রা করলেন। শহরের বাইরে শিবির সন্নিবেশ-অন্তে একজনকে 'কোতওআল' (কোতোয়াল) নিযুক্ত করে ভেতরে পাঠালেন। শহরে তখন সফদরজংগের লোকেরা ছিলনা। আর-যারা ছিল,

পাঠানদের আগমনের সংবাদে পালিয়ে গেল। পাঠান কোতোয়াল শহরে প্রবেশ করেই অত্যাচার শুরু করে দিল।

সেই সময় লখনউয়ের শেখজাদাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিষ্ঠিত ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন শেখ মুইজউদ্দীন। তিনি শহর থেকে বেরিয়ে আফগানদের সর্দারের সঙ্গে দেখা করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একজন এসে অভিযোগ করল: শহরবাসীরা কোতোয়ালকে অপমান করছে, কেউ তার হুকুম মানছে না। শেখ মুইজউদ্দীন বললেন: "কার এতো সাহস এমন 'গুস্‌তাখী' (অপরাধ) করে! আমি এখনই গিয়ে দুষ্কৃতিকারীদের শাস্তি দিচ্ছি।" এই বলে তিনি চলে এলেন। ঘরে ফিরেই ভাই-বন্ধু সবাইকে ডেকে বললেন: "পাঠানদের কথার ও কাজের ঠিক নেই। তার চেয়ে ভালো নবাব সফদরজংগকে সাহায্য করা, এবং যুদ্ধ করে পাঠানদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া।" ঘরের গহনাপত্র বিক্রী করে শেখ মুইজউদ্দীন একটি সেনাদল গড়ে তুললেন এবং যতো শেখজাদা ছিল সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কোতোয়ালকে আক্রমণ করলেন। সেতো নিজের জান নিয়ে পালিয়ে বাঁচল। ওদিকে শেখ সাহেব একজন মুগলকে দরবারী পোষাক পরিয়ে নিজের বাড়িতে বসিয়ে দিলেন এবং ঘোষণা করে দিলেন: 'সফদরজংগ এই মুগলকে কোতোয়াল নিযুক্ত করে পাঠিয়েছেন'। সেইসঙ্গে, হজরত আলীর নামে একটা সবুজ পতাকাও তুলে দিলেন। লোকেরা দলে দলে এসে সমবেত হল তার নীচে।

খবর শুনে পাঠানরা শহর আক্রমণ করল। রুখে দাঁড়াল শেখজাদারা প্রাণ তুচ্ছ ক'রে, এবং আর একবার দেখিয়ে দিল নিজেদের পুরনো বাহাদুরী। সেই প্রচণ্ড প্রতিরোধ পাঠানরা 'বরদাশ্‌ত্‌' (সহ্য) করতে পারল না। পনেরো হাজার সৈন্য নিয়ে পালিয়ে গেল। আর, সেই সুযোগে, শেখজাদারা গোটা অওধ-প্রদেশ থেকে পাঠানদের মেরে তাড়িয়ে দিল।

দুবছর পরে সন্ধি হল এহমদ খাঁ বংগশের সঙ্গে। 1753 খ্রীষ্টাব্দে নবাব সফদরজংগ আবার লখনউ ফিরে এলেন। এবারে এসে

উঠলেন মেহদী ঘাটে। এখানে বসবাসের উদ্দেশ্যে একটা বাড়ি তৈরি করালেন। তারপর মনোযোগ দিলেন সৈন্য সংস্কারে। কিন্তু অবকাশ পেলেন না। ওই বছরেই তাঁর শিবির পড়েছিল সুলতানপুরের কাছে, পাপড়ঘাটে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃতদেহ নিয়ে এসে কবর দেওয়া হল ফয়জাবাদের 'গুলাব বাড়ী'তে। কিছুদিন পরে মৃতাস্থি নিয়ে যাওয়া হল দিল্লীতে এবং ওখানেই সমাহিত করা হল। তার ওপর বিদ্যমান সুন্দর 'মকবারা' (সমাধিভবন)। বিশ্বের পর্যটকরা আজও এই সমাধিভবনকে দেখে সাদর শ্রদ্ধায়।

॥ 4 ॥

সফদরজংগ মনসুর আলী খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নবাব সুজাউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করলেন 1753 খৃষ্টাব্দে। এই সময়ের কিছু বর্ণনা এই রচনার প্রথম ভাগে দিয়েছি। নতুন নবাব ছিলেন উদ্ধত ও চঞ্চল-স্বভাব, তবে শাসক হিসেবে যথেষ্ট সাহসী। দুর্ভাগ্যবশত, তাঁর শাসনকালে বড়ো বড়ো উপদ্রব ও ঝগড়া-ফ্যাসাদ লেগেই ছিল। তাঁরই চোখের সামনে বিশ্বের দুই প্রতাপশালী ঐতিহাসিক জাতির ও শক্তির ভাগ্য নির্ণীত হয়েছে। প্রথমটি হল, পাণিপথের সেই ভয়াবহ যুদ্ধ, যার একদিকে এহমদ শাহ দুর্‌রাণী, শুজাউদ্দৌলা ও নজীবউদ্দৌলার সঙ্গে রোহিলাখণ্ডের পাঠানদের জবরদস্ত ফৌজ, অন্যদিকে মারাঠা পঙ্গপাল। পরেরটা, বক্‌সারের তুমুল যুদ্ধ, ইংরেজের সুশিক্ষিত সৈন্য একদিকে, অন্যদিকে শুজাউদ্দৌলার বিপুল বাহিনী। পাণিপথ যুদ্ধের চার বছর পরে 1763 খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত এই লড়াই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিল ঃ হিন্দুস্তান আর মুসলমানদের নয়, এবার থেকে ইংরেজদের।

এই যুদ্ধের আগে শুজাউদ্দৌলা লখনউয়েই ছিলেন। কিন্তু বড়ো-বড়ো অভিযান, রাজনৈতিক ব্যস্ততা এবং সামরিক সংগঠনের ফাঁকে

এমন সময় ছিলনা, যে, শহরের উন্নতি ও অলংকরণের দিকে নজর দেন। তিনি কেল্লা বানিয়েছেন, গড় তৈরি করেছেন, লড়াইয়ের হাতিয়ার এবং ফৌজী সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এমন ফুরসৎ ছিলনা, যে, ঘরকে দুরস্ত, শহরকে সুসজ্জিত করেন। আগেই বলেছি, বকসারের লড়াইয়ের পর তিনি ফয়জাবাদে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। ফলে, লখনউ তাঁর কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হল। তাঁর মৃত্যু হয় 1775 খৃষ্টাব্দে। উত্তরাধিকারী হলেন নবাব আসফউদ্দৌলা।

রাজসিংহাসনে বসেই আসফউদ্দৌলা মায়ের ওপর বিরক্ত হয়ে লখনউ চলে যান। এই সময় থেকেই অওধ-দরবারের দ্যুতি ম্লানতর এবং লখনউয়ের বাহ্যিক শোভা উজ্জ্বলতর হতে থাকে। বকসারের যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের পর ইংরেজেরা অওধ-দরবারে হস্তক্ষেপের অধিকার পাকা করে নিল; সেনা-সংস্কারের পথে বাধানিষেধ আরোপিত হল; এবং অওধ-সেনা যাতে ইংরেজদের মোকাবিলা করার শক্তি আর কোনদিন না সঞ্চয় করতে পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখা হতে লাগল। তবু, শুজাউদ্দৌলা যতোদিন ফয়জাবাদে জীবিত ছিলেন, সৈন্যদল-সংস্কারেই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর দিনরাত্রির চিন্তা: যেমন করে হোক, শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক মুনশী ফ্যায়জবখ্‌শ্‌ তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ 'তারিখ্‌-এ-ফরহবখ্‌শ্‌'-এ এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন: দ্রুত গুলি ভরার ও ফায়ার করার নৈপুণ্যে শুজাউদ্দৌলার ফৌজী বন্দুকের মোকাবিলা করার ক্ষমতা ইংরেজ সেনার বন্দুকের ছিল না।'

আসফউদ্দৌলার শাসন শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এইসব ব্যাপারের ইতি। কারণ, ইংরেজ তখন অত্যন্ত হুঁশিয়ারীর সঙ্গে আপনার অধিকার বাড়াতে আরম্ভ করেছে। খুব চতুরতার সঙ্গে তারা আসফউদ্দৌলাকে বোঝাল: সৈন্যদের সংস্কারের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, মন দিতে পারেন অন্যান্য কার্যকলাপে। আসফউদ্দৌলার নিজেরও ফৌজের খুব একটা শখ ছিল না। টাকা ওড়ানো, মজা ওড়ানোর জন্যে তাঁর অর্থের প্রয়োজন ছিল; এবং

সৈন্যবাহিনী উঠিয়ে না দিলে এই প্রয়োজন মেটানো অসম্ভব। অতএব, কিছু খাস সৈন্য রেখে, বাকি সবাইকে তিনি পত্রপাঠ বিদায় দিলেন। তারপর আকণ্ঠ ডুবে গেলেন আয়েশে-বিলাসে। যারা তাঁকে অ-পদস্থ করল, তারাই হল তাঁর আজ্ঞাকারী মিত্র; তাদেরই ইশারায় তিনি চলতেন; তাদের পরামর্শ ছাড়া আর কারও কথায় কর্ণপাত করতেন না।

এই সনিষ্ঠ প্রীতির বিনিময়ে ইংরেজরা দিল রোহিলাখণ্ডের শাসনভার। তারপর যখন মা "বহুবেগম সাহিবা"কে উত্যক্ত করা ও তাঁর কাছ থেকে টাকা আদায়ের জন্যে সাহায্য চাইলেন, ইংরেজ খুব উদার হয়েই তাঁকে দিল নৈতিক সহায়তা, সমর্থন জানাল। এতো কাণ্ডকারখানার পরেও, নবাব বা লখনউয়ের প্রজাবর্গ, কেউই উপলব্ধি পর্যন্ত করতে পারলনা, যে দেশের শাসনকার্যে বাইরের শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তার বড়ো কারণ: আসফউদ্দৌলার সীমাহীন উদারতা ও বিলাসিতা প্রজাসাধারণকেও সমান বিলাসী করে তুলেছিল। এর শেষ পরিণাম কী হবে—ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবে থেকে একথা ভেবে দেখার প্রয়োজনই কেউ বোধ করল না!

এই বিলাসিতার ফল: লখনউয়ের বহিরঙ্গ-সমৃদ্ধি। দরবারের জাঁকজমক এতো বেড়ে গেল, অন্যত্র, অন্য দরবারে তা দুর্লভদর্শন। বিলাস ও ভোগের এতো সামগ্রী জড়ো হল, আর কোথাও সেরকম দেখা যায় না। লখনউ শহরের উন্নতি ও সৌন্দর্য ঐৎকর্ষ্যের এমন এক পর্যায়ে উপনীত হল, শুধু হিন্দুস্তানের নয়, হয়তো সারা দুনিয়ার কোন শহরই তার সামনে দাঁড়াতে পারত না। যে অর্থ শুজাউদ্দৌলা খরচ করতেন সৈন্য ও যুদ্ধ-প্রস্তুতি বাবদ, সেই অর্থ আসফউদ্দৌলা ব্যয় করতে লাগলেন বিলাসিতায়, শহর সাজানোয় ও তার উন্নতি-বিধানে। দেখতে দেখতে দুনিয়ার যাবতীয় আনন্দ-উপকরণ এখানে এসে জড়ো হল। একটিমাত্র বাসনাই তাঁর ছিল: 'হায়দরাবাদের নিজাম অথবা টীপু সুলতান, যিনিই হোন, কারও দরবারের আড়ম্বর ও দব্‌দবা আমার দরবারের চেয়ে অধিক যেন না হয়!'

পুত্র উজীর আলীর বিবাহে এমন ধুমধাম তিনি করেছিলেন, বরযাত্রার ঠাটবাটের ইতিহাসে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি। বরযাত্রীর শোভাযাত্রায় হাতীই ছিল বারো শ'। বরের দেহে যে রাজবস্ত্র ছিল, তাতে কুড়ি লক্ষ টাকার হীরে জহরত লাগানো ছিল। নাচ গানের আসরের জন্যে ছিল ছুটো বড়ো-বড়ো সুসজ্জিত 'শানদার' (জাঁকজমকপূর্ণ) শিবির—প্রত্যেকটা 60 ফুট চওড়া, 1200 ফুট লম্বা, উচ্চতায় 60 ফুট। খুব সুন্দর, দামী-দামী কাপড় লাগানো। শিবির ছুটো তৈরি করতে রাজকোষের দশ লাখ টাকা খরচ হয়েছিল।

'মচ্ছি-ভওঅনে'র পশ্চিমে, নদীর তীরে, নবাব তৈরি করেছিলেন 'দওলতখানা', 'রুমী দরওআযা' এবং একটি অনুপম ইমামবাড়া। 1784 খৃষ্টাব্দে অওধে আকাল দেখা দেয়, শহরের বড়ো লোকেরাও অনাহারে মরতে থাকে। সেই নিদারুণ অবস্থায়, প্রজাদের সাহায্যের জন্যে, ইমামবাড়াটি ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মজুরের কাজকে সম্মানহানিকর বলে মনে করত। তাই ইমারত নির্মাণের কাজ দিনের পর রাত্রেও চলত। শহরের দরিদ্র ও ক্ষুধার্তরা রাতের অন্ধকারে এসে জনমজুরদের সঙ্গে যোগ দিত, কাজ হত মশালের আলোয়। যে নিষ্ঠা, ভক্তি ও ধর্মোৎসাহের সঙ্গে নবাব এই ইমারতটি তৈরি করিয়েছিলেন, ঠিক সেই নির্মল ও আন্তরিক উৎসাহ-সহকারে লোকেরাও এটিকে তৈরি করেছিল। ফলে, এটি এমন 'শানদার' ও সুন্দর কান্তি লাভ করল, যা, এই জাতীয় ইমারতের মধ্যে অদ্ভুত ও অতুলনীয়। এর নক্সা তৈরি করার জন্যে বড়ো ও বিখ্যাত সব স্থপতি ও শিল্পীদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল। প্রত্যেকের চেষ্টা ছিল, তার নকশা যেন অন্যের প্রস্তাবিত নকশাকে ছাড়িয়ে যায়। অবশেষে যাঁর নকশা পছন্দ হল, তিনি তখনকার অদ্বিতীয় শিল্পী কিফায়ত উল্লাহ। তদনুসারে, এই 167 ফুট লম্বা ও 53 ফুট চওড়া ইমারত নির্মাণের কাজ আরম্ভ হল। আগাগোড়া ইঁট ও খুব ভালো জাতের চুন

দিয়ে তৈরি। নীচে থেকে ছাদ পর্যন্ত কোথাও কাঠের নামগন্ধও নেই। লখনউয়ে 'সংগ্‌মরমর' (মার্বেল পাথর) প্রায়-দুষ্প্রাপ্য ছিল। তাই মুগল বাদশাহদের পাথরের তৈরি অট্টালিকা আর এর জাত একেবারে আলাদা। এই ইমামবাড়া এবং আসফউদ্দৌলার অন্যান্য অট্টালিকা দেখলে বোঝা যায়ঃ সৌন্দর্যের ও আড়ম্বরের এ এক নতুন রূপ। খিলেন দিয়ে তৈরি ইমামবাড়ার বক্র ছাদ খুব বড়ো। এমন সুবঙ্কিম ছাদ দুনিয়ার আর কোথাও নেই। এ কারণে এটিও পৃথিবীর আশ্চর্যজনক কারিগরীর মধ্যে পরিগণিত হবার যোগ্য।

আসফউদ্দৌলার অট্টালিকার ওপর য়োরোপীয় স্থাপত্যেরও বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই। স্ব-শ্রেণীতে, এগুলি খাঁটি এশীয় অট্টালিকা, যার মধ্যে লোকদেখানোর অহমিকা নেই, আছে অকৃত্রিম আভিজাত্য। নবাব আসফউদ্দৌলার পরে এইসব ইমারতের দেখাশোনা কেউ করেনি। 'গদর' বা সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজরা এটি নিয়ে নেয়; আশপাশের বাড়িগুলি ভেঙ্গে দেয়, এবং (একদিকে নদী ছিলই,) অন্য তিনদিকে ময়দান করে ইমামবাড়াকে কেল্লা এবং 'রুমী দরওআযা'কে তার তোরণ বানিয়ে নেয়। গোরা এসে ওঠে ইমামবাড়ায়। বড়ো হলে ছিল অস্ত্রাগার, মেঝের ওপর দিয়ে বড়ো বড়ো কামান আসা-যাওয়া করত। তবু মেঝেয় কোন গর্ত হয়নি; দেয়াল বা দরজার একটা টুকরোও উপড়ে নেওয়া হয়নি। অতি-সম্প্রতি ইংরেজ সরকার ইমামবাড়া ছেড়ে দিয়েছেন ও মুসলমানদের হাতে প্রত্যর্পণ করেছেন। এখানে এখন 'তাযিয়াদারী' (তাজিয়া অনুষ্ঠান) হয়, মসজিদে নমাজ পড়ান জনৈক ধর্মশাস্ত্রী।

প্রথম নির্মাণের পর থেকে সওয়া শ' বছর কেটে গেছে। ইমারত-গুলি তেমনি মজবুত, উজ্জ্বল ও স্থায়ী হয়ে আজও স্ব-স্ব-স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। না ভেঙ্গেছে একটা ইঁট, না কোথাও খসে গেছে চুন। নবাব আসফউদ্দৌলার তৈরি অট্টালিকা যে কতো দৃঢ়গঠন, এ থেকেই বোঝা যায়। এর বিপরীত চিত্র অওধের পরবর্তী

বাদশাহদের তৈরি অট্টালিকাগুলি। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত। কিন্তু তার মধ্যে না আছে আমাদের দেশী শৈলীর চিহ্ন, না আছে ওইরকম মজবুতী। মাঝে মাঝে সংস্কার না করা হত যদি, কবেই ভেঙ্গে পড়ত।

আসফউদ্দৌলা থাকতেন ইমামবাড়া ও 'মচ্ছী-ভওঅনে'র পাশে আপন মহল 'দওলতখানা'য়। জনতার ভিড় থেকে দূরে, সাংসারিক ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে, বিলাসের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবার কামনায় তিনি শহরের বাইরে, নদীর ওপারে বানিয়েছিলেন বিবইয়াপুরের মহলটি। যখনই ভ্রমণে বা শিকারে যেতেন, এই বাড়িতে অবস্থান করতেন। এইভাবে, চনহটে একটি স্বাস্থ্যপ্রদ ও আনন্দদায়ক বাড়ি এবং 'চার বাগ' ও 'আয়েশ বাগ'-এ ছোট ছোট ঘর করে রেখেছিলেন। আস্তাবল তৈরি হল ইয়াহিয়াগঞ্জ ও তার পাশে। এর পরে হয় মহল্লা-উজীরগঞ্জ, আসফউদ্দৌলা-পুত্র উজীর আলী খাঁর নিবাস-স্থল। তাঁর নামেই এর নাম, তাঁরই স্মৃতিচিহ্ন আজও।

শাসক ও আমলাবর্গ, সবাই যখন লখনউয়ে স্থায়ী বাসা বাঁধল, সাধারণ মানুষেরও মুখ ফিরে গেল লখনউয়ের দিকে। শুজাউদ্দৌলার সময়ে যারা ফয়জাবাদে থাকত, তারা এখন ফয়জাবাদের বাস উঠিয়ে লখনউয়ে চলে এল। ওদিকে, দিল্লীর লোকেরাও আপন জন্মভূমি ত্যাগ করে সোজা পাড়ি দিল লখনউয়ে। ফিরে যাওয়া আর অদৃষ্টে ঘটে উঠল না। জনবাহুল্য থেকে জনপদ-বাহুল্য। বহিরাগতরা যে যেখানে জায়গা পেল, বসে গেল। শত-শত নতুন মহল্লা গড়ে উঠতে লাগল।

আসফউদ্দৌলার শাসনকালে যেসব জনবসতির পত্তন হয়, তার কয়েকটি হল: 'আমানীগঞ্জ, ফতেহগঞ্জ, নরওআস, দলতগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, তরমনীগঞ্জ, টিকরী বা টিকলী, হাসীনউদ্দীন খাঁ কী ছাওনী, হাসানগঞ্জ বাওলী, ভবানীগঞ্জ, বালকগঞ্জ, কাশ্মীরা মুহল্লা, সুরত সিংহ কা অহাতা, নওআথগঞ্জ, তহসীনগঞ্জ, খুদাগঞ্জ, অম্বরগঞ্জ, মহবুবগঞ্জ, তোপ দরওআযা, টিকেটগঞ্জ, টিকেটরায় কা বাযার (প্রধান মন্ত্রী

মহারাজা টিকেট রায়ের নামে), খ্যায়ালীগঞ্জ, ঝাউলাল কা পুল (এই দুটি মহল্লার সংস্থাপক অওধ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী রাজা ঝাউমল), খানসামা কা অহাতা (এর সংস্থাপক নবাবের নিজস্ব এক দারোগা, এবং এর উদ্‌ঘাটন-সমারোহে স্বয়ং নবাব আমন্ত্রিত হয়েছিলেন), নগরিয়া' (এটির স্থাপয়িত্রী নবাবমাতা বহুবেগম সাহিবা ; একই দিনে নবাব আসফউদ্দৌলা নদীর ওপারে আলীগঞ্জের পত্তন করেন)। নদীর ওপারে হাসান রেজা খাঁও বসিয়েছিলেন হাসানগঞ্জ।

নবাব আসফউদ্দৌলার দিলদরিয়া মেজাজের খবর সবাই জানত ; দূর-দূর শহরেও তাঁর দানশীলতার চর্চা হত। উঠতে-বসতে লোকেরা তাঁর নাম উচ্চারণ করত সমম্মানে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে। বস্তুত, তাঁর যাবতীয় ব্যক্তিগত দোষ দানশীলতার এই উদার আবরণে ঢাকা পড়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়েছিল। জনগণের কাছে নবাব ছিলেন—বিলাসী শাসক নয়—নিঃস্বার্থ, সাধুস্বভাব শাসকের প্রতিমূর্তি। আজও হিন্দু দোকানদার ভোরে চোখ খুলে সশ্রদ্ধায় বলে ওঠে : 'ইয়া আসফউদ্দৌলা ওঅলী।'[1]

এইসময়ে লখনউয়ে জেনারেল ক্লড মার্টিন নামে একজন অত্যন্ত ধনবান ফরাসী ব্যবসায়ী থাকতেন। এক বিশাল অট্টালিকার নক্‌শা তৈরি করে তিনি পেশ করলেন নবাব আসফউদ্দৌলার কাছে। তাঁর এতো পছন্দ হয়ে গেল, দশলক্ষ আশরফী দাম দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু বায়নার কাজ সম্পূর্ণ হবার আগেই নবাব আসফউদ্দৌলা মারা গেলেন। ওদিকে মঁশিয়ে মার্টিনেরও মৃত্যু হল। বাড়িটা আর শেষ হল না। সাহেব অনেক ধনসম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন কিন্তু ওয়ারিস কেউ ছিলনা। তাই তিনি মৃত্যুকালে উইল করে যান : আমার মৃতদেহ যেন এই বাড়িতেই কবর দেওয়া হয়। তাহলে, কোন অওধ শাসক কোনদিনই এবাড়ি বাজেয়াপ্ত করে নিতে পারবে না। ইমারতের নাম তিনি রেখেছিলেন 'কন্‌সটেশিয়া'। জনসমাজে

শান্তা, অভিভাবক, সন্ত

কিন্তু এর প্রসিদ্ধি 'মারকীন সাহব কী কোঠী' নামে। এটি দর্শনীয়ও বটে। মৃত্যুর পর সাহেবকে সমাধি দেওয়া হয় এই বাড়িতে। এখানে একটি মাদ্রাসা আছে। অনেক ছাত্রকে খাদ্য-বস্ত্রাদি দেওয়া হয়। শোনা যায়, মার্টিন সাহেব স্কুল এবং বৃত্তিগুলিকে কোন বিশেষ ধর্ম বা জাতির মধ্যে সীমিত করে যান নি ; বরং উইল করে গিয়েছিলেন ঃ হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান সবাই এখানে সমান সুযোগ পাবে। কিন্তু স্কুলটিতে এখন শুধু য়োরোপীয় ছেলেমেয়েরাই পড়তে পারে। কোন হিন্দুস্তানীর বৃত্তি পাওয়া দূরের কথা, এখানে পড়তেই পায় না ! হয়তো গদরই[1] এর কারণ, যখন একদল অশিক্ষিত, সমাজবিরোধী কবর খুঁড়ে মার্টিনের অস্থি বার করে এদিকওদিক ছড়িয়ে দেয়। পরে ইংরেজরা একটি অস্থি খুঁজে পায় এবং এই মাটিতেই সেটি সমাহিত করে। কিন্তু মুষ্টিমেয় দুষ্কৃতিকারীর কুকার্যের দায় হিন্দুস্তানী জনগণের হতে পারে না।

1798 খ্রীষ্টাব্দে নবাব আসফউদ্দৌলার দেহান্ত হয়। সিংহাসনে বসলেন নবাব উজীর আলী খাঁ, যাঁর বিবাহের ধূমধামের বর্ণনা একটু আগেই আমি করেছি। চার মাসের মধ্যেই তিনি নির্বোধের মতো এমন এক জঘন্য কাজ করে বসলেন, প্রায় লোকেই তাঁর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠল। স্বয়ং বহু বেগম সাহিবা এঁর চেয়ে বেশি পছন্দ করতেন সৎপুত্র ইয়ামীনউদ্দৌলা নবাব সাদত আলী খাঁকে। ওদিকে খবর ছড়িয়ে গেল, উজীর আলী খাঁ আসফউদ্দৌলার ছেলেই নয়। কারণ, অনেকের ধারণা, আসফউদ্দৌলা জন্ম থেকেই নপুংসক !

নবাব সাদত আলী খাঁ ও আসফউদ্দৌলার বিরোধের জন্যে ওঁর সময়ে ইনি প্রায়ই রাজ্যের বাইরে, দূরে থাকতেন। কিছুদিন ছিলেন কলকাতায়, তার পর দীর্ঘ সময়ের জন্যে বেনারসে। যখন উজীর আলী খাঁ সম্পর্কে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল, তখন সবার দৃষ্টি গেল সাদত আলী খাঁর দিকে। বেনারস থেকে তাঁকে নিয়ে আসা

হল। বিবইয়াপুরের প্রাসাদে গভর্ণর জেনারেল স্বয়ং দরবার বসিয়ে উজীর আলী খাঁকে গদীচ্যুত করলেন, সিংহাসনে বসালেন নবাব সাদত আলী খাঁকে। উজীর খাঁকে তখনই গ্রেফ্‌তার করে বেনারসে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সেখানে তিনি অবিবেচকের মতো মিঃ চারীকে মেরে বসলেন। শাস্তিস্বরূপ, বন্দী করে তাঁকে পাঠানো হল চিনাগড়ে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। উজীর আলীর কষ্ট ও দুঃখভোগের একটি বড়ো ও করুণ কাহিনী আছে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তার বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়॥

॥ 5 ॥

1798 খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেই নবাব সাদত আলী খাঁ অর্ধেক রাজত্ব ভেট দিয়ে দিলেন ইংরেজকে। এ সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। রাজ্যলাভের আশা ত্যাগ করে সাদত আলী বেনারসেই পড়ে ছিলেন। এমন সময়ে খবর পৌঁছল: নবাব আসফউদ্দৌলা বাহাদুরের মৃত্যু হয়েছে. এবং রাজসিংহাসনে উপবেশন করেছেন উজীর খাঁ। শুনে, রাজ্য-প্রাপ্তির যেটুকু আশা-ভরসাও ছিল, উপে গেল। এইরকম আশাহত অবস্থা যখন, একদিন বেনারসেই জনৈক ইংরেজ অফিসার এসে জিজ্ঞাসা করলেন: 'নবাব সাহেব, ধরুন যদি অওধ-রাজ্যটি আপনি পেয়ে যান, তাহলে ইংরেজ সরকারকে কী দেবেন?' যে-জিনিস হাতের বাইরে চলে গেছে, তার আর মূল্য কী! অনায়াসে বলে উঠলেন: 'অর্ধেক রাজত্ব'। প্রতিজ্ঞা শুনে অফিসারটি বললেন: 'তাহলে আমি আপনাকে একটা সুখবর দিচ্ছি। শুনে আপনি খুশি হবেন, যে, আপনাকেই লখনউয়ের শাসনকর্তা নির্বাচন করা হয়েছে।' হঠাৎ এই সুসংবাদে সাদত আলী খাঁ খুশি তো নিশ্চয়ই হলেন, সেইসঙ্গে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ও হয়ে গেলেন, যখন প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ল। পরে, গদীতে বসে,

শপথমতো, রাজ্যের অর্ধেক দিয়ে দিলেন। এর কাঁটা সারা জীবন তাঁর মনে বিঁধেছে।

ইংরেজের লেখা ইতিহাসে নবাবের কাছ থেকে এই প্রতিজ্ঞা-আদায়ের কোন বর্ণনা নেই। কিন্তু একথা সবাই মানে, যে, যেহেতু সাদত আলী খাঁকে ইংরেজরাই সিংহাসনে বসিয়েছিল, তাই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি তাদের আধা-রাজত্ব ভেট দিয়েছিলেন। সে যাই হোক, সাদত আলী খাঁর সিংহাসন আরোহণকালে অওধের রাজ্যসীমা অর্ধেক হয়ে গেল। লখনউয়ের প্রাচীন লোকেরা শুনেছিলেন: এই দুঃখে সাদত আলী খাঁ খুব মিতব্যয়ী হয়ে উঠেছিলেন, এবং অত্যন্ত কুশলতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে বাইশ-তেইশ কোটি টাকা জমিয়েছিলেন। এমনকি, ইংল্যাণ্ডে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে পত্র-লেখালেখি করে এতোটাও আদায় করে নিয়েছিলেন, যে হিন্দুস্তান শাসনের ঠিকাদারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বদলে যেন তাঁকেই দেওয়া হয়। চুক্তি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল এমন সময়ে তাঁর শ্যালক এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তাঁকে বিষ দিয়ে হত্যা করল। সার্থক হল সেই প্রবচন: "ন রহেগা বাঁস অ্যর্ ন বজেগী বাঁসরী"—'না থাকবে বাঁশ আর না বাজবে বাঁশী।'

এই ধরণের আরও অনেক বৃত্তান্ত আছে, যা অপ্রামাণিক গুজব মাত্র। তবে, এতে কোন সন্দেহ নেই, যে, সাদত আলী খাঁ যেরকম মিতব্যয়ী ও সুশাসক ছিলেন, তাঁর মতো ব্যক্তির পক্ষে স্বরাজ্যের কোন অংশ অনায়াসে দান করা সম্ভব ছিল না। অন্যপক্ষে, তাঁর নীতি ও আচরণে এমন-একটা অস্থিরতা ও রহস্যময়ী ব্যাকুলতা ছিল, যা হয়তো দুর্বোধ্য। তবে, এটা পরিষ্কার বোঝা যেত, যে, তিনি এসেছেন কোন একটা বৃহৎ কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্যে। ব্যঞ্জিত ভ্রূকুটিতেই ছিল তার পরিচয়।

রাজ্য-বিভাজনের ফলে সবচেয়ে বড়ো মুশকিল হল—রাজ্যের অর্ধেক আয় কমে গেল। অথচ, সাধ্যের অতীত ব্যয়ের ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন আসফউদ্দৌলা। কষ্ট হচ্ছিল খুব, তবু বাধ্য হয়ে,

দরবারের খরচ কমিয়ে ফেলতে হল। এতদুদ্দেশ্যে, তিনি হিসাবী হয়েছেন, তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন, ছোট ছোট খরচের ওপর নজর দিয়েছেন, জায়গীর ও সীমাসরহদ্দের বিস্তৃত তদন্ত ও তাদের পুনর্বিন্যাস করেছেন, এবং যতোদূর সম্ভব, দরবার খাতে কম খরচ করেছেন। লোকেদের ওপর রূঢ় হয়েছেন, বদনাম রটেছে, তবু যেভাবে পেরেছেন, ব্যয়-সংকোচ করে রাজ্যের আয় বাড়িয়েছেন।

এইসব কাজকারবার দেখে সমঝদার ও সুবিচার-প্রিয় ব্যক্তিবর্গ সাদত আলী খাঁর যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার কাছে মাথা নত করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ এতে খুশি হতে পারেনি। একদিকে অভিযোগের পর অভিযোগ করেছে জমিদার-জায়গীরদারদের দল, যাদের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল; অন্যদিকে, যেসব ফালতু ও পুরনো চাকরবাকরদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা কেঁদে-কেঁদে ফিরতে লাগল। শুধু তাই নয়। রাজ্যের মধ্যে উজীর আলী খাঁর সমর্থকরাও ছিল, বেশ ভারী দলই। তারা উজীর আলী খাঁকেই রাজত্বের সাচ্চা হক্‌দার বলে মনে করত। সাদত আলী খাঁকে বলত 'লুটেরা'। দেশ জুড়ে এমনি হাজার-হাজার শত্রু ছিল; বিপদ ছিল তাদের নিয়ে।—নবাবের ওপর কোন্‌দিন হামলা না করে বসে! প্রজারা ছাড়া সেনাবাহিনীও নতুন নবাবের ওপর অপ্রসন্ন ছিল। নবাব শুজাউদ্দৌলার সময়ে অসংখ্য সেনা ছিল, পংগপালের মতো। আসফউদ্দৌলার সময় থেকে ইংরেজ সরকারের পরামর্শে এই সংখ্যা কমানো হতে থাকে। তবে, তাঁর দানশীলতা ও বাজে খরচের জন্যে এ নিয়ে কোন হৈচৈ হয়নি, শোনা যায়নি অভিযোগের কোন ধ্বনি। সাদত আলী খাঁ যখন এই খাতে আরও ছাঁটাই করলেন, নিজেও হলেন মিতব্যয়ী, চারদিকে হায়-হায় পড়ে গেল, ঝড় বয়েগেল সমালোচনার।

তখন ইংরেজ সরকারের মনে হল: নবাবকে রক্ষা করার জন্যে ইংরেজ সৈন্যের একটা 'বাযাব্‌তা ফ্যওজী গার্ড', (রিজার্ভ পাহারা) খাস শহরের মধ্যে রাখা উচিত। যেহেতু, শহরের বিদ্রোহী ও

দাংগাকারীদের দমনের এবং শান্তি ও শাসন অব্যাহত রাখার জন্যে বাইরের একটা জবরদস্ত শক্তির সবসময়ে হাজির থাকা খুবই দরকার। শোনা যায়, নবাব সাদত আলী খাঁ অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই এই প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন।

ইতিপূর্বেও অওধের শাসকরা সরল জীবন যাপনের পরিচয় রেখে গিয়েছিলেন। প্রথম তিন নবাব, অর্থাৎ নবাব বুরহান-উল-মুলক্, নবাব সফদরজংগ এবং নবাব শুজাউদ্দৌলা যেসব সাধারণ বাড়িতে জীবন কাটিয়ে গেছেন, সেগুলি তাঁদের নিজেদের সম্পত্তি ছিলনা, ভাড়া বাড়ি ছিল। তাঁদের কাছে আসল বাড়ি ছিল লড়াইয়ের ময়দান, ছিল গোটা রাজ্যটাই, যার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁরা দৌড়োদৌড়ি করতেন; স্বদেশ-ভূমির প্রতিটি অংশকে নিজের বাড়ি বলে মনে করতেন। ব্যস্ত-মানুষ নবাব আসফউদ্দৌলা বদনাম কুড়িয়েছেন বাজে খরচ ও ভোগবিলাসের বিনিময়ে। ইমারতের শখ মেটাতে এক ইমামবাড়া ও মসজিদের জন্যেই কুড়ি লক্ষ টাকা খরচ করেছেন; তার চেয়েও বেশি ব্যয় করেছেন চক-হাট-বাজার সেতু সরাই ইত্যাদি খাতে। তবু, তাঁরও জন্যে একটা অতি সাধারণ, পুরনো ঢংগের বাড়ি 'পঞ্চমহলাই' যথেষ্ট ছিল। মোদ্দা কথা, প্রথম তিন শাসকের ইমারতের শখ মিটত কেল্লা ও গড় তৈরি এবং সেনাবাহিনীর রসদ-সংগ্রহে, আর, আসফউদ্দৌলার শখ পরিতৃপ্ত হত ধর্মস্থান ও লোকহিতের কাজে। ইমারত তৈরির পুরনো শখ এর সঙ্গে বনিবনা করে চলত। আসফউদ্দৌলার ইমামবাড়া পর্যন্ত অট্টালিকাগুলি পুরনো স্থাপত্যের নমুনা। শাহজাহাঁ বাদশাহ দিল্লী ও আগ্রার নিকটবর্তী খনি থেকেই ভালজাতের সাদা ও লাল পাথর পেয়েছিলেন; তাই তাঁর ইমারত সমূহে প্রথম শ্রেণীর ঔৎকর্ষ্য ও শিল্পত্ব অভিব্যক্ত হয়েছে। লখনউয়ে পাথর পাওয়া যেত না; দুঃসাধ্য ছিল আগ্রা ও জয়পুর থেকে আনানো। কেউ নিয়ে আসতে সাহস করত না তাই। ফলত, আসফউদ্দৌলা ব্যবহার করেছেন ইঁট আর চুণ, এবং তাই দিয়েই সমান ঔৎকর্ষ্য সৃষ্টি করেছেন।

মিতব্যয়িতা, কৃপণতা ও অর্থসঞ্চয়ের নেশা সত্ত্বেও নবাব সাদত আলী খাঁর ইমারত অট্টালিকার শখও ছিল। কিন্তু আফ্‌শোসই বলতে হবে—কলকাতার এবং অন্যান্য জায়গার ইমারত দেখে দেখে তাঁর এই শখ উপে গিয়েছিল, এবং এমনভাবে, যে, তাঁর সময়ের অট্টালিকা থেকে পুরনো বৈশিষ্ট্যগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। স্থাপত্য-কলার-রীতি স্তরও বদলে গেল সেইদিন থেকে।

গদ্দীনাশীন হওয়ার আগে নবাব সাদত আলী খাঁ ছিলেন দেশান্তরে, যাযাবর ও য়োরোপীয় জাতিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা করেছিলেন—লখনউয়ের ইমারত-শিল্পের রীতি-বদলের এই হল আসল কারণ। জেনারেল মার্টিনেরও অবদান ছিল। নিজের মনোমতো দু-একটা বাড়ি তৈরি করে স্থাপত্যের এমন একটা নতুন শৈলী তিনি হাজির করলেন নবাবের সামনে, স্থায়িত্বের দিক থেকে যা বেকার, কিন্তু জীবনের প্রয়োজনের দিক থেকে খুবই আকর্ষণীয়। এগুলি ছিল শিশুর হাতের খেলনার মতো—রোজ ভাঙে, রোজ নতুন কিনতে হয়। য়োরোপের সমালোচক বেশ জোর গলায় ঘোষণা করেন: 'আসফ-উদ্দৌলার পরবর্তী নবাবদের গৃহ-রচনার রুচি সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, এবং তাঁদের তৈরি তাবৎ ইমারত ছেলের হাতের খেলনা বা মেয়েদের খেলাঘর।' কিন্তু এরা একবারও ভেবে দেখেন না, এই রুচি বিকৃতি ঘটিয়েছিল কে? এখানকার নবাবী রুচির এই অধঃপতনের কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়, যে, এখানে বাস্তবিক কোন জাতিই ছিলনা! তাঁরা কিন্তু একথা চিন্তা করে দেখেন না, এখানকার জাতীয়তাকে কে বা কারা খারাপ করেছে? কাদের কারসাজিতে লোকেরা প্রাচীন রীতি পরিত্যাগ করেছে? আসলে, সমস্তই ওঁদের উর্বর মস্তিস্কের কল্পনা!

সাদত আলী খাঁ প্রথমে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে 'ফরহন-বখ্‌শ্‌'-এর বাড়িটা কিনলেন জেনারেল মার্টিনের কাছ থেকে। আশেপাশে আরও কয়েকটা বাড়ি তৈরি করিয়ে ওখানেই বাস করতেন। পরে, ওরই কাছে, রেসিডেণ্ট সাহেবের জন্যে বানালেন 'টেঢ়ী কোঠী'। এর

ভগ্নাবশেষ আজও রেসিডেন্সীর ভেতরে পড়ে আছে। দরবারের জন্যে হল লাল 'বারহদরী',[1] এখন যেখানে লাইব্রেরী। তখন এর নাম ছিল 'কস্র-উল-সুলতান'[2]। এ ছাড়া আরও দুটো বাড়ি তৈরি করালেন— নদীর ওপারে 'দিল আরাম', অন্যটি সুদর্শন 'দিলকুশা'। এখন যেখানে সদর অর্থাৎ লখনউয়ের ফৌজী ছাউনীর এলাকা, তারই একটা উঁচু জায়গায় ছিল দ্বিতীয় বাড়িটি, যেখান থেকে সারা শহর, চারপাশের ময়দান ও নদীর রমণীয় দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠত। এইরকম আর একটি বাড়ি 'হায়াতগঞ্জ'। কিন্তু নবাব সাদত আলী খাঁর পর অওধের আর কোন অধিপতিই এ বাড়ি ব্যবহার করেন নি। গদরের আগে এখানে থাকতেন মেজর ব্যাঁক; গদরের পরে থাকতেন ইংরেজ সরকার নিযুক্ত অওধের চীফ কমিশনার। প্রায়শই, এঁরা হতেন উচ্চপদস্থ য়োরোপীয়। এবং, এটা একরকম নিয়মেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

এইসব অট্টালিকা ছাড়া সুপরিচিত 'মুনব্বর বখ্‌শ্‌' ও 'খুরশীদ মঞ্জিল' নবাবের কীর্তি। তাঁরই স্মৃতিবাহী 'চ্যপড়া-কা-অস্তবল'। এগুলি তৈরি হয় য়োরোপ থেকে আগত নতুন শৈলীতে; পুরনো দেশী রীতি পরিত্যক্ত। খোদ ব্রিটিশ সরকারের তত্ত্বাবধানে ও প্রভাবে এই নবশৈলীর অট্টালিকা হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহরে তৈরি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়: লখনউয়ের কোন পুরনো ইমারতই এই নতুন, বিশাল অট্টালিকার সামনে দাঁড়াতেই পারত না। আসল কথা হল: ঐতিহাসিক মহত্ত্ব যতোই থাক, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্যে পর্যটকদের যতোই আকৃষ্ট করুক না কেন, লখনউয়ে পুরনো ঘরানার ইমারতের দিন শেষ হয়ে গেছে।

নবাব সাদত আলী খাঁ লখনউয়ের পশ্চিমে একটা বড়ো বাজার বসিয়েছিলেন। তার শোভা ও লোকবসতির জন্যে সুব্যবস্থা ও আইন প্রণয়ন পর্যন্ত করেছিলেন; বণিক ও দোকানদারদের বিশেষ

[1] আলো হাওয়াযুক্ত খোলামেলা গ্রীষ্মাবাস। [2] সুলতান-এর মহল।

সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। ফলে, বাজারটির সমৃদ্ধি ঘটে। এবং জানপদ শহর থেকে দূরে, একেবারে আলাদা হয়ে থাকা সত্ত্বেও, এটি আজও হরেক জিনিসের সবচেয়ে বড়ো বাজার। শুধু এরই জন্যে আলম নগর স্টেশনের দিন-দিন উন্নতি ঘটে চলেছে।

এই 'সাদতগঞ্জ' ছাড়া এই সময়েরই অন্যান্য বাজার : 'রকাবগঞ্জ' (যেখানে আজ লোহা ও সব্জির বড়ো পট্টি), জংলীগঞ্জ, মকবুলগঞ্জ, মৌলভীগঞ্জ, গোলাগঞ্জ ও 'রস্তোগী মুহল্লা'। এরাও নেহাৎ ছোটখাট নয়। 'মোতী-মহলে' যে আসল ও পুরনো বাড়ি রয়েছে, সেটিও নবাব সাদত আলী খাঁর কীর্তি। বর্তমান 'মোতী-মহলে'র চৌহদ্দীর উত্তর দিকে এটি অবস্থিত। এতে অনেকগুলি সুন্দর শাদা গম্বুজ ছিল, যার ওপর শিল্পীরা রচনা করেছিল মোতির মতোই টল্‌টলে সৌন্দর্য।

অওধের অন্যান্য নবাবদের তুলনায় সাদত আলী খাঁ ছিলেন অধিকতর বুদ্ধিমান ও রাজনীতিজ্ঞ, সেই সঙ্গে সুমিতব্যয়ী ও কৃপণ। অসাধারণ যাগ্যতা ও চতুরতার সঙ্গে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। সন্দেহ নেই, তিনি যদি শেষ দিন পর্যন্ত নির্বিঘ্নে, সন্তোষে শাসন করে যেতে পারতেন, তাহলে অতীতের সমস্ত ত্রুটি অপনোদিত হয়ে যেত, সমৃদ্ধি ঘট্‌ত রাজ্যের। কিন্তু বাধা হল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। এদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো ছিল না। বরং খারাপই ছিল। এবং এতোদূর খারাপ, যে, মাঝে-মাঝেই তাঁর মন তিক্ত হয়ে উঠত রাজ্য ও সিংহাসনের ওপর। এইসব কারণে ব্যতিব্যস্ত হয়েই তিনি অর্ধেকেরও বেশি রাজত্ব দিয়েছিলেন মহান ব্রিটিশ সরকারকে ; ভেবেছিলেন : আমার অধিকারে এখন যেটুকু রাজ্য রইল, নির্বিরোধে শাসন করতে পারব। কিন্তু শান্তি করতলগত হল না। যে অংশ তাঁর নিজের অধিকারে ছিল, তারও স্থানে-স্থানে ইংরেজ সেনার শিবির পড়ল ; লখনউয়েই বেশি, বাকি তার আশেপাশে। এইসব সেনাশিবিরের তত্ত্বাবধান খুব সহজ কাজ ছিল না ; সংখ্যাধিক্যের য রাজ্যের কাঁধে বোঝাও ভারী হল। পরিণামে, কমিয়ে ফেলতে হল নবাবী চাল, নবাবী সেনা।

ইত্যাকার দুশ্চিন্তা ও হয়রানী সত্ত্বেও তিনি যেসব সংস্কারকার্য করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা: হাট-বাজারের উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহদানের পাশাপাশি তাঁর দরবারে এতো গুণী, প্রভাবশালী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল, যা হিন্দুস্তানের আর কোন দরবারে সেদিন দেখা যায় নি। এই ধরণের লোক সাধারণত সেই স্থানেই জমায়েৎ হন, যেখানে ধনী ব্যক্তিরা উদার ও দানশীল। আগেই বলেছি, সাদত আলী খাঁ মিতব্যয়ী ও কৃপণ ছিলেন। তবু, এই ব্যয়সংকোচ ও কার্পণ্যের সঙ্গে আর একটা গুণও তাঁর ছিল: নিজের যোগ্যতা ছিল বলেই অপরের যোগ্যতাকে স্বীকার না করে তিনি পারতেন না, এবং 'লায়ক'(যোগ্য) ব্যক্তিকে কদর দিতে জানতেন। এর ফলে, লখনউ, প্রথম থেকেই, জ্ঞানীগুণীদের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেই, তিনি যেখানকারই হোন, সাদত আলী খাঁর 'কদরদানী'র খ্যাতি শুনেই স্বদেশ ছেড়ে লখনউ উদ্দেশ্যে পা বাড়াতেন। এবং এখানে এসে এমন আরাম পেতেন, দেশে ফিরে যাবার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতেন না!

1814 খ্রীষ্টাব্দে নবাব সাদত আলী খাঁর মৃত্যু এবং তাঁর পুত্র গাজীউদ্দীন হায়দরের রাজগদীতে উপবেশন। 'ক্যয়সর-বাগের' চতুষ্কোণ ইমারতটির ভেতরে নবাব সাদত আলী খাঁ ও তাঁর বিবি মুর্‌শীদজাদীর 'মকবরা' অবস্থিত। এই সমাধিভবনের জায়গায় আগে একটা বাড়ি ছিল; সেখানে থাকতেন নবাব গাজীউদ্দীন হায়দর, যখন তিনি যুবরাজ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি যখন নবাবের মহলে গেলেন, বললেন: "বাবার বাড়ি আমি নিয়েছি; সুতরাং এখন ওঁর থাকার জন্যে আমার বাড়িটা দিয়ে দেওয়া উচিত।" এই ভেবে, তিনি নিজের ঘরেই স্বর্গীয় নবাবকে কবর দিলেন, এবং পুরনো বাড়ি ভেঙ্গে ফেলে নির্মাণ করলেন সমাধি-ভবন।

গাজীউদ্দীন হায়দরের আমলে না ছিল তাঁর পিতার মতো বিচার-বিবেচনা ও ঐশ্বর্যের কদর, না ছিল আগেকার শাসকদের মতো ফৌজী সরগরম। -হ্যাঁ, আসফউদ্দৌলার আমলের মতো আরাম-বাসনা ও

আয়েশ-প্রিয়তা অবশ্যই ছিল। তবে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও ছিল—আসফউদ্দৌলার বাজে খরচেও দেশ ও জনগণ উপকৃত হত; এখন যা কিছু সব আত্মস্বার্থে।

পিতৃদেব রেখে গিয়েছিলেন কোটি কোটি নগদ টাকা। পুত্র গাজীউদ্দীন হায়দরের নবাবী শখ মেটাতে গিয়ে তারা উড়তে লাগল। আগেই বলেছি, মোতী-মহলের উত্তরে একটা বাড়ি তৈরি করেছিলেন সাদত আলী খাঁ। ওই চোহদ্দীর মধ্যেই গাজীউদ্দীন হায়দর আরও দুটো বাড়ি তুললেন: 'মুবারক মঞ্জিল' ও 'শাহ মঞ্জিল'। শাহ-মঞ্জিলের পাশে 'কিশ্‌তীর'[1] পুল ছিল একটা, তার পূর্বে 'মুবারক-মঞ্জিল।' 'শাহ-মঞ্জিলের' সামনে, নদীর ওপারে। 'হাজারী বাগ' নামে একটা 'চরাগাহ' (মুক্তাঙ্গন-চিড়িয়াখানা) ছিল; ভেতরে মাইলের পর মাইল সুন্দর বাগিচা। এখানে প্রায়ই হাতী, গণ্ডার ও অন্যান্য জংলী জানোয়ারের লড়াই হত, আর, অন্য পারে 'শাহ মঞ্জিলের' কোঠায় বসে বাদশাহ লড়াইয়ের সেই তামাশা দেখতেন। বাঘের লড়াই হত। তার জন্যে লোহার মজবুত খাঁচা এবং সুব্যবস্থিত ক্রীড়াঙ্গণও তৈরি হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত নিরীহ ও ছোট জানোয়ারদেরও লড়ানো হত—নদীর এপারে, শাহ মঞ্জিলের খাস চৌহদ্দীতে।

চতুষ্পদী বন্য পশুদের লড়ানোর এই শখ হিন্দুস্তানে এর আগে ছিল বলে শোনা যায় না। মনে হয়, রেসিডেণ্ট, এবং দরবারে আসা-যাওয়া ছিল এমন য়োরোপিয়নদের কাছ থেকে রোমের 'অ্যাম্‌ফীথিয়েটার[1]-এর কথা শুনে জাহাঁপনার চিত্তে এই শখ জেগে উঠেছিল। তবে, মৌলানা হবীবুর রহমান খাঁ সাহেব শেখানী যা বলেছেন, তা থেকে ধারণা হয়, পশুদের লড়াইয়ের রেওয়াজ মুগল শাসনকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল।

গাজীউদ্দীন হায়দর তাঁর এক য়োরোপীয় বেগমের জন্যে বিলিতি

---

[1] নৌকো।

মহল বানিয়ে তার নাম রেখেছিলেন 'বিলায়তী বাগ'। এখান থেকে কয়েক পা গেলেই 'রসূল কী ইমারত'। গাজীউদ্দীন হায়দরের ইচ্ছানুসারে ইংরেজ দরবার তাঁকে "বাদশাহ" উপাধি প্রদান করেছিল। এতোদিন অওধের শাসকের পদ ছিল মন্ত্রীর সমতুল্য। এবং "নওআব" তথা 'নবাব' ছাড়া অন্য কোন সাম্মানিক নাম বা পদ দেওয়া হত না। দেশ তখনও স্বাধীন—যদিও বিদ্রোহী শাসকেরা তাকে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল নিজেদের মধ্যে, এবং দিল্লীর বাদশাহর অধিকারে ছিল দিল্লীর চারপাশের জমিমাত্র। তবু তখনও, এই দারুণ দুরবস্থাতেও, তামাম হিন্দুস্তানে মুগল শাহানশাহীর গৌরব-গরিমার উদ্বৃত্ত কিছুটা অবশিষ্ট ছিল, দিল্লীশ্বরই ছিলেন "শাহানশাহ" ও "জঁহাপনাহ"। তিনি ছাড়া, হিন্দুস্তানের আর কারোরই "বাদশাহ" উপাধি-গ্রহণের অধিকার ছিলনা, ক্ষমতা ছিলনা 'খিতাব' ও 'ইয্যত' (ইজ্জৎ), উপাধি ও সম্মান প্রদানের। দিল্লীর সম্রাটের, এই অহংকার ভাঙ্গবার জন্যেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই খেতাবটি দান করে গাজীউদ্দীন হায়দরকে—যিনি বাপের জমানো রাজকোষ থেকে প্রচুর টাকা ধার দিয়েছিলেন ইংরেজদের। অওধ-দরবার এই সম্মানকে অতি সমাদরেই গ্রহণ করল। ঠিক এই সময় থেকেই অওধের শাসক হলেন রেসিডেন্টের হাতের পুতুল; শেষ শাসক ওয়াজিদ আলী শাহর মৃত্যু পর্যন্ত ছিলেন ওদের কৃপাপাত্র—আর, "বাদশাহ" বনে গেলেন!

শাহী খেতাব! তার স্মারক-চিহ্ন থাকা খুবই জরুরী! অতএব, নদীর ওপারে মচ্ছী-ভবনের সামনে নতুন বাজার বসল: 'বাদশাহগঞ্জ'! 'হকীম মেহঁদী' বসালেন 'মেহঁদীগঞ্জ'। প্রধান মন্ত্রী আগা মীর স্বনামে স্থাপন করলেন একটি সরাই। তাঁর শাহী ইমারত অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে শহরের ঠিক মাঝখানের মহল্লাটির নাম হল: 'আগা মীর কী ড্যোওড়ী'—আগা মীরের দেউড়ী।

বাদশাহ, তাঁর চেয়েও বেশি বাদশাহ বেগমের, ধর্মবিষয়ে মতি ছিল

অত্যধিক। সাফাবিয়া[1] বংশীয়দের সময়ে ইরানের (পারস্যের) ধর্মছিল "শীয়া ইসনা অশরী"[2]। অন্যদিকে, হিন্দুস্তানের সাধারণ মুসলমান ছিল সুন্নী। বুরহান-উল-মুলক সন্ত এসেছিলেন ইরান থেকে; তাঁর ও তাঁর বংশের সকলের ধর্ম ছিল শীয়া। তথাপি লখনউয়ের শাসন-ব্যবস্থায় সেই পুরনো রীতিনীতিই দীর্ঘদিন চলে এসেছে, যে রীতি মুসলমান রাজত্বের শুরু থেকেই হিন্দুস্তানের অন্যান্য শহর, অর্থাৎ সারা দেশ জুড়েই ছিল। কিন্তু এখন, বাদশাহ ও তাঁর খাস 'মাল্কা-'র (বেগমের) ধর্মীয় অনুরাগের জন্যে শীয়া মত লখনউয়ের শাসনব্যবস্থার মুখ্য অঙ্গ হয়ে উঠল। ফিরিংগী মহলের পণ্ডিতদের দিক থেকে শাসকদের মনোযোগ অপসৃত হল। শাসকদের আশ্রয় পেয়ে সমৃদ্ধি লাভ করল 'মুজ্তহিদ'[3] বংশ।

কিন্তু শীয়া ধর্মমত যদি স্বরূপেই স্থিত থাকত, তাহলে কিছু বলার ছিল না। আপত্তির কারণ হল—বাদশাহ ও বেগমের ধর্মীয় আচরণ ছিল আমীরী, কায়দার, এবং অজ্ঞানতায় ভরা। তাঁরা শীয়ামতের নতুন-নতুন ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব তৈরি করতে লাগলেন। ফলে, বাদশাহ এবং আমীরদের মধ্যে শিশুজনোচিত আচারের জন্ম হল। শুধু তাই নয়, লখনউয়ের শীয়া মত আন্তর্জাতিক শীয়া-মত থেকে বিচ্ছিন্ন এক নতুন ও আজব ব্যাপার হয়ে উঠল।

সর্বপ্রথমে 'বেগম সাহিবা' তৎকালীন বড়-ইমামসাহেবের 'ছঠী' (ষষ্ঠী) উৎসব চালু করলেন। ধর্মসভায় ইমাম সাহেবের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে পুণ্যার্জন—যদি শুধু এইটুকুই হত, তাহলে দোষের কিছু ছিলনা। কিন্তু তা হয়নি। হিন্দুদের জন্মাষ্টমীর ঐতিহ্য অনুকরণে একটা পুরো প্রসব-গৃহই নির্মাণ করা হল। পরবর্তী ধাপ: কুলীন সৈয়দ-বংশের সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে এসে বারো ইমামের 'বিবি' করে দেওয়া হল, নাম দেওয়া হল: 'অছুতিয়াঁ'। এবং, ওরা যখন ইমামদের

[1] ইরানের এক রাজবংশ। [2] যে শীয়ারা বারো ইমামকে মানে
[3] ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ শীয়া পণ্ডিত।

বিবি, তখন ওদের ওখানে ইমামের জন্মও অবশ্যম্ভাবী! বারো ইমামের এই জন্মোৎসব খুব ঠাট-বাটের সঙ্গে পালিত হতে লাগল।

গাজীউদ্দীন হায়দর অত্যন্ত কোপন-স্বভাব ও অস্থিরমতি শাসক ছিলেন। তাঁর দাপটে ইংরেজের সঙ্গে সম্বন্ধ তো ভালোই ছিল। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী আগা মীর দরবারকে এমন হাত করলেন, তাঁর অত্যাচারের কবল থেকে খোদ বাদশাহ-বেগম, এমনকি রাজকুমার পর্যন্ত রেহাই পেতেন না। এই আগা মীরকে গাজীউদ্দীন হায়দর রীতিমতো লাথি ও ঘুঁষি মারতেন। তিনি সমস্ত মার হাসিমুখে গ্রহণ করতেন। তারপর তার বদলা নিতেন দরবারের অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত সদস্য এবং বাদশাহের আত্মীয়দের ওপর দিয়ে।

ইতিপূর্বে, ধর্মীয় শ্রদ্ধাবশত, অওধ-নরপতি মোতী-মহলের পাশে, নদীতীরে, 'নজফে অশরফ' অর্থাৎ হযরত আলীর সমাধির একটি নকল তৈরি করিয়েছিলেন। তার তদারকী ও আলোকসজ্জার জন্যে ইংরেজের হাতে অনেক টাকা দিয়ে রেখেছিলেন। তারই জন্যে আজও এখানে ঘন জনবসতি ও জীবনের স্পন্দন বিদ্যমান। 1827 খ্রীষ্টাব্দে নবাব সাহেবের যখন মৃত্যু হয়, তাঁকে সমাহিত করা হয় এইখানেই॥

॥ 6 ॥

1827 খ্রীষ্টাব্দ। সিংহাসনে আরোহণ করলেন গাজীউদ্দীন হায়দরের পুত্র নাসীরউদ্দীন হায়দর। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি: গাজীউদ্দীন হায়দরের সময়ে অওধ-শাসক আর নবাব নন, 'বাদশাহ'। 'নবাব' সম্মানের সূত্রপাত দিল্লীর উজীরের পদ থেকে। তাই প্রথম দিকের শক্তিশালী, মহান শাসকরা সবাই ছিলেন "নওআব-ওঅযীর" —'নবাব-উজীর'। কিন্তু এখন যখন দিল্লীর সেই শাসন ও জৌলুষ অবসিত, যখন হিন্দুস্তানের রাজনীতিতে মুগলশাহীর কোন

প্রভাবও আর অবশিষ্ট নেই, তখন এখানে এঁরা বনে গেলেন 'বাদশাহ' !

একথা হয়তো মনে হতে পারে, ইংরেজরা যখন বাদশাহী ইজ্জত দিল অওধ-শাসকদের, তাঁরা তখন নিশ্চয়ই নামের মর্যাদা অনুযায়ী তার গৌরব বাড়িয়েছিলেন, শুধু নামেই বাদশাহ না থেকে কাজেও যথার্থ বাদশাহ হয়ে উঠেছিলেন। বাস্তবে কিন্তু তা হয় নি। অওধের বাইরে প্রাদেশিক শাসকদের কোন প্রভাব তো ছিলই না, আপন রাজ্যের মধ্যেও তাঁদের আর সেই স্বাধীনতাও ছিল না, যা তাঁদের পূর্বপুরুষরা ভোগ করে গেছেন। এখন কারও 'তাজপোশী' (মুকুট-পরিধান) অভিষেক ইত্যাদি ইংরেজের সম্মতি ছাড়া হবার জো নেই। রাজ্যের জায়গায়-জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে ইংরেজ সৈন্য। রেসিডেণ্ট সাহেবের হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায় নেই। এখন রাজসিংহাসন একটি মঞ্চ ; তার ওপর যা কিছু হচ্ছে, অভিনেতাই করছে বলে নজরে পড়ছে ; আসলে, ওই অভিনয়ের পরিচালক অন্য ব্যক্তি, যে পর্দার আড়ালে থেকে যেমন-ইচ্ছে অভিনয় করিয়ে চলেছে।

খোদার মেহেরবানী (ঈশ্বরের কৃপা) বলতে হয়—এইসব অওধ-নরেশ এবং তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে তাবৎ রাজকর্মচারীর সংবেদনশীলতা একেবারে মরে গিয়েছিল। নিজেদের দুর্বলতা ও অসহায় অবস্থাটা তাঁরা অনুভবই করতে পারতেন না। গাজীউদ্দীন হায়দর বাদশাহ হয়েই ডুবে গিয়েছিলেন আয়েশে-বিলাসে। আর নাসীরউদ্দীন হায়দর তো 'শাহী তখ্‌ত্‌' পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। নবাব সাদত আলী খাঁর জমানো অর্থ দুজনের বিলাসিতার খোরাক জুগিয়েছিল। কিছু ধার দেওয়া হয়েছিল ইংরেজদের, কিছু খরচ হয়েছিল বাদশাহ ও বেগমের রুচি-অনুগামী, বড়ো শখের আবিষ্কার, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ; বাকি সব বাজে খরচ, উৎকট বিলাসিতার নজরানা ! গাজীউদ্দীন হায়দর তো এতোদূরও গিয়েছিলেন—'নজ্‌ফে অশরফের' নকল বানিয়ে নিজের গোরস্থানের ঠিকানা পর্যন্ত করে নিয়েছিলেন,

এবং স্বীয় উত্তরাধিকারীর ভরসায় না থেকে ইংরেজের হাতে কিছু টাকাও ধরে দিয়েছিলেন, যাতে তার সুদ থেকে ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে 'নজফ'[1]-এরও তত্ত্বাবধান ঠিকমতো হয়। আজও তাঁর কবরের ওপর 'চিরাগ' (বাতি) জ্বালানো হয়; 'মজলিস'[2] হয়, কুরান-পাঠ হয়, 'মুহর্‌রমে' আলোর সাজ পরানো হয়। কিছু গরীবও এতে উপকৃত হয়। কিন্তু নাসীরউদ্দীন হায়দর ভোগবিলাসে রত থাকায় এ-ফুরসৎও পান নি। নদী-পরপারে, ইরাদত নগরে একটি 'করবলা' (কারবালা) তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন, যেখানে তাঁর কবরও হবার কথা। কিন্তু তার দেখাশোনা করার কথা একবারও ভাবেন নি। ফলে, ওটি এখন পড়ে আছে ডালীগঞ্জ স্টেশনের পাশে জংগলাকীর্ণ নির্জন নিস্তব্ধতায়। বাতি দেবারও কেউ নেই। অথচ, তাঁরই সময়ে ওখানে আবাদ হয়েছিল গণেশগঞ্জ ও চাঁদগঞ্জ নামে দুটি নতুন মহল্লার।

নাসীরউদ্দীন হায়দরের জ্যোতিষে আসক্তি ছিল। জ্যোতিষ থেকে আকর্ষণ নক্ষত্র-বিদ্যায়। বাসনা হল: শহরের মধ্যে একটা প্রথম শ্রেণীর মানমন্দির স্থাপন করবেন। নবাব সাদত আলী খাঁর সমাধিভবন ও মোতী মহলের মাঝখানে তৈরি হল বাড়ি। মানমন্দির হওয়ার জন্যে এর খ্যাতি 'তারেওয়ালী কোঠী' নামে। বড়ো বড়ো সব দূরবীন এবং অন্যান্য জটিল যন্ত্রপাতি আনানো হল। ওগুলোকে ঠিকমতো বসানোর ও তদারকীর ভার দেওয়া হল দক্ষ আকাশবিজ্ঞানী কর্নেল ভ্যালকাওঅসকে। লখনউয়ের এই মানমন্দির কর্নেল সাহেবের জীবনে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা! 1827 খ্রীষ্টাব্দে নাসীরউদ্দীন হায়দরের শাসনের আরম্ভ; আনুমাণিক চার-পাঁচ বছর পরে মানমন্দিরটির প্রতিষ্ঠা; সেই থেকে 1847 খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ অওধের শেষ শাসক ওয়াজিদ আলী শাহর সময় পর্যন্ত এই মানমন্দির

---

[1] আরবের একটি প্রসিদ্ধ নগর নজফ; এখানে হযরত আলীর সমাধি আছে; তারই নাম 'নজফে অশরফ'। তা থেকে, 'নজফ' অর্থে 'কবর' প্রসিদ্ধ। [2] কারবালার শহীদদের স্মৃতিপূত শোকসভা।

তাঁরই রক্ষণাবেক্ষণে ছিল। সেই বছরে কর্নেল সাহেবের দেহান্ত হয়। তারপর আর কাউকে ওই কাজে নিযুক্ত করা হয়নি। আর ওয়াজিদ আলী শাহ তো এ বিষয়ে চূড়ান্ত অবহেলাই দেখিয়েছেন। লখনউয়ের কতিপয় পদস্থ ব্যক্তির কাছে শোনা: এখানকার সবচেয়ে বড়ো দূরবীনটিকে খেলনা মনে করে ওয়াজিদ আলী শাহ সেটি দান করেছিলেন রক্ষিতা হায়দরীকে। তবে 'গেটেজিয়ার' থেকে জানা যায়: মানমন্দিরটি তাঁর রাজত্বের শেষ পর্যন্ত অক্ষত ছিল। সম্ভবত গদরের সময় দুষ্কৃতিকারীরা এটিকে নষ্ট করে দেয়। এ সিদ্ধান্তের প্রমাণ: এহমদউল্লা শাহ (যিনি ডংকা শাহ নামেও পরিচিত ছিলেন এবং অসীম বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন) এই 'তারেওয়ালী কোঠী'তেই অবস্থান করতেন, এখানেই দরবার বসাতেন, এবং বিদ্রোহী সেনাদের অধ্যক্ষরা এখানেই একত্রিত হয়ে সলাপরামর্শ করতেন।

এই সময়েই প্রধান মন্ত্রী র‍্যাওশনউদ্দৌলা তাঁর সুন্দর ও চমকদার বসতবাড়িটি তৈরি করিয়েছিলেন। ওয়াজিদ আলী শাহ যখন এটিকে 'ক্যায়সর বাগ' করছিলেন, তখনই ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করে নেয়। গোটা রাজ্যই যখন ইংরেজের অধিকারে গেল, এ বাড়ি হল সরকারী সম্পত্তি। বর্তমানে এখানে ডেপুটী কমিশনার বাহাদুরের এজলাস বসে।

নাসীরউদ্দীন হায়দরের সময়টা, সত্যি বলতে কি, খুবই দুঃসময় ছিল। শাসনকার্য ছিল ঢিলেঢালা, ভোগবিলাস ও স্বরচিত ধর্মোৎসবের ভিড়ে ফুরসৎই মিলত না। যাবতীয় দায়িত্ব ছিল প্রধান মন্ত্রীর ওপর। আর মন্ত্রীরাও তেমনি! এমন একজন লোকও ছিল না, যে সততা ও সমঝদারীর সঙ্গে কাজ করতে পারে। হকীম মেহঁদীকে ডাকিয়ে আনা হল। কাজ তিনি ভালোই জানতেন। কিন্তু তাঁর আগ্রহ, রাজ্যটিকে কি ক'রে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে তোলা যায়। র‍্যাওশনউদ্দৌলা মন্ত্রী হলেন। কিন্তু তাঁর না ছিল কর্মক্ষমতা, না মনোযোগ। তাঁর দ্বারা কিছু হল না। বাদশাহর বাজে খরচের

'দৌলতে' সাদত আলী খাঁর জমানো টাকা জলের মতো বেরিয়ে গেল। রাজ্যের আয়ে মহলের ব্যয় চলা দুষ্কর। সর্বোপরি, বাদশাহ ও তাঁর মা, গাজীউদ্দীন হায়দরের পত্নী—দুজনের মধ্যে বিবাদ বেধে গেল। তিনি বলছেন, মুন্নাজান বাদশাহ-পুত্র; ইনি ওকে নিজের ছেলে বলে মনেই করেন না। এই সমস্ত মিলে, জট পাকিয়ে, অওধের অবস্থা এমন দাঁড়াল, বোঝা গেল : দেশকে শাসন করার, সামলানোর ক্ষমতা শাসকদের একেবারেই নেই।

রেসিডেণ্ট সাহেব এবং হিন্দ-এর গভর্ণর জেনারেল বারবার বুঝিয়েছেন, ভয় দেখিয়েছেন, সাবধান করে দিয়েছেন, ফলাফলের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন ; কোন ফল হল না। নারী-সংসর্গে থেকে থেকে নাসীরউদ্দীন হায়দরের মধ্যে 'জনানাপন' (মেয়েলীপনা) দেখা দিল ; মেয়েদের পোষাক পরতেন, মেয়েদের মতো কথা বলতেন। জেনানা-স্বভাবের সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাস মিলিত হল, জাত হল এক আশ্চর্য ফলশ্রুতি। মাতৃদেবী-প্রচলিত বারো ইমামের সেই নকল বিবি ('অছুতিয়াঁ') ও ইমামদের জন্মোৎসব অধিকতর প্রশ্রয় পেল। এমনকি, ইমামদের জন্ম-সমারোহে নাসীরউদ্দীন হায়দর স্বয়ং গর্ভবতী নারী সেজে প্রসূতি গৃহে গিয়ে বসতেন, চেহারায়, হাবে-ভাবে প্রসব-পীড়া ফুটিয়ে তুলতেন, এবং অবশেষে একটি কাল্পনিক শিশুর জন্মও দিতেন ! অপিচ, বাস্তবে যেমন, ঠিক সেই-ভাবেই, কাল্পনিক শিশুর 'জন্ম-ছঠী-স্নান' আদি অনুষ্ঠিত হত। ক্রমে, এই উৎসব এতো বড়ো হয়ে গেল, বাদশাহ আর কোন কাজে ফুরসৎই পেতেন না। রাজ্যের দিকে দৃষ্টি কে দেয় !

অওধ দরবার ও ইংরেজ সরকারের তৎকালীন সম্পর্ক দেখে মনে হয় : যদি গভর্ণর জেনারেল ও রেসিডেণ্টের অনুকূল মনোভাব না থাকত, ইংলণ্ডের বোর্ড যদি অধীনস্থ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সংযত করে না রাখত, তাহলে সেই কালেই বাদশাহী শাসনের অবলোপ সূচিত হত। কিন্তু শাসকের শিশুসুলভ আচরণ সত্ত্বেও—এই দরবারের পরমায়ু তখনও ছিল। হয়তো

সেইজন্যেই, রাজ্যঅধিকারের কথা ভেবেও ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত কিছু করল না।

লখনউয়ের পুরনো ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের অভিমত: এই স্ত্রৈণতা ও শিশুসুলভ কদাচারের পাশাপাশি খুব নিষ্ঠুরও ছিলেন নাসীরউদ্দীন হায়দর। সারাটা জীবন তিনি কাটিয়েছিলেন নারী-সমাজে ; তাঁর জুলুমের শিকার ছিল মেয়েরাই। পত্নী ছিল কুড়িটিরও বেশি। ছোটখাট অপরাধ, মামুলী ধরণের দুঃশীলতার শাস্তিস্বরূপ তাদের পুঁতে দিতেন দেয়ালের মধ্যে। এও শোনা যায়ঃ পথে যেতে যেতে যদি চোখে পড়ত, কোন রমণীর বুকের ওপর কোন পুরুষের হাত, তখনই স্ত্রীলোকটির দুই স্তন ও পুরুষটির হাত কেটে দেবার আদেশ জারী হয়ে যেত।

এমনি চলল দশবছর। কুরীতি ও কদাচারে উত্যক্ত হয়ে উঠল দরবারী পরিবেশ। অবশেষে, বাদশাহ স্বয়ং শিকার হলেন তাঁর আত্মীয়-বন্ধুদের হাতে। এদের কেউ একজন বিষ দিয়ে তাঁকে হত্যা করল 1837 খ্রীষ্টাব্দে।

নাসীরউদ্দীন হায়দর নিঃসন্তান মারা গিয়েছিলেন। গাজীউদ্দীন হায়দরের বেগম বারবার মুন্নাজানকে নিজের পৌত্র এবং রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী বলে দাবী করেছেন। কিন্তু গাজীউদ্দীন হায়দর ও নাসীরউদ্দীন, দুজনের কেউই ওকে শাহী বংশোদ্ভব বলে স্বীকার করেন নি। এই কারণেই, ইংরেজ সরকার আগে থেকেই, নবাব সাদত আলী খাঁর পুত্র নাসীরউদ্দৌলা মুহম্মদ আলী খাঁর সিংহাসন লাভের বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল। কিন্তু বেগম সাহেবা তা মানতে চাইলেন না। মুন্নাজানকে নিয়ে তিনি চলে গেলেন লাল 'বারহদরীতে' ; সেখানেই সিংহাসন ছিল। রেসিডেণ্ট বারবার নিষেধ করলেন, বোঝালেন ; কর্ণপাত করলেন না। জোর করে মুন্নাজানকে সিংহাসনে বসালেন, তার সব দায় নিলেন নিজের কাঁধে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন শত্রুপক্ষের ওপর, বদলা নেবার জন্যে। লুট গ্রেফতার খুনোখুনি শুরু হয়ে গেল। হাহাকার পড়ে গেল শহর জুড়ে।

তখন সঙ্গীসাথী নিয়ে রেসিডেণ্ট ছুটে এলেন দরবারে। বাদশাহ-বেগমকে বোঝালেন : মুন্নাজান রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে না, এবং এভাবে আপনিও সফল হতে পারবেন না। লাটসাহেবের লেখা ফরমান দেখালেন, এবং বললেন : তার চেয়ে বরং মুন্নাজান সিংহাসন খালি করে দিক, এবং নাসীরউদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসানো হোক। কিন্তু একটা কথাও কারও কানে গেল না। উল্‌টে, সহকারী রেসিডেণ্টের ওপর হামলা করে রক্তপাত ঘটিয়ে দিল। রেসিডেণ্ট আগে থেকেই চৌকীর সমস্ত ইংরেজ প্রহরীদের ডাকিয়ে এনে সিংহাসন-গৃহের সামনে কামানসহ লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। এখন বাধ্য হয়ে, হাতে ঘড়ি নিয়ে তিনি বললেন : 'দশ মিনিট সময় দিচ্ছি ; এর মধ্যে মুন্নাজান যদি সিংহাসন থেকে না নামে, তাহলে জোর খাটাতেই হবে'। তবু কেউ পরোয়া করল না। রেসিডেণ্ট বলে চললেন : আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে ··আর মাত্র দুমিনিট আছে···আর এক মিনিটও নেই, ভেবে দেখুন ··'।

এই সাবধানবাণীতেও কেউ কান দিল না। হঠাৎ গুড়্‌গুড়্‌ শব্দে কামান আক্রমণ শুরু হল। মুহূর্তের মধ্যে পড়ে গেল ত্রিশ-চল্লিশ জন। দরবারের সভাসদরা ঘাবড়ে গিয়ে পড়ি-কি-মরি করে পালাল। একটা নাচিয়ে-দল মুজরা করছিল, তাদেরও কয়েকজন জখম হল। কাঁচের জিনিসপত্র ভেঙ্গে পড়ল ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে। কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুগত বীর যোদ্ধা মাটি কামড়ে লড়াই করছিল। একে-একে তারাও নিহত হল। তখন মুন্নাজানও সিংহাসন থেকে নেমে প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল। কিন্তু পারল না, ধরা পড়ে গেল। মুন্নাজান ও বেগম সাহেবা দুজনকেই গ্রেফতার করল ইংরেজরা ; সেই সঙ্গে সিংহাসনে বসিয়ে দিল নাসীরউদ্দৌলাকে।

মুহম্মদ আলী শাহ নাম নিয়ে নাসীরউদ্দৌলা অওধের বাদশাহী পেলেন। মুন্নাজান ও তার পিতামহীকে বন্দী করে লখনউ থেকে কানপুর, কানপুর থেকে চিনারগড় দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হল। রাজকোষ্‌ থেকে বেতন নির্ধারিত হল মাসিক দুহাজার চারশো টাকা।

সিংহাসন-আরোহণের সময় মুহম্মদ আলী শাহর বয়স ছিল তেষট্টি। বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ। সময়ের উত্থান-পতন, দরবারের বালকোচিত আচরণ, সবই দেখেছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা হল : তিনি ছিলেন নবাব সাদত আলী খাঁর পুত্র, পিতার মেজাজ দেখেছেন। ফলে, খুব সতর্কভাবে কাজ করতে লাগলেন ; মিতব্যয়ের পরিকল্পনা তৈরি করলেন, এবং যতোদূর সাধ্য, শাসনব্যবস্থাকে সামাল দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু বয়স হয়ে গেছে বেশি, শরীরও অপটু। গদীতে বসেই ফরখ্‌খাবাদ থেকে হকীম মেহঁদীকে ডাকিয়ে এনে উজীরের পদ দিলেন। দিন কয়েক পরেই হকীম গেলেন মারা। তখন প্রধান মন্ত্রী করলেন জহীরউদ্দৌলাকে। মাস দুই-তিন পরে তিনিও ইহলোক ত্যাগ করলেন। এরপর উজীর হলেন মুনব্বরউদ্দৌলা। দু-চার মাস পরে কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি চলে গেলেন কারবালা। অবশেষে, উজীর হলেন আশরাফউদ্দৌলা মুহম্মদ ইব্রাহীম খাঁ। অন্যদের তুলনায়, তিনি অনেক সমঝদার ও সৌম্যস্বভাব ছিলেন।

ইতিমধ্যে ইংরেজ ও অওধের মধ্যে একটা নতুন চুক্তি হল। তদনুসারে, রাজ্যস্থিত ইংরেজী তদারকী সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হল। দ্বিতীয়ত, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণমেণ্টকে অধিকার দেওয়া হল, সারা অওধে বা তার যে এলাকায় শাসন-শৈথিল্য দেখা যাবে, যতদিন ইচ্ছে তারা সে-জায়গা নিজ অধিকারে রাখতে পারবে। খুবই অনিচ্ছার সঙ্গে বাদশাহ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন, এবং শাসন-ব্যবস্থার, যতটা সম্ভব, সংস্কার করতে লাগলেন।

সিংহাসন-প্রাপ্তির দ্বিতীয় বছরে তিনি বিখ্যাত ইমামবাড়া 'হসনাবাদ' এবং তার কাছে এক বিশাল মসজিদের নির্মাণকার্য শুরু করলেন। মসজিদটিকে আকারে ও সৌন্দর্যে দিল্লীর 'জামা' (জুমা) মসজিদের চেয়েও বড়ো করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হল।

এই সময়ে লখনউয়ের জনবসতি ও শোভা খুবই বেড়ে গিয়েছিল ; আর, শহর ও তার আশেপাশে এতো লোক বাস করত, লখনউকে

'হিন্দুস্তানের বাবুল' বললেও ভুল হত না। বাস্তবিক, যাবতীয় মানদণ্ডের বিচারে, এই শহর ওই যুগের জীবন্ত 'বাবুলই' (বাবিলন) ছিল।

হয়তো ইংরেজ কিংবা অন্য কোন সভাসদের কাছে মুহম্মদ আলী শাহ এই তুলনার কথা শুনে থাকবেন। শুনে অবধি, স্থির করলেন : লখনউকেও পুরোপুরি বাবিলন করে তুলব ; আর, নিজের এমন এক স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাব, আমার নাম থাকবে অওধের তাবৎ বাদশাহদের ডিঙ্গিয়ে। অচিরেই, 'হসনাবাদের' কাছে, বর্তমান ঘণ্টাঘরের পাশে, বাবিলনের শূন্যোদ্যানের অনুকরণে একটা ইমারত তৈরি করাতে আরম্ভ করলেন। খিলান বা 'মেহরাবের' একটা বৃত্ত, তার ওপর দ্বিতীয় বৃত্ত, তার ওপর তৃতীয় বৃত্ত, এইভাবে নীচে থেকে গাঁথা হতে-হতে ওপরে চলতে থাকল। পরিকল্পনা ছিল : এইভাবে সাততলা পর্যন্ত তৈরি করে এমন একটা বড়ো ও উঁচু গম্বুজ বানানো হবে, সারা দুনিয়ায় তা হবে 'লাজবাব', অদ্বিতীয়। আর তার ওপর থেকে গোটা লখনউ, আশপাশের ময়দান, সব দেখা যাবে। যদি শেষ হত এ-অট্টালিকা, তাহলে অবশ্যই আশ্চর্যজনক ও অদ্বিতীয় হত। নাম দেওয়া হয়েছিল 'সাতখণ্ডা' ; নির্মাণ-ব্যবস্থা ছিল বিপুল। কিন্তু পাঁচতলার পর আর হল না ; 1842 খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদ আলী শাহ ইহসংসার পরিত্যাগ করলেন।

আভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদের সূত্রপাত, কিংবা দেশশাসনে অচল অবস্থার সৃষ্টি যাতে না হয়, সে ব্যবস্থা আগে করেছিলেন মুহম্মদ আলী শাহ ; তারপর হাত দিয়েছিলেন লখনউর অঙ্গসজ্জায়। 'হসনাবাদের' ফটক থেকে 'রোমী দরওআযা' পর্যন্ত নদীর পারে-পারে যে সড়কটি চলে গেছে, তাকে বলা হতো 'চক'। এই সড়কের দুদিকে ছিল বিশাল-বিশাল অট্টালিকা। একদিকে ছিল 'রোমী দরওআযা,' আসফউদ্দৌলার ইমামবাড়া ও মসজিদ, অন্যদিকে 'সাতখণ্ডা' ও 'হসনাবাদের' ফটক। নতুন ইমামবাড়ায় অনেকগুলি আকাশছোঁয়া ইমারত ছিল, কাছেই ছিল 'জামা' মসজিদ। এইসব

বাড়ি মিলে সড়কের দু-পাশে এমন এক মনোহর দৃশ্যের রচনা করত, যা পৃথিবীর তাবৎ বিখ্যাত ও সুন্দর দৃশ্যকে মাত করে দিত।

এসবের মাঝখানে ছিল শহরের বাসিন্দাদের বাড়ি। এখন আর সেগুলি নেই; ভেঙ্গে গেছে, খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে। তবু, আজও, এতো ভাঙ্গচুর সত্ত্বেও, এই অঞ্চলটিকে পৃথিবীর একটি সুন্দরতম দৃশ্য বলা যেতে পারে।

॥ 7 ॥

মুহম্মদ আলী শাহর পর রাজসিংহাসন পেলেন আমজাদ আলী শাহ। মুহম্মদ আলী শাহ চেষ্টা করেছিলেন, যুবরাজের শিক্ষাদীক্ষা যেন উচ্চকোটির হয়। সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে রেখেছিলেন বিদ্বজ্জন-সংসর্গে। কিন্তু, আমজাদ আলী শাহ পড়াশোনায় বিশেষ এগোতে পারলেন না। তার পরিবর্তে, স্বভাবে-আচরণে-শিষ্টাচারে একজন সাচ্চা মৌলভী হয়ে উঠলেন। প্রজারা তাঁকে সীমাহীন শ্রদ্ধা করত। শাসনের বল্গা হাতে আসার পর এই একটিমাত্র যোগ্যতারই পরিচয় তিনি দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু, একথা সকলেরই জানা, যে, নিষ্ঠাবান ধার্মিক ও দেশনেতার রাজনীতির মধ্যে কোনরকম আত্মীয়তা হতে পারে না। ধর্মাচারী না হতে পারেন 'পলিটিসিয়ান,' না হতে পারেন 'স্টেট্স্ম্যান'। ফলত, তাঁর কাছ থেকে যেটুকু নির্দেশ পাওয়া যেত, তা হল: 'সৈয়দদের সেবা করবে, রাজধন খরচ করা হবে ঈশ্বর-ভক্তদের সেবায় ও সাহায্যদানে।' এবং সংযমী, সচ্চরিত্র, শ্রদ্ধাবান অওধ-পতি আমজাদ আলী শাহর দৃষ্টিতে, এই ধর্ম-কর্মগুলিও সন্তোষজনক হত একমাত্র তখনই, যখন সেগুলি সম্পন্ন হত প্রধান ধর্মাচার্য, 'মুজতহিদ-উল-অস্র'-এর শুভ স্পর্শ-মাধ্যমে। বস্তুত, রাজস্বের লক্ষ-লক্ষ টাকা আচার্যকে নজর দেওয়া হত 'যাকাত' (জাকাত) বা দানের নামে। এছাড়া, 'খয়রাত'-বাবদও আরও অনেক অর্থ যেত তাঁর হাতে।

ক্রমশ, সংযম ও শুদ্ধতার বাছ্‌বিচার আমজাদ আলী শাহর একরকম বাতিক হয়ে দাঁড়াল। এইসব করতে করতেই তাঁর সময় খরচ হয়ে যেত। শাসনের দিকে নজর দেবার অবকাশ আর মিলত না। ফল যা হবার, তাই হল। স্বকীয় বিচারবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা দিয়ে মুহম্মদ আলী শাহ যাকিছু কাজ করে গিয়েছিলেন, সব বৃথা হয়ে গেল। কাজী মুহম্মদ সাদিক খাঁর বর্ণনানুসারে : 'অবস্থা তখন চরমে উঠেছে; তাবৎ কর্মচারী দুশ্চরিত্র, বেইমান, স্বার্থপর ; জোর যার মুল্লুক তার। অপরাধী ও অত্যাচারীদের শাস্তি হয় না ; প্রজারা মরে দলে-দলে ; রাজকোষ খালি ; ঘুষের অবাধ রাজত্ব ; ঝগড়া-ফ্যাসাদ-হাংগামা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, থামালেও থামে না।'

সংযম এবং জনহিতে যত্নহীন উদাসীনতা সত্ত্বেও তিনি মহল্লার পত্তন করেছিলেন। যেমন, 'হযরতগঞ্জ'—লখনউয়ের সমস্ত মহল্লার তুলনায় পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর, ঘনবসতিপূর্ণ, ধনী বণিকদের সবচেয়ে বড়ো বাজার, এবং 'সিভিল-লাইনস্‌'-এর সর্বাধিক সুশোভন-অংশ। লখনউ থেকে সোজা কানপুর পর্যন্ত একটা পাকা সড়কও তিনি তৈরি করিয়েছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বড়ো কাজ, সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় : বিশালকায় লৌহসেতু নির্মাণ। এই সেতুর জন্যে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম গাজীউদ্দীন হায়দর ইংল্যণ্ড থেকে আনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেতুর বিভিন্ন অংশ ও উপবস্তুগুলি লখনউ এসে যখন পৌঁছল, বাদশাহ তখন ইহসংসার ছেড়ে চলে গেছেন। নাসীরউদ্দীন হায়দরের সময়ে, যখন ওগুলি বিলেত থেকে এল, তিনি দরবারের ইঞ্জিনীয়ার মিঃ সিনক্লেয়রকে বিভিন্ন অংশগুলি জুড়ে, সেতু বানিয়ে ও বসিয়ে দেবার ঠিকাদারী দিলেন। এবং হুকুম দিলেন : লৌহ সরঞ্জামগুলি যেন রেসিডেন্‌সীর সামনে, নদীর ওপারে রাখা হয়। এখন যেখানে মন্দির ও ঘাট, সেই জায়গাতেই ওগুলি তখন রাখা হয়েছিল। মিঃ সিনক্লেয়র নদীর ভেতরে থাম পোঁতার জন্যে গভীর কূপ খুঁড়লেন, থামগুলি লাগিয়েও দিলেন। কিন্তু তারপর আর কিছুই হল না, সেতু রইল্‌ অসম্পূর্ণ। মুহম্মদ আলী শাহর শাসনকালে সেতু ওই-

রকম অসমাপ্তই পড়ে থাকল। আমজাদ আলী শাহ বাদশাহ হয়েই এদিকে মন দিলেন ।পুল তৈরী হয়ে গেল। বর্তমানে ওখানে যে লোহার পুল রয়েছে, এটা সেই পুরণো পুল নয়। মুহম্মদ আলী শাহর আমলের তৈরি পুল ছিল 'হ্যাংগিংগ্ ব্রিজ', ঝুলন্ত সেতু—চারটে উঁচু ও শক্ত লৌহস্তম্ভের ওপর চাপানো ছিল সমস্ত ভার। ইংরেজরা যখন এল, এর বিভিন্ন অংশে ততোদিনে জং ধরে গেছে, কমজোর হয়ে গেছে, পুরো দেহটা জনসাধারণের চলাচলের পক্ষে বিপজ্জনক। তাই ওটা নামিয়ে নিয়ে ওর জায়গায় আর একটা লোহার পুল বসানো হল। সেইটেই এখনো পর্যন্ত রয়েছে।

আমজাদ আলী শাহর উজীর আমীনউদ্দৌলার কীর্তি 'আমীনাবাদ', যার দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে। আমজাদ আলী শাহ কিছুই করে যান নি ; স্মারকচিহ্ন হিসেবে কোন ইমারত তৈরির শখও তাঁর ছিলনা। তবে, স্বীয় সংযম ও পবিত্র হৃদয়তার পরিবর্তে এক বিষয়ে তিনি 'স্বাভাবিক জনপ্রিয়তা' অর্জন করেছেন—বর্তমান লখনউয়ের সবচেয়ে বিখ্যাত, সর্বাধিক ঘনবসতি ও ধনী মহল্লা—হযরতগঞ্জ ও আমীনাবাদ—তাঁরই কালের স্মৃতিচিহ্ন।

শেষ জীবনে তিনি বদলে গিয়েছিলেন। 1848 খ্রীষ্টাব্দে, যখন তাঁর বয়স আটচল্লিশ বছর কয়েকদিন, 'ক্যান্‌সার' রোগে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। কবর দেওয়া হল, তাঁরই স্থাপিত মহল্লা হযরতগঞ্জে, মেনূড়ু খাঁ রিসালদারের ছাউনীর ভেতরে। হযরতগঞ্জের পশ্চিমভাগে, পথের ধারেই তাঁর ইমামবাড়া, যেখানে তাঁর সমাধি রয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর এই ইমারতটি তৈরি করিয়েছিলেন ওয়াজিদ আলী শাহ। দশ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। তবু, এটি 'হসনাবাদের' ব্যর্থ অনুকরণ। 'হসনাবাদের' মতো এখানেও যদি আলোকসজ্জার ব্যবস্থা থাকত, মহরমে লখনউয়ের পূর্বাঞ্চলও তাহলে ঝক্‌মকিয়ে উঠত। এর জন্যে কোন বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা নেই ; তবু এর নিজস্ব আয় কম নয়। এর চৌহদ্দীর মধ্যে যেসব বাড়ি আছে, তার ভেতর দিকে অনেক 'ইয়ুরেশিয়ান' ইত্যাদি বাস

করে ; বাইরের দিকে দোকানের সারি, যার মধ্যে বড়ো-বড়ো ব্যাপারীর দোকানও আছে ; এদের ভাড়া থেকে বেশ ভালো রকম অর্থই পাওয়া যায়। ভাড়া যারা আদায় করে, মহরমে কবর ও ইমামবাড়ার 'চিরাগ' জ্বালানোর দায়িত্বও তাদের।

অতঃপর সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন আমজাদ আলী শাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র ওয়াজিদ আলী শাহ। তাঁর শাসনকাল এই পূর্বী দরবারের ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠা, সেই সুপ্রাচীন শোকগীতির অন্তিম পদ। যেহেতু, তাঁর সময়েই অওধ শাসনের শেষাবসান, তাই তাবৎ বিবেচক ব্যক্তির ধিক্কারের পাত্র হয়েছেন তিনিই ; এবং একথাও প্রায় সবাই মেনে নিয়েছেন—তিনিই পতনের কারণ। কিন্তু যে সময়ে তাঁর রাজত্বের অবলোপ ঘটে, সে সময়ে হিন্দুস্তানের সমস্ত দেশীয়-শক্তিই ভেঙ্গে পড়ছে ; ভালো হোক, মন্দ হোক, সবরকমের পুরনো রাজত্ব ও শাসনব্যবস্থা বিদায় নিচ্ছে পৃথিবীর বুক থেকে। পাঞ্জাবে শিখ ও দক্ষিণে মারাঠাদের পতন হল কেন ? তারা তো ছিল বীর, শক্তিশালী, হুঁশিয়ার। দিল্লীতে মুগল শাহানশাহী এবং বাঙ্গলায় নবাব নাজিমের পতন কেন হল ? লখনউ অধিপতিদের মতো "ছেলেমানুষী" তো এঁদের কারোরই ছিল না ! উপরি-উক্ত চার দরবারের কোনটাতেই তো কোন ওয়াজিদ আলী শাহ ছিলেন না। যদিচ, তাঁর মৃত্যু লখনউয়ের মৃত্যুর চেয়ে কম ছিলনা !

আসল কথা : একদিকে যখন হিন্দুস্তানীদের গাফিলতী ও অজ্ঞতার পরিমাণ আকণ্ঠ-বিস্তৃত, অন্যদিকে তখন ব্রিটিশ রাষ্ট্র আপন যোগ্যতা, দূরদর্শিতা, পরিশ্রম ও প্রযত্ন মাধ্যমে স্বীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ফলভোগ করছে। ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞের বুদ্ধিমত্তা, বিবেচনাশক্তি, অধ্যবসায় ও নিয়মানুবর্তিতা হিন্দুস্তানীদের অজ্ঞতা ও আত্মবিস্মৃতির ওপর জয়ী হবে না, এ অসম্ভব প্রস্তাব। বিশ্ব জুড়ে তখন এক নবীন সংস্কৃতির উত্থান। প্রত্যেক জাতিকে ডেকে ডেকে সে বলছে : আমার সঙ্গে যে আসবে না, সে শেষ হয়ে যাবে। কালের এই দুন্দুভি-ধ্বনি কেউই শোনেনি ; ফলে নিশ্চিহ্ন

হয়ে গেছে। এই নিহতদের দলে অওধরাজ্যও সেদিন ছিল। তার পতনের দায়িত্ব বেচারী ওয়াজিদ আলী শাহর ওপর অর্পণ করার অর্থ : ইতিহাসের প্রতি অন্যায় করা !

ধর্মশাস্ত্র-অনুগামী পিতা। পুত্র ওয়াজিদ আলী শাহকেও বিদ্বান-সমাজে রেখে নিজের মতো করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তার আংশিক প্রভাব পড়েছিল ওয়াজিদ আলী শাহর ওপর, এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার রং গাঢ়তর হয়েছিল। তবে, রাজত্বের উত্তরাধিকারী রাজকুমারের স্বাভাবিক প্রবণতা বিলাসিতা ও ললিত-কলার দিকে ; এক্ষেত্রে আমজাদ আলী শাহর কোন ভূমিকা ছিল না। শুধুমাত্র পিতার আগ্রহ বলে নয়, পড়াশোনায় এমনিতেই ভালো ছিলেন ; তবে গানের নেশা ছিল তার চেয়েও বেশি। পিতার আপত্তি ছিল ; নিজের ছিল রুচি। তারই নির্দেশে, রাজকুমারত্ব-কালেই রীতিমতো ওস্তাদ রেখে গান-বাজনা শিখেছিলেন। ঘনিষ্ঠতা করেছিলেন বাজারের স্ত্রীলোক ও ঢুলি-ডোমদের সঙ্গে। ফল হল অবধারিত। সুন্দরী নারী ও সুকণ্ঠ গায়কদের সান্নিধ্যে যে আনন্দ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সভ্য সমাজে তা দুর্লভ হয়ে উঠল।

পিতার বিপরীত পুত্র। ইমারতের শখ ছিল। যৌবরাজত্বেই ভোগবিলাস ও আনন্দ-সভার জন্যে একটা সুন্দর বাগান এবং তার মধ্যে খান দুয়েক ছোট ছোট সুদৃশ্য বাড়ি তৈরি করে নিয়েছিলেন। সিংহাসনে বসেই তিনি উজীরী খেলাত দিলেন যে আলী নকী খাঁকে, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল এক বেশ্যালয়ে। তখনও তিনি যুবরাজ। নতুন বন্ধুর যৌবনসুলভ চঞ্চলতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন রাজকুমার। এখন নিজে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত বাড়ি ও বাগান তৈরি করালেন ; যখন পছন্দ হল, তখন বুঝে গেলেন : উজীরী ও রাজ্য পরিচালনার জন্যে এঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেউ নেই !

রাজত্বের শুরু তো এইভাবে হল। আইন-কানুন ও সেনার সংস্কারে নবযুবা ফ্যাশন-প্রিয় বাদশাহর বিশেষ রুচি ছিল। রাজকীয় শোভাযাত্রার আগে আগে ঘোড়ার পিঠে একটা সিন্দুক চলত, চাবি

থাকত স্বয়ং বাদশাহর কাছে। কারও কোন অভিযোগ থাকলে আরজী লিখে তার মধ্যে ফেলে দিত। মহলে পৌঁছে হুজুর আরজী বার করে তার ওপর নিজ হাতে হুকুম লিখতেন। কিছু নতুন পলটন ও "রিসালা" (অশ্বারোহী সেনা) ভর্তি হল। বাদশাহ অক্ষর-লিপির নাম অনুসারে রিসালগুলির নাম রাখলেন 'বাঁকা, তিরছা, ঘনঘোর', পলটনদের নাম 'অখতরী, নাদরী'। নবাব সাহেব স্বয়ং ঘোড়ায় চড়ে যেতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে দাঁড়িয়ে ওদের কুচকাওয়াজ ও ও যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষাদান দেখতেন। খুশি হলে, দক্ষ সৈনিকদের 'ইনাম-ইকরায়' (বখশিষ-উপহারাদি) দিতেন। ফৌজী কুচকাওয়া-জের জন্যে নিজেই ফারসী শব্দ ও বাক্য তৈরি করেছিলেন : "রাস্তর্য" (সোজা চলো), "পস বইয়া" (পেছনে ঘোরো) "দস্তর-চপ বাগির্দ" (বাঁদিকে ঘুরে যাও)। কিছুদিন পরে, যুবতী ও সুন্দরী মেয়েদের নিয়েও একটা ছোট "জনানা ফৌজ" গড়া হল। তাদেরও এইসব শব্দ সহায়ে ড্রিল করানো হত।

আধুনিক যুগের এই প্রাথমিক লক্ষণ কিছুদিন চলল। পুরো এক বছরও গেল না, মন পিছলে গেল বিষয়ান্তরে। যৌবরাজ্যকালের পুরনো রুচি আবার ফিরে এল। সুন্দরী, গরঠিকানা স্ত্রীলোকদের সান্নিধ্য বেড়ে গেল, আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হতে লাগল। ঢুলি-ডোমরাই হল দরবারের সভাসদ এবং রাজ্যের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। বাদশাহর চিত্তে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ভদ্র রুচি যেটুকু তখনও অবশিষ্ট ছিল, তার প্রকাশ ঘটল কবিতায়। নিজে লিখতেন, কবিদের কদর দিতেন।

তখন লখনউয়ে কবিতার চর্চা খুব বেশিই ছিল। শুধু লখনউতেই এতো কবি ছিলেন, গোটা হিন্দুস্তানের কবিদের মোটসংখ্যাও তাদের অতিক্রম করতে পারত না। 'মীর' ও 'সওদা'র পুরনো কবিতা বাতিল। এখন 'নাসিখ'-এর ভাষা ও 'আতশ'-এর কল্পনা হৃদয়-বিহারিনী। 'রিঁদ' ও 'সহবা'র সুরা-সুন্দরী বিষয়ক কবিতা এবং নবাব মির্জা 'শ্যক'-এর "মসনবী" বাড়িয়ে দিল বিষয়-বাসনাকে।

বাদশাহর রুচি ছিল এরই অনুকূল ; এগুলি ছিল তাঁর স্বভাবেরই অনুরূপ।

ইসলামী খিলাফতের প্রথম শতক পর্যন্ত ইসলামী কবিতার বিষয় ছিল : কবি এক বিশেষ রমণীর 'আশিক' (প্রেমিক) হতেন ; তার নাম নিয়ে, তার রূপসৌন্দর্য ও অঙ্গবিভঙ্গের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা দিতেন ; তাকে সম্বোধন করে প্রকাশ করতেন ব্যাকুলতা ও মুগ্ধতা; প্রায়ই গোপনে মিলিত হতেন তার সঙ্গে, ভদ্রতা ও শিষ্টতাকে কদাপি লংঘন করতেন না। পরবর্তী অধ্যায়ে, আরবেই 'মাশুক' (প্রেমিকা) চলে গেল যবনিকার অন্তরালে। কবির নতুন প্রেমিকা তাঁরই কল্পনার এক পুত্তলিকা—ভোগীদের কেউ বলেন : ইনি সুন্দরী নারী ; কেউ বলেন, সুন্দর কিশোর ; এবং সুফীরা সন্ধা ভাষার মাধ্যমে তাকেই বলেন : প্রিয়তম, স্রষ্টা। এই সবের যোগফলস্বরূপ ফারসী কবিতায় দেখা দিল এক ধরণের গুপ্ত, রাহস্যিক, কল্পনা ও প্রথা। এবং ওই সময় পর্যন্ত লিখিত উর্দূ কবিতা ছিল এরই ফসল। কিন্তু নবাব মির্জা শ্যকের কবিতা হল : পর্দানশীনা সুন্দরী রমণীর প্রেমিক হয়ে তাকে চরিত্র-হীনা করার সাধ্য-সাধন। তাঁর 'মসনবী'র ভাষা অবশ্য সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, প্রথাবিরোধী, এবং অত্যধিক প্রেম-প্রণয়-বিলসিত। সভ্য শিষ্ট ব্যক্তিও স্বাদ গ্রহণ না করে থাকতে পারত না।

ওয়াজিদ আলী শাহও এই 'মসনবী' দেখেছিলেন। স্বয়ং কবি ছিলেন। এই ফর্মটিকে সহজেই আত্মসাৎ করে নিয়ে তিনি কবিতা লিখতে লাগলেন। এবং, বলা বাহুল্য, সেই সব কবিতার বিষয় ছিল : প্রেম, যৌবনের শতশত অসংগতির অভিব্যক্তি, এমনকি স্বকৃত নৈতিক অপরাধের অকপট স্বীকৃতিও। আমার বিশ্বাস, বাদশাহ তো বটেই, উজীর আমীরদের মধ্যেও এমন কেউ ছিলেন না, যিনি যৌবনে প্রাণ ভরে কামবাসনা চরিতার্থ করে নেন নি। কিন্তু ওয়াজিদ আলী শাহর মতো আর কেউই নিজের সেইসব অপরাধ এমন নির্লজ্জভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন নি। ওয়াজিদ আলী শাহর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি কবিতা হিসেবে খুব সার্থক না হতে পারে, কিন্তু

আত্মগত ভাব-ভাবনার ও বাস্তব অভিজ্ঞতার বহিপ্র্রকাশে তিনি নবাব মির্জার চেয়েও দু-কদম এগিয়ে গেছেন। এমনকি, স্থানবিশেষে, বাজারী কৌতুক ও অশ্লীল শব্দের প্রয়োগেও সংকোচ বোধ করেন নি।

বারবনিতা, দাসী, কাহারনী, মহলে আগতা বিভিন্ন শ্রেণীর রমণী, এমনি শত শত নারীতে তিনি আসক্ত হয়েছিলেন। যুবরাজ ছিলেন, অবাধ, অবারিত প্রেমেও তাই পরিপূর্ণ সফল হয়েছিলেন। তাঁর সেইসব প্রেমের লজ্জাজনক বৃত্তান্ত কবিতায়, অন্যবিধ রচনায়ও, তাঁরই স্বগতোক্তিতে উচ্চারিত হয়েছে। সত্যি, মানব-ইতিহাসে এমন অপচিত্র ও কলুষিত চরিত্র আর দেখা যায় না।

ইমারতের শখ তো ছিলই। গদীতে বসেই আরম্ভ করে দিলেন ক্যয়সর বাগ'। তুলনামূলক বিচারে, এটি আসফউদ্দৌলার বাড়ির মতো অতো মজবুত নয় ; কিন্তু সৌন্দর্যে ঔজ্জ্বল্যে অতুলনীয়। বহুদূরবিস্তৃত আয়ত এলাকা ; তার মধ্যে আশ্চর্যসুন্দর দোতলা বাড়ি পর পর। একটা দিক ছিল নদী ছুঁয়ে—বিদ্রোহের পর সেটা খুঁড়ে ফেলা হয়। বাকি তিন দিক এখনও রয়েছে। গভর্ণমেণ্ট সেগুলিকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে অওধের তালুকদারদের বসবাসের জন্যে দিয়েছেন ; সেইসঙ্গে এই আদেশও : যেখানে যেমনটি আছে, ঠিক সেইভাবেই রেখে দিতে হবে।

'ক্যয়সর বাগের' অন্দর-প্রাঙ্গনে গাছ গাছালির ভীড়। এটিকে বলা হত ঃ 'জিল্যওখানা' (আস্তাবল) মাঝখানে পাথরের 'বারহদরী' —এখন যেখানে লখনউয়ের টাউন হল। আরও কয়েকটা অট্টালিকা ছিল। স্থানটি তখন ছিল দর্শনীয়। এ হল 'ক্যায়সর বাগের' পূর্বী তোরণের বাইরের চিত্র। তোরণটি দিয়ে বেরিয়ে এলে দুপাশে কাঠের পর্দা ; পেরিয়ে গিয়ে 'চীনা বাগ'। সেখান থেকে বাঁদিকে ঘুরলেই আপনি পৌঁছে যাবেন এক বিশাল জলপরী-ফটকে। এখানেই প্রধান মন্ত্রী আলী নকী খাঁর বিশ্রামগৃহ, জাহাঁপনার প্রাসাদের কাছাকাছি ; প্রয়োজন হলেই তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠানো যায়। ফটকের অন্যদিকে 'হয়রত বাগ', ভেতরে ডানদিকে 'চাঁদীওয়ালী

বারহদরী'—মামুলী ইঁট-চূণের বাড়ি, ছাদ রূপোর পাত দিয়ে মোড়া; তাই এই রূপালী নামঃ 'চাঁদীওয়ালী বারহদরী।' এরই লাগোয়া 'খাস মকাম' ঃ জহাঁপনার আরাম গৃহ। আসলে এটি ছিল সাদত আলী খাঁর 'বাদশাহ মঞ্জিল'।

পুনশ্চ, কাঠের পর্দার গলি থেকে বেরিয়ে অন্য দিকে ঘুরলেই দৃষ্টির গোচরে বৃত্তাকার অট্টালিকার সারি, অনেক দূর অবধি চলে গেছে। এটি হল বিখ্যাত 'চ্যওলক্‌খী'। এগুলির পত্তন করেছিলেন হুজুরী নাঈ আজিমউল্লাহ; তাঁর কাছ থেকে বাদশাহ কেনেন চার লক্ষ টাকা দিয়ে, খাস বেগম ও অন্যান্য পট্টমহিষীদের জন্যে। গদরের সময়ে এরই ভেতরে ছিল হযরত মহলের বিশ্রামগৃহ; সেখানে তাঁর দরবার বসত।

এখান থেকে একটা পথ গেছে 'ক্যয়সর বাগের' দিকে। তার এক পাশে বিশাল গাছ। গাছের নীচে অনেক ছায়া। ছায়ার আড়ালে শ্বেতপাথরের একটা সুন্দর গোল চত্বর। 'ক্যয়সর বাগের' মেলার সময় জাহাঁপনাহ গেরুয়া পরিধান করে, যোগী সেজে আসতেন, এই চত্বরেরই ওপর বসতেন আসর জমিয়ে। একটু এগোলেই এক বিশাল তোরণ, এক লক্ষ টাকার তৈরি 'চ্যওলক্‌খী ফাটক'। আর একটু অগ্রসর হলেই আপনি আবার ফিরে আসবেন 'ক্যয়সর বাগে'। এই বাগান-বাড়ির জন্যে রাজকোষের আশীলক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। এর চারদিকের বাড়িগুলিতে থাকতেন জাহাঁপনার বেগমরা, পরীর মতো সব সুন্দরী রমণীরা। আজ সেখানে বাস করে অদ্ভুত অদ্ভুত সব মূর্তি। এইসব দেখে, প্রাচীন লোকেরা বলে ওঠে ঃ

> পরীনহুফ্‌তা রূখাঁ-ও-দেব দরকারিশ্‌মা-ও-নায
> বস্যুখ্‌ত্‌ অক্‌ল্‌খ্‌ হয়রত কি ঈচে বুলঅজবীস্ত
>
> পরীরা লুকিয়ে ফেলেছে নিজেদের চেহারা,
> রাক্ষসরা দেখাচ্ছে তাদের ছলাকলা,
> ভেবে ভেবে বুদ্ধি হয়রান—
> কী করে হলো এমন সব!

'ক্যয়সর বাগের' পশ্চিমী তোরণের বাইরে ছিল র‍্যাওশনউদ্দৌলার বাড়ি। ওয়াজিদ আলী শাহ সেটিকে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে নাম রাখেন 'ক্যয়সর-পসন্দ'। এখানে তাঁর এক প্রেমিকা নবাব মাশূক মহল থাকতেন। এখন বসে ডেপুটী কমিশনার সাহেবের আদালত। এর সামনে, 'ক্যয়সর বাগের' পশ্চিম দিকে আর একটা আস্তাবল ছিল।

বছরে একবার জম্‌জমাট মেলা বসত 'ক্যয়সর বাগে'। জনসাধারণ পেত প্রবেশের অধিকার এবং জাহাঁপনার বিলাস-রঙ্গ দেখার সুবর্ণ সুযোগ। হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণের 'রাস' বাদশাহ দেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা তাঁর খুব ভালো লেগেছিল। রাসলীলাকে ভিত্তি করে একটা নাটকই লিখে ফেললেন। অভিনয়ে, তিনি সাজতেন কানাই, বেগমরা হতেন গোপিনী, নাচ ও রঙ্গের আসর জমে উঠত। কখনোবা যৌবনেই যোগী সাজতেন, মোতি পুড়িয়ে হত বিভূতি, শাহানশাহর ফকিরী দেখে নিত সবাই। এই মেলায়, সমাবেশে, শহরের সকলে যোগ দিতে পারত, সে অনুমতি দেওয়া ছিল। শুধু একটা শর্ত ছিল: প্রত্যেককে গেরুয়া পরে আসতে হবে। ফলম: আশী বছরের বৃদ্ধরাও কাষায় বস্ত্র পরিধান ক'রে সেজেগুজে আসত, এবং বাদশাহর যৌবনের আনন্দ-মদিরা দিয়ে পূর্ণ করে নিত আপন-আপন বার্ধক্যের পাত্রগুলি।

এইভাবে চলছিল জীবন। ভাবনাহীন নিশ্চিন্ততায় ডুবে ছিল আরামে, আয়েশে, রং-তামাশায়। ব্রিটিশ সরকারের কাছে রেসিডেণ্ট স্থানীয় অবস্থার কথা লিখে পাঠালেন। পত্রপাঠ ওখানকার বোর্ড অওধ-রাজ্যকে ব্রিটেনের অধিকারভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। হুকুম তামিলের জন্যে ইংরেজ ফৌজ লখনউ এল। এবং হঠাৎই বাদশাহকে নিরাশ করে দিয়ে শোনাল: "অতঃপর আপনার রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হল। আপনার জন্যে বছরে বারো লক্ষ টাকা, এবং আপনার 'হুলূসী লশকর'[1]-দের জন্যে বছরে

1 যে সেনার কাজ সিংহাসনকে (তথা, বাদশাহকেও) রক্ষা করা।

তিনলক্ষ টাকা পেনশন নির্ধারিত হল। আপনার এবং আপনার আশ্রিতদের প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে এ-ই যথেষ্ট। এইসঙ্গে অনুমতি দেওয়া হল : আপনি শহরের মধ্যে নিশ্চিন্ত আরামে থাকুন এবং প্রজাদের ভাবনা থেকে মুক্তি পেয়ে 'বেধড়ক' রংতামাশায় মেতে থাকুন''—আদেশ শুনে সারা শহর স্তব্ধ! বাদশাহ কেঁদে-ককিয়ে, নানাভাবে ক্ষমাভিক্ষা করলেন। বাদশাহের মা ও খাসমহল অনেক ওকালতী করলেন। কিন্তু গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের আদেশের রদবদল করা রেসিডেণ্ট, সাহেবের এখ্‌তিয়ারের বাইরে। এইভাবে, বিনা বাধায়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার অওধ গ্রাস করলেন। মা, যুবরাজ, খাস বেগম ও বিশ্বস্ত সঙ্গীদের নিয়ে বাদশাহ কলকাতা যাত্রা করলেন। উদ্দেশ্য : ইংল্যণ্ডে গিয়ে আপীল করবেন, এবং আপন নির্দোষিতা প্রমাণ করে সিংহাসনচ্যুতির এই হুকুম রদ করাবেন।

॥ 8 ॥

খুব ভাগ্য বলতে হবে, ওয়াজিদ আলী শাহ কলকাতা চলে গিয়েছিলেন!

তাজ ও তখ্‌ত্‌ হারিয়ে ওয়াজিদ আলী শাহ 1856 খ্রীষ্টাব্দে লখনউ ছেড়ে কলকাতা অভিমুখে রওনা হলেন। ওখানে গিয়ে মামলার যথাবিহিত তদ্‌বির করবেন ; হিন্দ্‌-এর গভর্ণর জেনারেলের কাছে দরবার করে ব্যর্থ হলে লণ্ডন গিয়ে পার্লামেণ্ট ও 'ইংগলিস্তানের মাল্‌কা' মহারাণীর কাছে মোকদ্দমা পেশ করবেন। কিন্তু কলকাতায় কোন লাভ হল না। সুতরাং ইংল্যণ্ড যাওয়াই স্থির হল। বৈদ্য-হকীমরা বললেন : 'বাদশাহর যা শরীর, সমুদ্রযাত্রায় ক্ষতিই হবে'। উপদেষ্টারাও নিষেধ করলেন। অতএব, বাদশাহ কলকাতায় থেকে গেলেন ; মা ও ভাইয়ের সঙ্গে যুবরাজকে পাঠিয়ে দিলেন

ইংল্যণ্ড। এই যাত্রায় আমার দাদামহাশয় মুনশী কমরউদ্দীন সাহেবও ভাগ্যহত বাদশার 'কাফিলা'র সঙ্গে ছিলেন। ইংরেজ সরকারের প্রস্তাবিত বেতন বাদশাহ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি এই কথাটা ধরে বসে রইলেন: 'আমি তো আমার তাজ-তখ্‌ত্‌ই নেব—যা ওরা বিনা অপরাধে ছিনিয়ে নিয়েছে!'

বাদশাহ কলকাতায়। তাঁর পরিবার লণ্ডনে। মামলা বিচারাধীন।

হঠাৎ 'কারতুজ' নিয়ে ঝগড়া, এবং গভর্ণমেণ্টের জিদ। ফল: 1857 খ্রীষ্টাব্দের 'গদর' বা বিদ্রোহ। মীরাট থেকে বাংলা পর্যন্ত এমন আগুন জ্বলে উঠল, তাতে আপন-পর সকলের ঘর জ্বলে গেল। হিন্দুস্তানে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের ভিৎ পর্যন্ত কেঁপে উঠল। মীরাট এবং অন্যান্য নানান জায়গা থেকে বিদ্রোহী সিপাহীরা এসে জড়ো হল দিল্লীতে, এবং শাহ জাফরকে হিন্দুস্তানের শাহানশাহ বলে ঘোষণা করল। একইভাবে, এলাহাবাদ ও ফয়জাবাদের বিদ্রোহীরা 1857-র মে মাসে হৈ হৈ করে এসে জমায়েৎ হল লখনউয়ে। এরা আসতেই স্থানীয় অনেকেই উঠে দাঁড়াল, এবং অওধের শাহী পরিবারের কাউকেই না পেয়ে ওয়াজিদ আলী শাহর এক দশ বছরের নাবালক পুত্র মির্জা বীরজীস কদ্রকে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। বীরজীসের মা নবাব হযরত মহল হলেন 'মুখ্‌তার' (প্রতিনিধি)। এখানে যেসব ইংরেজ সৈন্য ও য়োরোপীয় কর্মচারী ছিল, বেলী গারদে আশ্রয় নিল সবাই। বিদ্রোহীরা এখানে পৌঁছবার আগেই একে কেল্লা বানিয়ে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভালোই হয়েছিল, কিংবা বলতে পারেন, অদৃষ্ট ভালো ছিল, ওয়াজিদ আলী শাহ লখনউ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। নইলে অকারণ বাদশাহ বনে যেতেন, এবং তার ফলাফল জাফর শাহর চেয়েও খারাপ হত। যতো অল্পদিনেরই হোক, আর একবার নতুন করে বেঁচে ওঠার জন্যে, বেচারী অওধ-অভাগার মেটিয়াবুরুজের দরবারে যে ক্ষণিক আশ্রয়টুকু মিলেছিল, তাও তাঁর কপালে জুটত না!

লখনউয়ে তখন বিদ্রোহী সেনাদল ছাড়া ছিল অওধের প্রায় সমস্ত জমিদার, তালুকদার, এবং বাদশাহর শাসনকালে কর্মচ্যুত সেনারা। সব মিলিয়ে খুব বড়ো সংখ্যাই হবে। তাছাড়া, শহরের ব্যভিচারী ও ভয়ংকর কদাচারী লোকেরাও এ দলে ঢুকে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল : এক মুঠো ইংরেজ সৈন্যের ওপর গণনার অতীত বিদ্রোহী যেন ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু দুই পক্ষের মধ্যে পার্থক্য ছিল। যারা ঘেরাও করেছিল শহরের যতোসব 'লোফার' ও গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল নির্বোধ মাথাগরম লোক—তাদের মধ্যে এমন একজনও ছিলনা যে যুদ্ধবিদ্যা জানে এবং বিক্ষিপ্ত শক্তিগুলিকে একত্রিত করে একটি সুসংবদ্ধ সেনাদল গড়ে তোলে। অন্যদিকে ইংরেজ সেনা ছিল আধুনিক যুদ্ধকলা-বিশারদ; প্রাণপণে তারা আত্মরক্ষা করছিল, আক্রমণকারীদের ঠেকাচ্ছিল বিপদের সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে।

বীরজীস কদ্র-এর জমানা হযরত মহলের 'হুকুমত' (শাসন) মুদ্রায় অংকিত হল বীরজীস কদ্র-এর নাম। রাজ্যের কর্মচারী নিযুক্ত হল। রাজস্বও আদায় হতে লাগল! ওদিকে চলতে থাকল ইংরেজ ঘেরাও স্রেফ মনোরঞ্জনের জন্যে! লোকেরা হযরত মহলের সততার তৎপরতার তারিফ করতে লাগল। সৈন্যদের তিনি কদর দিতেন, কৃতিত্ব ও সাহসের অধিক পুরস্কারও দিতেন। কিন্তু পর্দা থেকে বেরিয়ে এসে ফৌজের সৈনাপত্য গ্রহণ তাঁর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং, সমাধান হল না। তাঁর পরামর্শদাতারা, ছিল অপদার্থ, সৈন্যনা নিষ্কর্মা প্রত্যেকে স্বার্থপর; কেউ কারও কথা শুনতনা।—'এসব হচ্ছে আমাদেরই কারণে, আসল শাসক আমরাই, যার মাথায় জুতো রাখব, সেই হবে বাদশাহ'—ফৌজের বিদ্রোহী সেনারা এই অহংকারেই ডগমগ! ফয়জাবাদের বিদ্রোহীদের সঙ্গে এসেছিলেন এহমদউল্লাহ নামে অনেক লড়াই ফেরৎ এক শাহ সাহেব; খুব দাপট দেখাচ্ছিলেন। আসলে, তিনি নিজেই রাজ্যের কর্তা হতে চাইছিলেন। বীরজীস কদ্র এর সামনেই, লখনউয়ে, তাঁর আলাদা দরবার বসত। দুটো দরবারের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ তো ছিলই, সেই সঙ্গে

প্রকট ছিল শিয়া-সুন্নীর ঝগড়া ও ধর্মীয় গোঁড়ামি। ফলে, বাদশাহ ও শাহ দুজনের শত্রুতা বেড়েই চলল।

বছরের শেষে নভেম্বরে বীরজীস কদ্র-এর গদীতে বসার ছ-সাত মাস পরে ইংরেজ সৈন্য লখনউ প্রবেশ করল। সঙ্গে পাঞ্জাবের শিখ ও ভুটানের পাহাড়ী সেনা। শোনা যায়, এরাই জুলুম করেছিল সবচেয়ে বেশি। দু-তিন দিনের গোলাবর্ষণেই নতুন রাজ্যের সবকিছু মাকড়সার জালের মতো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। হাজারে-হাজারে লোক পালাতে লাগল। তাদের সঙ্গে হযরত মহল ও বীরজীস কদ্রও পালালেন নেপালের দিকে। শাহ সাহেব লড়লেন দিন দু-তিন, বীরজীস কদ্রকে পালাবার সুযোগ করে দিলেন, কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না। পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন—'বাড়ী' ও 'মুহম্মদী' হয়ে সোজা 'পওআঈ'। সেখানে একজন তাঁকে গুলি করে হত্যা করল। 'পওআঈ'-এর রাজা তাঁর মাথাটি কেটে পাঠিয়ে দিলেন ইংরেজদের কাছে; পরিবর্তে পেলেন 'ইনাম' ও জায়গীর।

জানপদ বিদ্রোহীদের দমন করার জন্যে ইংরেজরা শহরে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করতে লাগল। প্রজারা চমকে উঠল। পুরুষ, নারী, ঘর ছেড়ে পালাল। সে এক ভয়ংকর প্রলয়ের দিন; যারা দেখেছিল, আজও, মনে পড়লে, কেঁপে ওঠে। অন্দর মহলের অসূর্যম্পশ্যা নারী, সেও নগ্ন পায়ে জংগলে-জংগলে ঘুরতে থাকে; অসহায়া, আশ্রয়ের সন্ধানে, যাকেই পায়, জড়িয়ে ধরে; যাকেই ধরে, সে-ই দুশমন। পূর্ণ চরিতার্থ হয় 'সাদী'-র শ্লোক: "ইয়ারাঁ ফরামোশ করদন্দ ইশক্"—প্রেমিক ভুলে গেছে প্রেম করতে। এই যখন অবস্থা, বিজেতা সৈন্য তখন শহর লুট করতে লাগল। সব নষ্ট হয়ে গেল। তারপর অনুমতি মিলল। লোকেরা 'খুদা খুদা' করে, (ঈশ্বরের নাম জপতে জপতে) ঘরে ফিরতে লাগল। ফিরে এল শান্তি। আজও তা বর্তমান ও বর্ধমান।

হৃতমান রাজত্বের কর্তাব্যক্তি, বাদশাহর আত্মীয়-বন্ধুবর্গ এই গোলমালে এবং রাজ্যের ভাগ্য-পরিবর্তনে বেকার হয়ে গেল। নতুন

পরিস্থিতিকে কাজে লাগাবার যোগ্যতা তাদের ছিল না। তারা ক্রমেই শেষ হতে লাগল। বড়ো-বড়ো ধনী ও প্রভাবশালী পরিবার একের পর এক নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগল। পল্লীর পর পল্লী উজাড় বংশের পর বংশ বিলুপ্ত। আর মাত্র কয়েকদিন, তারপর লখনউয়ের নাম-চিহ্ন মাত্রও কোথাও থাকবে না বলে মনে হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হল না। সফল হল ইংরেজের নীতি, যে নীতির জন্যে তারা গোটা দুনিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেছে। লখনউ বেঁচে উঠল দুর্ঘটনার মধ্যে থেকে, আবার সবুজ হয়ে বাড়তে লাগল। যারা যাবার তারা চলে গেছে। যারা যোগ্য, তারাই থেকে গেছে। অতঃপর মিঃ বাটলারের মতো আরও কিছু অধিকারিককে পেলে, আশা আছে, লখনউ প্রভূত উন্নতি করবে।

ঘটনার ক্রম-অনুসারে, এইখানে ওয়াজিদ আলী শাহর শেষ জীবন এবং কলকাতা প্রবাস কাহিনী পাঠকদের সামনে উপস্থিত করার প্রয়োজন বোধ করছি। নইলে এ-ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কলকাতায় আমার শৈশব কেটেছে বাদশাহর ছত্রছায়ায়। এতোক্ষণ যে প্রাচীন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছি, সবই ইতিহাসের পাতায় পড়ে, এবং লোকমুখে শুনে। এবার যে বিবরণী হাজির করছি, আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী।

কলকাতার মাইল তিন-চার দক্ষিণে, হুগলী নদীর তীরে "গার্ডন রিজ" (গার্ডেন রীচ) নামে এক শান্ত মহল্লা। এখানে একটা মাটির টিপি থাকায় লোকের মুখে মুখে নাম : "মটিয়া বুর্জ" (মেটিয়া বুরুজ) নদীর তীরে-তীরে প্রায় দু-আড়াই মাইল দীর্ঘ জমি ; সেখানে ছিল কয়েকটা বড়ো বাড়ি। ওয়াজিদ আলী শাহ যখন কলকাতা পৌঁছলেন, গভর্নমেণ্ট অফ ইনডিয়া এই বাড়িগুলি ওঁকে দিলেন। দুটো বাড়ি খাস বাদশাহর জন্যে, একটা নবাব খাস মহলের, আর একটা আলীনকী খাঁর থাকার জন্যে। বাদশাহর সঙ্গে তিনিও ছিলেন। পাশের জমির একাংশ—নদীর ধার থেকে চওড়ায় এক কি দেড় মাইল। লম্বায় প্রায় ছ-সাত মাইল—বাদশাহর নিজের ও তাঁর

কর্মচারীদের জন্যে দেওয়া হল। আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য যেদিকে, তার মাঝখান দিয়ে গেছে ম্যুনিসিপ্যালিটীর সড়ক। বাদশাহর জন্যে প্রদত্ত বাড়ি দুটোর নাম তিনি রাখলেন 'সুলতানখানা' ও 'আসাদ মঞ্জিল'। বাদশাহ যখন নবাব খাসমহলের বাড়ি অধিকার করলেন, তার নাম রাখলেন 'মুরস্‌সা মঞ্জিল'। আলী নকী খাঁর বাড়ি শেষ পর্যন্ত তাঁরই অধিকারে ছিল ; তারপর পায় তাঁর ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে, নবাব আখতার মহল। ইনি ছিলেন আলী নকী খাঁর মেয়ে, বাদশাহর খাস বেগম, এবং দ্বিতীয়-যুবরাজ মির্জা খুশবখ্‌ত বাহাদুরের মা।

গদরের সময় ইংরেজ বাহিনীর বিদ্রোহী অফিসাররা চেয়েছিলেন, বাদশাহ যদি তাঁদের শাসক হতে চান, কলকাতাতেও যেন বিদ্রোহ শুরু করে দেন। কিন্তু এ-নীতি বাদশাহর মনঃপুত হল না। তাঁকে যখন সিংহাসন থেকে অপসৃত করা হল, তখনও গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়ার বিরুদ্ধে তিনি এ-নীতি অবলম্বন করেন নি ; এখনও করলেন না। বরং লাটসাহেবকে এই খবরটা জানিয়ে দিলেন। তিনি ধন্যবাদ জানালেন এবং দিন দু-চার পরে বাদশাহকে ফোর্ট উইলিয়মে রাখাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন। তাহলে আর বিদ্রোহীরা তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবে না। তাঁর পক্ষ থেকে লণ্ডনে যে মোকদ্দমা উপস্থাপিত হয়েছিল তা মুলতুবী রাখা হল। কারণ দেখানো হল : যে দেশের দাবি উনি করেছেন, তা এখন আমাদের অধিকারে নেই ; যখন আবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারে আসবে, দেখা যাবে।'

বাদশাহ বন্দী থাকাকালীনই লখনউয়ের উপদ্রব শান্ত হয়ে গেল। তখন বাদশাহর লণ্ডনস্থ 'মুখতার-এ-আম[1] মসীহউদ্দীন খাঁ আবার স্বপক্ষের দাবি পেশ করলেন। তাঁর আত্যন্ত বিশ্বাস ছিল : মামলা জিতবেন, এবং রাজ্য ফিরে পাওয়া যাবেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কেল্লায় বাদশাহর যেসব 'মুসাহিব' ও পরামর্শদাতা ছিল, তারা এক ষড়যন্ত্র করল। হয়তো বাইরের কারণ ছিল ; হয়তো স্বার্থচিন্তাই

যাকে 'পাওয়ার অফ অ্যাটর্নী' দেওয়া হয় ; আইন-বিষয়ক প্রতিনিধি।

ছিল মূল। তারা ভাবল : মসীহউদ্দীন খাঁ যদি মোকদ্দমা জিতে যায়, তাহলে আমাদের আর কে পুছবে? ও একলাই শুধু থেকে যাবে! অতএব, সকলে মিলে বাদশাহকে বোঝাতে আরম্ভ করল : “জাহাঁপনাহ, দেশ নিয়ে কেউ আবার ফেরত দেয়? মসীহউদ্দীন খাঁ হুজুরকে ধাপ্পা দিয়েছে। কিছুই হবে-টবে না। জাহাঁপনাহ অকারণে কষ্ট ভোগ করছেন। দেড়বছর-দুবছর হতে চলল, বেতন নেন নি, সব দিকেই অর্থের টানাটানি। আমরা, সরকারের চাকররা, একটা পয়সার জন্যে হন্যে হয়ে বসে থাকি। এ-অবস্থায়, হুজুরের পক্ষে ইংরেজ সরকারের প্রস্তাব মেনে নেওয়াই যুক্তি সম্মত। বেতন উশুল করে নিন, বেগম ও সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে নিশ্চিন্তে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করুন।” সত্যিই তখন বাদশাহর খরচে টান পড়ছিল; তাঁর চেয়েও বেশি কষ্ট হচ্ছিল তাঁর সঙ্গীদের। এই পরিস্থিতিতে সভাসদরা যখন বারবার এই পরামর্শ দিতে লাগল, তিনি আর দ্বিধা করলেন না; ভাইস্‌রয়কে লিখে পাঠালেন : “ইংরেজ সরকার প্রস্তাবিত পেনশনে আমার স্বীকৃতি জানাচ্ছি। সুতরাং, আজ পর্যন্ত পাওনা আমার ‘তনখা’ (বেতন) দিয়ে দেওয়া হোক। এবং লণ্ডনে যে মোকদ্দমা দায়ের আছে, তা খারিজ করা হোক।” উত্তর পেলেন : “প্রথমত, বিগত দিনের পেনশন আপনাকে দেওয়া হবে না, এখন থেকেই পেনশন জারী হবে। দ্বিতীয়ত, বছরে বারো লক্ষ টাকাই শুধু দেওয়া হবে। আপনার কর্মচারীদের জন্যে যে বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা দেবার কথা ছিল, এখন তার আর কোন প্রয়োজন দেখছিনা।”

এতোখানি লোকসান বাদশাহ বরদাস্ত করিবেন না, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু সভাসদরা এতেই তাঁকে রাজি করাল। গভর্ণমেণ্ট অফ ইনডিয়া খবর পাঠালেন ইংল্যণ্ডে : ওয়াজিদ আলী শাহ সরকারের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। অতএব, তাঁর মোকদ্দমা খারিজ করা হোক।’ এসব ঘটনা আমি শুনেছি আমার নানা মুনসী কমরউদ্দীন সাহেবের মুখে। তিনি ছিলেন বাদশাহী দফতরের মীর মুনসী এবং

মৌলভী মসীহউদ্দীন খাঁর খাস নায়েব। তাঁরই মাধ্যমে সমস্ত কিছু কার্যকরী হত।

পেনশনে বাদশাহ রাজী হয়ে গেছেন, এ-সংবাদ লণ্ডনে পৌঁছতেই মসীহউদ্দীন খাঁ তো হতবুদ্ধি! বাদশাহর মা, ভাই ও যুবরাজ মাথা চাপড়াতে লাগলেন; বুঝতে পারলেন না—ব্যাপারটা কী ঘটছে! এতোদিন পর্যন্ত যতোকিছু করা হয়েছিল, সব বৃথাই গেল। অবশেষে অনেক ভেবে-ভেবে মসীহউদ্দীন খাঁর মাথায় একটা যুক্তি এল। তিনি পার্লামেন্টে একটি আইনগত আপত্তি উত্থাপন করলেন: "বাদশাহ এখন গভর্ণমেন্ট অফ ইনডিয়ার হাতে বন্দী। এ অবস্থায় তাঁর কোন উক্তিই বিশ্বাসযোগ্য বলে মানা যায় না।" এই আপত্তি বিধিসম্মত ছিল, এবং গৃহীতও হল। গভর্ণমেণ্ট অফ ইনডিয়াকে বাদশাহর মুখতারের এই আপত্তির নোটিশ দেওয়া হল। তখন মসীহউদ্দীন খাঁ এবং শাহী পরিবারের সকলেই বাদশাহকে লিখলেন: "আপনি এসব কী করছেন? অওধ রাজ্য ফিরে পাবার পূর্ণ আশা আমাদের আছে।"

বিদ্রোহ শেষ হয়ে গেছে। বাদশাহকে গভর্ণমেণ্ট ছেড়ে দিয়েছেন। হাঁফ ছেড়ে, তিনি কেল্লা থেকে বেরিয়ে মেটিয়াবুরুজ এলেন। আবার সেই স্বাধীনতা। আবার আর্জি সেই সভাসদদের: "হুজুর! লণ্ডনে মসীহউদ্দীন খাঁ বলে বেড়াচ্ছে, কয়েদে ছিলেন বলেই জাঁহাপনাহ বেতন গ্রহণ মঞ্জুর করেছেন।" শোনামাত্র বাদশাহ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, এবং তৎক্ষণাৎ লিখে পাঠালেন: "আমি স্বেচ্ছায় ও স্বাধীন-ভাবে গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। কয়েদে ছিলাম বলে, কিংবা কারও জোর-জবরদস্তিতে সম্মতি দিয়েছি, মসীহউদ্দীনের এই বিবৃতি সম্পূর্ণ মিথ্যা। অতঃপর যে মুখতারনামা অনুসারে তাকে আমার আম মুখতার নিযুক্ত করা হয়েছিল, তা বাতিল করে দিলাম।"

তারপর আর কী! সব কারবার খতম। মেটিয়াবুরুজে বাদশাহ ডুব দিলেন প্রমোদরঙ্গে অর্থ বৃষ্টি হতে লাগল সভাসদদের ঘরে। আর, ওদিকে ইংলণ্ডে পড়ে থাকা শাহি পরিবারের সেই ভাগ্যহত 'কাফিলা'র

(যাত্রিদলের) প্রায় সকলেই ওখানেই শেষ হয়ে গেলেন। অধিকাংশ সাথী সঙ্গত্যাগ করল। এই আঘাতে অসুস্থা হয়ে পড়লেন বাদশাহ মাতা, এবং সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে পড়লেন—ফ্রান্স হয়ে যাবেন মুসলিম তীর্থস্থানে; তীর্থ দর্শন-অন্তে কলকাতায় ফিরবেন। কিন্তু 'মওত' (মৃত্যু): প্যারিসের আগে আর পা বাড়াতে দিল না, সেখানেই তাঁর দেহান্ত হল। ফ্রান্সস্থিত উসমানী দূতাবাসের মসজিদের পাশে মুসলমানদের একটি কবরস্থান আছে; সেখানেই তাঁকে সমাধি দেওয়া হল। মার মৃত্যু মির্জা সিকন্দর হশমতের বুকে গভীরভাবে বাজল। তিনিও শয্যা নিলেন। মা মারা যাবার চোদ্দ কি পনেরো দিন পরে মায়ের পাশেই পুত্রকে শুইয়ে দেওয়া হল। একা যুবরাজ কলকাতা ফিরে এসে মাতা-পিতার সঙ্গে মিলিত হলেন।

মেটিয়াবুরুজেও বাদশাহ প্রথম-প্রথম বুঝে-সুজে, হুঁশিয়ারীর সঙ্গে জীবন নির্বাহ করতেন বলে শোনা যায়। তাই দেখে, প্রতিবেশীরা কয়েকটি বাদ্য দিল। দ্রুত চরিতার্থ হল 'যে ঢুলছে, তাকে শুধু ঠেলা দেওয়ার অপেক্ষা' প্রবচনটি। জমে উঠল আনন্দ মণ্ডলী। হিন্দুস্থানের আচ্ছা-আচ্ছা গাইয়ে এসে চাকরি নিলেন। মেটিয়াবুরুজে সংগীতকারদের এক অদৃষ্ট পূর্ব জমায়েৎ বসে গেল।

লখনউয়ে যেমন শোনা যায়, তেমনি এখানেও সুন্দরী রমণীদের সমাবেশ এবং প্রেম-প্রণয়-লীলায় মেতে যাওয়ার সেই শখ পুনর্জাগ্রত হল। তবে, মেটিয়াবুরুজের শৌখীন লীলা-বিলাসে কিছু ধর্মীয় সতর্কতা ছিল। বাদশাহ ছিলেন শিয়া। শিয়া ধর্মে অবাধ 'মুত্‌আ বিহিত। এই ধর্মীয় স্বাধীনতার সাহায্যে বাদশাহ প্রাণ ভরে শখ মিটিয়ে নিতে লাগলেন। আরেকটি নিয়ম ছিল: যার সঙ্গে 'মুত্‌আ[1] হয়নি, এমন স্ত্রীলোকের মুখ দেখা পাপ। অতএব, যে যুবতী ভিশতিনী অন্দরমহলে জল নিয়ে আসত, তাকে 'মুত্‌আ' করে খেতাব দিলেন 'নবাব আবরসাঁ বেগম'। হুজুরাণীর কাছে আসা-যাওয়া

1 একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্ধারিত বিবাহ-বন্ধনের নাম

ছিল যুবতী ঝাড়ুদারণীর; তাকেও 'মুত্‌আশুদা' বেগমদের শামিল করে নবাব মুসফ্‌ফা বেগম' খেতাবে ভূষিতা করলেন। এইভাবে, গানের শখও সীমিত ছিল 'মুত্‌আশুদা বেগম' পর্যন্ত। বাদশাহ বাজারের কোন বেশ্যার মুজরা দেখেছেন, এটা কদাচিৎ সম্ভব ছিল। 'মুত্‌আশুদা-বেগমদের' নিয়েই তিনি দল গড়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তাদের নাচ-গান শিক্ষা দেওয়া হত। রাধা মনৃজিলওয়ালী, ঝুমুরওয়ালী লটকনওয়ালী, শারদা মনৃজিলওয়ালী, নথওয়ালী, ঘুংঘটওয়ালী, রাসওয়ালী, নকলওয়ালী'—এই রকম প্রায় কুড়িটা দল। নাচে-গানে এরা ছিল পটীয়সী। অনুরঞ্জিত করে রাখত বাদশাহ-হৃদয়কে। এদের সঙ্গে তাঁর 'মুত্‌আ' হয়েছিল; এদের বলা হত 'বেগম'। 'মুতআ' হয়নি, এমন কয়েকটি অল্পবয়সী নাবালিকাও ছিল দু-একটা দলে। এরা যখন সাবালিকা হবে, তখন 'মুত্‌আ' হবে—এইরকম ব্যবস্থা ছিল। এইসব বেগমদের অধিকাংশই থাকত খোদ বাদশাহর কাছাকাছি, খাস 'সুলতানখানায়'। কয়েকজন থাকত অন্য বাড়িতে, স্বতন্ত্র অন্তঃপুরে। এদের মধ্যে যার সন্তান হত তাকে 'মহল' খেতাব দেওয়া হত; থাকবার জন্যে আলাদা মহল, এবং বেতন ও ইজ্জত নির্দিষ্ট হত।

শুধু গান। তাছাড়া অন্য-সমস্ত ক্ষেত্রে বাদশাহ অত্যন্ত সংযমী ছিলেন। ধর্মীয় বিধান পালন করতেন। নমাজে কখনও দেরি হত না, তিরিশ দিন 'রোযা'[1] (রোজা) রাখতেন। মদ, আফিম, চরস, হাশিশ, কোনরকম নেশাই কোনদিন করেননি। সনিষ্ঠায় পালন করতেন মহর্‌রমের 'মাতমদারী' (শোক-সমারোহ)।

তৃতীয় শখ ছিল বাড়ির। সুলতানখানার পাশে নির্মিত হল কুড়িরও বেশি মহল, আরও অনেক বাড়ি এবং সেগুলিরও 'মহলসরা' বা হারেম। গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল শুধু সুলতানখানা, আসাদ-মঞ্জিল, ও মুরস্‌সা মঞ্জিল। বাদশাহী শখ থেকে জন্ম নিল আরও অসংখ্য বাড়ি, যার আশেপাশে সবুজে ভরা আনন্দদায়িনী বাগিচা। আমি যখন দেখেছিলাম, তখন যে-সব বাড়ি বাদশাহর

[1] রমজান মাসে বিহিত উপবাস।

অধিকারে ছিল, সেগুলি হ'ল, দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত, পরপর সারি সারি : 'সুলতানখানা, কস্র-উল-ব্যায়া, গ্যশ : এ সুলতানী, শাহানশাহ মঞ্জিল, মুরসৃসা মঞ্জিল, আসাদ মঞ্জিল, শাহ মঞ্জিল, নূর মঞ্জিল, তফরীহ বখ্‌শ্‌, বাদানী, আসমানী, তহনিয়ত মঞ্জিল, হদ্দ-এ-সুলতানী, সদ্দ এ-সুলতানী, আদালত অঞ্জিল। আরও কয়েকটা বাড়ি ছিল; তাদের নাম আমার মনে নেই।

এছাড়া, বাগানের ভেতর, পুকুরের ধারে, অনেক ঘর, বাংলো, ছোট-ছোট মহল ছিল। সমস্ত বাড়ি, ঘর, বাংলো মহলে পরিচ্ছন্ন 'ফর্শ' (ফরাশ) পাতা, রূপোর পালঙ্কে বিছানা ও তাকিয়া ইতি-উতি ফার্নীচার সাজানো, 'তস্‌বীর' (ছবি ও ভাস্কর্য)। দেখাশোনো করার জন্যে নিযুক্ত 'মকানদার'-রা রোজ ঝাড়ত, মুছত, সব জিনিস পরিষ্কার করে সাবধানে সাজিয়ে রাখত। সমস্ত বাড়িই সবসময়ে এতো সাজানো-গোছানো থাকত। লোক অবাক হয়ে যেত দেখে। সংলগ্ন বাগ-বাগিচা এমন গাণিতিক ও জ্যামিতিক ডিজাইনে তৈরি, দর্শক বিস্মিত হত স্থাপত্যকলায় বাদশাহর স্বাভাবিক রুচির পরিচয় পেয়ে।

লখনউয়ে বাদশাহ 'ক্যয়সর বাগ,' তার পাশে কয়েকটা ইমারত, পিতার ইমামবাড়ী ও সমাধি ভবন, শুধু এই কটিই তৈরি করছিলেন। কিন্তু মেটিয়াবুরুজে চমৎকার-সব ইমারতের একটা সুন্দর শহরই গড়ে তুলেছিলেন। নদী-পরপারে, মেটিয়াবুরুজের ঠিক মুখোমুখী কলকাতার বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেন। কিন্তু মেটিয়াবুরুজের ভূস্বর্গ ও তার বিচিত্র বস্তুসম্ভারের সামনে সে গার্ডেন দাঁড়াতেই পারতনা। এই সমস্ত বাড়ি, বাগান, কুঞ্জ ও সবুজ মাঠের চারদিকে ছিল উঁচু দেয়ালের ঘের। ম্যুনিসিপ্যালিটীর সদর-রাস্তার ধারে-ধারে প্রায় এক মাইল পর্যন্ত বড়ো-বড়ো দোকান। সেখানেই থাকত নিম্নশ্রেণীর চাকর-বাকররা। কাজের সুবিধার জন্যেই ওদের ওখানে থাকার ব্যবস্থা। তবে, ভিতরে যাবার রাস্তা ছিল ফটকের মধ্যে দিয়ে;

কেয়ারটেকার

দোকানের মধ্যে দিয়ে যাবার কোনরকম ব্যবস্থা ছিল না। ফটকে পাহারা থাকত। খাস 'সুলতানখানার' ফটকের ওপর ছিল 'শানদার' (জাঁকজমকপূর্ণ) নহবৎখানা সেখানে নহবৎ বাজত আর পুরনো পহর ও ঘড়ীর হিসাবমতো দিনরাত ঘড়ি বাজানো হত।

পৃথিবীতে ইমারত-বিলাসী হাজার-হাজার বাদশাহ রাজত্ব করে গেছেন। কিন্তু, ব্যর্থ জীবন ও নামমাত্র বাদশাহীর স্বল্প অবকাশে, ওয়াজিদ আলী শাহ নিজের শখ ও পছন্দ অনুযায়ী যতো বাড়ি তৈরি করে গেছেন, এমন আর কোন বাদশাহ করেননি। শাহজাহাঁর পরে, এক্ষেত্রে, কারও নাম যদি করতে হয়, তো তিনি এই অত্যাচার-পীড়িত অওধ-নরেশ। পুনশ্চ বক্তব্য : কোন অট্টালিকা একশো কি হাজার বছরেরও বেশি দিন টিকে থাকে ; কারও শত-শত অট্টালিকা দুদিনেই ধুলোয় মিশে যায়।

ইমারতের পর বাদশাহর শখ ছিল জানোয়ারের। এই শখটিকে তিনি এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তামাম দুনিয়ায় তার সমান্তরাল দৃষ্টান্ত তো নেইই, হাজার চেষ্টাতেও কেউ তার অর্ধেক পর্যন্তও পৌঁছাতে পারবে না।

'নূর মঞ্জিলের' সামনে লোহার বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা লম্বা-চওড়া পথ। তার মধ্যে বিচরণ করত শত শত চিতা, হরিণ ইত্যাদি, অরণ্য পশুর দল। ঠিক মাঝখানে, শ্বেতপাথরে বাঁধানো একটা পুকুর, সর্বদা ভরাভর্তি। তার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল শুতুরমুর্গ, কিশোরী,[1] ফীলমুর্গ,[2] সারশ, কায়া,[3] বগলা, করকর,[4] চকোর, ময়ুর, হাঁস, এবং আরও নানান জাতের পাখি ও কচ্ছপ। সদাসর্বদা পরিচ্ছন্ন ; কোথাও বিষ্ঠা বা পালখের চিহ্ন পর্যন্ত চোখে পড়ার উপায় ছিল না। পুকুরের একধারে খাঁচায় থাকত বাঘ। চরণভূমির পাশে, লোহার রেলিং ঘেরা সারবন্দী ঘরে কুড়িরও বেশি জাতের,

[1] ছোট প্রাণী। [2] ময়ূরজাতীয় পাখি, চারকী। [3] বড়ো হাঁস। এক ধরণের-সুন্দর পাখি।

এবং খুদা জানেন কোথাকার বাঁদর নিয়ে এসে রাখা হয়েছিল। বাঁদরগুলো যথারীতি বাঁদরামি করত, এবং সে-তামাশা না দেখিয়ে মানুষজনকে এগোতে দিত না!

জলাধারের স্থানে স্থানে মাছ পোষা হত। ইশারা করলেই জড়ো হত; খাবার দিলে নেচে-কুঁদে খুব বাহার দেখাত। সবচেয়ে দর্শনীয় ছিল সর্পগৃহ। শাহানশাহ মনজিলের সামনে একটা দীর্ঘ ও গভীর জলাশয়; তার চারধারের পাড় পিছল করে নেওয়া; ঠিক মাঝখানে সামনের দিকে ঝোঁকানো একটা কৃত্রিম পাহাড়। পাহাড়ের ভেতরে সংখ্যাহীন নালী; দু-এক জায়গায় ওপর থেকে কেটে জলস্রোত বইয়ে দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে হাজার হাজার সাপ। দুগজ-তিনগজ লম্বা বড়ো-বড়ো সাপ চব্বিশ ঘণ্টা দৌড়ত, ঘুরত, কিলবিল করত; পাহাড়ের মাথায় উঠত, আবার নীচে নেমে আসত; ব্যাঙ ছাড়া হলে দৌড়ে-দৌড়ে ধরত। পাহাড়ের আশেপাশে খালের মতো নালা; তার মধ্যেও সাপেরা এঁকে বেঁকে ছুটত, ব্যাঙের পিছু নিত; লোকেরা পাশে দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে সেই দৌড় দেখত। পাহাড়ের নীচে দুটো খাঁচা, তাতে থাকত দুটো বড়ো-বড়ো চিতা। এমনিতে চুপচাপ; কিন্তু যেই মুর্গী দেওয়া হত, লাফ দিয়ে ধরে গোটাটাই গিলে ফেলত। সাপ পোষার এহেন ব্যবস্থা এর আগে কোথাও হয় নি। এটা খাস ওয়াজিদ আলী শাহর আবিষ্কার। য়োরেপের পর্যটক অবাক হয়ে দেখত, ছবি এঁকে ও বর্ণনা লিখে নিয়ে যেত।

এইসব জানোয়ার ছাড়া হাজার হাজার পাখি ছিল। তারা থাকত খাস সুলতানখানার অন্দরে, পিতল-পিঞ্জরে। লোহার জাল দিয়ে সুরক্ষিত গোটা কুড়ি বড়ো-বড়ো ঘর ছিল, বলা হত 'গঞ্জ'। তার মধ্যে নানা ধরণের অসংখ্য পাখি। তাদের থাকা-খাওয়া লালন-পালনের সব ব্যবস্থাই ছিল। বাদশাহর বাসনা: পশু পাখির যতো জাতি ও শ্রেণী আছে, সব এখানে জমা করবেন, এবং এমন এক সম্পূর্ণ ও জীবন্ত চিড়িয়াখানা বানিয়ে যাবেন, দুনিয়ার কোথাও তার জুড়ি নেই। এদের সংগ্রহের জন্যে তিনি বেপরোয়া অর্থব্যয়ও করেছেন।

কেউ নতুন কোন পাখি বা পশু আনলে, যে দাম চাইত পেয়ে যেত। শোনা যায়, বাদশাহ একজোড়া 'রেশমপরা' পায়রা চব্বিশ হাজার টাকায়, এবং এক জোড়া সাদা ময়ূর এগারো হাজার টাকায় কিনেছিলেন। আফ্রিকার জিরাফও ছিল তুটো। কোহানের তুটো বাগদাদী উটও—যা হিন্দুস্তানের আর কোথাও চোখে পড়ে নি। কলকাতায় তখন হাতির নামগন্ধ ছিলনা; কিন্তু বাদশাহর এই জীবন্ত 'ন্যাচরল হিষ্ট্রী মিউজিয়াম'-এ একটা হাতীও ছিল। কোন জানোয়ার যাতে বাকি না থাকে, শুধু এই কথা ভেবেই তুটো গাধা নিয়ে এসে ওখানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। চতুষ্পদীদের মধ্যে সিংহ, বাঘ, চিতা, তেঁতুয়া,[1] রীছ,[2] সিয়াহগোল,[3] ভেড়া চর্‌খ্[4] ইত্যাদি খাঁচায় থাকত। তদ্‌বির-তদারকের বেশ বড় রকম ব্যবস্থাই ছিল।

পায়রা থাকার ব্যবস্থা অন্যরকম ছিল। বাদশাহর বিভিন্ন বাড়িতেই সব মিলিয়ে চব্বিশ পঁচিশ হাজার পায়রা ছিল। কবুতর বাজরা গিয়ে তাদের ওড়াত। দেখবার মতো সে-দৃশ্য!

আটশোরও বেশি 'জানোয়ারবাজ' (পশুরক্ষক), তিনশোর মতো কবুতরবাজ, এইরকমই হবে মৎস্য পালক, ত্রিশ-চল্লিশ জন সাপুড়ে। বেতন: মাসিক ছয় থেকে দশ টাকা পর্যন্ত। অফিসারদের বেতন কুড়ি থেকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত। পায়রা, সাপ ও মাছ ছাড়া অন্যান্য জানোয়ারদের খোরাকী খরচ: মাসে হাজার টাকার কিছু কম। এ থেকেই এই চিড়িয়াখানার ব্যয়ের একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায়।

ইমারতের কাজ বেশির ভাগ দেখতেন মুনিসউদ্দৌলা এবং রেহানউদ্দৌলা। ইমারত খাতে বরাদ্দ ছিল প্রতি মাসে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা।

এক হাজারের কাছাকাছি পাহারাদার সেপাই ছিল। মাইতে পেত গড়পরতা ছ টাকা মাসে; কেউ-কেউ আট বা দশ টাকাও পেত।

---

[1] প্যান্‌থার। [2] ভাল্লুক। [3] কুকুরজাতের এক জানোয়ার। [4] হায়না।

একই বেতন পেত 'মকানদার'রা ; সংখ্যায় তারা ছিল পাঁচশোর বেশি। জন আশী 'মুহর্‌রির' (মুহুরী) মাসিক দশ থেকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত বেতন পেত। প্রতিষ্ঠাবান সভাসদ, এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সংখ্যা চল্লিশ-পঞ্চাশের কম ছিল না ; মাসিক বেতন আটাশী টাকা। কাহার ছিল একশোরও বেশি।

অনেকগুলি ছোট-ছোট 'মহকমা' (বিভাগ): 'বাওঅর্চীখানা',[1] 'আবদারখানা',[2] 'ভিস্তিখানা',[3] 'খসখানা',[4] এবং খোদা জানেন, আরও কী-কী বিভাগ! সবার ওপর, ব্যয় বরাদ্দ ছিল 'মুত্‌আ-শুদা-বেগম'-দের আত্মীয়-স্বজনদের জন্যে। তাঁরা বেতন পেতেন নিজ নিজ মর্যাদা অনুসারে।

এইসব লোক থাকত বাড়ির আয়ত-সীমার বাইরে, বেশির ভাগই সরকার কর্তৃক বাদশাহকে দেওয়া জমির ওপর। অনেকে পাশের অন্য জমির ওপরেও বাড়ি তুলেছিল। সব মিলিয়ে একটা শহর; লোকসংখ্যা কিঞ্চিদধিক চল্লিশ হাজার। এদের সকলেরই জৈবিক অস্তিত্ব নির্ভর করত বাদশাহী বেতন এক লক্ষ টাকার ওপর। এতো লোক এতো অল্প টাকায় কেমন করে থাকে, কেউ ধারণাই করতে পারত না। বাংলায় তখন জনশ্রুতি ছিল: বাদশাহর কাছে পরশ পাথর আছে, দরকার হলেই নাকি তামা কিংবা লোহায় ঘসে সোনা করে নেন!

মোদ্দা কথা, বাদশাহর অবস্থানের ফলে কলকাতার কাছে দ্বিতীয়-লখনউ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আসল-লখনউ ততোদিনে মৃত। সেখানকার সব বাছা-বাছা লোক পাড়ি দিয়েছিল মেটিয়াবুরুজে। বস্তুত, সেদিন লখনউ আর লখনউ ছিল না, মেটিয়াবুরুজই ছিল লখনউ। সেই জীবন, সেই জবান, সেই কবি, সেই আসর, সেই প্রমোদ উপকরণ! ওখানকারই বিদ্বান ও ধর্মজ্ঞ, ওখানকারই আমীর ও রইস, ওখানকারই জনতা এখানে! কারও মনেই হত না, যে, বাংলায়

---

[1] পাকশালা। [2] জলের ভাঁড়ার। [3] হুঁকো-তামাকের ভাঁড়ার। [4] বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর স্টোররুম।

আছি'! সেই মুর্গীবাজী, বটেরবাজী, আফিমখোর, ফানুস ও ঘুড়ির নেশা! সেই কথকতা. 'মর্সিয়া', তাজিয়াদারী! সেই ইমামবাড়া ও কারবালা! যে জাঁকজমকের সঙ্গে বাদশাহর খাস তাজিয়া উঠত, লখনউয়ের বাদশাহী আমলে কখনও তেমন ওঠেনি। সিপাহী-বিদ্রোহের পরতো কোন তাজিয়াই উঠতে পারেনি। কলকাতার হাজার হাজার লোক এমনকি. ইংরেজরাও এই 'তাজিয়া-দারী' (তাজিয়ার শোভাযাত্রা) দেখার জন্যে মেটিয়াবুরুজ চলে আসত।

বাদশাহ ছিলেন শীয়া। তবু, তাঁর স্বভাবে গোঁড়ামি বা ধর্মীয় পক্ষপাত ছিল না। তিনি বরাবর বলতেন: "আমার দুই নয়নের একটি শীয়া, অন্যটি সুন্নী।" একবার ধর্মমত নিয়ে দুই ব্যক্তির মধ্যে মারামারি হয়েছিল। বাদশাহ দুজনকেই চিরকালের মতো বহিষ্কৃত করলেন; হুকুম দিলেন: "এসব লোকের আমার এখানে ঠাঁই নেই।" আর একবার বাদশাহের একটি গ্রন্থে এমন কিছু আপত্তি-জনক লেখা ছিল, যা নিয়ে কলকাতার সুন্নী সমাজে হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। কেউই জানত না, ওইসব শব্দ বাদশাহর নিজের নয়, অন্য একজনের লেখা ইতিহাস তথা সমীক্ষা থেকে উদ্ধৃত। কিন্তু বাদশাহ যেমনি খবর পেলেন, কেউ কিছু বা শোনার আগেই, ক্ষমা-প্রার্থনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তাঁর সরকারে ব্যবস্থাপনার তাবৎ দায়িত্ব ছিল সুন্নীদের হাতে। উদার পক্ষপাতহীনতার এর চেয়ে বড়ো প্রমাণ আর কী আছে! প্রধানমন্ত্রী মুন্সরিমউদ্দৌল্লা বাহাদুর সুন্নী ছিলেন; একদা বাদশাহের কাছের মানুষ এবং পশু-শালা, মুহুরীর দল ও কয়েকটি বিভাগের বড়কর্তা মুন্শী উস্সুলতান সুন্নী ছিলেন; তাবৎ চাকর-বাকর এমন কি শাহজাদা ও বেগমদের বেতন যাঁর হাত দিয়ে পাওয়া যেত, সেই বখ্শী আমানতউদ্দৌলা বাহাদুর সুন্নী ছিলেন। সিব্‌তয়নাবাদের ইমামবাড়া, এবং খাস ইমামবাড়া 'বেতুলবকা'-র তত্ত্বাবধান, মজলিস ও ধর্মীয় সমারোহের আয়োজন, এসব দায়িত্বও ছিল সুন্নীদের হাতে—এর চেয়ে বেশি

আর কী হতে পারে! কে সুন্নী আর কে শীয়া একথা কখনও কারও মনে হয় নি।

মেটিয়াবুরুজের দোকানদার এবং মহাজনও ছিল লখনউয়ের লোক। লখনউয়ের এমন জিনিস ছিল না, যা এখানে পাওয়া যেত না। যেদিকে যান, চোখে পড়বে এক অদ্ভুত শোভা ও জীবনধারা; আর, লোকেরা সব এমন বে-হিসেবী মাতাল হয়ে তার মধ্যে ডুবে আছে কারও মাথাতেও আসে না—এই সমস্তের শেষ ফল কী হবে!

শাহী ইমারত, পশুচারণভূমি, সর্বত্রই মেটিয়াবুরুজ প্রবাসী লখনউ-ওয়ালাদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। বাগানে বেড়ান, এর চেয়ে রমণীয়তর স্থান আর কোথাও পাওয়া যাবে না। নদীর তীরে দাঁড়ান, আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাবেন। সামনে দিয়ে চলছে কলকাতা যাতায়াতকারী জাহাজ; ফোর্ট উইলিয়মকে সেলাম জানাবার জন্যে এইখান থেকে এরা পতাকা নামাতে আরম্ভ করে। লোকের ধারণা: সেলাম করছে বাদশাহকে! বেগমদের অন্দরমহল ও দেউড়ির সামনে দাঁড়ান—আজব ধুমধামের মধ্যে, কখনও-কখনও, এমন রূপ নজরে আসবে, এমন সুন্দর ইডিয়ন ছোঁয়ানো ভাষা আর এমন সপ্রেম কথালাপ কানে আসবে, মানুষ, দীর্ঘদিনের জন্যে, না—আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

আহা, এই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য তো লুপ্ত হবার জন্যে নয়! কিন্তু, হায়! করাল হাত একেও শেষ করে দিয়েছে, আর এমনভাবে শেষ করছে, মনে হয়, এসব কখনও ছিলই না! 1887 খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ হঠাৎ চোখ বুজলেন, আর বোধ হল: "খোআব থা জো কুছ ভী দেখা, জো সুনা আফসানা থা"—'যা-কিছু দেখেছি সব স্বপনই, শুনেছি যা-কিছু সবই কাহিনী।' সমস্তই যেন স্বপ্নিল কল্পনা! একটা 'তিলিস্‌ম', যেন ভানুমতীর একটা খেলা—হঠাৎ ভেঙ্গে গেল! আর, সেই অপূর্বসুন্দর শহর, যাকে দর্পণ করার বাসনা য়োরোপের সম্রাট, হিন্দুস্তানের রাজাদের ছিল—আজ নিঃস্ব, নির্জন, নিস্তব্ধ জগৎ! কিচ্ছু নেই। যে দেখেছিল আগের সেই

জীবন, আজ সেখানে স্তব্ধতা, শূন্যতা দেখে সে দুঃখে ক্ষোভে অতৃপ্ত কামনায়, একটুকু ঠাণ্ডা বাতাস নিয়ে বলে : 'রহে নাম অল্লাহ্ কা।'

এ-ছাড়া আর কীইবা করতে পারে !

এই দরবারের বাদশাহের ইতিহাস প্রসঙ্গে আর একটু কথা বাকি আছে।

মির্জা বিরজীস কদ্র বাহাদুর লখনউ থেকে পালিয়ে গিয়ে থামলেন একেবারে নেপালের সীমান্তে। সঙ্গে ছিল লাখখানেক লোক। তাদের সংকল্প : হিমালয়ের ঘাঁটিতে আশ্রয় নেবে ; তারপর, সুযোগ এলেই, বেরিয়ে, ইংরেজদের আক্রমণ করবে। যদি জিৎ হয়, ঘরে ফিরবে ; যদি পরাজয়, পালিয়ে আবার পাহাড়ে আত্মগোপন করবে। কিন্তু এ-ব্যাপার বেশিদিন চালানো যায় না। নেপাল রাজ্যেরও ক্ষমতা ছিল না এতো লোককে আশ্রয় দেবার, ওদের হয়ে লড়বার শক্তিও ছিল না। সে 'তাকত'-ই তার ছিল না। সুতরাং নেপাল সরকার কেবল বিরজীস কদ্র ও তাঁর মাকে আশ্রয় দিল। এবং সঙ্গীসাথীদের তখনই ফিরে যেতে হুকুম দেওয়া হল ; নতুবা, মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। বহিষ্কারের নির্দেশও জারী হয়ে গেল। ফলে, সকলেই পালাতে লাগল। অনেকে মারা পড়ল ; অনেকে বেশ বদল করে-করে এদিক-ওদিক দিয়ে পালিয়ে গেল। মির্জা বিরজীস কদ্র মাকে নিয়ে নেপালে গিয়ে উঠলেন। উভয়ের জন্যে নেপাল দরবার যৎসামান্য ভাতার ব্যবস্থা করল। শোনা যায়, দুজনের কাছে যতো হীরে জহরৎ ছিল, নেপালের রাজকোষে সব জমা পড়েছিল। অবশেষে, ওখানেই হযরত মহলের মৃত্যু হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলীর সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মির্জা বিরজীস কদ্রকে ক্ষমা প্রদর্শন করলেন। তাঁকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হল। কাউকে না জানিয়ে নেপাল ছেড়ে তিনি চলে এলেন কলকাতায়। এখানে তখন ওয়াজিদ আলী শাহর দেহান্ত হয়েছে ; জ্যেষ্ঠ-যুবরাজ হওয়ার জন্যে মির্জা কমর কদ্র সর্বাধিক বেতন পাচ্ছিলেন। বিরজীস

কত্র দাবি করলেন : বাদশাহর সমস্ত পুত্র অপেক্ষা সবচেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠিত ও অধিকারী—আমিই। আইনানুসারে, বাদশাহের পেনশন থেকে তিন ভাগ কমিয়ে বাকি বেতন আমায় দেওয়া হোক, এবং তাঁর সমস্ত উত্তরাধিকারী ও আত্মীয়দের খবরদারীও আমার জিম্মায় দেওয়া হোক। আবেদন অন্তে, তদ্‌বিরের উদ্দেশ্যে তিনি ইংল্যণ্ড যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। ঠিক তখনই, আত্মীয়দের মধ্যে একজন নিমন্ত্রণ করল। নিমন্ত্রণ সেরে, ঘরে ফিরেই শুরু হল ভেদবমি। অতি দ্রুত অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। একই দিনে প্রাণত্যাগ করলেন—তিনি, তাঁর পত্নী ও পুত্র। 'তখ্‌ত্‌' ও 'তাজ', সিংহাসন ও মুকুটের মুখ একদিন যারা দেখেছিল, সেই বংশের শেষ স্মৃতিচিহ্নও বিলুপ্ত হয়ে গেল পৃথিবীর বুক থেকে।

এর পরেও মেটিয়াবুরুজের চলমান জীবন, সেই নয়া বসতির জানপদ শোভা বজায় ছিল। শেষ পর্যন্ত যদি দুর্ঘটনার হাত এড়িয়ে কোনরকমে বেঁচে থাকতে পারত, তাহলে সেই হতভাগ্য নবাবের দরবার, তাঁর স্বজনদের জীবন যাপনের স্তর ও জাঁকজমক কেমন ছিল, তার স্মৃতি জাগিয়ে রাখতে পারত অনেক দিন। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় ওয়াজিদ আলী শাহর সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা হল। উত্তরাধিকারদের কারও প্রতি যাতে কোন অন্যায় না হয়, তাবৎ সম্পদ, সম্পত্তি, বাড়ি, সব বিক্রী করে, যার যতোটা প্রাপ্য, সেই অনুসারে টাকার অংশ দিয়ে দেওয়া হল। আর যা-কিছু অবশিষ্ট রইল, তার বদলে দেওয়া হল নগদ অর্থ। এর অনিবার্য পরিণাম একটাই, এবং তা-ই হল—মেটিয়াবুরুজের সর্বনাশ হল। লাখ টাকার জিনিস কড়ির দামে বিক্রী হয়ে গেল। যে-স্থান স্বল্পদিনেই হয়ে উঠেছিল 'বাগে-ইরম' (শদ্দাদের স্বর্গ)[1] দেখতে দেখতে পতনে-বিনাশে নরক হয়ে গেল। আপনি ওখানে গিয়ে এখন

[1] শদ্দাদ নামে এক বাদশাহ মর্ত্যেই একটা কৃত্রিম স্বর্গ নির্মাণ করিয়ে-ছিলেন। তাকে 'বাগে-ইরম'-ও বলা হয়। কথিত আছে, এই 'স্বর্গ'-প্রবেশের দিন তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে মারা যান।

ধুলো সরান, কিছুই চোখে পড়বে না। আপনার দৃষ্টি যদি বিগত সেই জীবন ও তার সৌন্দর্য খোঁজে, তো ইমরো-উল-ক্যস[1]-কে ডেকে আনুন। তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে আপনাকে শোনাবেন ঃ এইখানে ছিল 'মুরসৃসা মঞ্জিল', এইখানে 'নূর মঞ্জিল', এইখানে 'সুলতানখানা', এইখানে ছিল 'আসাদ মঞ্জিল', ওইখানে কবিদের 'মুশাইরা'[2] হত, ওইখানে হত বড়ো-বড়ো পণ্ডিতদের সমাবেশ, ওখানে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ব্যস্ত থাকতেন পরিহাসে-বিনোদে, আর ওইখানে জাত্ত-সঞ্চারী কবি ও লেখক আপন-আপন নিপুণতা প্রদর্শন করতেন। ওই স্থানে বিশ্ব-সুন্দরীদের মেলা বসত, ওই জায়গায় নাচগান হত, ওখানে পরীর মতো সুন্দরী মেয়েদের নাচগান শেখানো হত, আর এখানে জাহাঁপনাহ তাঁর রূপসী 'মুত্‌আশুদা'-বেগমদের মাঝখানে বসে জলসা করতেন। এই জায়গায় আফীমচীদের জমায়েতে উছ্‌লে উঠত গল্পের পর গল্প। ওখানে থাকত বটেররা, এখানে পায়রা উড়ত ; আর ওইখানে 'কন্‌ক্যওআর'[3] ময়দানে ধরা হত বাজী। এই দেউড়িতে চোখে পড়ত ঃ পর্দার পাশ দিয়ে মুখটি বার ক'রে চন্দ্রমুখীদের লোচনপাত ; ওই দেউড়িতে 'মামা-অসীলের'[4] সপদদাপে যাতায়াত। এই দেউড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন একজন বিশেষ কবি—অন্তঃপুরচারিণী 'মহলসরার মালিক' বড়ো ভালবাসেন কবিতাকে। ওই দেউড়িতে প্রত্যহ খোঁজ পড়ে নবীন রংদার লিপিকরের—এখান থেকে নব-নব রসের 'নোত্নামা'[5] গিয়ে হাজির হবে বাদশাহ-সকাশে।

সে-মেটিয়াবুরুজের মৃত্যু হয়েছে।

তবু, পূর্বী দরবারের হাজারো স্মৃতি এখনও রয়ে গেছে। খোদ লখনউ শহর ও সমাজ এই দরবারকে স্মরণে আনে। অওধেও স্থানে

---

[1] ইসলাম-পূর্ব যুগের এক প্রখ্যাত কবি, যিনি প্রাচীন রঙ্গশালার বিনষ্টি-চিত্র অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় এঁকেছেন।

[2] কবি-সম্মেলন। [3] ফানুস, কাগজের প্যারাচুট। [4] রাঁধুনী। [5] 'নোত্নামা' এক ধরণের চিঠি, বেগমরা পাঠাতেন জহাঁপনাহকে ; সাধারণত, প্রেম-প্রণয়ই মূল বিষয়।

স্থানে আছে অতীত রাজত্বের স্মৃতিচারী চিহ্ন। সর্বোপরি, লখনউ-বাসীদের আচার-আচরণ হাব-ভাব, এগুলিও পুরাতনী দরবারীদের জীবন্ত ইতিহাস। তাঁদের চাল-চলন দেখে মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে: "এ্যায় গুল বতূখুর সনদম তু বূএ্যায়্ কসে দারী"—'ওগো ফুল, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন, তোমাতে ও কিসের সুরভি!'

অতএব, এই প্রাচীন অবশেষের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করার একমেব বাসনায় আমি যে-প্রস্তাবের সূত্রপাত করতে চাই, তা হল: এই দরবার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলস্বরূপ লখনউয়ে যে 'সোসাইটী'র জন্ম হয়েছিল, তার স্বরূপ কী! হিন্দুস্তানের সংস্কৃতির উপর তার কী-কী প্রভাব পড়েছে।

॥ 9 ॥

তখন হিন্দুস্তানের দরবারী ভাষা ছিল ফারসী, এবং হিন্দুস্তানী সংস্কৃতি পারস্যের 'ঈরানী' (ইরানী) সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত। সফ্উইয়া সাম্রাজ্য-কালে ইরানের গণ-ধর্ম ছিল: "শীআ ইসনা অশীরী"। অন্যদিকে, হিন্দুস্তানের মুগল সম্রাট ছিলেন যে-ধর্মের অনুগামী, তা হল "চুগ্তাইয়া ময্হব-উল-মিন্নত" (সুন্নী)। কিন্তু স্থানীয় সংস্কৃতি-বৃত্তে ছিল ফারসীর প্রভাব। ফলে, ইরানীরা এদেশে এলে খুব আদর সম্মান পেত। ধর্মীয় মতভেদ ভাষাগত ঐক্যের পথে কোনদিনই বাধা হয়ে ওঠে নি। এই ঔদার্যের জন্যেই নূরজাহাঁ বেগম জাহাঁগীর 'তাজ' ও 'তখ্ত্' (মুকুট ও সিংহাসন)-এর মালিকানী হতে পেরেছিলেন। ফলত, আলোচ্য যুগের অন্তিমকালে, দিল্লীর অধিকাংশ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিই ছিলেন 'শীআ' (শীয়া), এবং এই কারণেই আমীনউদ্দীন খাঁ ন্যশাপুরী এখানে পৌঁছেই নবাব বুরহান-উল-মুল্ক্-রূপে গাঙ্গেয় ভূমির এক বিস্তৃত ক্ষেত্রের মালিক হতে পেরেছিলেন। অতঃপর বুরহান-উল-মুল্ক্-এর প্রভাব ও প্রতিপত্তি যতো বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ

করতে লাগল, ততোই তিনি দিল্লীর বিভিন্ন স্তরের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আশ্রয়দাতা হয়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু, তাঁর ও নবাব সফদরজংগের জীবন অতিবাহিত হয়েছিল নতুন রাজ্যের ভিত্তিস্থাপনে। ফলে, বীর সৈনিকদের পুরস্কৃত করা ছাড়া জাতীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক বিষয়ে মনোনিবেশ করার সময় তাঁরা পান নি। এবং বলা বাহুল্য, সমাজ ও সংস্কৃতির সম্বন্ধ—যুদ্ধ ও যুদ্ধজয়ের যুগ নয়—শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ।

শুজাউদ্দোলা যখন বকসারের যুদ্ধে হেরে গিয়ে ইংরেজের সঙ্গে নতুন বোঝাপড়া করলেন, এবং নিরুপায় হয়ে ফয়জাবাদে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন, তখন থেকেই অওধে এক নয়া সংস্কৃতির, জন্ম-পত্রিকা রচনার সূত্রপাত। এই সময়েই দিল্লীর কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ অধিকতর সংখ্যায় স্বদেশ ত্যাগ করে এখানে আসতে লাগলেন—একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। সেদিন, দিল্লী থেকে ফয়জাবাদের পথে তাবৎ পেশার ও তাবৎ শ্রেণীর মানুষের অবিরল স্রোত। মাত্র ন'বছরের মধ্যেই সেই ফয়জাবাদ কী থেকে কী হয়ে গেল! শুজাউদ্দোলার পরে নবাব আসফউদ্দোলা যখন লখনউবাসী হলেন, ফয়জাবাদের জমজমাট আখড়া ফয়জাবাদ থেকে শেকড়শুদ্ধ উপড়ে চলে এল লখনউ। দিল্লীর যেসব বনেদী পরিবার ও কলাবিদের দল ফয়জাবাদের উদ্দেশ্যে পা বাড়িয়েছিল, তারা পা চালিয়ে দিল লখনউ অভিমুখে, যেটা রাস্তাতেই পড়ে। অবশেষে, ক্রমে-ক্রমে, তারাও চলে এল লখনউ—মুষ্টিমেয় শিল্পী ও ভদ্রজন—যারা ওতঃপ্রোত জড়িয়ে পড়েছিল ফয়জাবাদের বেগমের সরকারে। কারণ, আসফউদ্দোলা ফয়জাবাদে ধন-দৌলতের এমন গঙ্গা বইয়ে রাখেন নি যে, শোনামাত্রেই লোক দৌড়বে অবগাহনের জন্যে।

সে সময়ে হিন্দু 'রিয়াসত' (রাজ্য) অনেক ছিল। কিন্তু শিষ্ট ও শীল দরবার মুসলমান শাসকদেরই ছিল বলে মনে করা হত। হিন্দু রাজারা প্রশংসা করে বলতেন ; সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আমরা মুসলমান দরবারের সঙ্গে পাল্লা দিতে অক্ষম। তার কারণ : স্বকীয়

প্রাচীন সংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করে নতুন সংস্কৃতি ও নবীন সাহিত্য সৃষ্টির কাজ তখনও আরম্ভ হয় নি। এর জন্ম হয় ইংরেজী শিক্ষা থেকে। ফলে, দেখা গেছে; যদি কখনও কোন সুপণ্ডিত, কবি বা সেনানী, মুসলমান সামন্তের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ধনী হিন্দুর এলাকায় প্রবেশ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাদর অভ্যর্থনা ও দেবতার মতো আদর আপ্যায়ন করা হয়েছে।

অবশ্য, মুসলমান দরবার তখন অল্প কয়েকটিই ছিল। সবার আগে তো দিল্লীর মুগল দরবার: প্রাচীন বৈভব হেতু বিভিন্ন অঞ্চলের কলাবিদ ও ভদ্রজনদের কেন্দ্র। এঁদেরই মধ্যে থেকে অনেকে দূর-দূরান্তের সুবায় গিয়ে নতুন নতুন দরবার স্থাপন করেছেন। যেমন, দাক্ষিণাত্যের আসফ ঝার দরবার। ওখান থেকে এগিয়ে টীপু সুলতান ও আর্কটের নবাবের দরবার। দিল্লী থেকে উত্তরে গেলে, রোহিলা-খণ্ডের বীর পাঠানদের রাজ্য। তারপর অওধের এই দরবার। ওদিকে মুর্শিদাবাদে নবাব 'নাযিম-এ বংগাল'-এর দরবার। অন্যান্য মুসলমান দরবার থেকে দক্ষিণের দরবারগুলি অনেক দূরে ছিল। জঙ্গল ও পাহাড়ের জন্যে রাস্তা এমনিতেই খুব দুর্গম ছিল। তবু, যদি সাহস করে কেউ পা বাড়াত, তো, ঠগ, ডাকাত—যারা সারা দেশেই ছড়িয়ে ছিল—পথের মধ্যেই খতম করে দিত। টীপু সুলতান ও কর্ণাটকের নবাবের রাজ্য পর্যন্ত যাওয়া তো দূরের কথা, নিজাম-হায়দরাবাদের রাজ্য পর্যন্ত পৌঁছনোই অনেক ভাগ্যের ব্যাপার ছিল। দিল্লীর পতন যখন শুরু হল, দিল্লীর সম্রাটের অবস্থা খারাপ হতে লাগল, সমাদর-আপ্যায়ন হ্রাস পেতে লাগল, ওখানকার লোক বেশির ভাগ দক্ষিণ দিকেই আসতে আরম্ভ করল। খুব কাছেই ছিল রোহিলাখণ্ড; সুযোগ সুবিধাও কম ছিলনা। এখানকার পাঠান শাসকরা ছিলেন বীর, ধার্মিক ও অন্য নানা গুণে ভূষিত। তবে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কলাপে তাঁদের কোন আসক্তি বা আকর্ষণ ছিলনা। ছিল নির্ভেজাল সৈনিক-রুচি। দেশের লোকদের ঐক্যবদ্ধ করে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি, এবং 'জির্গা'র (দল) আয়তন বৃদ্ধি—এছাড়া

অন্য কোন শখই তাঁদের ছিলনা। অর্থাৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিতে এখানকার পারিপার্শ্বিক চরিত্র জংলী গেঁয়োর মতো! এ ধরণের লোকেরা কবি সাহিত্যিক শিল্পীদের মহত্ত্ব কী বুঝবে! তাই এদের রাজ্যে যে-ই গেছে, পত্রপাঠ বেরিয়ে এসেছে; আরও চার-পাঁচ জায়গায় গেছে। শেষে, লখনউ পোঁছে দেখেছে: রইস থেকে আরম্ভ করে অতি সাধারণ লোক পর্যন্ত 'স্বাগতম্' জানিয়ে যাবতীয় সেবার জন্যে সদা প্রস্তুত। এমন জায়গায় পোঁছে, কে আবার ফিরে যেতে চায়! যে এসেছে, সে এখানকারই হয়ে গেছে। দিল্লীর যতো হাঘরে এখানে এলো তো 'পা মুড়ে' জমিয়ে বসে গেল। না মনে থাকল স্বদেশকে, না রইল অন্য কোন দরবার দেখার আকাঙ্ক্ষা। কিছু লোক অগ্রসর হয়ে বাংলার নবাব-নাজিম পর্যন্ত পোঁছেছিল। এরা ছিল সেইসব লোক, যাদের লখনউ কদর দিতে পারে নি। এমন লোকের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম ছিল। নতুবা, দিল্লী থেকে যতো কলাকার আসত, সব এখানকারই এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ত। অচিরেই অবস্থা এমন হল, ওই সময়ের সর্বাধিক সুসংস্কৃত সমাজের যতো প্রসিদ্ধ জ্ঞানীগুণী, সবাই ছিলেন লখনউয়েই, এবং লখনউয়েরই।

একটা জিনিস এই দরবার স্থাপিত হবার আগে থেকেই লখনউয়ে ছিল, সেটি হল আরবীয় জ্ঞান। শাহানশাহ আওরঙ্গজেব যখন মুল্লা নিজামউদ্দীন সিহালভীকে ফিরিংগি মহলের বাড়ি দিয়ে দিলেন, তখন থেকেই এর সূচনা। মুল্লা সাহেব ও তাঁর পরিবারবর্গ অল্প দিনের মধ্যেই ফিরিংগী মহলকে হিন্দুস্তানের একটি উচ্চশ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করলেন; লখনউয়ের এই ক্ষুদ্র মহল্লাটি হিন্দুস্তানের বিদ্যা ও বিদ্বানের কেন্দ্র হয়ে উঠল। শেখ আবদুল হক দেহলভীর পরে দিল্লীতে আর কোন প্রসিদ্ধ বিদ্বানের আবির্ভাব ঘটে নি। অবশ্য, পরবর্তীকালে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের বংশ অনেক প্রগতি করেছিল। কিন্তু তাঁদের খ্যাতি শুধু বিদ্বজ্জনমণ্ডলীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। 'হাদীস[1] ছাড়া জ্ঞানের আর যতো শাখা, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়

[1]হযরত মুহম্মদ সাহেব কথিত উক্তিনিচয়।

ছিল লখনউ। শহর তখনও এতো প্রসিদ্ধি লাভ করে নি। এইরকম অজ্ঞাত স্থানে এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি—হিন্দুস্তান দূর অস্ত, হিরাত, বুখারা, খোরাসান, কাবুল যার সামনে মাথা নীচু করত—খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার! গোটা ইসলামী দুনিয়া সেদিন এখানকার শিক্ষার্থী বলে অহংকার করত, এবং এখানকারই নির্বাচিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করত। এই দরবার প্রতিষ্ঠার আগেই ফিরিংগী মহলের বিদ্বানদের অনন্য প্রচেষ্টায় দর্শন, তর্কশাস্ত্র, ইসলামী ধর্মশাস্ত্র ও তার সিদ্ধান্ত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল লখনউ। অতএব, এই একটা বিষয়ই যা লখনউ-দরবারের কাছে ঋণী নয়। বাকি তাবৎ প্রগতিই এই রাজত্বপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে ওতঃপ্রোত জড়িত।

দিল্লী থেকে লখনউয়ে কোন্-কোন্ জিনিস এসেছিল, এবং এখানে তাদের কী কী রূপ ও রূপান্তর ঘটল, এবার সেগুলি একে-একে বলা যেতে পারে।

প্রথম: উর্দূ ভাষা। দিল্লী থেকে যেসব ফৌজী সরদার ও ভদ্রজন বুরহান-উল-মুলক্ বাহাদুরের সঙ্গে লখনউ এসেছিল, এটি ছিল তাদের ভাষা। এ ভাষার জন্ম দিল্লীতে এবং এ-ভাষায় কবিতা লেখার সূত্রপাত দাক্ষিণাত্য থেকে। 'ওঅলী' গুজরাতী দিল্লীতে নিয়ে এলেন তাঁর 'দীওআন' (কবিতা সংকলন), এবং স্বরচিত মনকাড়ানিয়া 'শাইরী' (কবিতা) দিয়ে উর্দূভাষীদের ঘুম থেকে জাগালেন। তাঁর 'কলাম'-এ (বাক্যে-শব্দে) এমন একটা যাদু ছিল, শোনামাত্রই লোকের মুখে-মুখে ফিরতে লাগল। দিল্লীতে উর্দূ কবিতার সূত্রপাত হল।

দিল্লীর কয়েকজন জ্ঞানবৃদ্ধ গোড়া থেকেই বেশ ওস্তাদীর সঙ্গে উর্দূ শাইরীর প্রশংসা করতে লাগল। যদিচ, তখন, উর্দূভাষার না হোক, উর্দূ কবিতার শৈশবকালই বলা উচিত। উর্দূ জগতের এই অগ্র-পশ্চাৎ কালে সর্বাধিক বিদ্বান ও সবচেয়ে দক্ষ ছিলেন 'খান' আরযূ, যাঁকে মৌলানা মুহম্মদ হুসেন আজাদ রেখেছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের

কবিদের মধ্যে। পরবর্তীকালের বড়ো-বড়ো ধুরন্ধর কবি—'স্যদা', 'মীর', মির্জা মযহর 'জানে জানান্' এবং খোজা মীর 'দর্দ' প্রভৃতি—এঁর শিষ্য ছিলেন। কবিতা ও কাব্যভাষার ওপর অসাধারণ অধিকার ছিল 'খান' আরযূর; কবির এতাদৃশ অধিকারের পত্তনও তাঁর মাধ্যমে। নবাব শুজাউদ্দৌলার মামা সালারজংগ অনেক মিনতি ও খোসামোদ ক'রে এঁকে লখনউয়ে এনেছিলেন। অওধে ছিলেন কিছুদিন। মৃত্যু হয় লখনউয়ে 1752 খ্রীষ্টাব্দে শুজাউদ্দৌলার সিংহাসন লাভের দুবছর পরে। উর্দূ শাইরীর (কবিতার) ইনিই ছিলেন প্রথম ওস্তাদ; উর্দূ শাইরীকে লখনউয়ে আনার কৃতিত্বও তাঁর। দুঃখের কথা, তাঁর মৃতাস্থি লখনউয়ের মাটি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দিল্লীতে সমাহিত করা হয়েছে।

এর পরে, এই পর্যায়ের আরেকজন নামী কবি, এহমদ শা বাদশাহর 'দুধ-শরীক ভাঈ' (সহোদর) আশরফ আলী খাঁ 'ফুগাঁ' সমাদরের সন্ধানে লখনউয়ের পথ ধরলেন। শুজাউদ্দৌলা অত্যন্ত আদর-সম্মানের সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করলেন, স্থান দিলেন দরবারে। কিন্তু—কবি-কল্পনা নাজুক (দুর্বল) না হতে পারে, কবি-হৃদয় নাজুক (কোমল) বটে। একটা অতি সাধারণ কথায় রুষ্ট হয়ে তিনি চলে গেলেন আজিমাবাদ। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় শুজাউদ্দৌলার দেহান্তের দুবছর আগে।

এইবার শুরু হল মৌলানা মুহম্মদ হুসেন আজাদ নির্দেশিত তৃতীয় পর্যায়ের কবিযুগ। 'খান' আরযূর সাগরেদদের উর্দূ কবিতার ওপর তখন একচ্ছত্র আধিপত্য। তৎকালীন অবস্থা বিচারে ধারণা হয়, দিল্লী আপন কলাকারদের আর নিজের কোলে ধরে রাখতে পারছে না। তাবৎ কলাবিদ স্থান ত্যাগ করছে। যে যাচ্ছে, সে আর ফিরে আসছে না। এর বিপরীত ছবি লখনউয়ে: যে-শিল্পীই আসে, যেখানকারই হোক, এখানকারই একজন হয়ে থেকে যায়। মির্জা রফী 'স্যদা', মীর তকী 'মীর', সৈয়দ মুহম্মদ মীর 'স্যয' যিনি এই তৃতীয় পর্যায়ের মহাকবি—সকলেই দিল্লী ত্যাগ করে লখনউ এসেছেন এবং এখানকার মাটিতেই দেহরক্ষা করেছেন।

এঁরা ছাড়া আর যেসব মহাকবি এই সময়ে লখনউ এসেছেন এবং এখানকারই হয়ে গেছেন, তাঁরা হলেন : মীর্জা জাফর আলী 'হসরত', মীর হায়দার আলী 'হ্যয়রান', খোজা হাসান 'হসন', মীর্জা 'ফাখর' মকী', মীর 'যাহক' বকাউল্লাহ খাঁ 'বকা', মীর হাসান দেহলভী, মীর যাহক-এর পুত্র (যাঁর মসনবী আছে) প্রভৃতি জনকুড়ি 'শাইর' বা কবি। মীর কমরউদ্দীন মিন্নত, মীর জিয়াউদ্দীন 'যিয়া', আশরফ আলী খাঁ 'ফুগাঁ'—এঁরা দিল্লী থেকে লখনউয়ে এসে অনেকদিন ছিলেন, এবং এখানেই সমৃদ্ধি লাভ করেন। শেখ মুহম্মদ কায়ম 'কায়ম'-এর মৃত্যু হয়েছিল তাঁর জন্মভূমি নগীনায়; তিনিও এই লখনউ-সভার অভিনেতা ছিলেন দীর্ঘদিন।

দিল্লীতে থেকে গেলেন মীর্জা 'মযহর জান জানান' এবং খোজা মীর 'দর্দ'-এর মতো কয়েকজন প্রৌঢ় কবি। এঁদের মধ্যে ছিল ফকীরদের সংযম ও সন্তোষ। তাছাড়া, 'সজ্জাদানশীনি'-র[1] জন্যে এঁদের পক্ষে দরবেশী ছেড়ে দেওয়া সম্ভবও ছিলনা। অর্থাৎ, ওখানে থাকার সুযোগ এঁরা পেয়েছিলেন। বস্তুত, উর্দু শাইরীর তৃতীয় পর্যায় তখনই, যখন দিল্লার কবিসভা ওখান থেকে উপড়ে লখনউয়ে এসে জমে বসল। এবং লখনউয়ে এদের এমন কদর হল, হিন্দুস্তানের ইতিহাসে তেমনটি ঘটেনি।

চতুর্থ পর্যায়ের কবিদের জন্মস্থান দিল্লী, আকবরাবাদ ইত্যাদি স্থান; কিন্তু তাঁদের কবিতার প্রসূতি-ভবন লখনউ। এখানেই খ্যাতিলাভ। এখানকার কবি-সম্মেলনে এঁরাই ছিলেন সভা-নায়ক : 'মীর-এ মজলিস'। এঁরা এখানেই থেকেছেন, এখান থেকেই অন্যত্র গেছেন, এখানেই বিকশিত হয়েছেন, আর এখানেই মৃত্যু-বরণ করেছেন। 'যুরঅত' সৈয়দ 'ইন্‌শা', 'মুসহফী', 'কতীল', 'রংগীন' প্রভৃতি এই পর্বের কবি। কাব্যভাষার ওপর এঁদের পূর্ণ অধিকার ছিল; কবিতা ছিল অসাধারণ লোকপ্রিয়; অন্য-কোন কবির বা কবিদের নাম

[1] কোন বড়ো ফকীরের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীর ওই গদীতে উপবেশন।

উচ্চারণ ছিল অসম্ভব প্রত্যাশা। এঁদের সকলের অস্থিই রয়েছে লখনউয়ের মাটিতে।

সে সময়ে দিল্লীর সাহিত্যিকরা যে-সংখ্যায় লখনউ আসতেন, তার একটা আন্দাজ সৈয়দ ইন্‌শা বিবৃত একটা গল্প থেকেই পাওয়া যায়। কাহিনীটির বিষয়ঃ জনৈক বৃদ্ধ শরীফ ও নূরন নামে এক বেশ্যার কথোপকথন। দুজনেই দিল্লীর লোক, আপাতত লখনউয়ে। বিবি নূরন উবাচঃ “আরে, এসো এসো মীর সাহেব! তুমি যে একেবারে ঈদের চাঁদ হয়ে গ্যাছো! দিল্লীতে যখন আসতে, রাত দু' পহর পর্যন্ত বসে থাকতে। লখনউয়ে এসে কী হলো তোমার—চেহারা পর্যন্ত ছাখা যায় না? এইতো, কারবালায় কতো খুঁজলুম আমি; কোথাও তোমার টিকিও দেখতে পেলুম না। ‘আঠোঁ’-তেও যাবে না, এরকম কিন্তু কোরোনা। আলীর দোহাই, আঠোঁতে নিশ্চয়ই যেও।” এর জবাবে মীর সাহেব যা বলেছিলেন, তা মনোহারিণী। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিধায় বিস্তারিত করলাম না। তিনি দিল্লী ও লখনউয়ী জীবন-ধারার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন, সমকালীন কবিদের ছিদ্রান্বেষণ করেছেন, ইত্যাদি। এসবের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই। বলার মধ্যে শুধু এইটুকুইঃ ওই সময়ের শরিফ ও কৃতিমান ব্যক্তিদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি, বারবনিতারা পর্যন্ত এখানে এসে বাস করতে আরম্ভ করেছে। যারা একদিন দিল্লীতে ‘ফুলওয়াড়ী মেলা’য় রসিক-রসিকা ছিল, তারা আজ কারবালা ও আঠোঁর মেলায় হৃদয় মেলে দিচ্ছে!

শম্‌স্‌-উল-উলেমা মৌলানা আজাদ অতঃপর ব্যক্তিগত যুগচেতনা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে দিল্লীর তাবৎ কবিকে একত্র জড়ো করেছেন, এবং সমকালীনতার জোরে তাদের পঞ্চম পর্যায়ের অন্তর্গত করেছেন। এটা ঘোরতর অবিচার। আসলে, পঞ্চম পর্যায়ের সূত্রপাত ‘নাসিখ’ ও ‘আতিশ’ থেকে, যখন ভাষায় এসেছে নবীন রূপ, অনেক পুরনো রীতি-শৈলী, ‘মুহাবিরা’ (প্রবচন) পরিত্যক্ত হয়েছে, নতুন ‘বন্দিশ’ তথা ফর্মের জন্ম হয়েছে। এই পর্বে উর্দু যে-রূপ নিল, দিল্লী ও লখনউয়ের উত্তরসূরি কবিদের কাছে তা-ই হল সর্বজনপ্রিয়।

এই ভাষাই কোথাও কোথাও বিবর্তিত হল সেই রূপে, হিন্দুস্তানে যা আজ প্রামাণিক। এবং এ-ই হল সেই সময়, যখন কবিতা-সাম্রাজ্যে লখনউ-ঘরানার সবপ্রথম ছাপ পড়ল।

এর পর ষষ্ঠ পর্যায়। লখনউয়ে 'ওঅযীর', 'যিয়া', 'রিঁদ', 'গোয়া' 'রশ্‌ক্', 'নসীম' দেহলভী, 'অসীর', মসনবী-লেখক নবাব মির্জা 'শ্যক্' ও পণ্ডিত দয়া শংকর 'নসীম'-এর কবিতার খুব ধুম ছিল। দিল্লীতে 'শাইরানা' (কাব্যগীতি) শোনাতেন 'মোমিন', 'য্যক্' এবং 'গালিব'। ভাষার দিক থেকে দেখলে, স্বীকার করতেই হবে যে এই পর্বটির প্রগতি হয়েছিল সকলের চেয়ে অধিক।

সপ্তম পর্যায়ে ছিলেন 'আমীর', 'দাগ', 'মুনীর', 'তসলীম' 'মযরুহ', 'জলাল', 'লতাফত', 'অফজল', 'হকীম' প্রভৃতি।

লখনউয়ে ভাষার সমৃদ্ধি এবং শাইরী কোন্ দৃঢ়মূল স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল—এই শেষ পর্যায়গুলির ওপর দ্রুত চোখ বোলালে স্পষ্ট নজরে পড়ে। অচিরেই "শের বলা" (শ্লোক-পাঠ) লখনউয়ের একটা ফ্যাশন দাঁড়িয়ে গেল। কবিদের সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল গণনার অতীত—অন্য কোন ভাষায় বোধহয় এরকম দেখা যায় না। মহিলা মহলেও শের-শাইরীর চর্চা হতে লাগল। এমনকি, অশিক্ষিতদের কথাবার্তায়ও কাব্যিক ভাব, উপমা ও অলংকারের ঝলক দৃষ্টিগোচর হতে লাগল।

॥ 10 ॥

ফারসী কবিতায় যৌবন এসেছিল 'মসনবী'[1] মাধ্যমে। এই কাব্য-রূপটি চিরকালই মহৎ ও লোকপ্রিয় বলে পরিগণিত। এর সূচনা

[1] একটি কাব্য-রূপ, যাতে কোন কাহিনী বা উপদেশ একটি বৃত্তেই বিধৃত হয়। প্রতি শেরের পংক্তিদ্বয় সানুপ্রাস। কিন্তু পরবর্তী শেরের অন্তঃধ্বনির সঙ্গে অনাত্মীয়তা।

ফিরদৌসীর মহাকাব্য 'শাহনামা' থেকে। অতঃপর 'নিযামী', 'সাদী', মৌলানা 'রুম', 'খুসরো', 'জামী' ও 'হাতিফী' প্রভৃতি কবি বিখ্যাত হয়েছিলেন এই কাব্যরূপ মাধ্যমে। দিল্লীতে এবং লখনউ প্রবাস-কালেও মীর তকী 'মীর' উর্দুতে ছোট-ছোট অনেকগুলি 'মসনবী' লিখেছিলেন। কিন্তু সেগুলি এতো ছোট ও মামুলী যে মসনবী প্রসঙ্গে তাদের উল্লেখ অনুচিত বলে মনে হয়।

উর্দুতে 'মসনবী' রচনার সত্যিকার আরম্ভ মীর 'যাহক'এর পুত্র মীর গুলাম হাসান 'হসন'এর লেখনীতে। ইনি শৈশবেই পিতার সঙ্গে লখনউ চলে এসেছিলেন ; এখানেই থেকেছেন, বড়ো হয়েছেন, এখানেই তাঁর কাব্য-প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। যে সমাজ ও যে শিক্ষা তাঁকে দিয়ে মসনবী 'বেনযীর' ও 'বদ্র-এ-মুনীর' লিখিয়েছিল, তা শুদ্ধরূপে লখনউয়েরই। এই সময়ে মির্জা মুহম্মদ তকী খাঁ 'হবস' লেখেন 'মসনবী ল্যয়লা-মজনূঁ'। লখনউয়ে মসনবী-প্রীতি বাড়তে থাকে। 'আতিশ' ও 'নাসিখ'এর সময়ে কিছুটা থমকে গিয়েছিল। তারপর আবার যখন এই শখ দেখা দিল, পণ্ডিত দয়াশংকর 'নসীম' লিখলেন 'গুলযার-এ-নসীম', আফতাবউদ্দৌলা 'কলক' লিখলেন 'তিলিস্‌ম্‌-এ-উলফত' এবং নবাব মীর্জা শ্যক 'বাহর-এ-ইশ্‌ক্‌', 'যহর-এ-ইশ্‌ক্‌' ও 'ফরেব-এ-ইশ্‌ক্‌'। এগুলি এতো প্রসিদ্ধ ও লোকপ্রিয় হয়ে উঠল, যে, ছোট-বড়ো সকলের মুখে মুখেই এইসব মসনবীর শের তথা পংক্তি প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এই সময়ের আগে, কোন এক কবি 'মসনবী মীর হসন' এর জবাবে লিখেছিলেন 'লজ্জত-এ-ইশ্‌ক্‌' নামে মসনবী। এটি প্রকাশিত হয়েছিল নবাব মির্জা শ্যক-এর মসনবীর সঙ্গে একত্রে। ফলে, তাঁরই নামে চিহ্নিত হয়ে গেছে। আসলে কিন্তু এটি ওঁর লেখা নয়, ওঁর কালেরও নয়।

মসনবী 'গুলযার-এ-নসীম' যদিও খুব লোকপ্রিয় হয়েছিল, এর মধ্যে অসংখ্য দোষ আছে। দেখলেই বোঝা যায়, এটি এক নবীন কবির দুর্বল কল্পনা। কবি চেয়েছেন স্বগত রচনায় যাবতীয় কাব্যগুণ ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু কাব্যকলায় অনধিকার হেতু পদে-পদে ঠোক্কর

খেয়েছেন এবং লক্ষ্যভেদ করতে পারেন নি কোথাও। এর জবাবে অভিজ্ঞ কবি আগা আলী 'শম্‌স্‌' এমন 'বহর' বা ছন্দে একটি মসনবী লিখলেন, যা কাব্যদোষ-বিরহিত তো বটেই, উপমা-অলংকার-শব্দালংকারের চমৎকৃতিতে উচ্ছলিত। কিন্তু, এই মসনবী দাঁড়াতে পারেনি, কাবু করতে পারেনি 'গুলযার-এ-নসীম'এর অর্জিত প্রসিদ্ধিকে। ওই সময়ে, দিল্লীতে মোমিন খাঁ কয়েকটি ছোট-ছোট মসনবী লিখেছিলেন ; সেগুলি গুণে যেমন অতুলনীয়, জনপ্রিয়তায় তেমনি প্রসিদ্ধ।

মোমিন খাঁর শাইরীতে নাজুক কল্পনার প্রাধান্য ছিল, গঠন ছিল কল্পকাহিনী ও অলংকার-ভিত্তিক। তাঁর মসনবীতে প্রগাঢ় কবি-ভাবনার মানবীকৃত রূপ এক বিশুদ্ধ কাব্যরসের জনক। মোমিন খাঁর শিষ্য 'নসীম' দেহলভী লখনউয়ে এসে স্থানীয় কবি-সম্মেলনকে এমন জমিয়ে দিয়েছিলেন, অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত গুরুর খ্যাতিকে তিনি উজ্জ্বলতরই করেছিলেন। তাঁর সাগরেদ 'তসলীম' লখনউভী উর্দূ মসনবীতে নিয়ে আসেন 'নযীরী', 'উর্ফী' ও 'সাইব'-এর উর্বর কল্পনা, এবং উর্দূ কবিতার জগতে 'ফযী' ও 'গনীমত'-এর মতো প্রাণবন্ত সৃষ্টি। এদিকে, শেষ পর্বে, মৌলভী মীর আলী হায়দার এবং তবাঈ 'নজ্‌ম্‌' লখনউভী শরাবের নিন্দাসূচক 'সাকীনামা সকসকিয়া' নামে একটি অদ্বিতীয় নীতি-বিষয়ক কবিতা ধরে দিলেন উর্দূ জনগণের সামনে, যার জবাব নেই। বাস্তবিক, মোমিন খাঁর ছোট ছোট মসনবীর কথা ছেড়ে দিলে, উর্দূ মসনবী রচনার আরম্ভ লখনউয়ে, প্রগতিও এখানে—একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে।

কিছু ব্যক্তি মীর হাসানের মসনবী এবং 'গুলযার-এ-নসীম'-এর মাধ্যমে দিল্লী ও লখনউয়ের ভাষার তুলনা করে থাকেন। এই ধরণের বিচারধারাকে মৌলানা মুহম্মদ হুসেন আজাদ স্পষ্টতর করেছেন। 'নাযীর' আকবরাবাদীর 'বন্‌জারা-নামা'র মতো খ্যাতি 'গুলযার-এ-নসীম'-এর ভাগ্যে যদি জুটেও থাকে, মীর হাসানের মসনবীর সঙ্গে তার তুলনা উর্দূ কবিতার প্রতি ঘোর অপমান। তুলনা যদি করতেই

হয়, তাহলে মীর হাসানের মসনবী এবং মসনবী 'তিলিস্‌ম্‌-এ-উলফত' এর মধ্যেই হতে পারে। এবং 'গুলযার-এ-নসীম'-এর ভাষাকে লখনউয়ের ভাষা বলে যদি জোর-জবরদস্তি করে মেনে নিতেই হয়, তাহলেও মীর হাসানের মসনবীর সঙ্গে তার তুলনাকে দিল্লী ও লখনউয়ের কবিতার তুলনা আদৌ বলা চলে না। বরং বলা উচিত, খোদ লখনউয়েরই আগের-পিছের ভাষার তুলনা। কারণঃ মীর হাসানের মসনবী এই ভাষার প্রাথমিক স্তরের নমুনা এবং আলোচ্য মসনবীটি তার অন্তিম স্তরের।

শাইরীর একটি প্রাচীনতর ও মহত্তর রূপঃ "মর্সিয়া"[1]। প্রাচীন আরবী শাইরীতে প্রধানত মর্সিয়া ও "রজয"-ই[2] ছিল কাব্য-চমৎকার প্রদর্শনের মাধ্যম। ফারসীতে মর্সিয়া পাঠের প্রথা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু সফউইয়াদের শাসনকালে ইরানে শীয়া সম্প্রদায় প্রাধান্য লাভ করে। তখন হযরত মুহম্মদের আত্মীয়দের ওপর আপাতিত দুঃখ-দহনকে স্মরণ-উজ্জ্বল করে রাখার জন্যে কবিদের দৃষ্টি গেল মর্সিয়ার দিকে। মৌলানা মোহতশিম কাশফীর অনুপম মর্সিয়া সংক্ষিপ্ত ও সর্বত্র জনপ্রিয়। এর পর থেকে কবিরা কখনও-কখনও হোসেনের শোক-সভার জন্যে দু-একটা মর্সিয়া লিখে দিতে লাগলেন। ক্রমে এটা রেওয়াজে দাঁড়াল। কিন্তু কাব্যজগতে মর্সিয়ার প্রভাব এতো কম যে কথাই তৈরি হয়ে গেলঃ "বিগড়া শাইর মর্সিয়াগো"—'অসার্থক কবিই মর্সিয়া-লেখক'। অপিচ, ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখলে, সফউইয়া সাম্রাজ্যেরই উত্তরাধিকারী অওধ রাজ্য। লখনউয়ে মজলিশের বৃদ্ধি এবং 'তাজিয়াদারীর' উৎসাহের জন্যে 'মর্সিয়াগোঈ' তথা মর্সিয়া-গীতির কদর হতে লাগল, সেই সঙ্গে দ্রুত ও অসাধারণ প্রগতিও। বাস্তবত, লখনউয়ের উন্নতির রহস্যও এই ঐতিহাসিকতার মধ্যে নিহিত। হিন্দুস্তানে তখন মুগল রাজত্ব; ফারসী তার দরবারী ভাষা বলে ঘোষিত; ফারসী সংস্কৃতি তার জীবন ও অন্য সমস্ত কার্যকলাপের কেন্দ্র। ফলে, হিন্দুস্তানে কোন ইরানী এলেই তাকে নয়নের মণি

---

[1] শোক-গীত। [2] যুদ্ধে স্ব-বংশের বীরত্বের বর্ণনা।

করে রাখা হত, লোকপ্রিয় হত তার যাবতীয় হাবভাব-ক্রিয়াকলাপ। কিন্তু দিল্লীর বাদশাহর ধর্ম ছিল সুন্নী। তাই ইরাণীরা সেখানে তাদের অনেক বিষয়ই গোপন করে রাখত। 'মহফিল' বা মাইফেলে মুখ খুলত খুব কম—অথচ বাস্তবে তারা এর উল্‌টোই ছিল। এদিকে, অওধের দরবার ছিল শীয়া, এবং এখানকার শাসক-বংশ এসেছিলেন খাস খোরাসান থেকে। এখানে এলে তাই ইরাণীর আসল রূপ বেরিয়ে পড়ত ঃ দিল খোলা, মুখ মুখর, হৃদয় প্রফুল্ল। এর চেয়েও বেশি করল এখানকার দরবারীরা—ওদের বৈশিষ্ট্যগুলির অনুসরণ করতে লাগল। ধর্মীয় ঐক্যই এসবের কারণ। ফলস্বরূপ, সাসানী ও আব্বাসী আভিজাত্যের কোলে প্রতিপালিত ইরাণী সংস্কৃতি অচিরে লখনউ সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠল।

'স্যদা' ও 'মীর'-এর সময়ে মিয়াঁ 'সিকন্দর'. 'গদা', মিস্‌কীন' ও 'অফস্নুর্দা' ছিলেন নামকরা 'মর্সিয়াগো'। এঁরা ইমাম হোসেনের শহীদত্বের ওপর ছোট-ছোট 'নয্‌ম্' (কবিতা) লিখে 'মজলিসে' শোনাতেন। পরে, মীর খলীক ও মীর 'যমীর' 'মর্সিয়াগোঈ'য়ের বিকাশ সাধন করেন। এই সময় থেকেই মর্সিয়ার আধুনিক রূপ ফুটে উঠতে থাকে। মীর 'যমীরের' সাগরেদ মির্জা 'দবীর' এবং মীর খলীকের পুত্র মীর 'অনীস'ও কালক্রমে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। মর্সিয়া রচনায় অসাধারণ কৃতিত্বের ফলে এঁরা সাহিত্য-গগণের চন্দ্র-সূর্য-রূপে দীপ্তিমান। 'মীর' ও 'স্যদা', এবং 'আতিশ' ও 'নাসিখ'-এর মধ্যে যে 'মুকাবিলা' (উতর-চাপান) ছিল, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটে মীর 'অনীস' ও মির্জা 'দবীর'-এর মধ্যে। মির্জা 'দবীর'-এর যদি ভাষার গরিমা, উন্নত কল্পনা ও পাণ্ডিত্য, মীর 'অনীস-এর তবে সহজতা, সরলতা ও মানবভাবনাকে প্রবুদ্ধ করার মতো ভাষা—যা শিক্ষার দ্বারা অধিগত হয় না, যা একমাত্র ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। এই দুই কবি-প্রৌঢ়ের কৃতিত্বে 'মর্সিয়াগোঈ' নামক আর্ট কবিতার অন্যবিধ কলারূপকে অতিক্রম করে গেছে, এবং উর্দূ সাহিত্যে সেই নতুন বোধ সঞ্জাত হয়েছে, ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা যার সন্ধানে প্রবৃত্ত।

'অনীস' ও 'দবীর' 'মর্সিয়াগোঈ'কে এমন এক উচ্চ সীমায় পোঁছে দিয়েছেন, যার ফলে এটি মণ্ডিত হয়েছে সর্বাত্মক কাব্যগুণে। লখনউয়ের প্রতিটি ব্যক্তি এই দুই মহাকবির এমন গুণগ্রাহী ও স্তাবক হয়ে ওঠে, যে, গোটা শহর দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়ঃ 'অনীসিয়া' ও 'দবীরিয়া'। এবং দু দলের মধ্যে আপসে লড়াই নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

মীর 'অনীস' মর্সিয়াগোঈর সঙ্গে-সঙ্গে 'মর্সিয়াখোআনী' (মর্সিয়া কথন)কেও দিয়েছিলেন কলাসম্মত রূপ। শোনা যায়, গ্রীসের কতিপয় বক্তা স্ব-ভাষণকে সুভাষণ করার জন্যে লোকচিত্তে প্রভাব বিস্তারের উপযোগী স্বরের ওঠা-নামা হাব-ভাব, মুদ্রা-পরিবর্তন এইসব রীতিমতো অভ্যাস করতেন। এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আর্টকে, ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, মীর 'অনীস'ই পুনর্জীবিত করলেন। যথোচিত শব্দ-ধ্বনির মাধ্যমে বৈচিত্র্য সম্পাদন, বিষয়ের অনুকূল চেহারা বানানো, পড়ার সময়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হাবভাব প্রদর্শন, ইত্যাদির সাহায্যে মর্সিয়াকে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী করে তোলার শিল্প লখনউয়ের, এবং 'অনীস'-এর ঘরানার আবিষ্কার। অধিকতর সমৃদ্ধির অবকাশ এখনও আছে ; সে চেষ্টাও হচ্ছে। আমাদের বক্তাগণ স্বগত ভাষণকে আকর্ষণীয় করার জন্যে এইসব ওস্তাদের কাছে যদি কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেন, সফল বক্তা বনে যাবেন।

'ড্রামা' পাশ্চাত্য কাব্যের একটা বড় অঙ্গ। আরবী ও ফারসী সাহিত্যে এর অস্তিত্ব ছিল না। উর্দূ ফারসী-আশ্রিত ; তাই এখানেও এ বিষয়ে কখনও মনোযোগ দেওয়া হয় নি। সংস্কৃতে অনেক উচ্চশ্রেণীর নাটক আছে। কিন্তু, পরবর্তীকালের সমাজ সেসবের খবর রাখত না। অবশ্য, রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের কার্যাবলী হিন্দুদের মধ্যে ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে প্রদর্শিত হত। কিন্তু এদের সঙ্গে উর্দূ কবিতার কোন সম্বন্ধ ছিল না। য়োরোপের 'অলিমপিয়া'-উপম মুক্তাঙ্গনে মহাকাব্য-প্রদর্শনীর মতো রামচন্দ্রের জীবনচরিত দেখানো হত। শ্রীকৃষ্ণের জীবন-লীলা দেখানো হত মঞ্চের ওপর নাচ-গান-বাজনার মাধ্যমে—ঠিক

'অপেরা'-র মতো—যাকে বলা হত 'রাস'। ওয়াজিদ আলী শাহর এই রাস খুব ভাল লেগেছিল। এই রাসের প্লটকে ভিত্তি করে তিনি নিজে একটি নাটক লিখেছিলেন। অভিনয়ও করতেন। তিনি সাজতেন কানাই, কিংবা প্রেমে অসফল-যোগী সেজে বসে থাকতেন, অনেক রমণী অপ্সরা-গোপিনী সেজে তাঁকে খুঁজে ফিরতেন। মেলা উপলক্ষে ক্যয়সর বাগের দরজা উন্মুক্ত ছিল জনসাধারণের জন্যে। তার অভিভবে, শহরের শৌখীনদের মধ্যেও নাট্যকলা বিকশিত হতে লাগল। অচিরাৎ, এই শিল্পকলার এতো উন্নতি ঘটল, প্রখ্যাত কবিরাও যুগের রুচি অনুসারে নাটক লিখতে লাগলেন। ওয়াজিদ আলী শাহর শখের নাট্যাভিনয়ের সমকালেই অনুভবী কবি মিয়াঁ আমানত লিখলেন 'ইন্দর সভা'। এবং এখনকার (নাট্য) কোম্পানীর মতো বিভিন্ন (নাটুকে) দল শহরের বিভিন্ন স্থানে তাঁর 'ইন্দর সভা' মঞ্চস্থ করতে লাগল। কোথাও ছেলেরা, কোথাওবা মেয়েরা অভিনয় করত। এতে, সংযোজিত হয়েছিল গানও : সুশ্রাব্য, সুমধুর এবং সঙ্গীতবিধিসম্মত। সারা শহর 'ইন্দর সভা' দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত।

মিয়াঁ আমানতের 'ইন্দর সভা'র এই সফলতা দেখে আরও অনেকের শখ হল। এইভাবে অনেক নাটক লেখা হল, আর সকলেরই নাম 'সভা'। বদলে যেত শুধু প্লট। এই প্রসঙ্গে মাদারী লাল প্রভৃতির সভা উল্লেখনীয়।

সভার এই নতুন রূপ-রং শহরে এমন আনন্দিত উৎসাহের সৃষ্টি করল, লোকেরা 'ইন্দর সভা' ছাড়া আর কোনরকম নাচ-গান পছন্দই করত না। চতুর্দিকে তখন সভার ধুম! ক্রমে, এর একটা নিজস্ব রূপ-রীতিও দাঁড়িয়ে গেল ; সমাজের বিভিন্ন স্তরের উপযোগী প্রাচীন প্রেম-আখ্যানগুলিকে শ্রুতিমধুর কবিতায় রূপান্তরিত করে এবং সুন্দর আঙ্গিকে জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা হল।

সন্দেহ নেই, সুব্যবস্থা ও প্রদর্শনের চটকে 'পারসী থিয়েটার' সভার রং ফিকে করে দিয়েছে। তবু, ড্রামার যে-রূপ লখনউয়ে উপজাত ও

প্রচলিত, হয়েছিল তার অবসান হয়ে গেছে মনে করার কোন কারণ নেই। স্বয়ং পারসী থিয়েটারই এ-জিনিস নিয়েছে লখনউ থেকে; এদের প্রথম অভিনীত নাটকই ছিল: 'ইন্দর সভা'! লখনউয়ের যাবতীয় সমারোহে আজও 'সপেরা', 'হরিশচন্দ্র' ইত্যাদি অভিনীত হয়, এবং এর ফলে অভিনয়-শিল্পীদের একটা স্থানীয় দলও গড়ে উঠেছে যারা জনগণের মনোরঞ্জন করে। তবু, এখানকার ভদ্রজনের সে রুচি আর নেই। সে যাই হোক, উর্দু নাটকের বুনিয়াদ নিঃসন্দেহে লখনউতেই, এবং এখান থেকেই সারা হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়ে।

উর্দু কবিতার একটি রূপ 'ওআসোখ্‌ত্‌'—মূলত প্রেম-প্রণয়ের কাব্যিক অভিব্যক্তি। সাধারণভাবে, এর বিষয়: কবি প্রথমে ব্যক্ত করেন স্বীয় ভালবাসাকে; তারপর তাঁর প্রেমিকার সৌন্দর্যের বর্ণনা করেন; তার পরে ছদ্ম-কৃতঘ্নতা—রুষ্ট কবি প্রেমিকার চিত্তে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দেন, যে, তিনি অন্য এক প্রেমিকায় মুগ্ধ হয়ে গেছেন; সেই কাল্পনিকা প্রেমিকার সৌন্দর্যের প্রশংসা ও তদ্বারা আপন প্রেমিকাকে জ্বালানো-পোড়ানো-বিরক্ত করা ও কঠোর বাক্য শোনানো; এইভাবে তার অহংকার ভেঙ্গে দিয়ে পুনশ্চ-মিলন। উর্দু কাব্যের এই বিশিষ্ট রূপ উদ্‌ঘাটিত হয় লখনউয়ে। মধ্যযুগের প্রায় সব কবিই 'ওআসোখ্‌ত' লিখেছেন এবং চমৎকৃতির সৃষ্টি করেছেন। দিল্লীতেও কিছুদিন 'ওআসোখ্‌ত্‌'-এর চর্চা হয়েছিল। বিশেষভাবে উল্লেখ্য মোমিন খাঁ, যিনি কতিপয় উত্তম 'ওআসোখ্‌ত' রচনা করেছিলেন। তবে, এর সূত্রপাত লখনউয়েই।

আমীরী বিলাসপ্রিয়তা থেকেও কয়েকটি কাব্যরূপ নবজাত হয়েছে, যার আরম্ভ দিল্লীতে। এই নব-রূপগুলির মধ্যে সর্বাধিক ব্যর্থ-রচনা 'হযলগোঈ'[1], এবং অংশত সার্থক 'রেখ্‌তী'[2]। 'হযলগোঈ'-এর পত্তনীদার দিল্লীর 'যাফর যটল্লী'। সম্ভবত, মুহম্মদ শাহর সময়ে ইনি জীবিত ছিলেন। এঁর কাব্য আদ্যন্ত আমি পড়েছি—না আছে

[1] অশ্লীল কবিতা। [2] স্ত্রীলোকদের ভাষায় লেখা কবিতা।

কাব্যসৌন্দর্য, না ভাষার কোন রস-মাধুর্য; শুধু অশ্লীলতা, আর সীমাহীন নির্লজ্জতা। এর পরে, বিলগ্রামের এক 'হ্যল'-কবি, উপনাম 'সাহব কর্ াঁ' দিল্লী থেকে লখনউ আসেন, এবং এখানেই স্ফূর্তিলাভ করেন। এঁর নাম ছিল সৈয়দ ইমাম আলী। ইনি আসফউদ্দৌলার সময়ে লখনউ আসেন। মনে হয়, এখানকার পতনশীল রইসজাদাদের মধ্যে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন। এঁর কাব্যসংগ্রহ পাওয়া যায়। এঁর কবিতা, বলা বাহুল্য, অশ্লীল এবং শিষ্টতা থেকে বহু যোজন দূরে, তবু কাব্যগুণ-মণ্ডিত, ভাষা ও সংলাপের প্রয়োগও সুন্দর। তবে, লখনউয়ের শেষ পর্বে, মির্জা 'দবীর'-এর শিষ্য মিয়াঁ মুশীরই এই কাব্যরূপটিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন।

'হ্যলগোঈ' প্রসঙ্গে মিয়াঁ 'চিরকীঁ'ও উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগ-লখনউয়ে আশূর আলী খাঁ নামে একজন প্রোৎসাহী, কর্মঠ ও সহৃদয় রইস ছিলেন। তাঁর ঘরোয়া 'গোষ্ঠী' বা সম্মেলন-আসর তৎকালীন সমাজের সজীব নমুনা ছিল। জান সাহেব ও 'চিরকীঁ'কে তিনিই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। কেউ-কেউ বলেন, 'সাহবকর্ াঁ'ও এঁরই সভায় উজ্জ্বলতর হয়েছিলেন। 'চিরকীঁ-র সমস্ত 'শের'-এ প্রস্রাব-পায়খানার উল্লেখ আছে। তাঁর রচনাবলী থেকে এমন দুর্গন্ধ বহির্গত হয়, যে নাম শুনেই পাঠকদের বোধহয় বমি আসছে! তবু, তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল, যার জন্যে তাঁর নাম গ্রহণ করছি—তাঁর কবিতায় সৌন্দর্য ও সু-উপমা বিলক্ষণ। কিন্তু তাঁর বিকৃত রুচি এই গুণগুলিকেও নোংরা ও অপবিত্র করে দিয়েছে।

'রেখ্‌তী'র আর্ট অশিষ্ট, তবু মনোহারিণী। 'চিরকীঁ'র কবিতার মতো ত্রাসদায়িকা নয়।

সব ভাষাতেই পুরুষ ও নারীর কথালাপ ও উচ্চারণে অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে। উর্দূতে এই পার্থক্য সবচেয়ে বেশি, আরবী-ফারসীর চেয়েও স্পষ্টতর। আরবী ও ফারসীতে প্রাচীন প্রথা ছিলঃ স্ত্রীলোক কবিতা লিখলে নিজের ভাষাতেই লিখবে। পুরুষ-কবি যদি কখনও

কবিতায় স্ত্রৈণ ভাষা ব্যবহার করে, তবে সে কাব্যভাষার লালিত্য সৃষ্টির জন্যে। প্রথাটি ইংরেজীতেও আছে।

উর্দূ কবিতার ভাষা, আবহমান কাল, পরুষ ভাষা। 'শাইরা' বা মহিলা-কবি যখন স্বগতোক্তি করেছেন, পুরুষ হয়েই করেছেন, পুরুষেরই ভাষা প্রয়োগ করেছেন, এমনকি স্বকীয় সর্বনাম পর্যন্ত পুংলিঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কবির নাম যদি জানা না থাকে, কারও বোঝার ক্ষমতা নেই, কবিতাটি পুরুষের লেখা, না, নারীর।

ব্যতিক্রম দেখা দিল উর্দূ কবিতার তৃতীর্থ-চতুর্থ পর্যায়ে।

কিছু চঞ্চলস্বভাব নবযুবকের একদা খেয়াল জাগল: 'রেখ্‌তা' (পদ্য)র মতো 'রেখ্‌তী'ও (মেয়েলী ভাষায় লেখা কবিতা) বানানো যাক। মীর হসন তাঁর মসনবীতে প্রয়োজনস্থলে এই ভাষার প্রয়োগ করেছিলেন। সে পর্যন্ত কিছু বলার নেই। মিয়া 'রংগীন' থাকতেন দিল্লীতে, লখনউয়ের সভায় অংশ গ্রহণ করতেন। এই কবিতা-কলাকে তিনি দিলেন স্থায়ী রূপ। কিন্তু সভ্য ও শিষ্ট সমাজ রেখ্‌তীকে অত্যন্ত অশিষ্ট ও নির্লজ্জ প্রকাশ-মাধ্যম বলে মনে করত।

একটু আগেই, সৈয়দ 'ইন্‌শা'র জবানীতে, দিল্লীর এক সভ্যভব্য বৃদ্ধ ও বেশ্যা নূরনের লখনউয়ে বার্তালাপের উল্লেখ করেছি। সেখানে সেই বৃদ্ধ ফরমাচ্ছেন: "আর একটা শোনো; এটা সবার ওপর দিয়ে যায়: ·······স্‌আদত ইয়ার তহমাস্তের ব্যাটা আনওয়ারী রেখ্‌তা হচ্ছে আত্মজ্ঞানী। তার 'তখল্‌লুস' (উপনাম) 'রংগীন'। একটা 'কিস্‌সা' (কাহিনী) লিখেছে; সেই মসনবীর আবার নাম রেখেছে 'দিলপযীর' (মনোহর)! মেয়েলী ভাষায় বেঁধেছে। মীর হসনকে বিষ খাইয়েছে। কিন্তু সেই 'মরহূম' (স্বর্গত ব্যক্তি) বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তা জানতেও পারেন নি। 'বদ্র-এ-মুনীর'কে মসনবী বলি না। যে বলে, সে 'সাণ্ডের তেল ব্যাচে'[1]। আচ্ছা, একে 'শের' (কবিতা) বলা হবে

[1] 'সাণ্ড' গিরগিটির মতো প্রাণী; টিপে তেল বার করা হয়; সেই তেল যৌনশক্তিবর্ধক বলে মনে করা হয়।

কেন ? সমস্ত লোক—দিল্লীর, লখনউয়ের…মেয়ে থেকে মদ্দা পর্যন্ত —পড়ছে :

চলী ওঅহাঁ সে দামন উঠাতী হূঈ
কড়ে সে কড়ে কো বজাতী হুঈ
হোথা থেকে চলো আঁচল উড়িয়ে
কাঁকণে কাঁকণ বাজিয়ে বাজিয়ে

ব্যাচারী 'রংগীন'ও এই জাতের কিস্‌সা লিখেছে। কারও প্রশ্ন : ভাই, তোর বাপ তো আপাদমস্তক রিসালদার, ভল্ল চালায়, খাঁড়া চালায়। তা, তুই এমন 'কাবিল' (লায়েক) হলি কোথা থেকে ? গুণ্ডাবাজীর মেজাজে রণ্ডীবাজী করে এসেই রেখ্‌তার কড়াই ছেড়ে এখন এক রেখ্‌তী বানিয়েছেন। এই জন্যে, যে, ভালো মানুষদের বউ-বেটিরা জমিয়ে পড়বে, আর লেখকের সঙ্গে নিজেদের মুখেও কালি মাখবে। ভালো, এ-'কলাম'টা কী জিনিস ?—

যরা ঘর কে 'রংগীন'-কো তহকীক্ কর লো
ইহাঁ সে হুয়্ ক্যয়্ প্যয়সে ডোলী কহারো
ঈষৎ যাচাই করো 'রঙীন'-কে ঘরের
হেথা থেকে ক'পয়সা পালকি কাহারের

পুরুষ হয়ে বলে কিনা—'এমন যেন হয় না কখনও কম্‌বখ্‌ত্, আমি মরে যাই !' আর একটা কেতাব বানিয়েছে, মেয়েলী ভাষায় লেখা, তাতে আছে : 'ওপরউলীরা চলে, ওপরওয়ালা চাঁদ, সুন্দরী ধোবানী, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

সভ্যভব্য বুড়ো তো অভিযোগ করতে-করতে মরেই গেল। এদিকে, নওজোয়ানদের রঙীন মেজাজ এই 'রংগিনী' রুচিকে বাড়িয়ে দিয়ে তবে ছাড়ল। উর্দুর একটি কাব্যাঙ্গ হয়ে গেল 'রেখ্‌তী'। এর আবিষ্কার দিল্লীরই এক কবি করেছেন, কিন্তু লখনউতে স্থিত হয়ে ; এবং এখানেই এর ক্রমবিকাশ।

'কিস্‌সা'র ধারায়, মীর 'হসন'-এর পর নবাব মির্জা 'শৌক' এই ভাষাকে উৎকর্ষতার যে স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন, তা অনির্বচনীয়।

পাতার পর পাতা পড়ে যেতে থাকুন, শাইর তাঁর শের-এ স্বগত প্রয়োজনে, কথ্যভাষার কোন পরিবর্তন আদৌ করেছেন কী করেননি, বুঝতেই পারবেন না! তবে গজল রচনায় 'রঙীনে'র উত্তরাধিকারী লখনউয়ের একজন সাধারণ ব্যক্তি—'জানসাহব'। এঁকে, আশূর আলী খাঁ—চলতি ভাষায় বলতে গেলে—লেদ মেশিনে চড়িয়ে তৈরি করেছিলেন। এর পরেও লখনউয়ে 'রেখ্তীগো'[1] আরও অনেকে আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু জানসাহেব যে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, তা আর কারও অদৃষ্টে ঘটে নি। তিনি গজল লিখেছেন 'ওআ-সোখ্ত্' লিখেছেন, এবং কতিপয় 'নয্ম্' তথা কবিতাকণাও।

অশ্লীলতা ও লাম্পট্য পরিহার ক'রে পরিচ্ছন্ন ভাবের বাহন হলে, 'রেখ্তী'র উন্নতি হত। মুশ্কিল হল, ওর ভিত্তিই হচ্ছে লম্পট ভাবনা, অশ্লীল ভাব। এই কারণে, 'রেখ্তীগো', রেখ্তী-রচয়িতাদের পা সংযম ও শিষ্টাচারের পথ থেকে বরাবর, বারবার পিছলে গেছে। তাতে হয়তো ভাষার কিছুটা লাভ হয়েছে, কিন্তু নৈতিকতার ক্ষতি হয়েছে অজস্র।

॥ 11 ॥

উর্দূ পদ্যর তুলনায় উর্দূ গদ্য অল্পবয়সী। কিছু ব্যক্তি ফারসীতেও শের বলতেন; কিন্তু সাধারণ প্রবণতা ছিল উর্দূ গজলের অভিমুখে; —শিক্ষিত সমাজে এ-ই ছিল দীর্ঘদিনের রেওয়াজ। ফলত, হিন্দুস্তানে, উর্দূ কবিদের মোট সংখ্যা ফারসী কবিদের চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে ফারসীই ছিল অধিকতর জনপ্রিয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, ধর্মশাস্ত্র ফারসীতে লেখা হত। আবালবৃদ্ধ পত্র ব্যবহার করত ফারসীতে। মাদ্রাসায় শিশুদের পড়ানো হত ফারসী রচনা, এই ভাষাতেই পত্র-লেখা শেখানো হত। পরিণাম দাঁড়িয়েছিল:

[1] রেখতীর্ কবি

কথায়-বার্তায় উর্দূ ভাষা যতো মধুরই হয়ে উঠুক, লেখার সময়ে সব বোবা!

ইংরেজদের উৎসাহ ও প্রেরণায় মীর অম্মন দেহলভী লিখলেন উর্দূ গ্রন্থ 'চার দরবেশ'। এই সময়ে মীর্জা আলী লুত্‌ফ্‌ লিখলেন 'তযকিরা-এ-শোঅরা-এ-উর্দূ' (উর্দূ-কবিদের আলোচনা)। হায়দরাবাদের আবদুল্লা খাঁ সাহেবের চেষ্টায় গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল। এরই কাছাকাছি সময়ে মৌলভী ইসমাইল সাহেব 'শহীদ' লেখেন 'তকবিয়ত-উল-ইমান' (ধর্ম-শক্তি), যার আলোচ্য বিষয় 'ত্যওহীদ' (অদ্বৈতবাদ) এবং 'ইত্তিবাঅ-এ-সুন্নত' (পয়গম্বর কথিত মার্গের অনুসরণ)। এই রচনাগুলিকে এখন যে দৃষ্টিতেই দেখা হোক না কেন, সেকালে কোন সাহিত্যিক চমৎকৃতি দেখানোর জন্যে কিন্তু লেখা হয় নি। এদের একটিমাত্রই উদ্দেশ্য ছিল: সোজা সরল ভাষায় নিজের কথা বলা, যাতে জনসাধারণের লাভ হয়। এইসব মহানুভব ব্যক্তি যদি সাহিত্যিক কৃতিত্ব দেখাতে চাইতেন, তাহলে তৎকালীন লিখন-শৈলীর অনুসরণে 'জহুরী এবং নেমত খান-এ-আলী এবং আবুল ফজল এবং 'তাহির ওঅহিদ'এর রীতি-পদ্ধতিই তাঁরা গ্রহণ করতেন। এই রীতি-প্রথা-শৈলীই সেদিন সারা দেশ ছেয়ে ছিল, এবং ভিন্নধর্মী রচনা দেশবাসীর কাছে প্রশংসাযোগ্য বলে বিবেচিতই হত না। শুধু লেখাতেই নয়, শিষ্টাচারের প্রতি অতি-আনুগত্য বশত, 'বোলচাল' তথা কথাবার্তায়ও এই রীতিনীতি অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। যেমন, সৈয়দ ইন্‌শা করেছেন মীর্জা মযহর জানেজানানের ভাষণ থেকে কিছু শব্দ উদ্ধৃত ক'রে।

সত্যি বলতে কি, উর্দূ গদ্য-রচনার শুরু লখনউয়ে—যেদিন প্রথম মির্জা রজব আলী বেগ 'সুরুর' তাঁর 'ফসানা-এ-অজায়ব' এবং অন্য আর একটি স্বরচিত গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এই সময়ে 'ন্যওরতন'ও লেখা হয়েছিল। এর লেখক মুহম্মদ বখ্‌শ্‌ 'মহজুর্‌' ছিলেন 'জুরঅত'-এর শিষ্য, এবং লখনউয়েই প্রতিপালিত।

তবে, রজব আলী বেগ 'সুরুর'ই গদ্য রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন

করেছেন। তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে উর্দূ জগতে সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি মীর অম্মনকে আক্রমণ করেছেন—যে কারণে, দিল্লীবাসীদের দৃষ্টিতে তাঁর তাবৎ বিশেষত্বের কোন গুরুত্বই নেই। এমনকি, মীর মহম্মদ হুসেন আজাদের মতো শিষ্ট ব্যক্তিও তাঁকে বলেছেন 'লখনউ কা শোহদা'—লখনউয়ের গুণ্ডা। জানিনা, স্বর্গীয় রজব আলী বেগের এই অপরাধের বদ্‌লা কতোদিন নেওয়া হবে! মীর অম্মনের গদ্যের সৌন্দর্য ইংরেজের কাছে ধরা পড়তে পারে, কিন্তু হিন্দুস্তানের উর্দূ-ভাষীদের কারোরই নজরে কোনদিন পড়েনি, পড়বেও না। যেহেতু—ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব তখনও পর্যন্ত হিন্দুস্তানী সাহিত্যের রুচি বদলে দেয় নি, পূর্বের সাহিত্যই ছিল হৃদয়-কল্পনা-বিহারী।

ইতিপূর্বে কয়েকবার লিখেছি, আবারও লিখছি : শিক্ষা ও বিশিষ্ট রুচির বিকাশের সঙ্গেই সাহিত্যিক শৈলীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যেভাবে, বর্ণ-গন্ধ-আহার ইত্যাদি তাবৎ বস্তু নগর-বিশেষের সংস্কৃতি অনুযায়ী ভালো বা মন্দ হয়; এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে এতো মতভেদ যে; একের কাছে যা স্বাদু ও প্রিয়তম, অপরের কাছে তাই-ই রসহীন ও গর্হণীয়; ঠিক সেইভাবে সাহিত্য ও তার রুচিও আপেক্ষিক --যে বিশেষ শৈলী একটি জাতির মধ্যে বিকশিত ও জনপ্রিয়, অন্য জাতির দৃষ্টিতে সেই শৈলীই আবার নিরস, নিরর্থক ও নির্বোধ প্রতিভাত হয়। দুটোর মধ্যে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, নির্ণয় করা অসম্ভব।

অনুপ্রাসাত্মক বাক্যের ব্যবহার, সিদ্ধরসাত্মক ও ঔচিত্যপূর্ণ শব্দের প্রয়োগ এবং একই অর্থের পুনরাবৃত্তি দ্বারা রচনাকে মনোহারিণী ও পরিণামমুখী করে তোলা—ইসলাম-পূর্ব আরবে এই শৈলীই সুন্দর ও অলংকৃত বলে বিবেচিত হত। এই শৈলী ছিল আরব জাতির ভাষায়। আর, ছিল বলেই কুরান একে এক অপূর্ব শিল্পশ্রীতে প্রস্ফুট করে তুলল। এই শিল্পিত শৈলীই আরবী সাহিত্যের মৌল তত্ত্ব। বর্তমান কালের বিন্দু থেকে দেখলে, আরবীর বিশিষ্ট কৃতি 'মুকামাত-এ-হরীরী'

এবং 'তারীখ্-এ-ত্যমুরী' ইত্যাদি গ্রন্থ অনুপ্রাসের আতিশয্য, অনাবশ্যক শব্দের আধিক্য ও অনুচিত বিস্তার ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। বলা বাহুল্য, এ-সবই ক্ষণ-আনন্দদায়িনী। এই শৈলীকেই ফারসী সাহিত্যিক গ্রহণ করেছিলেন। এবং, সাহিত্য যেমন-যেমন প্রগত হয়েছে, এই শৈলীও তেমনি-তেমনি প্রৌঢ়ত্ব ও স্থায়িত্ব অর্জন করেছে। প্রথমদিকের উর্দূ সাহিত্যিকরা এই শৈলীর দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাই তাঁরা এরই অনুসরণ করেছেন, এবং সকলে তার প্রশংসাও করেছে। সুতরাং, 'চার দরবেশ' যখন লেখা হয়েছিল, হিন্দুস্তানের তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ একে সাহিত্যিক দিগ্‌দর্শন বলে গ্রহণ করেছিল, এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। একমাত্র ব্যতিক্রম ইংরেজরা—যারা এটি পছন্দ করত। কিন্তু ওরা তো উর্দূ জানতই না!

ইংরেজীর প্রভাবে এখন এসেছে নতুন যুগ। প্রাচীন সাহিত্য উর্দূকে যে 'যেবর অ্যর্ লিবাস' (গহনা ও বস্ত্র) পরিয়ে দিয়েছিল, তা খুলে নিয়ে পশ্চিমী পোষাক পরানো হয়েছে। 'চার দরবেশ' এবং এরই মতো অন্যান্য গ্রন্থগুলি প্রাচীন সাহিত্যিক বেশ ও ভূষণ থেকে বঞ্চিত, তাই লোকের পছন্দ হয়েছিল; অন্তর্নিহিত কোন ঔৎকর্ষ্যের জন্যে নয়; যে বিশিষ্ট গুণাবলী আধুনিক কালে পরিত্যক্ত, সেই প্রাচীন ও জনপ্রিয় সাহিত্যিক বিশিষ্টতা থেকে রিক্ত বলেই। এটাই আসল তত্ত্ব।

সমসমকালে, লখনউয়ে, মৌলভী গুলাম ইমাম 'শহীদ' লেখেন তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ম্যওলূদ শরীফ'। সমকালীন সাহিত্যিক রুচির অনুকূল ছিল বলে সকলের খুব পছন্দ হয়েছিল এবং ধর্মীয় লোকপ্রিয়তার জন্যে আজও বহুল সমাদৃত।

আধুনিক উর্দূ গদ্য দিল্লীতেই উদ্ভূত, তার ঋণও চিরকাল দেহলী-সমীপে। মির্জা গালিব উর্দূ গদ্যের শৈলীতে এনেছেন সরলতা ও সহজতা, যা নব্য রুচির অনুরূপ। তবু, তাঁর রচনাতেও কখনও-কখনও অনুপ্রাসের ছটা দেখা যায়। তবে, তা এতো সহজগম্য যে, মনোযোগী

পাঠকের কাছে তার সূক্ষ্মতা ধরা পড়ে। আধুনিক শিক্ষা এই শৈলীরই নিরন্তর অভিমুখী। তাই, সর্বত্রই এর প্রশংসা। স্যর সৈয়দ এই সরলতার মধ্যে নিয়ে এলেন গাম্ভীর্য। অথচ, ভাষা যাতে কঠিন না হয়, ছোট-বড়ো সকলেরই বোধগম্য হয়, সে চেষ্টাও তাঁর ছিল। মৌলভী মুহম্মদ হুসেন আজাদ এই গাম্ভীর্যের সঙ্গে অধিকতর সরলতাকে মিশিয়ে দিলেন। তখনও 'লখনউয়ের পাঠকসমাজ ইংরেজী প্রভাব থেকে দূরে স্থিত ; প্রাচীন শৈলীতেই তারা অভ্যস্ত। তাই ওয়াজিদ আলী শাহর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সানুপ্রাণ রংদার রচনাই প্রচলিত ছিল। এখানকার লোক সরলতার স্বাদ তখনও পর্যন্ত পায় নি।

আলীগড় থেকে 'তহযীব-উল-অখ্‌লাক', আগ্রা থেকে 'তেরহউঈ সদী', এবং লখনউ থেকে 'অওধ পাঞ্চ' প্রকাশিত হতে লাগল। এদের প্রত্যেকটিতেই উর্দূ গদ্যের বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। 'তহযীব-উল-অখ্‌লাক'-এ পাণ্ডিত্য ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে জাতীয় সহানুভূতির দরদী স্পর্শ ছিল ; ছিল পরিচ্ছন্ন বোধগম্য ভাষা, নব্য পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন থেকে গৃহীত ভাব-ভাবনা এবং প্রভাবশালা লেখন ও ভাষণ। 'তেরহওঈ সদী'তে উচ্চবিত্ত লেখন-যোগ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ছিল নতুন ভাব ও চিন্তার উপস্থাপনা, এবং এদের মাধ্যমে প্রাচীন সাহিত্য-রুচিকেও রক্ষা করার অবিরল প্রয়াস। পুরনো, পুরাগত সাহিত্যকে এরা ঈষৎ সরল ক'রে নব্য শৈলীতে উপস্থাপিত করতেন। প্রচেষ্টাটি নব্য ও প্রাচীন উভয় দলেরই উৎসাহিত প্রশংসা লাভ করেছিল।

ভাষার আসল রূপ প্রদর্শিত হয়েছিল 'অওধ পাঞ্চ' পত্রিকায়। হাস্যই ছিল এর উপজীব্য। বিভিন্ন লেখক এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ; সকলের হাসির লেখাতেই ছিল বিশেষ ধরণের সৌন্দর্য ও স্বাদ। মুনশী সজ্জাদ হুসেন (সম্পাদক)-এর নির্মল হাসি, মির্জা মচ্ছ বেগ সাহেবের 'ক্যয়সর'[1]-এ স্নাতক ভাষা, মুনশী এহমদ আলী কসমণ্ডভীর

[1] স্বর্গের একটি কুণ্ড।

কাব্য-সাহিত্যিক রুচি-সমন্বিত শৈলী, পণ্ডিত ত্রিভুবন নাথ 'হিজ্র'-এর হিন্দী কবিতা ও অতিশয় মনোগ্রাহী রচনা, সব মিলিয়ে উর্দু গদ্যে এক বিচিত্র সজীবতা ও প্রফুল্লতার সৃষ্টি করেছিল।

এই সময়ের মধ্যেই, 'অওধ-অখবার'-এর সঙ্গে পণ্ডিত রতন নাথ 'সরশার' লিখিত 'ফসানা[1]-এ-আজাদ' মুদ্রিত হতে থাকে। প্রকাশ-মাত্রেই উপন্যাসটি দেশব্যাপী সাড়া জাগায়। উর্দু জগৎ উপন্যাস শিল্পের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়। 'ফসানা-এ-আজাদ'-এর লেখক যেখানে লেখনী মাধ্যমে কোন দৃশ্য আঁকছেন বা কোন ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেন, সেখানে যে-ভাষা তিনি প্রয়োগ করেছেন, তা 'ফ়সানা-এ-অজায়ব'-এর পুরনো শৈলীরই ঈষৎ সমৃদ্ধ রূপ। আর, যেখানে চরিত্র-মাধ্যমে সংলাপ, সেখানে তিনি ভাষাকে খুব সহজ সরল রেখেছেন। বিশেষভাবে, স্ত্রীলোকদের মুখের ভাষা খুবই সুন্দর—যদিও ইতি-উতি কিছু ত্রুটি আছে। একথা অনস্বীকার্য, স্ব-চেষ্টায় যে সফলতা তিনি লাভ করেছেন, তা এর আগে কেউ পাননি বা পারেন নি।

অতঃপর গভর্নমেণ্টের ফরমাইশে মৌলভী নাজীর এহমদ সাহেব 'তাযীরাত-এ-হিন্দ'-এর অনুবাদ করেন। সাবলীলতায় ও সহজতায় এর ভাষা তুলনারহিত। তবে, স্থানে স্থানে, আরবী শব্দের অতি-শয়তায় দুর্গম ও অলংকারবহুল। সমকালীন লেখক মৌলভী মুহম্মদ হুসেন সাহেব আজাদের সাহিত্যকৃতিত্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বিশেষত, উর্দু ভাষার ইতিহাস এবং উর্দু কবিদের 'তযকিরা' (চর্চা) লিখে তিনি উর্দু সাহিত্যজগতে সু-খ্যাতি লাভ করেন।

এই পর্বেই, 1882 খ্রীষ্টাব্দে মৌলভী মুহম্মদ আব্দুল বাসিত সাহেব 'মহশর-'এর নাম-চিহ্নিত 'মহশর' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি আমি বার করেছিলাম। এই পত্রিকায় এমন সুন্দর শীর্ষক, সমুচিত শব্দ ও ভাবনা দিয়ে এডিসনের স্টাইলকে উর্দুতে আনা হয়েছিল, দেশ হঠাৎ চমকে উঠেছিল। এই সঙ্গেই আমার লেখা 'অওধ অখবার'-এ

[1] গল্প, কাহিনী, উপন্যাস।

প্রকাশিত হতে থাকে। এদেশের পক্ষে এগুলি একেবারে নতুন সাহিত্য। লেখাগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও উচ্চ প্রশংসিত হয়। হঠাৎ দেখা গেল: অধিকাংশ লেখক এই শৈলীতেই অনুশীলন করছেন এবং সাধারণ প্রবণতাও ওইদিকে। এরই মধ্যবর্তী সময়ে আমি পাঠকের সামনে হাজির করি আমার বলিষ্ঠ ও মনোজয়ী নাটক 'শহীদ-এ-ওআফা'। চতুর্দিক থেকে উৎসাহ-বাণী আসতে থাকে।

অবশেষে, স্বদেশবাসীর আগ্রহ দেখে 1887 খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আমি 'দিলগুদায' প্রকাশ করি। পত্রিকাটি প্রাচীনপন্থী ও নব্য ইংরেজী শিক্ষিত, দুপক্ষেরই সমান সমাদর লাভ করেছে। 1888 খ্রীষ্টাব্দে ওরই সঙ্গে ছিল ঐতিহাসিক উপন্যাসের সিরিজ প্রকাশনের ঘোষণা। এরই প্রথম গ্রন্থ 'মলিকুল-অজীজ ভার্জিনা'। উপন্যাসটি যেভাবে জনসম্বর্ধিত হয়েছে, তার উল্লেখ নিশ্চয়ই অপ্রয়োজনীয়। তবে এটুকু বলা দরকার যে এই উপন্যাসগুলির দৌলতেই দেশবাসীর চিত্তে তথ্য-সন্ধিৎসা ও গ্রন্থপাঠের আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে; এদের মাধ্যমেই ইতিহাসপাঠ ও বিশ্ববোধের চেতনা সঞ্জাত ও সঞ্চারিত হয়। এইসব উপন্যাস এবং 'দিলগুদায'এর পাতায়-পাতায় যে শৈলী জন্মগ্রহণ করেছে, সাম্প্রতিক উর্দূ সাহিত্যের ভিত্তি তারই ওপর প্রতিষ্ঠিত।

উর্দূ গদ্যের যে-অংশ প্রাচীন সাহিত্যিক শৈলীর উত্তরাধিকারী, তার জন্মভূমি লখনউ; আধুনিক শৈলীর জাতকপত্র লেখা হয়েছে দিল্লীতে। ঠিক কথা। তবে এই প্রচেষ্টায় লখনউ দিল্লীকে যথাসাধ্য সহায়তা দিয়েছে। বিশেষভাবে, হাস্যরসরুচিতে, যার জন্ম ও বিকাশ লখনউয়েই।

॥ 12 ॥

লখনউয়ে উর্দূ ভাষার যে বিকাশ, তা কেবলমাত্র কবি-সাহিত্যিক-গদ্যকার অর্থাৎ-লেখকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বিভিন্ন শ্রেণীর

ও সংস্থার মধ্যেও প্রসারিত হয়। ফলে, ভাষার প্রগতি, বিস্তার ও নতুন-নতুন সম্ভাবনা দেখা দিল-বেড়ে গেল সর্বশ্রেণীর মানুষের আনন্দ-উপভোগের ক্ষমতা।

প্রথমেই উল্লেখনীয়: 'দাস্তানগোঈ'—দ্রুত কবিতা রচনা[1]। ইসলাম-পূর্ব যুগের আরবে 'দাস্তানগোঈ'-সম্মেলনের আয়োজন হত। বস্তুত এটি ওখানকারই শিল্পকলা। তবে আরবী 'কিস্‌সাখোআনী'র সঙ্গে হিন্দুস্তানী 'দাস্তানগোঈ'এর কোন সম্বন্ধ আছে কি নেই, তা বলতে পারব না। 'দাস্তানগো'দের[2] প্রেরণা-উৎস আমীর হামজার 'দাস্তান' ফারসীতেই লেখা হয়েছিল। বলা হয়: শাহানশাহ আকবরের সময়ে আমীর খুসরো নামে একজন ব্যক্তি এটি লিখেছিলেন। অথচ, ইতিহাস সাক্ষী—তুগলক বংশের বাদশাহদের শাসনকালে আমীর হামজার দাস্তান বর্তমান ছিল।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ 'দাস্তান্'-লেখকদের লখনউ আসা শুরু হল। স্থানীয় 'আফীমচী'রা এঁদের এতো আদর-সম্মান জানালেন, যে, বিভিন্ন সম্মেলনে দাস্তান-শ্রবণ একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠল। অল্পদিনেই এমন চল্ হয়ে গেল, যে এমন কোন ধনীগৃহ ছিলনা, যার সরকারে অন্তত একজনও 'দাস্তানগো' নিযুক্ত হত না। ফলে, শত শত 'দাস্তানগো'র আবির্ভাব ঘটল। বিষয় ও ভাষার ওপর এদের ছিল সম্পূর্ণ অধিকার, এবং প্রতিষ্ঠা ছিল সীমাহীন, যা আজকালকার বড়ো বড়ো বক্তাদের বক্তৃতাতেও মেলে না। দিল্লীতেও দু একজন 'দাস্তানগো' এখনও আছেন; তবে সংখ্যাগুরুত্ব লখনউয়েই। এবং এঁদের বর্ণনা-শৈলীর প্রভাব শহরবাসীদের ভাষার ওপর পড়েছে। উপন্যাস-সাহিত্যে আকৃষ্ট হবার পর 'দাস্তানগো'দেরই মুখ থেকে 'দাস্তান' (কাহিনী) লেখানোর চেষ্টা শুরু হল। দক্ষ, অভিজ্ঞ 'দাস্তানগো' মোটা মোটা বই লিখে উর্দু পাঠকদের সামনে হাজির করলেন। তার মধ্যে 'জাহ' ও 'কমর'-এর রচনা অধিক সমাদৃত।

দাস্তানের চার লক্ষণ: রয্‌ম্, বয্‌ম্, অ্যায়ারী, হুস্‌ন্-ও-ইশক্'

---

[1] বাংলায় যেমন 'দাঁড়া'-কবিতা বা 'তরজা': অনু.। [2] দাস্তান-কবি।

(লড়াই-মত্ততা-কপটতা-সৌন্দর্য ও প্রেম)। এই চার পর্যায়েই লখনউয়ের 'দাস্তানগো'রা এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, যা না দেখলে, না শুনলে, বোঝা যায় না। শব্দ দিয়ে ছবি আঁকা, এবং সেই ছবি দিয়ে শ্রোতার চিত্তে গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার এঁদের উপস্থাপনার বড়ো গুণ।

সমাজিক আমোদ, প্রমোদ, হাসি ও বিনোদনের মাধ্যমেও উর্দু ভাষার কয়েকটি শৈলী ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এক্ষেত্রে, লখনউ একক না হলেও, অদ্বিতীয়। এদের মধ্যে একটি: 'ফাব্‌তী'। 'ফাব্‌তী' উপমাদি অলংকার সমৃদ্ধ। এর লক্ষ্য: ব্যক্তিকে বিকৃত করে দেখানো, তার অবগুণগুলি স্পষ্ট করে তোলা। তারই উপযোগী নিত্যনতুন, হাস্যোদ্দীপক উপমা, যা দোষগুলিকে মুহূর্তে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। লখনউয়ের নিম্নশ্রেণীর বালক, বারবণিতা, মুর্খ দোকানদার ও কারিগররা পর্যন্ত এমন 'ফাব্‌তী' ছাড়ত, বহিরাগতরা অবাক মানত। যথা: এক ব্যক্তি কারবালা[1] দর্শন-অন্তে ফিরে এসে বন্ধুদের মধ্যে সবেমাত্র বসেছে, পরিধানে ধব্‌ধবে শাদা কাপড়; একটা ছেলে বলে উঠল: "ফারাত[2]-এর বকটা কোত্থেকে এলো?" এক বুড়ো বর চুলে কলপ লাগিয়ে বিয়ে করতে এসেছে খুব ধুমধাম ক'রে। অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসরের দিকে আসছে; জুতো খোলবার জন্যে ঝুঁকে মেঝের ওপর বেশ কয়েক পা এগিয়েছে হাঁটু গেড়ে। কে একজন শুধোল: "বর কোথায়?" সামনেই এক চঞ্চলস্বভাবা রণ্ডী দাঁড়িয়ে মুজরা করছিল, হেসে বলল: "এ্যায়, ওহ ম্যাইয়েঁ ম্যাইয়েঁ চলা তো আতা হ্যয়্‌"—'ওইতো, হামা দিয়ে দিয়ে আসছে'! এক কবড়িয়া[3] চকে বেচছিল আস্ত আখ, আওয়াজ দিচ্ছিল: "অরে ভঙ্গী, ইয়ে কন্‌ক্যাওএ ক্যওন্‌ ক্যওন্‌ লুটেগা?"—'আরে ভাই, এই কন্‌কওআ[4] কে কে লুটে নেবে'?—এর চেয়ে চিত্ত-

---

[1] ইরাকে একটি প্রসিদ্ধ স্থান, যেখানে হযরত ইমাম হোসেন শহীদ হয়েছিলেন। এখানে তাঁর সমাধি আছে। [2] নদী। [3] পুরোনো, ভাঙ্গা জিনিস বিক্রেতা। [4] কাগজে ঢিল পুরে তৈরী প্যারাচুট; ফানুস।

বিনোদিনী অলংকার আর কী হতে পারে! অলংকারের সূক্ষ্মতা তখনই, যখন উপমানের কোন একটা বিশেষত্ব উল্লেখ ক'রে উক্তির মধ্যে বৈচিত্র্য আনা যায়। লোকটা না নিল আখের নাম, না নিল আঁকশির, যা দিয়ে ছেলেরা 'কন্‌ক্যওআ' লুট করে বা টেনে নেয়—এর চেয়ে বড়ো উদাহরণ আর কী আছে? হাটে বাজারের লোকেদের পক্ষে এর চেয়ে উপযুক্ত উপমা আর হতে পারে না। এইরকম অসংখ্য উদাহরণ এখানকার গোষ্ঠীতে উঠতে বসতে হামেশা শোনা যায়।

আর একটি হল: 'যিলা'[1]। আসলে 'যিলা' হল একটি অলংকার, হাস্যোক্তি ও লোকোক্তির সঙ্গে মিলে এক নতুন রূপ ধারণ করে। 'যিলা'র বৈশিষ্ট্য: বর্ণনীয় বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন সব জিনিস কোন-না-কোন সূত্রে নিয়ে আসতে হয়। 'যিলা'-কথনে আজাদ ফকীর ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর রং-ঢংই ছিল আলাদা। অন্যদিকে 'আমানত' অতিশয় যত্নবান অলংকার-প্রয়োগে; সে-কারণে তাঁর শাইরীতে অন্য কাব্যগুণ ছাপিয়ে অলংকারই সর্বাধিনায়ক। ফলে তাঁর রচনা কবিতা হয়ে উঠে নি, যিলাই থেকে গেছে। ঔপচারিকতা নেই এমন সব সম্মেলনে এই কলাকে এতোদূর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে 'আমানত' এর কবিতা পেছনে পড়ে গেছে। যিলা-বাচনে লখনউ আজও প্রথম সারিতে। এ-বিষয়ে একটি বইও বেরিয়েছে।

তৃতীয় শৈলী: তুক্‌বন্দী'—তুক মিলিয়ে কবিতা রচনা। পূর্ব-প্রস্তুতি ব্যতিরেকেই সওয়াল-জবাব ও অন্ত্যানুপ্রাসের প্রয়োগে অশিক্ষিত লোকেরাও মুখে মুখে যেভাবে তুক-বন্দী করে, বড়ো-বড়ো কবিরও তাক লেগে যায়। ছাত্রাবস্থায় আমি এক হিন্দু বুড়ীর বাক্‌-যুদ্ধ দেখেছি। বুড়ী রোজ সকালে ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বেরোত। দেখতে পেলেই রাস্তার ছেলেরা ঘিরে ধরত। পথের ওপরেই ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে বুড়ী বসে যেত। আরম্ভ হত ছেলেদের সঙ্গে তুক্‌বন্দীর লড়াই। সমস্ত ভীড় সরে যেত একদিকে। তারপর দুপক্ষে

[1] ব্যঙ্গোক্তি।

গালাগালির অঝোর বরিষণ। তবে শর্ত থাকত: তুকের বাইরে গালি দেওয়া চলবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তুক চলছে—এ আমি বহুবার দেখেছি। কিন্তু বুড়ীকে কখনও হারাতে দেখিনি। কেউ-না-কেউ তুক খুঁজে ওকে ধরিয়ে দিত।

এসবের ফলে সাধারণ লোকেদের কথোপকথন, হাস্যপরিহাসে নতুন-নতুন ভাব ও কল্পনা জন্ম নিত। অশিক্ষিত ব্যক্তিও এমন সব কল্পভাব প্রায়ই হাজির করত, প্রতিষ্ঠাবান কবিরাও চমকে উঠতেন। বাস্তবিক, এই সময়টা ছিল লখনউয়ের 'সুবর্ণ যুগ'। কবিতা ও সাহিত্যগুণ লোকেদের রক্তে-মজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল। অতি সাধারণ যে, সেও অল্প লেখাপড়া শিখেই কবিতা-চর্চা আরম্ভ করত। মুর্খ, নিম্নশ্রেণীর লোক এবং অন্তঃপুরিকাদের মধ্যেও কবি-ভাব ও শৈল্পিক কোমলতা লক্ষণীয় হয়ে উঠল। লেখাপড়া-না-জানা কবড়িয়ার মধ্যেও কবিত্ব ছিল। অশিক্ষিত ব্যক্তিদেরও ভাষা এতো শিষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও সুসংস্কৃত ছিল, লেখাপড়াজানা লোক অবাক মানত এদের সংলাপ শুনে। কেউ কল্পনাই করতে পারত না, বক্তা পড়াশোনার ধার দিয়েও যায় নি! এবং ফেরীওয়ালার হাঁকও এমন অলংকৃত, কাব্যময় ও উক্তিবৈচিত্র্যে ভরা ছিল, অন্যরা বুঝতেই পারত না—আসলে বলছে কী!

এতাদৃশ ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে নিম্নবর্গের লোকেরাও স্বকীয় রুচির অনুগামী একজাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল, প্রবচন-ভিত্তিক এক ধরণের শৈলী। না ভেবে, আগে থেকে তৈরি না করেই লোকেরা সভায় কবিতা লিখত, গাইত। প্রত্যেকেই নিজ-নিজ কল্পনা শক্তি দিয়ে একটা-না-একটা নতুন কিছু বলত। তাই এর নাম রাখা হল: 'খ্যয়াল' (খেয়াল)। খেয়ালের যারা মর্মজ্ঞ, উচ্চবিত্ত সমাজ বা শিক্ষিত সভার সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু তথ্যগত বিচারে এগুলি ছিল স্বাভাবিক ও বাস্তবিক কবিতা। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবেও এর সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

এইরকম আর একটি দল: 'ডাণ্ডেওয়াল্মা'। এঁদের বৈশিষ্ট্য: বিগত যুগের প্রসিদ্ধ ও মহৎ ঘটনাবলীকে এঁরা সুন্দরভাবে কবিতাবদ্ধ

করতেন। যতো ধনী ও প্রতিপত্তিশালীই হোন না কেন, যিনি যেমন তাঁকে সেইভাবেই নির্ভয়ে আঁকতেন ; প্রমাণ করতেন—তাঁকে দিয়ে দেশের কী লাভ বা কতোটা ক্ষতি হয়েছে। এই কবিতা পড়া হত একটা বিশেষ পদ্ধতিতে, সেই সঙ্গে ডাণ্ডা বাজানো হত।

প্রত্যেক দেশে ও জাতির মধ্যে পুরুষদের ভাষার চেয়ে মেয়েদের ভাষা অনেক পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয়। লখনউয়ের বিশিষ্টতা : এখানকার রাজপ্রাসাদের ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহামান্যা বেগমদের ভাষায় স্ত্রৈণ আকর্ষণের অতিরিক্ত একটি সাহিত্যিক কোমলতাও প্রস্ফুটিত হয়েছে। কথা বলতেন, মনে হত : মুখ থেকে ফুল ঝরছে !

গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় : শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগে, সুন্দর শব্দ-বিন্যাসে, এবং ব্যঞ্জনাশৈলীর অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল ভাষার কতোটা সমৃদ্ধি এই প্রদেশে ঘটেছিল।

॥ 13 ॥

লখনউয়ে আরবীর বড়ো-বড়ো ধুরন্ধর বিদ্বান জন্মগ্রহণ করেছেন। তৎসত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে দেশের উচ্চকোটি ধর্মগুরু ও নেতাদের মধ্যেই আরবী শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দুস্তানের দরবারী ভাষা ছিল ফারসী। চাকুরি পাবার জন্যে এবং সভাসমিতিতে প্রতিষ্ঠালাভের জন্যে ফারসী শিক্ষাকেই যথেষ্ট বলে মনে করা হত। শুধু অওধে নয়, গোটা হিন্দুস্তানেই ফারসী ছিল সাহিত্যিক ও নৈতিক প্রগতির সাধ্য-সাধন। মুসলমান তো বটেই, উচ্চ বর্গের হিন্দুদেরও সাধারণ প্রবণতা ছিল ফারসী সাহিত্যের অভিমুখে। এমনকি হিন্দুদের লেখনী থেকেই উচ্চকোটির ফারসী রচনা প্রসূত হয়েছে। টেকচাঁদ 'বহার' যে 'বহার-এ-অজম'এর মতো অতুলনীয় গ্রন্থটি লিখেছেন, সেটি ফারসী ভাষার এক অনুপম শব্দকোষ। এতে প্রতিটি 'মুহাবরা' বা প্রবচনের প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত কবিদের রচনা উদ্ধৃত হয়েছে। লখনউয়ের

প্রাথমিক উত্থানকালে মুল্লা ফায়ক, তারপর মির্জা 'কতীল'-এর নাম প্রসিদ্ধ ছিল। 'কতীল' ছিলেন 'নব-মুসলিম' ফারসীবিদ। তিনি নিজেই সহাস্যে বলতেন: "বু-এ-কবাব মরা মুসলমান কর্দ"—'কাবাবের গন্ধই আমাকে মুসলমান করেছে'। আসলে, ফারসীর শিক্ষা, তার প্রতি অনুরাগ এবং এই বিদ্যায় কৃতিত্বলাভের ইচ্ছাই তাঁকে মুসলমান হবার প্রেরণা দিয়েছিল। শুধু এই আশা পুরণের জন্যেই তিনি ইরানে গিয়েছিলেন; কয়েক বছর ধরে ভ্রমণ করেছিলেন শীরাজ, ইস্‌পাহান, তেহরান ও অজরবাইজান। ফারসী সাহিত্যে তাঁর এমন প্রতিষ্ঠা হয় যে খোদ ফারসীভাষীও যদি এই মহান ভাষাবিদকে ঈর্ষ্যা করেন তো আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

মির্জা গালিব যত্র-তত্র মির্জা 'কতীল'কে আক্রমণ করেছেন। অবশ্যই, মির্জা গালিবের ফারসী-জ্ঞান অনেক গভীর ছিল। একটি সিদ্ধান্তের ওপরেই তিনি বারবার জোর দিয়েছেন: 'ভাষা-বিশেষ যাঁর মাতৃভাষা, এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারও বক্তব্য প্রামাণিক বলে মান্য করা যায় না।' অথচ, সে-সময়ে অওধ থেকে বাংলা পর্যন্ত তাবৎ লোক ছিল 'কতীল'-এর অনুগামী, কথায়-কথায় তাঁর নাম করত। এই জন্যেই মির্জা গালিব প্রায়শই যুক্তি হারিয়ে আবেগ-পীড়িত হয়ে যেতেন। অতঃপর 'কতীল'-এর ভক্তরা যখন তাঁর সমালোচনা করতে লাগল, তখন তিনি বললেন:

ফ্যায়জে অয সোহবত-এ-কতীলম নীস্‌ত্‌
রশ্‌ক্‌ বর শোহরত-এ-কতীলম নীস্‌ত্‌
মগর আঁনা কি ফারসী দানন্দ
হম বরীন অহ্‌দ-ও-রাএ-প্যায়মানন্দ
কি যঅহল-এ-যুবাঁ ন বূদ কতীল
হরগিয অয ইসফহাঁ ন বূদ কতীল
লাজরম এতিমাদ রা ন সযদ
গুফ্‌তা অশ ইস্তনাদ রা ন সযদ
কী যুবান খাস অহল-এ-ঈরান অস্ত্‌

মুশকিল-এ-মা-ও-সহল-এ ঈরান অস্ত্
সুখনস্ত আশকার-ও-পিনহাঁ নীস্ত্
দেহলী-ও-লখনউ য-ঈরান নীস্ত্

'কতীল-এর সান্নিধ্যে উপবেশন ও তদ্দ্বারা লাভবান হওয়ার অবকাশ আমি পাইনি ; ওঁর খ্যাতিকেও আমি ঈর্ষ্যা করিনা ; ঈর্ষ্যা-দ্বেষ যদি করতেই হয়, তাহলে এমন লোকের বিরুদ্ধে করব, যাঁর মাতৃভাষা ফারসী ; কতীল-এর মাতৃভাষা ফারসী ছিল না ; কতীল নন ইস্পাহানবাসী ; সুতরাং তাঁর কাব্যকে প্রামাণিক বা বিশ্বাসযোগ্য বলে মানা যায়না ; কারণ, এ-ভাষা হল ইরানীদের—ওদের পক্ষে সরল, আমাদের পক্ষে কঠিন ; তাঁর কবিতায় ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন এমন-কিছু বক্তব্যও নেই ; যেহেতু, দিল্লী ও লখনউ ইরানের শহর নয়।'

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত থেকে একথা প্রমাণিত হয়না, যে, ফারসী জ্ঞানলাভের জন্যে 'কতীল' যে যত্ন নিয়েছিলেন এবং এই ভাষায় দক্ষতা অর্জনের জন্যে সারাটা জীবন যেভাবে কাটিয়ে দিয়েছিলেন, সবই বৃথা গেছে ! একথা অবশ্য সকলেই মানবেন, যে, যতক্ষণ না কোন ফারসীভাষী পণ্ডিতের প্রশংসাপত্র পাওয়া যাচ্ছে, 'কতীল'-এর কোন দাবিই স্বীকৃত হতে পারেনা। খোদ 'কতীল'ও তেমন কথা ভাবেননি। কিন্তু এ-তো কেবলমাত্র 'কতীল'-এর ক্ষেত্রে নয়, উল্লিখিত অনুমোদনের অভাবে হিন্দুস্তানের কোন ব্যক্তিই প্রামাণিক হতে পারেন না। খোদ মির্জা গালিবও কোন ইরানীর প্রমাণ ছাড়া কোন ফারসী 'মুহাবিরা'[1] ব্যবহার করতে পারতেন না। বস্তুত, হিন্দুস্তানের ফারসীবিদদের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে, ফারসী কাব্যে তাঁদের গভীর অধ্যয়ন, এবং কোন্ কোন্ জায়গায় ফারসী শব্দের ঠিক-ঠিক প্রয়োগ হতে পারে, তার জ্ঞানের ওপর। সত্যি বলতে কি, গালিবের তুলনায় 'কতীল' অনেক বেশি প্রামাণিক। গালিব আজীবন হিন্দুস্তানেই কাটিয়েছেন, ব্যস্ত থেকেছেন জীবিকা-অর্জনে। 'কতীল'-

[1] প্রবচন-বাক্য ; ইডিয়ম

এর জীবন কেটেছে নিশ্চিন্ত সুখে, এবং তিনি বহু বছর ইরানে থেকে তার গ্রামে-গ্রামে ঘুরেছেন।

সে যাই হোক, লখনউয়ে ফারসী-জ্ঞানের সূত্রপাত শ্রীগণেশ 'কতীল' থেকে। তাঁর কিছু আগে মুল্‌লা ফায়ক—যাঁর পূর্বপুরুষ আগ্রা থেকে এসে লখনউয়ের আশেপাশে বাসা বেঁধেছিলেন—ফারসী গদ্যে-পদ্যে যে উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার তুলনা হয়না। তাঁরও আগে হিন্দুস্তানে ফারসীভাষী ও ফারসীবিদ ছিলেন। কিন্তু ফারসীজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে ওই ভাষার তত্ত্ব ও ব্যাকরণ রচনার শখ প্রথমে লখনউতেই উপ্ত হয়েছিল। এবং তা হয়েছিল এঁরই লেখনীর মাধ্যমে।

এর পর থেকে ফারসী শিক্ষা সর্বজনীন হয়ে উঠল। কিন্তু তার পাঠ্যক্রম এতো কঠিন ছিল, খোদ ইরানেও তেমন নয়। সব দেশেই থাকে সোজা সরল ভাষা, যাতে বক্তব্যকে স্পষ্ট করা যায়। ইরানেও তাই ছিল। পাঠ্যক্রমও সেইমতো। কিন্তু হিন্দুস্তানে 'উর্ফী', 'ফ্যয়যী' এবং নেমতখান-এ-আলীর মতো সূক্ষ্মকল্পনার কবিদের কাব্যও পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানে মুল্লা 'তুগ্‌রা' এবং 'পঞ্জরুক্‌কা'র মতো দুরূহ কবিদের কবিতা পড়া ও পড়ানো হয়। এথেকে দাবি করা যায়ঃ হিন্দুস্তানের ফারসী ভাষার জ্ঞান ইরানের চেয়েও অনেক বেশি ছিল। তাই, এখানকারই লেখক ফারসী পাঠ্যপুস্তকের যে টীকা লিখেছেন, তা প্রথম শ্রেণীর। কিন্তু এ-সমস্তের পরিণাম কী হল? যখন দুনিয়ার তাবৎ ভাষার কবিগোষ্ঠী মাতৃভাষার চর্চাতেই সীমিতগণ্ডী, তখন যদি কেউ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় কবিতা লেখেন, তাহলে ওই ভাষাভাষীরা তাঁকে মানতে চায়না! হিন্দুস্তানের ফারসী কবির সংখ্যা ইরানী কবিদের চেয়ে বেশি যদি নাও হয়, অন্তত তার সমান—বিশেষত, বিগত শতকে. যখন প্রগতি ও শিক্ষায় লখনউ সর্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল, যখন এখানকার শিশুরাও ফারসী বলত। মূর্খ, বেশ্যা, বাজারের মজুরদের জিহ্বায় তখন ফারসী গজল ছিল আরূঢ়; ভাঁড়েরা পর্যন্ত ফারসীর নকল

করত। অওধের নগর-নগরীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জীবিকা ছিল ফারসী পড়ানো। এমন কতো দেহাতী বিদ্বান ফারসী অধ্যাপক লখনউয়ের অলিতে-গলিতে সেদিন ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াতেন, যাঁদের ফারসী-জ্ঞান খোদ ইরানীদেরও চমকে দিত। তাঁদের 'লবো-লেহাযা' (উচ্চারণ) ইরানীদের মতো না হতে পারে, কিন্তু ফারসী প্রবচন কথনে, শব্দের বিন্যাসে ও প্রয়োগে তাঁরা এতো দক্ষ ছিলেন যে সাধারণ ইরানীরা এই ফারসীবিদদের কথা কিছুই বুঝতে পারত না।

লখনউয়ের ফারসী-প্রীতি কতোখানি সমৃদ্ধ ছিল, তার পরিচয় এখানকার উর্দু ভাষা থেকেই পাওয়া যায়। অশিক্ষিত এবং নারীদের জবানেও ফারসীর সন্ধি-কারক-শব্দবিন্যাস আজও বিদ্যমান। লখনউ-ভাষার বিরুদ্ধে যাঁরা আক্রমণোদ্যত, তাঁরা যদি আপত্তির কোন কারণ এতোদিনে পেয়ে থাকেন, তা হল—এই ভাষায় প্রয়োজনের চেয়েও বেশি ফারসী শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কিন্তু এটাই আবার লখনউ-ভাষার ঔৎকর্ষ্য এবং এখানকার সমাজের উন্নতির কারণ ছিল। খোদ দিল্লীতে উর্দু ভাষার বিবর্তনের যতো পর্যায়ই করা হোক না কেন, ওখানেও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু এই যে—প্রথম দিকের চেয়ে শেষ দিকেই ফারসীর প্রভাব অধিক।

মুসলমানদের মতো হিন্দুরাও ফারসীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুগল রাজত্বের প্রারম্ভিক কাল থেকেই হিন্দুদের ফারসী-প্রীতি প্রকট হতে থাকে। তখন লখনউয়ে ও তার আশেপাশে যতো প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ফারসীবিদ হিন্দু ছিলেন, এমন আর কোথাও ছিল না। কায়স্থ ও কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ ফারসী-শিক্ষাকে অত্যাবশকীয় বলে মনে করতেন। এরা এতোদূর পর্যন্ত উন্নতি করেছিলেন, যে, কাশ্মীরী পণ্ডিতের মাতৃভাষাই হয়ে গেল উর্দু। এবং এঁদের ও মুসলমানদের ফারসী-জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যও খুব বেশি রইল না। যেহেতু, কায়স্থরা এখানকারই অধিবাসী, তাই তাঁদের জবান বা কথ্যভাষা ছিল 'ভাষা' (খড়ী বোলী)। কিন্তু ফারসী-শিক্ষায় পরিপক্কতার

ফলে এঁরা ফারসী প্রবচন-বাক্যের অবাধ ব্যবহার করতে পারতেন। একথা অন্য কোন অঞ্চলের হিন্দুদের সম্বন্ধে বলা চলে না। তখনকার দিনে লোকেরা কায়স্থদের ভাষা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত। সত্যি বলতে—এটা করত নিছক মজার জন্যে। আসলে, কদরই করত। যেহেতু, তাঁদের ভাষা ছিল তাঁদের শিক্ষাগত প্রগতির দ্যোতক। ঠিক যেমন, ইংরেজী শব্দের উচিত-অনুচিত প্রয়োগকে আজকালকার ইংরেজীনবীশরা উন্নতির প্রমাণ বলে মনে করে, এবং তারপরেও—নিজেদের ভাষায় বেপরোয়া ভাবে ব্যবহার করে ওই ইংরেজী শব্দই!

সেকালের লখনউয়ে অসংখ্য ফারসী কবি ও গদ্যলেখক বিদ্যমান ছিলেন। উর্দূর মতো ফারসী 'মুশাইরা'ও (কবি-সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হত নিয়মিতভাবে। ফারসী শুধু ওপরতলার নয়, জনসাধারণেরও ভাষা হয়ে গিয়েছিল। কালক্রমে ফারসী আর দরবারী ভাষা রইলনা ; সে জায়গা নিল উর্দূ। তবু, আজও সভ্য সমাজে ফারসীর প্রভাব বিদ্যমান। ফারসী মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কৃত, জীবিকা অর্জনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। তবু, ফারসী না পড়লে মানুষ সভ্য সমাজে বসবার যোগ্য হয় না, সত্যিকারের সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।

একদা ইংল্যণ্ডে ফরাসী ছিল দরবারী ভাষা। বেশ কিছুদিন হল, দরবার থেকে সে ভাষা বহিষ্কৃত হয়েছে। তবু, ফরাসী না শিখলে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক প্রগতি অসম্ভব প্রত্যাশা। খাওয়া-পরা ওঠা-বসা, হাসা-বলা, পোষাক-পরিচ্ছদ, জীবনের সমস্ত রীতি-নীতির ওপর ফরাসীর সাম্রাজ্য আজও অমলিন। এ-ভাষা না শিখলে মেয়েরা হতে পারে না ভদ্রমহিলা। লখনউয়েও একই অবস্থা—ফারসী আজ আর দরবারে নেই, পত্র-ব্যবহারে নেই, তবু সমাজের সকল স্তরে তার আধিপত্য আজও সমভাবে বিদ্যমান। ফারসী না শিখলে আমাদের রুচি পরিশুদ্ধ হয়না, সুন্দর হয়না আমাদের কথা-বলার ভঙ্গি।

শেষ ও অভাগা অওধ-পতির সঙ্গে যাঁরা মেটিয়াবুরুজে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে এমন একজনও শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি ফারসী

জানতেন না। দফতরের ভাষা ছিল ফারসী। একশোরও বেশি হিন্দু-মুসলমান ফারসী কবি ছিলেন। স্ত্রীলোকরাও ফারসীতে কবিতা লিখত। বাচ্চা-কাচ্চারা মনোভাব ব্যক্ত করত ফারসীতেই।

সম্প্রতি লখনউয়ে ফারসীর শিক্ষা কমে গেছে। হিন্দুরাতো ছেড়েই দিয়েছে, এবং এমনভাবে দিয়েছে—যে 'কায়স্থ-ভাষা' নিয়ে এতো উপহাস করা হত, ভাঁড়রা নকল করত, সে ফারসী-ঘেঁষা ভাষাও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবু প্রাচীন 'বুযুর্গ' (জ্ঞানবৃদ্ধ) বিশেষত মুসলমানদের মধ্যে ফারসী-প্রীতি এখনও লক্ষ্যগোচর হয়। তার কারণ, উর্দূর জন্যে তাঁদের কিছুটা-ফারসী-সাধনা করতে হত। 'উর্দূদানী'ই[1] ছিল 'ফারসীদানী'র[2] সাধন।

তাই, মুসলমানদের মধ্যে এখনও ভারতপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত খোজা আজীজউদ্দীন সাহেবের মতো ফারসী গবেষক রয়েছেন, যাঁর কৃতিত্ব সেকালের সাহিত্য-গোষ্ঠীকে স্মরণে আনে। বৃদ্ধ হিন্দুদের মধ্যেও ফারসীর অনেক পণ্ডিত আছেন, যার একটি দৃষ্টান্ত সন্দেলার রাজা দুর্গাপ্রসাদ। সময় বদলে গেছে, আবহাওয়া বদলে গেছে, আসমান-জমিন বদলে গেছে, কিন্তু তিনি আজও সেই তিনিই আছেন। এইখানেই তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব। ফারসীদানীর সমাদর ও তার আদানপ্রদানের জীবন্ত প্রতীক তিনি; যেন, প্রাচীন ইতিহাসের একটি কীটদষ্ট পৃষ্ঠা: চুমু খাওয়ার, স্বাদ-গ্রহণের, নয়নের মণি করে রাখার যোগ্য।

॥ 14 ॥

'খুশনবীসী' অর্থাৎ সুন্দর ছাঁদে অক্ষর-লেখাও একটি কলাবিদ্যা। মুসলমানদের পুরনো লিপি ছিল আরবী, যাকে বলা হয়: 'নস্‌খ্‌'। বাগদাদী খিলাফতের সময় থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত তামাম ইসলামী

[1] উর্দূনিষ্ঠা। [2] ফারসীনিষ্ঠা।

দুনিয়ার পূবে-পশ্চিমে এই লিপিই ব্যবহৃত হত। হীরার[1] প্রাচীন লিপি থেকে 'কূফী', এবং 'কুফী' লিপি থেকে 'নস্‌খ্‌' লিপির বিবর্তন। তাহিরিয়া বংশের রাজত্বকাল থেকে বাগদাদের সমস্ত বিদ্যা ও কলায় এই লিপি ব্যবহৃত ও বিকশিত হতে থাকে। সেখান থেকে আসে ইরান ও খোরাসানের দিকে। বেলমী ও সলজূকদের[2] সময়ে বাগদাদের অধিকাংশ শিল্প ইরানে সমাহৃত হয়েছিল। বিশেষ ক'রে, বেলমীদের বিদ্যাশক্তি এবং আমোদপ্রমোদ চর্চার ফলে ইরানের পশ্চিম প্রান্তে, ইরানী-ইরাক ও আরবী-ইরাকের মাঝখানে স্থিত আজারবাইজান যাবতীয় উন্নতি ও ঔৎকর্ষ্যের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

এইখানেই লিপি সর্বপ্রথম নবরূপ পেতে লাগল। 'খুশনবীস' তথা লিপিকরদের আওতা থেকে বেরিয়ে 'নক্‌কাশ' বা নক্‌শাকারদের এলাকায় এল, এবং চিত্রকলা-উপম সূক্ষ্মরেখিনী হয়ে উঠল। ইরানীরা ছিল সৌকুমার্য প্রিয়; আরবী লিপির পুরনো সরল রূপ তাদের চোখে মনে হল: কুরূপা। ফলে, প্রাচীন 'লীক' (লিখন-প্রথা) অপসৃত হতে লাগল। নস্‌খ্‌-এ, অক্ষর ও শব্দের নির্মাণে, গোড়া থেকে শেষ অবধি কলমের চাল-চলন একই রকম থাকত। ফলে, অক্ষরের মোচড় সমান হত না, আকার হত অসমান; বৃত্তগুলি গোল হত না, নীচু ও চ্যাপ্‌টা হত, এদিক ওদিকে কোণ বেরিয়ে যেত। এখন 'নক্‌কাশী' ও 'খুসনবীসী' (নক্‌শার কাজ ও লিপিকার্য) একত্র মিশিয়ে আখরগুলি সুগঠিত হয়ে উঠতে লাগল; বৃত্তাক্ষররাও অতঃপর গোল ও সুন্দর হতে লাগল। এই আধুনিক প্রথাকে ভিত্তি করে বেলম-বাসী মীর আলী 'তব্রেযী'ই এই লিপি-শিল্পকে সর্বপ্রথম নিয়মিত রূপ দান করেন ও পূর্বাঞ্চলীয় শহরগুলিতে প্রচার ও প্রচলন করেন। তিনি এর নাম রাখেন 'নস্তালীক' অর্থাৎ 'নস্‌খ্‌-তালীক' অর্থাৎ নস্‌খ্‌-এর পরিশিষ্ট।

[1] দক্ষিণ আরবের একটি জেলা। [2] দুটি রাজবংশ, যারা ইরানে রাজত্ব করেছিল।

মীর আলী 'তব্রেযী' কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন, জানা যায়না। অধুনাতন লখনউয়ের বিখ্যাত ও সম্মানিত 'খুশনবীস' (অক্ষর-লেখক) মুনশী শম্‌সুউদ্দীন সাহেব এঁকে তৈ্যমূরের পূর্ববর্তী বলে মনে করেন। কিন্তু 'নস্তালীক'-এর এতো পুরানো পুঁথি পাওয়া যায়, যে, তৈ্যমুর তো দূরের কথা, আমার মনে হয়: এই লিপির আবিষ্কার মহমুদ গজনভীরও আগে হয়েছে। সন্দেহ নেই, মহমূদের আক্রমণের সঙ্গে-সঙ্গেই ফারসী 'খুশনবীসরা' হিন্দুস্তানে আসতে আরম্ভ করে। এদের প্রভাবে এখানে এই লিপি প্রচলিত হয়, এবং অচিরেই হিন্দুস্তানের প্রত্যেক রাজ্যে, প্রতিটি জেলায় সংখ্যাগণনার অতীত নস্তালীক-রীতির অক্ষর-লেখক আবির্ভূত হয়। সুতরাং, হয় মীর আলী 'তব্রেযী' আরও পুরনো যুগের, আর না হয়, তিনি এই লিপির আবিষ্কারক নন। এদিকে, দিল্লী, লখনউ, সারা হিন্দুস্তানের লিপিকররা তাঁকে আদি গুরু বলে আজও মনে করে। তাঁর অনেক পরে, ইরানে প্রসিদ্ধ ছিলেন জনপ্রিয় 'নস্তালীক'-গুরু মীর ইমাদুল হাসনী। তাঁর ভাগিনেয় আগা আবদুররশীদ ব্যলী নাদিরশাহের আক্রমণের সময়ে হিন্দুস্তানে আগমন করেন ও লাহোরে বাস করতে থাকেন। লাহোরে তাঁর অনেক শিষ্য ছিল। তারা হিন্দুস্তানের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এবং প্রমাণ করে: আগা আবদুররশীদ এখানকার 'খুশনবীসী'র "আদম" [1] না হলেও "নূহ" [2] অবশ্যই।

এঁর দুই বিদেশী শিষ্য হাফিজ নূরুল্লা এবং কাজী নেমতউল্লা লখনউয়ে আসেন। কথিত আছে, এঁর আর-এক সাগরেদ আবদুল্লা বেগও এখানে এসেছিলেন। তখন বোধহয় নবাব আসফউদ্দৌলা বাহাদুরের শাসনকাল, যখন কোন কলাকার তথা শিল্পী এখানে এলে আর ফিরে যেতে পারত না। এখানে পদার্পণ করেই কাজী নেমতুল্লা কাজ পেয়ে গেলেন—শাহজাদাদের হাতের লেখার সংস্কার-

---

[1] সৃষ্টির আদিতে প্রথম মানুষ। [2] প্রলয়ের পরবর্তী প্রথম মানুষ—পয়গম্বর নোয়া।

সাধন। হাফিজ নুরুল্লাও অওধ-দরবারের সঙ্গে যুক্ত হলেন। দুজনে মিলে স্থানীয় ছাত্রদের লিপি-লেখন-শিল্প শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন।

এখানে তখন আরও অনেক লিপি-লেখক ছিলেন। একজন তো, বৃদ্ধ, জনপ্রিয় মুনশী মুহম্মদ আলী। কিন্তু আগা আবদুররশীদের শিষ্যরা এমন জমিয়ে নিয়েছিলেন, 'খুশনবীসীর' যতো শৌখীন ব্যক্তি, তথা গোটা শহরই এঁদের প্রতি তখন আকৃষ্ট। যারই হাতের লেখা সুন্দর করার শখ হয়, এঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। যোগ্যতা ছিল বলেই এঁরা এইরূপ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। অন্যদিকে, প্রাচীন লেখক ও লেখনরীতি অবসিত, ডুবে গেল বিলুপ্তির অথৈ সাগরে।

হাফিজ নূরুল্লা লখনউয়ে যে কদর পেয়েছিলেন, সরকারী চাকরি দিয়ে তার পরিমাপ হয় না। তার আন্দাজ পাওয়া যায় লোকসমাজে, যারা তাঁর 'কিত্‌আ' (হাতেলেখা পুঁথি) মতির দামে কিনে নিত। তাঁর সামান্য একটা লেখাও বাজারে হাতে হাতে বিক্রী হয়ে যেত অক্ষরপিছু এক টাকা হিসেবে !

তখনকার দিনে, আমীর ও শৌখীন লোকরা বাড়ি সাজাত— 'তস্‌বীর' (ছবি বা মূর্তি) দিয়ে নয়—এইসব 'কিত্‌আ' বা পুঁথি দিয়ে। এইজন্যেই এর এতো চাহিদা ছিল। কোথাও একজন ভালো 'খুশনবীসের' হাতের একটা 'কিত্‌আ' পাওয়া গেল তো, সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ত আলোর পোকার মতো ; হাতে পেলে, নয়নের মণি করে রাখত। এথেকে লাভ হত সমাজের : চোখের সামনে সর্বদাই থাকত উপদেশ-বাক্য, নীতি-কথা, ঘরে সবসময়ে নীতি-পাঠ। 'খুশনবীসদের' লাভ : ভালো মোটা চক্‌মকে কাগজে শুধু কিত্‌আ লিখেই ঘরে বসে প্রচুর অর্থোপার্জন ; আর-কিছু করার প্রয়োজন হতনা।

দুঃখের কথা, হিন্দুস্তান থেকে 'কিত্‌আ' ও 'কত্‌বা' (শিলালেখ), দুইয়েরই রেওয়াজ উঠে যাচ্ছে। তার স্থান নিয়েছে 'তস্‌বীর'—ছবি

ও মূর্তি। গৃহসজ্জার এই প্রাচীন সভ্য ও সুসংস্কৃত রুচির অবলোপের সঙ্গে 'খুশনবীসী'-কলাও এখান থেকে তিরোহিত হয়েছে। এখন শুধু অক্ষর-লেখক 'কাতিব' আছে, অক্ষর-শিল্পী 'খুশনবীস' নেই। যে-দুএকজন আছে, তারা বাধ্য হয়ে 'কপিনবীশী' (কপিরাইটিং) ও 'কিতাবত'[1] ক'রেই পেট চালায়। এ কাজ 'খুশনবীসীর' স্বধর্ম-বিরোধী। এর বিরুদ্ধে খুশনবীসদের একটা সংগঠন গড়ে উঠেছিল, যার লক্ষ্য ছিল : 'খুশনবীসী' বিদ্যার নিয়মাদি যথাযথ পালন ও তার সময়োচিত বিকাশ-সাধন। প্রাচীন লিপি-লেখক 'কিতাবত'-এর কাজকে স্বমর্যাদার বিরোধী বলে মনে করত। এবং এও জানত : যে-ব্যক্তিকে একটা গোটা 'কিতাব' বা বই কপি করতে হয়, তার পক্ষে আদ্যন্ত 'খুশনবীসী'র নিয়মাদি পালন অসম্ভব। বস্তুত, এক-একটা 'বাসলী' (লিপি-লেখন) প্রস্তুত করতে যে-পরিমাণ পরিশ্রম করতে হত, একটা পুরো বই লিখতে গিয়ে প্রেসের 'কাতিব' তার লেশমাত্রও করতে সক্ষম হত না। তাই সেদিন ওই দলটি গড়ে উঠেছিল।

এই মেহনতের একটা আন্দাজ পাওয়া যায় একটি কাহিনী থেকে। নবাব সাদত আলী খাঁ একবার হাফিজ নূরুল্লাকে ফরমাইশ করলেন : "আমাকে 'গুলিস্‌তাঁ'[2]-র একটা 'নুস্‌খা' (নকল) লিখে দিন।" নবাব সাদত আলী খাঁ কবি সাদীর 'গুলিস্‌তাঁ'র খুব ভক্ত ছিলেন ; শোনা যায়, তাঁর মাথার কাছে সবসময়ে 'গুলিস্‌তাঁ' বিরাজ করত। আর কেউ এমন ফরমাইশ করলে হাফিজ নূরুল্লা অপমানিত বোধ করে তার মাথাই হয়তো ভেঙ্গে দিতেন। কিন্তু বলছেন স্বয়ং শাসক। সুতরাং অনুরোধ মেনে নিলেন এবং আরজি পেশ করলেন : "তাহলে আমাকে আশী 'গড্‌ডী'[3] কাগজ একশো 'কলমতরাশ'[4] ছুরি, এবং, খুদা জানেন কতো হাজার, কলমের জন্যে 'নরকট'[5] আনিয়ে

[1] লিথো প্রেসের জন্যে লেখার কাজ।

[2] ফারসী কবি শেখ সাদীর কথাসংগ্রহ। [3] রিম।

[4] কলমকাটা। [5] খাগ।

দিন।" সাদত আলী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "শুধু একটা গুলিসৃতাঁর জন্যে এতো জিনিস দরকার?" জবাব দিলেন: "জী হাঁ, এইরকম জিনিসই আমার লাগে।" নবাবের পক্ষে এইসব জিনিস সংগ্রহ করা কিছুই মুশকিল নয়, আনিয়ে দিলেন। হাফিজ সাহেব গুলিসৃতাঁ-লেখা শুরু করলেন। কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। সাত অধ্যায় পর্যন্ত লিখেছেন, অষ্টম অধ্যায় তখনও বাকি,' অকস্মাৎ তাঁর দেহান্ত হল। অতঃপর তাঁর পুত্র হাফিজ ইব্রাহীম দরবারে উপস্থিত হলেন। সমবেদনা-স্বরূপ তাঁকে দেওয়া হল কৃষ্ণবর্ণের খিলাত। তারপর সাদত আলী খাঁ বললেন: "ভাই, হাফিজ সাহেবকে দিয়ে আমি গুলিসৃতাঁ লেখাচ্ছিলাম। খুদা জানেন, তার কতোদূর কী হয়েছে!" পুত্র হাফিজ ইব্রাহীম নিবেদন করলেন: "সাত অধ্যায় পর্যন্ত তিনি লিখে তৈরি করে রেখে গেছেন; অষ্টম অধ্যায় শেষ হতে পারেনি। সেটি এই অকিঞ্চনই লিখে দেবে, এবং এমন করে বানিয়ে দেবে যে, হুজুর তফাৎ করতে পারবেন না। তবে হ্যাঁ, কোন মিশরী 'খুশনবীস' দেখলে অবশ্যই চিনতে পারবে।" নবাব অনুমতি দিলেন। হাফিজ ইব্রাহীম 'গুলিস্তাঁ' শেষ করে দিলেন।

হাফিজ নূরুল্লার যেসব শিষ্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন তো তাঁর ছেলে হাফিজ মুহম্মদ ইব্রাহীম। অন্যজন ছিলেন মুন্‌শী সরব সিংহ নামে এক হিন্দু বৃদ্ধ। কেউ বলেন, ইনি কায়স্থ ছিলেন, কেউ বলেন, কাশ্মীরী পণ্ডিত। তৃতীয়জন লখনউয়ের 'খুশনবীস' মুহম্মদ আব্বাস। হাফিজ ইব্রাহীমও খুব নাম করেছিলেন, এবং শত-শত ব্যক্তিকে খুশনবীস করে দিয়েছিলেন। পিতার ধারা থেকে ভিন্ন এক নবীনতার সৃষ্টি করে এই কলাকে তিনি গরিমামণ্ডিত করেছিলেন। হাফিজ নূরুল্লার 'দায়রা' (বৃত্তাক্ষর) গোল হত; হাফিজ ইব্রাহীম তাকে অনেকটা সাধারণ ডিমের মতো করে দিলেন। মুন্‌শী সরব সিংহ প্রসঙ্গে বলা হয়: গুরুর কায়দাকে তিনি এমন রপ্ত করেছিলেন যে, শত-শত বাসলী বাজারে ছেড়েছিলেন হাফিজ

নূরুল্লার নামে। বড়ো-বড়ো 'খুশনবীসরাও' আসল-নকল ধরতে পারেননি! এ-ধরণের কাজ সেদিনকার খুশনবীসদের একটা বড়ো কৃতিত্ব ছিল।

হাফিজ ইব্রাহীমের খাস সাগরেদদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য: তাঁর 'সাহেবজাদা' (পুত্র) হাফিজ সঈদউদ্দীন। মুনশী নামীর হামীদ, মুনশী আবদুল মজীদ নিযুক্ত ছিলেন 'শাহী হুকুম' এবং (ইংরেজ সাম্রাজ্য ও অওধ-রাজ্যের মধ্যে) পত্র-লেখায়। তবে, সর্বাধিক খ্যাতি ছিল অন্য দুজন শিষ্যের, যাঁরা সমকালীন লখনউয়ের ওস্তাদ বলে গণ্য হয়েছিলেন: একজন, এই কলায় দক্ষ কাশ্মীরী পণ্ডিত মুনশী মনসা রাম; অন্যজন মুনশী মুহম্মদ হাদী আলী—ইনি 'নস্তালীক' ছাড়া 'নস্‌খ্‌' এবং 'তুগরানবীসী'[1]-তেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

অন্যদিকে, কাজী নেমতউল্লার শিষ্য ছিলেন তাঁর পুত্র মৌলভী মুহম্মদ আশরফ এবং আর একজন মৌলভী কুল এহমদ।

এঁরাই ছিলেন 'নস্তালীকের' দক্ষ শিল্পী, যাঁরা 'খুশনবীসী'কে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। ছাপাখানা চালু হবার পর 'কপিনবীশী' ও 'কিতাবত'এরও প্রগতি হয়। এবং এঁদেরই অবদানের ফলস্বরূপ লখনউয়ের হাজার হাজার মুসলমান, শতশত কাশ্মীরী পণ্ডিত, এবং সহস্রাধিক কায়স্থ—যারা নওবস্তা ও আশরফাবাদে গিজ্‌ গিজ্‌ করছে—'খুশনবীস' হয়ে গিয়েছিল। দুঃখের কথা, এই কাজের গুরুত্ব কমে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এবং ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহে কাশ্মীরী পণ্ডিতেরা এই কলাশিল্পকে পরিত্যাগ করেছে। এখন, ভালো অক্ষর-লেখক বলতে, হয় মুসলমান অথবা কায়স্থ।

শেষদিকের নামকরা 'খুশনবীস' ছিলেন সন্দেলার মুনশী আবদুল হাঈ। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন: মুনশী আমীর উল্লা 'তসলিম',

---

[1] এক ধরণের লেখন, যাতে কোন আকৃতি রূপ নেয়; বাদশাহী ফরমানে শাহী অভিবাদন, সম্বোধনাদি লেখার আর্ট।

তাঁর বড়ো ভাই মুন্শী মুহম্মদ আবত্নল লতীফ এবং মুনশী আশরফ আলী, প্রভৃতি। বর্তমানে, 'নস্তালীক'-এর নামজাদা শিল্পী হলেন মুনশী শমসউদ্দীন সাহেব এবং 'নস্‌খ'-এর শিল্পী মুনশী হামিদ আলী সাহেব। ত্নজনেই মুনশী হাদী আলী সাহেবের শিষ্য।

হিন্দুস্তানে 'নস্‌খ্'-লেখা প্রসঙ্গে যাঁরা স্বনামখ্যাত, তাঁদের মধ্যে প্রথমজন 'ইয়াকুত মুস্‌তাসী' উপনামে খ্যাত, যাঁকে বলা হয় 'প্রথম ইয়াকুত'। কিন্তু 'মুঅত্‌সিম বিল্লা'র সমসাময়িক এই নামের কোন বিখ্যাত 'কতিব' আমার নজরে পড়ে নি। আশ্চর্যের কথা—হয়তো, হয়তো নয়—এ নামের ইঙ্গিত কি ইমাদ কাতিব, যাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'খরীদা', এবং যিনি প্রথমে সীরিয়ায় স্থলতান অতাবক নুরুদ্দীন জংগীর, এবং পরে মিশরে 'বেতুলমুকদ্দস' [1] বিজেতা স্থলতান সলাহ-উদ্দীন আইয়ূবীর 'কাতিব' ছিলেন? 'নস্‌খ্'-এর শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ 'খুশনবীস' ইনিই; তাই এই অনুমান। স্থলতান আওরংগজেব আলমগীরের শাসনকালে প্রখ্যাত ও দক্ষ 'নস্‌খ্'-লেখক মুহম্মদ আরিফ 'ইয়াকত-রকম-এ-সানী' খেতাব-পেয়েছিলেন। সাধারণভাবে বলা যায়, ইনি 'নস্‌খ'-এর নব-রূপ আবিষ্কার করেন, এবং প্রথম চেষ্টাতেই তাকে স্থন্দর করে তোলেন। লখনউয়ের 'নস্‌খ্'-শিল্পী এমনও দাবি করেন যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সমস্ত ইসলাম-ত্নিয়া স্বীকার করে নিয়েছে। একথা মেনে নিতে আমি প্রস্তুত নই। হিন্দুস্তানে 'ইয়াকুত-রকম--এ-সানী'র মহত্ত্ব যতোই থাক, যে-দেশে 'নস্‌খ্' হচ্ছে জাতীয় লেখন-পদ্ধতি এবং আরবী রাষ্ট্রভাষা, সেখানকার লোক ইয়াকুত রকম-এর নামই শোনে নি, তাঁর অনুগমন তো দূরের কথা!

মুহম্মদ আরিফ 'ইয়াকুত রকম'-এর সমকালে আবত্নল্ বাকী নামে এক ব্যক্তি ছিলেন যাঁর পেশা ছিল লোহার কাজ। 'ইয়াকুত রকম'-এর জনপ্রিয়তা দেখে তাঁরও এই শিল্পে নাম করার শখ হল। ওই সময়ে আবত্নল্লা তব্বাহ নামে 'নস্‌খ্'-এর আর একজন বিখ্যাত

'খুশনবীস' ছিলেন। লৌহকার তাঁর শিষ্য হলেন এবং প্রাণপণ পরিশ্রম করে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠলেন। পরবর্তীকালে, ইয়াকুত রকমের স্থান নিলেন তাঁর ভাইপো কাজী আসমতউল্লা। লুহারের স্মৃতি অম্লান রাখলেন তাঁর দুই পুত্র আলী আকবর ও আলী আসগর।

অতঃপর হিন্দুস্তানে বড়ো বড়ো খুশনবীস আবির্ভূত হয়েছেন এবং নস্‌খ্‌-রচনা উন্নততর হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় শাহ গুলাম আলী সাহেব, এবং কলপার মীর আকবর আলীর শিষ্য মৌলভী হাদী আলী সাহেব, যাঁর পূর্বপুরুষ এসেছিলেন দিল্লী থেকে। ইনি 'তুগরানিগারী'তেও কামাল দেখিয়েছিলেন।

মুনশী হাদী আলীর সমকালীন খ্যাতনামা 'নস্‌খ-খুশনবীস' মীর বন্দা আলী 'মুর্তইশ' ছিলেন পুরনো দিনের রইস ও 'নস্‌খ্‌'-এর অদ্বিতীয় শিল্পী নবাব এহমদ আলীর শিষ্য। মীর বন্দা আলীর হাতে 'রাশা' ছিল, হাত কাঁপত। কিন্তু যে-মুহূর্তে কলম স্পর্শ করত কাগজকে, মনে হত—এ হাত লোহার; একটা অক্ষরের সাধ্য কি তার কাবু থেকে পালায়! লেখন চিনতে পারার ক্ষমতাও তাঁর অসাধারণ ছিল, সকলেই তা একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

মুনশী হামিদ আলী সাহেব একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। একবার এক জমায়েতে মুনশী হাদী আলী, মুনশী মুহম্মদ ইয়াহিয়া (ইনিও 'নস্‌খ্‌'-এর বড়ো ওস্তাদ ছিলেন, এবং লখনউয়ের প্রথম-মুদ্রিত কুরান শরীফ লিখে দিয়েছিলেন), মুনশী আবদুল হাঈ সন্দেলভী এবং মীর বন্দা আলী 'মুর্তইশ' মিলিত হয়েছিলেন। এটি 'নস্‌খ্‌'-ওস্তাদদেরই জমায়েৎ ছিল। একজন 'নস্‌খ্‌'-এ লেখা একটা 'কিত্‌আ' বিক্রীর জন্যে নিয়ে এল। কোথাও 'কাতিবের' (লেখকের) নাম ছিল না। ওস্তাদরা সবাই একমত হলেন, যে, এ-'কিত্‌আ' খাস ইয়াকুতের। ফলে, সকলেরই ইচ্ছে হল: আমার কাছে রাখব। মুনশী হাদী আলী সাহেব বললেন: "আমার কাছে একদিনের জন্যে রাখলে ভালো করে দেখে বলে দিতে পারব, এটা সত্যিই ইয়াকুতের হাতের কাজ কিনা।" মালিক দিয়ে দিলেন।

তিনি ঘরে নিয়ে গেলেন। পরদিন ফিরিয়ে নিয়ে এসে বললেন: "এটা ইয়াকুতেরই হাতের কাজ, কোন সন্দেহ নেই। এরই জোড়া ইয়াকুতের একটা 'কিত্‌আ' আমার কাছে আছে। দুটোকে মিলিয়ে দেখি—একইরকম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এটা বাস্তবিকই ইয়াকুতের।" দুটো 'কিত্‌আ'-ই তিনি সকলের সামনে রাখলেন। সবাই নির্দ্বিধায় স্বীকার করলেন: দুটো অক্ষর-লিপিই ইয়াকুতের হাতের কাজ। মুনশী হাদী আলীর হাতে-লেখা কিত্‌আ ভালো করে দেখে মীর বান্দা আলী কিন্তু একটু হাসলেন, তারপর তলায় লিখে দিলেন: "ঈঁ কারঅয তু আয়দ-ও-মর্দা চুনীন কুনন্দ"—'এ কাজ তুমি করেছো এবং পুরুষরা এইরকমই করে থাকে।' লেখা পড়ে মুনশী আবদুল হাঈ রেগে গিয়ে বললেন: "এতে আপনার কোন সন্দেহ আছে?" মীর বান্দা আলী জবাব দিলেন: "এ-'কিত্‌আ' ইয়াকুতের হাতের হতেই পারেনা।" মুনশী আবদুল হাঈ এবং অন্যান্যরা দাবি করতে লাগলেন—এটা খাস ইয়াকুতেরই। তখন মীর বান্দা আলী "ওয়াও" (উর্দুর একটি বর্ণ)-এর মাথা দেখিয়ে বললেন: "এটা ইয়াকুতের হতেই পারেনা।" সবাই তখন খুব গোলমালে পড়ে গেলেন। ইতিমধ্যে মুনশী হাদী আলী 'বাসলী'র একটা কোণ ছিঁড়ে কাগজের পরতের মধ্যে থেকে নিজের নাম বার করে দেখালেন। তখন সকলের বিশ্বাস হল, মুনশী হাদী আলী সাহেবই এই কারচুপি করেছেন। সকলে তাঁর তারিফ করতে লাগলেন। তিনি বললেন: "কিন্তু আমি তো মীর বান্দা আলী সাহেবের নজর এড়াতে পারি নি।"

'খুশনবীস'দের সর্বজনীন রুচির অনুগামী মীর বান্দা আলী সাহেবের কাছেও 'কিত্‌আ-নবীসী' পেটের ওপর সুছাঁদের অক্ষর-রচনা) ছিল স্বধর্ম, 'কিতাবত' (ছাপাখানার জন্যে গ্রন্থের নকল) ছিল অসম্ভব। সারা জীবন একটি ছোট বইও কখনও তিনি 'লিখলেন' না। হাজী হরম্যান শরীফ্যান যখন ছাপাখানা খুললেন, অনেক কাকুতি-মিনতি করে মীর বান্দা আলীকে একটি 'পঞ্জসুরা'[1] লিখে দিতে রাজী

[1] কোরানের পাঁচটি ছোট ছোট সুরত, যেগুলি ফাতিহায় পড়া হয়।

করালেন। মীর বান্দা আলী অনেক মেহনত করে, এবং খোদা জানেন কত দিনে, লেখা শেষ করলেন। তারপর নিয়ে গেলেন। হাজী সাহেবের সামনে যখন ওর ওপর শেষবার চোখ বোলালেন, কয়েকটা জায়গা পছন্দ হলনা। হাজী সাহেবকে না দিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। বললেন: "ভাই, আমাকে দিয়ে হবে না।"

এইসব শিল্পীদের আলোচনা থেকে একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, যে, সারা হিন্দুস্তানে খুশনবীসীতে লখনউয়ের প্রতিষ্ঠা অদ্বিতীয় ছিল। আমার সিদ্ধান্ত বরং এর বিপরীত। মুগল রাজত্বের আগে 'নস্‌খ'-এর যেসব শিল্পী হিন্দুস্তানে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের লেশমাত্র গুণপনাও এইসব ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল না। 'নস্‌খ্‌'-এর বিবর্তন ততোদিনে শেষ হয়ে গেছে। তবে, 'নস্তালীক' প্রসঙ্গে বলা যায় যে হাফিজ নূরুল্লা এবং হাফিজ ইব্রাহীমের হাতের 'কিত্‌আ' হিন্দুস্তানে যতো জনপ্রিয় হয়েছিল, অন্য কোন খুশনবীসের বোধহয় তেমনটি হয় নি। তবু, এই কলায় অন্য সুসংস্কৃত নগরের যে স্থান, লখনউয়েরও প্রায় তাইই ছিল।

তবে, ছাপাখানার উন্নতিতে লখনউয়ের 'খুশনবীসী' যে সহায়তা দিয়েছে, অন্য কোন স্থানের 'খুশনবীসী' সম্ভবত তা পারেনি। হিন্দুস্তানে ছাপার কাজ সর্বপ্রথম কোথায় আরম্ভ হয়েছিল, তা আমার জানা নেই। কলকাতায় উর্দূ সাহিত্যের উন্নতি এবং প্রাচ্যবিদ্যাকে উৎসাহদানের জন্যে অনেক কিছু করা হয়েছে। কিন্তু টাইপে ছাপা ছাড়া পাথরের ছাপা ওখানকার কোন পুরনো বই আমি দেখি নি।

গাজীউদ্দীন হায়দারের শাসনকালে (1814-1827 খ্রীষ্টাব্দ) আর্সল নামে এক য়োরোপীয় লখনউ এসে লোকদের মনে ছাপাখানার ধারণা জাগিয়ে দেন; শিক্ষিত ব্যক্তিরা এদিকে আকৃষ্ট হন। লখনউয়ে প্রথম ছাপাখানা তিনিই খোলেন। এখানেই সবকিছু তৈরি করিয়ে মুদ্রণ-কার্য আরম্ভ করলেন, এবং 'যাদ-উল-মআদ', 'হফ্‌ত্‌ কুলযুম' ও 'তাজ-উল-লুগাত' (এটি একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত) ছেপে জনসাধারণের সামনে হাজির করলেন। তাঁর কাছ থেকে শিখে অন্য

লোকেরাও ছাপাখানা খুলতে শুরু করল। প্রথমটা বোধহয় হাজী হরম্যান শরীফ্যানের ছিল। ধনী কাঁচ-ব্যবসায়ী মুস্তাফা খাঁ একদা কিছু ছাপার জন্যে হরম্যানের কাছে গিয়েছিলেন। হাজী সাহেব তাঁকে কোন শক্ত কথা বলে থাকবেন। ফিরে এসে মুস্তাফা খাঁ নিজের বিখ্যাত 'মুস্তাফাই প্রেস' খুললেন। কালক্রমে, প্রেসটি অসাধারণ উন্নতি করে। কিছুদিন পরে আলী বখ্‌শ্‌ খোলেন 'আলভী প্রেস।' ক্রমে, আরও অনেক মুদ্রণালয় স্থাপিত হতে থাকে।

লখনউয়ে মুদ্রণের কাজ আরম্ভ হয়েছিল, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নয়, শখের খাতিরে। পাথরে ছাপার উপযুক্ত বড়ো ও ভালো ভালো কাগজ তখন ব্যবহৃত হত। বড়ো-বড়ো খুশনবীসদের ধরে এনে অনেক মাইনে দিয়ে 'কিতাবত'-এর কাজ করিয়ে নেওয়া হত। কাজের কোন শর্ত ছিল না; সারাদিনে তাঁরা কতোখানি লিখেছেন বা আদৌ লিখেছেন কিনা, কেউ দেখত না। বরং, খাতির করা হত। প্রেস-কর্মীদেরও জিজ্ঞাসা করা হত না—সারাদিনে কতো কাগজ ছাপা হল! কালির জন্যে সর্ষের তেলের হাজার হাজার চিরাগ জ্বেলে উত্তম কাজল তৈরি করা হত; অম্লত্বের জন্যে কাগজী নেবু খরচ হত; কাপড়ের বদলে আসল স্পঞ্জ দিয়ে কাজ হত। অর্থাৎ, উত্তম বস্তু ও উত্তম কার্যই ছিল লক্ষ্য। এর ফল হল: নবাবী শাসনকালে, আরবী ও ফারসী পাঠ্যপুস্তক ও ধর্মগ্রন্থ লখনউয়ে যেমন মুদ্রিত হত, এমন ছাপা আর কোথাও বোধহয় হত না। ওই সময়ের মুদ্রিত পুস্তক আজও যার কাছে আছে, সেতো তার এক ধরণের সম্পত্তিই হয়ে গেছে। অন্যেরা এখনও খোঁজ করে, কিন্তু পায় না।

আমার পিতার আপন কাকা মৌলভী এহমদ সাহেবের ভ্রমণ ও ব্যবসায়ের খুব শখ ছিল। যে সময়ে লোকে ঘর থেকে বাইরে বেরোতে ভয় পেত, তিনি তখন হাজী হরম্যান শরীফ্যানের এজেণ্ট হিসেবে হাজার হাজার বই সঙ্গে নিয়ে রথে-রেলগাড়িতে চড়ে লখনউ থেকে রাওলপিণ্ডী পর্যন্ত যাতায়াত করতেন। তিনি বলতেন: 'সে সময়ে বই দুর্লভ ছিল; এখানকার ছাপানো বই দেখে লোকেদের

চোখ খুলে যেত, তারা সব পোকার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ত তার ওপর। যে শহরে বা গ্রামে আমি যেতুম, আমার আগেই চলে যেতো আমার খবর; লোকেদের এতো শখ ছিল যে, আমার শহর বা গ্রাম প্রবেশ—সে এক আজব ধুমধামের ব্যাপার ছিল। কোন লোকালয়ে পৌঁছলে ঘিরে ফেলত জনসমুদ্র, ভীড় লেগে যেত চারপাশে। যে-বই যে-দামে দিতুম, লোকেরা নিঃসংকোচে নিয়ে নিত, এতো আদর করে রাখত, যেন চোখের মণি। 'করীমা', 'মামকীমা'[1] ইত্যাদি প্রতি কপি ছয় কি আট আনা ক'রে, এবং 'গুলিসতাঁ', 'বোস্তাঁ' প্রতি খণ্ড তিন কি চার টাকায় বেচতুম। তবু, চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারতুম না। এক শহর থেকে অন্য শহরে পৌঁছতে-পৌঁছতে বইয়ের স্টক শেষ হয়ে যেত। আবার নতুন মালের জন্যে কয়েক মাস অপেক্ষা করতে হত; কারণ, তখনকার দিনে মাল পৌঁছনো ব্যাপারটা সহজ ছিল না। তবে আমি এমন ব্যবস্থা করে রেখেছিলুম, লখনউ থেকে বরাবর মাল আসত।'

শাহী রাজত্বের শেষ পর্বে 'মুস্তাফাই প্রেস' মুদ্রণকার্যে অতুলনীয় দক্ষতা অর্জন করেছিল। মুনশী নওলকিশোর যখন প্রেস খোলেন, তখন রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখানে ছাপা ভালো হতনা; কিন্তু প্রখর ব্যবসায়বুদ্ধির সাহায্যে মুনশীজী ফারসী ও আরবীর এতো বড়ো-বড়ো, মোটা-মোটা বই ছেপেছেন, যা আজকের কোন প্রেস ছাপতে সাহস করে না। বস্তুত, লখনউয়ের শৌখীন ব্যক্তিরা এতো সামগ্রী জমা করে রেখেছেন, তা থেকে লাভ ওঠানোর জন্যে মুনশী নওলকিশোরের মতো সাহসী মুদ্রাকরের প্রয়োজন ছিল। প্রাচীন সাহিত্যকে তিনিই আবার বাঁচিয়ে তুলেছেন, এবং তাঁরই প্রেসের প্রগতির কারণে বিশ্বস্ততা ও সুমুদ্রণের যে খ্যাতি লখনউয়ের হয়েছে, তা অন্য কোন শহরের পক্ষে দুর্লভ। তখন একদিন ছিল, যখন মধ্য-এশিয়ার কাশগর ও বুখারা পর্যন্ত এবং ইরান ও আফগানিস্তানের

[1] ফারসী ভাষার দুটি প্রাইমারী গ্রন্থ।

সমস্ত চাহিদা লখনউই মেটাত। নওলকিশোর প্রেস আজও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ের কেন্দ্র ; একে বাদ্ দিয়ে কোন ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে একপাও অগ্রসর হতে পারেনা।

লখনউয়ে এখন প্রেসের সংখ্যা অনেক। কিন্তু আফ্‌শোসের কথা, মুদ্রণের অবস্থা দিন-দিন শোচনীয় হয়ে উঠছে। আমার মতে, প্রেসম্যানদের নৈতিক দুরবস্থার কারণেই আজ লখনউয়ে অন্য শহরের তুলনায় খারাপ ছাপা হয়। সান্ত্বনা এই, মুনশী রহমতউল্লা সাহেবের দৌলতে কানপুরে মুদ্রণ-ব্যবস্থা অতি উত্তম। এবং, কে না জানে, কানপুর হল লখনউয়ের প্রগতিরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।

প্রেসের সঙ্গে-সঙ্গে পাথরে-ছাপার সংশোধন-কার্যের সূত্রপাতও লখনউয়ে। পাথরের ওপর যে-কপি জমানো হয়, তাকে কিছুটা ছুলে নিয়ে, কলম দিয়ে সংশোধন করার পদ্ধতি সম্ভবত য়োরোপেই আবিষ্কৃত। এবং আশ্চর্যের কথা, পদ্ধতিটি ওখানে এখনও প্রচলিত। অন্যদিকে, 'নস্‌খ্' ও 'নস্তালীকের' অক্ষর-সংশোধনের এই প্রক্রিয়া 'খুশনবীস'দের আপন শৈলী। কেউ বুঝতেই পারবে না, ওতে অন্যের কলমের স্পর্শ আছে। এই বৈশিষ্ট্য লখনউয়েরই। কোন অক্ষর কিংবা নক্‌শা উড়েই যাক অথবা চেঁচে উঠিয়ে ফেলাই হোক, পুনর্নির্মাণের কাজ নিপুণভাবে করে দেওয়া হত। প্রথমদিকে কলাটি এই পর্যন্তই সীমিত ছিল। কিছুদিন পরে, স্থানীয় নবীনতা-প্রবৃত্তি এই সীমাকেও অতিক্রম করে গেল। এমন দক্ষ 'সংগ্‌সায্'-এর (প্রস্তর-সংশোধকের) আবির্ভাব হল, যারা পুরো 'কিতাব' (বই) পাথরের ওপরেই উল্‌টিয়ে লিখে দিতে লাগল। সে-লেখা এমনভাবে জমে থাকে, কেউ বুঝতেও পারবে না, পাথরের ওপর উল্‌টিয়ে লেখা হয়েছে! এই পদ্ধতির আদি আবিষ্কারক জনৈক বৃদ্ধ, মুস্তাফাই প্রেসের সমৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরও খ্যাতিবৃদ্ধি হতে থাকে। জীবিতকালেই, তাঁর শিষ্যসংখ্যা এতো বেড়ে যায়, লাভ হয় প্রেসেরই। ক্রমে, সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয় গুণ ; দক্ষ 'সংগ্‌সায'রা এখান থেকে অন্যত্রও প্রেরিত হতে থাকে। কাজটি

জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সেই সময়ে, বিখ্যাত প্রস্তর-সংশোধক মুনশী জাফর হুসেন মনস্থ করলেন : কপি করার ঝঞ্ঝাট থেকে ছাপাখানাকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। তিনি পাথরের ওপরে উল্‌টে-লেখা আরম্ভ করলেন। প্রথমে ছোট-ছোট প্রেসে, তারপর বড়ো প্রেসে এই প্রক্রিয়া অনুসৃত হতে লাগল। মুনশী সৈয়দ আলী হুসেন সাহেব এতোদূর দক্ষতা অর্জন করলেন, যে, তাঁর উলট-লেখন হার মানাল লিপি-লেখনকে, বিখ্যাত 'খুশনবীস'রাও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে অক্ষম। তাঁর "উল্‌টী কিতাবত"-এর এক মামুলী নমুনা আমাদের এই 'দিলগুদায' পত্রিকাটি। এর কপি "লেখা" হয়না, মুনশী আলী হুসেন সাহেব রচনাগুলি পাথরে "উল্টে-লিখে" দেন। 'দিলগুদায'-এর পাঠক এগুলি প'ড়ে, এবং অক্ষর-লেখ বিচার ক'রে বুঝতে পারবেন, এতদ্দেশে প্রস্তর-সংশোধনের কলা কতো উন্নত। অধিক কি, হিন্দুস্তানের অধিকাংশ শহরে যেসব 'সংগ্‌সায' আছে, তারা লখনউয়েরই। কপি-জমানোর বদলে রচনা পাথরে উল্টো লিখিয়ে নিয়ে ছাপার ব্যবস্থাও আর-কোন শহরে নেই। এই কলা এখনও পর্যন্ত লখনউয়েই সীমিত। তবে, দুঃখের কথা, প্রেসম্যানদের অবস্থা শোচনীয় হওয়ার জন্যে 'সংগ্‌সাযী'র এই কলাবিদ্যার দ্বারা লখনউয়ের যতোটা লাভবান হওয়া উচিত ছিল, তা হতে পারে নি।

॥ 15 ॥

লখনউয়ের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে এখনও অনেক কথা বলার আছে—সেসব কথা নৈতিক চরিত্র ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে যুক্ত। তবে, তার আগে, যুদ্ধকৌশলের ইতিহাসটা সংক্ষেপে বিবৃত করা উচিত বলে মনে করি।

একথা ঠিক, যে, অওধ-রাজ্য স্থাপিত হয় সেই সময়ে, যখন মুসলমান ও হিন্দুস্তানী জনগণের সামরিক শক্তি দুর্বল হয়ে গেছে। এর

চেয়েও বড়ো সত্য হল: প্রাচীন যুদ্ধকৌশল তখনও ততোটা অকেজো হয়ে যায়নি, যতোটা অকেজো হয়ে গেল পুরনো হাতিয়ার। নতুন যুদ্ধকৌশল ও নতুন হাতিয়ারের সামনে পুরনো হাতিয়ার নেহাৎই অকর্মক। পরিণামে এই হল: প্রাচীন যুদ্ধকৌশল মুসলমান বা হিন্দুস্তানীদের কব্জা থেকে বেরিয়ে গিয়ে নতুন কোন প্রগতিশীল শূরবীর জাতির আশ্রয়ে উন্নত হলনা, পৃথিবী থেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেল। আর, এমনভাবে লোপ পেয়ে গেল যে আজকের যুগের মানুষ তাদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বপূর্ণ কৃতিসমূহ এবং তাঁদের প্রাচীন যুদ্ধকৌশলের সঙ্গে পরিচিত হবার কোন সুযোগই পেলনা। আজ এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে আমি যখন লেখনী ধারণ করেছি, তখন এমন কোন লোক নেই, যার কাছ থেকে কিছু জানা যায়। এই প্রসঙ্গে, শাহজাদা মির্জা মাস্দুদ কদ্র্ বাহাদুর বি. এ. এবং লখনউয়ের এক অতি প্রাচীন অভিজ্ঞ বৃদ্ধ সুলেমান খাঁ সাহেব (যিনি বেরিলী-পতি হাফিজ রহমত খাঁর বংশধর), উভয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সেকালের যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে যাকিছু লিখছি, এই দুজনেরই সাহায্যে।

যুদ্ধের যে কলা-কৌশলের বিকাশ দিল্লীতে, এবং দিল্লীর পর লখনউয়ে হয়েছে, বাস্তবে তা তিনটি বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। এই তিন জাতির মিলিত কর্ম-ফলেই এই কলার সমুচিত বিকাশ ঘটেছে। তবু, আশ্চর্যের কথা, এই মিশ্রণ সত্ত্বেও প্রত্যেকের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। কিছু কৌশল তো আর্য যোদ্ধাদের অবদান; তুর্কী ও তাতার বীররা কিছু কৌশল সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এসেছিল; কিছু দিয়েছে আরব—ইরান ছুঁয়ে সেগুলি এদেশে এসেছে।

সেকালের লখনউয়ে যে কলা-কৌশলগুলি ও যেসবের কলাবিদরা বিদ্যমান ছিল, তা হল, যথাক্রমেঃ (1) লকড়ী; (2) পটা; (3) বাঁক; (4) বিন্নাট; (5) কুশ্তী; (6) বর্ছা; (7) বানা; (8) তীরন্দাজী; (9) কাটার; -এবং (10) জলবাঁক।

1 লকড়ী (লাঠি)

এই কলাটি ছিল মূলত আর্যদের, যার নাম 'ফিক্যায়তী' বা 'ফিকেতী'। হিন্দুস্তান ও ইরান, দুই দেশের আর্যদের মধ্যেই এর প্রচলন ছিল। আরবদের বিজয়লাভের পর ইরানের ফিকেতীর ওপর আরবী যুদ্ধকৌশল ও যোদ্ধাদের প্রভাব পড়ে, এবং ওখানকার 'ফিকেতী' হিন্দুস্তানের চেয়েও উন্নততর হয়ে ওঠে। হিন্দুস্তানে দুটো কলাই নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। এক সময়ে, লখনউয়ে এর দুটো 'স্কুল'ও ছিল। ইরানের আরবী-মিশ্রিত ফিকেতী এখানে প্রসিদ্ধ ছিল 'আলী মদ' নামে, এবং শুদ্ধ হিন্দুস্তানী ফিকেতী 'রুস্তমখানী' নামে আজও স্মরণীয়। আলী মদে 'ফিক্যায়ত' বা 'ফিকেত'-এর (লাঠিয়ালের) বাঁ পা থাকত এক জায়গায়, শুধু ডান পা আগে-পিছে ক'রে 'প্যাঁয়্‌তার' (পাঁয়তাড়া) বদলে যেত। এর বিপরীত রুস্তম খানীতেঃ পাঁয়তাড়া বদলের সময়ে, ডাইনে-বাঁয়ে আগে-পিছে, যতোটা দরকার বা জায়গা পাওয়া যেত, 'ফিকেত' এগোত-পেছোত, এবং একেবারে প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর গিয়ে পড়ত। আর একটা পার্থক্যও ছিল—'আলী মদ' ছিল খাস রইস[1] ও শরীফ[2]দের একচেটিয়া। এর ওস্তাদ কখনও কোন নিম্নশ্রেণীর লোকদের 'শার্গিদ' (সাগরেদ) করত না, কিংবা অন্য কোনভাবেও শিখতে দিত না। অপরপক্ষে, 'রুস্তমখানী' ছিল জনগণের আপন শিল্পকলা।

আলী মদের এক জবরদস্ত ওস্তাদ ফয়জাবাদে শুজাউদ্দৌলা বাহাদুর এবং তাঁর পরে তাঁর 'বেওআ' (বিধবা পত্নী) বহুবেগম সাহিবার সরকারে নিযুক্ত ছিলেন ; পরে লখনউ আসেন। ফয়জাবাদের ইতিহাসে এঁর উল্লেখ আছে। মনে হয়ঃ এই কলার ইনিই প্রথম ওস্তাদ। অপর ওস্তাদ মুহম্মদ আলী খাঁ আমারই মহল্লা বা পাড়া

[1] ধনী ব্যক্তি। [2] সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

'বিয্যন খাঁ কাটরা'য় থাকতেন এবং আলী মদের আবিষ্কারক বলে গণ্য হতেন। তৃতীয় ওস্তাদ মীর নজমউদ্দীন দিল্লীর শাহজাদাদের সঙ্গে প্রথমে বেনারস গিয়েছিলেন, সেখান থেকে আসেন লখনউ। তাঁর নিয়ম ছিল: তিনি শুধু শরীফ বা অভিজাতদের শেখাতেন, এবং শিষ্যত্ব-গ্রহণের সময় শাহজাদাদের কাছ থেকে অর্থ এবং শরীফদের কাছ থেকে শুধু মিঠাই নিতেন, এবং তাও নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার না করে স্বয়ং গিয়ে দিয়ে আসতেন সৈয়দদের। এটা নবাব আসফউদ্দৌলার সময়ের কথা। ওস্তাদ মীর আতা হুসেন ছিলেন হকীম মেহদীর খাস সাথীদের অন্যতম। পটেবাজ খাঁ আর একজন ওস্তাদ, যিনি গাজীউদ্দীন হায়দারের সময়ে আলী মদের আবিষ্কারক ও সংস্থাপক বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। শোনা যায়, তিনি ছিলেন 'নব-মুসলিম'; কিন্তু, তাঁরও নিয়ম ছিল—শরিফ ছাড়া নিম্নশ্রেণীর কোন লোককে স্ব-কলা শিক্ষা দিতেন না। স্বীয় স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তিনি একটি মসজিদ রেখে গেছেন—'ধনিয়া মেহরী কে পুল' পেরিয়ে আলমনগরের পাশে এটি এখনও বর্তমান।

'রূস্তমখানী'র রেওয়াজ ছিল জনতার মধ্যে। এই কারণে, হিন্দু বা মুসলমানদের মধ্যে এটি কোনদিন প্রাধান্য লাভ করতে পারে নি। তবে, এর শত শত ওস্তাদ ছড়িয়ে ছিল অওধের গ্রামে-নগরীতে। এবং লখনউয়ে, ইয়াহিয়া খাঁ বিন মুহম্মদ সিদ্দীক খাঁ 'রূসৃতমখানী'তে যে দক্ষতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, তা আর কারও ভাগ্যে হয় নি। নবাব ফতেহ্ইয়ার্ খাঁ ছিলেন প্রথম সারির রইস, একজন বড়ো 'খুশনবীসও'; তৎসত্ত্বেও তিনি 'রূসৃতমখানী'র চর্চায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আর একজন নামকরা রূসৃতমখানী-ওস্তাদ ছিলেন বীর পালোয়ান মীর লংগর বাজ।

আজও যদি রূসৃতমখানীর অল্প-বিস্তর রেওয়াজ অবশিষ্ট থেকে থাকে তো সে নিম্নবর্গের লোকদের মধ্যে। আলী মদ প্রচলিত ছিল শরিফদের মধ্যে এবং যুদ্ধকলার সঙ্গে শরিফদের কোন সম্পর্ক ছিল না; তাই এ-কলাও নষ্ট হয়ে গেছে। রূসৃতমখানীর চর্চা ছিল নিম্নবর্গের

লোকেদের মধ্যে এবং এরা আজও লড়াই-টড়াই করে। তাই রুসতম-খানীর চর্চা আজ পর্যন্ত এদের মধ্যেই আছে।

আলী মদের দু-একজন ওস্তাদকে আমি মেটিয়াবুরুজে দেখেছি। অতঃপর সবশেষে উল্লেখ্য মুহল্লা মহমুদনগর নিবাসী মীর ফজলে আলী।

2 পটা

এই কলার মূল উদ্দেশ্য ছিল: শত্রুরা যদি ঘিরে ধরে, তাহলে হাতের লাঠি চারিদিকে ঘুরিয়ে, সকলের হাত থেকে বেঁচে, সবাইকে মেরে, হটিয়ে দিয়ে, বেরিয়ে যাওয়া। এরই নাম 'পটা হিলানা' (পটা ঘোরানো)। পটায় ভর করে শূন্যে লাফ দেওয়া এই কলার একটা বিশেষত্ব ছিল। সবচেয়ে প্রশংসনীয় ব্যাপার—এক সঙ্গে দশটা তীরও যদি ছুটে আসে, তারও 'কাটান' এতে ছিল। এই কলা দিল্লীতে ছিল না, লখনউয়ে আসে য়োরোপ থেকে; এবং মুর্খ তাঁতীদের মধ্যেই এর প্রচলন সবচেয়ে বেশি হয়। অবশ্য, শেষদিকে অনেক শরিফ বিশেষত 'কস্‌বা'র (উপনগরীর) শেখজাদারা এবিদ্যায় রপ্ত হয়েছিল। গুলাম রসুল খাঁর ছেলে গওরী পটেবাজ এই কলার সবচেয়ে বড়ো 'মাহির' (জ্ঞাতা) বলে পরিগণিত ছিলেন। এঁর সম্বন্ধে অনেক কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত আছে। কিন্তু হায়, এইসব আখ্যানও আজকের যুগ ভুলিয়ে দিচ্ছে!

মীর রুসতম আলীর 'স্যাফ'[1]-এর দুদিক ধারাল হত, ঘোরালে, শতাবধি প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিরে বেরিয়ে যেত। অসেবনের এক শেখজাদা শেখ মুহম্মদ হুসেন পটা ঘোরাতেন দুহাতে। গাজীউদ্দীন হায়দার তখন সিংহাসনে; একদিন সাহেব রেসিডেণ্ট বাহাদুর এবং কয়েকজন

[1] 'যিল্‌দ্‌সায' অর্থাৎ বইয়ের ওপরে যে কাগজ মুড়ে দেওয়া হয়, তা কাটবার অস্ত্র।

য়োরোপীয় 'মেহমান' (অতিথি) এই কলার কোন ওস্তাদের খেলা দেখতে চাইলেন। শেখ মুহম্মদ হুসেন এসে হাজির হলেন। কিন্তু তাঁর কাছে পটা ছিল না। শাহী অস্ত্রাগার থেকে একটা সুসজ্জিত পটা দেওয়া হল। সেটা নিয়ে এমন-সব কায়দার খেলা দেখালেন, চারদিক থেকে 'বাহ্ বাহ্' হতে লাগল। সেই জয়জয়কারের উত্তেজনায়, পটা ঘোরাতে ঘোরাতেই তিনি ভিড় থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন এবং সোজা নিজের ঘরে গিয়ে উঠলেন। কলাকারদের মধ্যে প্রচলিত প্রবচন : যে-লোক পটা ঘোরাতে জানে, সে দশজন তরোয়ালধারীকেও কাছে ঘেঁষতে দেবে না।

এই কলায় প্রবীণ একজন সাহেব হলেন মীর বিলায়ত আলী 'ডাণ্ডাতোড়'। এঁর প্রসিদ্ধি ছিল : প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে যতো জবরদস্ত ডাণ্ডাই থাক, ইনি তা ভেঙ্গে দিতেন।

3 বাঁক (ছুরি)

'বাঁক'-এর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল যুদ্ধ-কৌশলের সঙ্গে। ফলত, অন্যান্য যুদ্ধ কলার মধ্যে একে প্রথম স্থান দেওয়া হত। অভিজাত ঘরের ছেলেরা শখ করে ও বিশেষ চেষ্টায় এটি শিখত। এর মুখ্য উদ্দেশ্য : ছুরি নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হওয়া। প্রাচীন কাল থেকেই খেলাটি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আরবদের মধ্যেও ছিল। দুদেশের ছুরি দুরকম। হিন্দুদের ছুরি ছিল সোজা, যার দুদিকে ধার ; আরবী ছুরির ধার একদিকে, খাঁড়ার মতো বাঁকা। শেষ দিকে, আরবীরা যে-ছুরি ব্যবহার করত, তার নাম 'জ'বিয়া'—মাথা থেকে কিছু দূর পর্যন্ত চারদিকে চার ধার হত, এবং তা দিয়ে এমন চৌগুণো আঘাত পড়ত, শোনা যায়, সে-ঘা সেলাই করা মুশকিল হত। এই অস্ত্র দিয়ে লড়াইয়ের নামই 'বাঁক'।

বাঁক শিক্ষা দেওয়া হত এইভাবে : ওস্তাদ ও সাগরেদ দুজনে মুখোমুখী হাঁটু গেড়ে বসত। হিন্দুদের সোজা ছুরি খেলা শিক্ষায়ও

হাঁটু গেড়ে বসা নিয়ম; তবে একটা হাঁটু তোলা। আরবী প্রথায় ছটো হাঁটুই মাটিতে। এইভাবে বসে খেলাও হয় হুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে। চোটের সঙ্গে সঙ্গে জবরদস্ত সব প্যাঁচ প্রয়োগ করা হয়, যার কাছে কুস্তীর প্যাঁচ কিছুই না। আর একটা পার্থক্যও ছিল—আরবী খেলায় আসলে সাত চোট ছিল, হিন্দুদের নটা। আরবী বাঁকে প্যাঁচ যদি পুরো বেধে যেত, তো প্রতিদ্বন্দ্বীকে জীবন্ত ছেড়ে দেওয়া একেবারে ক্ষমতার বাইরে চলে যেত। হিন্দুস্তানী খেলায় এর বিপরীত—যখন ইচ্ছে, প্যাঁচ খুলে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছেড়ে দেওয়া যেত।

সুতরাং এই খেলায় শুধু চোট নয়, বড়ো-বড়ো জটিল সব প্যাঁচও আছে। এর সাহায্যে হুই প্রতিদ্বন্দ্বী ঘণ্টার পর ঘণ্টা যুঝত, এবং প্যাঁচ মেরে-মেরে একজন অন্যজনকে বেঁধে জখম করে দেওয়ার চেষ্টা করত। এই প্যাঁচ এতো জটিল সংখ্যাহীন এবং নিয়মবদ্ধ ছিল, যে অনেকে বলত: কুস্তী ও লাঠি খেলার তাবৎ প্যাঁচ বাঁক থেকেই বেরিয়েছে। বাঁক-ওস্তাদদের মতে: প্রতিপক্ষ শুয়ে পড়লে বাঁক পুরো হয়, বসে পড়লে আধা, দাঁড়িয়ে থাকলে স্রেফ 'চৌথাই', চার ভাগের এক ভাগ। 'বঁক্যাত' বা 'বাঁকেত'এর কাজ প্রতিদ্বন্দ্বীকে শুধু ঘায়েল করা—এটা ভুল ধারণা। তার আসল কাজ: প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু ও বিবশ করে জ্যান্ত গ্রেফতার।

বাঁকওয়ালারা খেলার কৌশলকে যথাসম্ভব গোপন রাখে। এটা তাদের একটা বৈশিষ্ট্য। তাদের চাল-চলন রংগ-ঢংগ দেখে বোঝার উপায় নেই, যে, এরা সত্যিকারের লড়াকু। 'বাঁকেতরা' শিষ্ট ও সভ্য ব্যক্তিদের কায়দা-কানুন রপ্ত করে, জুতো পরে, সঙ্গে কোন হাতিয়ারও নেয় না। এমনকি, কলমকাটা লোহার ছুরি বা ছুঁচ পর্যন্ত সঙ্গে রাখা যেত না, কসম বা দিব্যি থাকত। শুধু একটা রুমাল, তার কোণে লোহার একটা চাকৃতি বা ঘুঁটি বাঁধা। ব্যস, ঐইটুকু অস্ত্রই দরকারের সময় কাজ দেয়। তার চেয়েও বেশি সভ্যভব্য হতে চাইলে, হাতে 'তস্‌বী' (জপের মালা), আর তাতে দিগদর্শন-যন্ত্রের

মতো একটা জিনিস লাগানো। যথেষ্ট!

হিন্দুসমাজে এই যুদ্ধকলা প্রাচীন কাল থেকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। রাজপুত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়রা জানত না, ব্রাহ্মণরাও শেখাত না; ক্ষত্রিয়রাও মর্যাদাহানিকর বোধে শিখত না। এর কারণ বোধহয় এই ছিল, যে, সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব থাকলে তবেই বাঁকেত হওয়া যেত। রাজপুতরা ছিল জন্মসৈনিক। ব্রাহ্মণ-বাঁকেত দিগদর্শন যন্ত্র বা লোহার কলাইয়ের বদলে চাবি রাখত উপবীতের সঙ্গে। তার সাহায্যেই বেশ শান্ত, ভদ্রভাবেই শত্রুকে ঘায়েল করত। শাহজাদা মির্জা হুমায়ুঁ কদ্র্ বাহাদুরের মতে, এই কলা লখনউয়ে প্রবেশ করে শাহ আলমের শাসনকালে, যখন মির্জা খুর্‌রম বখ্‌ত্ বাহাদুর এই খেলার দু-একজন ওস্তাদকে কাশী থেকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। কিন্তু ফয়জাবাদের ইতিহাস এবং অন্য বিশ্বস্ত সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমার ধারণা হয়েছে: এই খেলার আদি ওস্তাদ মনসুর আলী খাঁ 'বঁক্যাত' ফয়জাবাদে আসেন শুজাউদ্দৌলার শাসনকালে।

নবাব আসফউদ্দৌলার সময়ে লখনউয়ের 'বাঁক কে উস্তাদ' ছিলেন শেখ নজমউদ্দীন। প্রায় এই সময়েই বাঁকের অন্য ওস্তাদ ছিলেন মীর বাহাদুর আলী। এঁর দাবি ছিল: 'পালংকের নীচে জংলী পায়রা ছেড়ে দিন, তারপর তামাশা দেখুন—কোনো দিক দিয়ে যদি উড়ে যায়, তাহলে আমি বাঁকেত নই।' শুধু ইনি একাই নন, বাঁকের এটাই ছিল বৈশিষ্ট্য; সব ওস্তাদই এমন কৃতিত্বের দাবিদার। লখনউয়ের তৃতীয় ওস্তাদ ওঅলী মুহম্মদ খাঁ! নাসীরউদ্দীন হায়দারের সময়ে শেখ নজমউদ্দীনের শিষ্যের শিষ্য ছিলেন স্বনামখ্যাত আব্বাস। তাঁর চার সাগরেদ নাম করেছিলেন—একজন ডাকাত, বাকি তিনজন ভদ্র ব্যক্তি। শেষ ওস্তাদ মীর জাফর আলী লখনউয়ের পতনের পর ওয়াজিদ আলী শাহর সঙ্গে মেটিয়াবুরুজ চলে আসেন। এঁকে আমি দেখেছি, বাল্যে এঁর সাগরেদীও করেছি। দু-এক মাস শিখে ছেড়ে দিয়েছি। যতটুকু শিখেছিলাম, সব এখন স্বপ্ন ও কল্পনার মতো

মনে হয়। জানিনা, বাঁক বিস্তায় অভিজ্ঞ কেউ এখনও বেঁচে আছেন কিনা।

4 বিন্নৌট

প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতের তলোয়ার, লাঠি বা যেকোন হাতিয়ার ফেলে দেওয়া, এবং পয়সাবাঁধা একটা রুমাল ছুঁড়ে অথবা শুধু-হাতেই তাকে মেরে ফেলা—এ-কলার এটাই উদ্দেশ্য। প্রথম থেকেই লখনউয়ে প্রসিদ্ধি ছিল, যে, এ-খেলার বড়ো-বড়ো জবরদস্ত ওস্তাদ হায়দরাবাদ-দাক্ষিণাত্যে থাকে। ওখানে গিয়ে এবং দেখেশুনে জানা গেল: এই খেলা সত্যি এখনও বেঁচে আছে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন: সম্মুখীন দুই কলাকার যদি নিরস্ত্র হয়, তাহলে হয় কুস্তী; হাতে ছুরি থাকলে, বাঁক; আর, দু-গজ লম্বা সোঁটা বা রুমাল থাকলে হয় 'বিন্নৌট'। বিন্নৌটওয়ালারাও নিজেদের কৌশল গোপন রাখে। শুরুতেই স্থির হয়: কেবল শরিফদেরই শেখাবে এবং কথা দিতে হয়—কখনও দুর্বল ও নিরীহ ব্যক্তির ওপর প্রয়োগ করবে না। বিন্নৌটওয়ালাদের পাঁয়তাড়ার নাম 'পাওলে'। এর জন্যে দরকার ক্ষিপ্রতা ও 'সাফাই' (নির্ভুল তাক)। বয়স্ক লোকের পক্ষে দুটোই অসম্ভব। এছাড়া, মানব-শরীরের যতো স্নায়ু-নাড়ী আছে, সমস্তের জ্ঞান থাকা চাই। বিন্নৌটওয়ালার জানা উচিত: শরীরের ঠিক কোন্ জায়গায় আঙুল দিয়ে স্রেফ্ একটু চাপ দিলেই একটা সামান্য চোটই মানুষকে বেদম করে দেবে! এ-খেলার প্রসিদ্ধি আসলে হায়দরাবাদে; তবে, লখনউয়েও বিন্নৌট-ওস্তাদ অনেক ছিল। শোনা যায়, মুহম্মদ ইব্রাহীম খাঁ রামপুর থেকে এই কলাকে সর্বপ্রথম নিয়ে আসেন। এই সময়ে এখানে তালিব শের নামে জনৈক জবরদস্ত বীর জোয়ান ছিলেন; তিনি ভালো তলোয়ার চালাতেও পারতেন। তিনি যখন ইব্রাহীম খাঁর আস্ফালন শুনলেন, তলোয়ার নিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলেন। মুহম্মদ ইব্রাহীম খাঁও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ

করলেন। দুজনে মুখোমুখী। তালিব শের খাঁ যেমনি তলোয়ার ঘুরিয়ে মেরেছেন, মুহম্মদ ইব্রাহীম খাঁ কোণে-পয়সা-বাঁধা রুমালটা এমন কায়দা করে মারলেন, তালিব শের খাঁর হাত থেকে তলোয়ার খসে গিয়ে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে দূরে ছিট্‌কে পড়ল। তিনি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সকলেই মুহম্মদ ইব্রাহীম খাঁর ওস্তাদী এক বাক্যে স্বীকার করে নিল।

লখনউয়ে শেষ দিন পর্যন্ত এই কলার চর্চা ছিল। এমনকি, মেটিয়া-বুরুজেও ছিলেন বিন্নাটের জবরদস্ত এক ওস্তাদ : নবাব মাশূকমহলের বাড়ির দারোগা মুহম্মদ মেহদী।

5 কুশ্‌তা (কুস্তী)

এটিও মুখ্যত আর্য কলা—হিন্দুস্তানেও, ইরানেও। আরব ও তুর্কীরা এ-খেলা জানত না ; হিন্দুস্তানের প্রাক্‌-আর্য জাতিরাও না।

লখনউয়ে, কুস্তীর প্যাঁচ ও প্রতিপক্ষকে হারানোর কায়দা অনেক উন্নত হয়। কিন্তু কুস্তী হল আসলে শারীরিক শক্তি-নির্ভর। লখনউয়ের আবহাওয়াকে এমন কোন গুণ প্রকৃতি দেয়নি, যাতে এখানে গুলাম প্রভৃতির মতো ভীমকায় পালোয়ান সব জন্মাবে। এইজন্যে লখনউয়ের কুস্তী-কলা কেবলমাত্র 'দাও-প্যাঁচ' দেখানো মাত্র, যার সাহায্যে, নিজের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিধরকে পর্যন্ত কাবু করা যেতে পারত। তার চেয়ে শক্তিধরকে ফেলে দেওয়া অবশ্য অসম্ভব ছিল। লখনউয়ের আখড়া ও প্রথম দিকের পালোয়ানদের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী চলিত আছে। কিন্তু সবই দাও-প্যাঁচের গল্প, শক্তির নয়। আমি একবার এখানকার এক বিখ্যাত পালোয়ান সৈয়দের সঙ্গে তার দ্বিগুণ আকৃতি এক পাঞ্জাবী পালোয়ানের লড়াই দেখেছিলাম। সৈয়দ গোড়া থেকেই ভালো লড়ছিলেন ; তাঁর 'চলৎ-ফিরৎ', ক্ষিপ্রতা, সবই ছিল প্রশংসা করার মতো। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সৈয়দ দরদর ঘামতে লাগলেন, শক্তিহীন হয়ে পড়লেন, দমও ফুরিয়ে গেল।

পাঞ্জাবী পালোয়ান, যিনি ওঁকে খেলাচ্ছিলেন, তাঁর কিন্তু কিছুই হয়নি। সৈয়দ ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলেন, শেষ পর্যন্ত না ল'ড়ে হার স্বীকার করলেন।

6 বর্ছা (বর্শা)

এটাও যুদ্ধের একটা পুরনো কলা ; আর্য, তুর্কী ও আরবরা ব্যবহার করত। আরবী বর্শা ছিল লম্বা, এবং সূচ্যগ্র ফলক। তুর্কী বর্শা ফলকও শংকুর মতো চুঁচলো, তবে ছোট। আর্য বর্শা ছিল লম্বা, ফলক পাতলা ও পানের মতো। আশ্চর্যের কথা, লখনউয়ে এই তিন ধরণের ভল্লই ছিল। বড়ো বর্শা ছিল পাঁচ গজ লম্বা, ছোট বর্শা তিন গজ লম্বা। বড়ো বর্শা শুধু আকারেই বড়ো নয়, তাতে নমনীয়তার নামগন্ধও থাকতনা। সেই কারণে তুটো চালানোর পদ্ধতিও ছিল আলাদা। লখনউয়ের বিখ্যাত ও আসল 'বর্ছ্যাত' বা 'বর্ছেত' (বর্শাধারী) ছিলেন মীর কাল্লু। এঁর নাম বুরহান-উল-মুলক-এর সময় থেকেই শোনা যায়। তারপর খ্যাতি অর্জন করেন মীর আকবর আলী। রামপুর ও বেরিলী থেকেও অনেক বর্ছেত আসতে থাকে। বাদশাহ গাজীউদ্দীন হায়দারের হাতী শিকারের শখ হয়েছিল ; তখন বর্শাধারীদের খুব খাতির ছিল। আর, যুদ্ধে তো এ হাতিয়ার খুবই কাজ দিত। এরই জোরে, বড়ো-বড়ো প্রাচীন জাতিরা সব একদা বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল ! লখনউয়ে—আসল হোক নকল হোক—এ-কলার রেশ এখনও রয়েছে। কিন্তু হায়, এখন এর একমেব কর্ম : বরযাত্রীর জুলুসের জৌলুষ বাড়ানো !

7 বানা (লাট্টু-লাঠি)

'বানা'-ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল, এবং এখনও এর অল্পস্বল্প চর্চা বিদ্যমান। লাঠি-খেলার দাও-প্যাঁচ-চোট্ এ-থেকেই জাত। এরও উদ্দেশ্য: বানা বা বড়ো লাঠি ঘোরাতে-ঘোরাতে শত্রুদের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে যাওয়া। বানা—আসলে একটা লম্বা লাঠি, যার একদিকে, বা, দুদিকে, লাট্টু থাকত, এবং এমনভাবে ঘোরানো হত, কেউ কাছে আসতে পারত না। কেউ-কেউ আবার লাট্টুতে কাপড় বেঁধে তেলে ডুবিয়ে জ্বালিয়ে নিত, এবং এমনভাবে ঘোরাত, যে, নিজের ওপর আগুনের ছিটেও লাগত না, আগুনের ভয়ে শত্রুই দূরে থেকে যেত।

8 তীরন্দাজী (ধনুর্বিদ্যা)

পৃথিবীর যাবতীয় লড়াকু জাতিসমূহের পুরনো হাতিয়ার—এই 'প্রাচীন কালের বন্দুক'। এই কলা শিক্ষায় ও কৃতিত্ব অর্জনে কোন শ্রেণীভেদ ছিল না। রাজা রামচন্দ্র ও তাঁর ভাই লক্ষ্মণ এই হাতিয়ার দিয়েই রাবণ ও তাঁর মতোই ভীমকায় শত্রুদের নিপাতিত করেছিলেন। অধুনা বন্দুকের আবিষ্কারের ফলে এর সার্থকতা কমে গেছে। কিন্তু যুদ্ধ-কৌশলের দৃষ্টিতে একদিন এর অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল।

'কমান' (ধনুক) এতো কড়া করে বাঁধা হত, তাতে 'চিল্লা' (ছিলা) লাগানো তথা জ্যা-আরোপণ অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। কারণ, ধনুক যতো কড়া, তীরও ততো দূরে যেত, তীক্ষ্ণও হত। দিগ্বিজয়ী আরবরা তীরন্দাজীতে বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছিল। আরব-বনিতা উম্মেলব্বান, মাত্র পাঁচ ছ'দিন শাদী হয়েছে; ইতিমধ্যে, দামাসকাস জয় করতে গিয়ে স্বামী হলেন শহীদ। উম্মেলব্বান চললেন বদ্‌লা নিতে। এমন জোরে তীর মারলেন, শত্রুর ধ্বজাবাহক পড়ে গেল প্রথম তীরেই; দ্বিতীয় তীর গিয়ে বিঁধল শত্রুপক্ষের বীর সেনাপতি

টমাসের চোখে—এতো জোরে, যে, টেনে বার করা গেল না ; শেষে, বাইরে যতোটা বেরিয়েছিল, সেই অংশটা কেটে নেওয়া হল, বাকিটা থেকে গেল চোখের মধ্যেই।

অওধের পাঁসী ও ভর্‌রা গোড়া থেকেই এই কলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত ছিল। দিল্লী থেকে নতুন-নতুন ওস্তাদ এসেছে পরবর্ত্তী কালে। তখন আসফউদ্দৌলার শাসনকাল ; নামকরা তীরন্দাজ ছিলেন ওস্তাদ ফ্যয়জ্‌ বখ্‌শ্‌। বাদশাহর ইঙ্গিতে, তিনি হাতীর ওপর সওয়ার মির্জা হায়দারের পিতাকে এমন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তীর মারেন—কেউ তাঁকে নিশানা করতে তো দেখেইনি, যিনি শিকার হলেন, তিনিও বুঝতে পারেননি, তীর কোমরবন্ধ্‌ ভেদ করে চলে গিয়েছিল, তবু জানতে পারেননি। ঘরে পৌঁছে, পোষাক ছাড়তে গিয়ে দেখেন—রক্তে মাখামাখি ! সঙ্গে সঙ্গে, আহত স্থান থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটতে থাকে, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা যান।

এই কলা শিক্ষার নিয়ম কানুন খুব কঠিন ছিল। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যে থেকেই এই কলার রেওয়াজ উঠে গেছে, আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র একেবারে বেকার করে দিয়েছে। তবে, হিন্দুস্তানের অসভ্য জাতিদের মধ্যে এটি এখনও টিঁকে আছে। শিকারে, বা কখনও কখনও নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে এরা এখনও তীর-ধনুক ব্যবহার করে।

9 কাটার (ছোরা)

‘কাটার’ (ড্যাগার) পুরনো হাতিয়ার ; বিশেষভাবে আর্যরা ব্যবহার করত। পরে, চোর-ডাকাতরা একে কাজে লাগায়। এ দিয়ে প্রতিপক্ষকে মুখোমুখী আক্রমণ করা যেত না, তবে, তার অজ্ঞাতসারে, তার ওপর হামলা করা হত। বোধহয় এইজন্যেই, দিল্লীতে, বিশেষত-লখনউয়ে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এর ব্যবহার ছেড়ে দেয়।

কাটার তখন সবাই সঙ্গে রাখত। কিন্তু এও যে' আক্রমণ ও লড়াইয়ের অস্ত্র হতে পারে, তা কারও মাথাতেই কখনও আসে নি।

কাটার দিয়ে আক্রমণের পরিভাষা ছিল: যখন ইচ্ছে, আক্রমণ করতে পারো; যদি চাও তো ওর হাতল পর্যন্ত শত্রুর শরীরে ঢুকিয়ে দিতে পারো; কিন্তু, খবরদার, দুশমনের শরীরে জখমের একটা দাগও যেন না পড়ে!

এইভাবে, চোরেরা ছোরা নিয়ে রাত্রে ঘুমন্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করত, এবং তাকে নিঃশব্দে নিহত করে চলে আসত।

10 জলবাঁক

'বাঁক'-এর কথা আগেই বলেছি। 'জলবাঁক' এই একই কলা—শুধু, জল ও সাঁতারের সঙ্গে যুক্ত। গভীর জলে শত্রুকে কাবু ক'রে তাকে বেঁধে আনা বা জলের মধ্যেই খতম করে ফেলা এই খেলার লক্ষ্য।

ইতিহাসে আর কোথাও এর উল্লেখ নেই। লখনউয়ের এক সন্তরণবীর মীরক জান এটির আবিষ্কর্তা। অনেককে তিনি এই কলায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। এদিক থেকে—জলবাঁক-এর জন্মভূমি লখনউ। আজও, সাঁতারের এমন-কিছু কৌশল এখানকার ওস্তাদরা জানে, অন্যত্র যার নাম-নিশানাও নেই।

['প্যায়রাই' বা সাঁতারেও লখনউ উন্নতি করেছিল। তার কথা পরে বলব।]

উর্দুতে একটা বিখ্যাত উক্তি আছে : 'বার্ধক্যে মানুষের কামবাসনা জিহ্বায় অধিষ্ঠান করে'—"বুঢ়াপে মেঁ ইনসান কী কুওঅতে শহ্ওআনী যবান মেঁ আ জায়া করতী হ্যয়।"

ঠিক একইভাবে, অনেকসময় দেখা গেছে : বড়ো-বড়ো শূরবীর বাহাদুররা যখন কমজোরী বা দুর্বল হয়ে পড়ে, হাত-পায়ের বল জবাব দিয়ে দেয়, তখন তাদের সমস্ত সাহস ও শৌর্য করতলচ্যুত হয়ে আশ্রয় নেয় আঁখিতে ও 'জবানে'—জিহ্বাগ্রে তথা ভাষায়। তারা তখন নিজেদের বীরত্ব ও খ্যাতির গল্প শোনায়। নিজেরা কোন বীরত্বমূলক কাজ করে না। তার বদলে, লড়াইয়ের তামাশা দেখে জানোয়ারদের মাধ্যমে, এবং অন্যজনকেও দেখিয়ে প্রশংসা পায়।

এই অবস্থাই হয়েছিল লখনউয়ের। যখন যুদ্ধ থেকে ছুটি মিলল, রণক্ষেত্রে দাঁড়াবার সাহস যখন ফুরিয়ে গেল, তখন যুদ্ধ-ভাবনা রূপান্তরিত হল জানোয়ারে-জানোয়ারে লড়িয়ে দিয়ে, বাহাদুরীর ও রক্তপাতের তামাশা দেখার শখে। এ শখ অবশ্য অল্প-বিস্তর সব জায়গাতেই আছে ; কিন্তু লখনউবাসীরা এতে যেভাবে আসক্ত হয়েছিল, এবং এই অর্থহীন ও ক্রূরতাপূর্ণ রুচির চর্চা করেছিল, অন্য স্থানের লোকেরা তা বোধহয় স্বপ্নেও দেখে নি। আরও স্পষ্ট করে বললে, এইসব শখ মেটানোর যেসব পদ্ধতি ও মনোরঞ্জক তামাশা লখনউ ও তার আশেপাশে সেদিন দেখা যেত, দিল্লী বা হিন্দুস্তান দরবার কোন্‌ছার, সম্ভবত পৃথিবীর কোন শহরেই তা সুলভ-দ্রষ্টব্য ছিল না।

অপরের বীরত্বপূর্ণ কার্যের মাধ্যমে স্ব-হৃদয়ের অতৃপ্ত কামনা প্রকাশের এই শখ তিনভাবে পূরণ করা হত : এক হিংস্র ও অন্যান্য চতুষ্পদীদের লড়িয়ে ; (খ) পাখিদের লড়িয়ে ; এবং (গ) 'তুক্‌কল' ও 'কনক্যওআ', ফানুষ ও ঘুঁড়ির লড়াইয়ে। এই তিন পদ্ধতি সম্পর্কে

আমি যতোদূর জানি, আলাদা আলাদা বিবরণীসহ উল্লেখ করছি।

প্রথমত, হিংস্র জানোয়ার ও চতুষ্পদীদের লড়াই। এই পর্যায়ে যেসব জানোয়ার দিয়ে লড়ানো হত বলে দেখেছি, তারা হল : (1) বাঘ, (2) চিতা, (3) কালো চিতা, (4) হাতী, (5) উট, (6) গণ্ডার, (7) হরিণ, (8) ভেড়া।

জানোয়ার লড়ানোর শখ প্রাচীন ভারতের কোথাও কখনও ছিল বলে শোনা যায় নি। এ রুচি বাস্তবত ছিল রোমানদের; রোমে পশুতে-মানুষে, কখনও পশুতে-পশুতে লড়িয়ে দেওয়া হত। খ্রীষ্ট ধর্মের প্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে প্রথাটি বিলুপ্ত হয়। বর্তমানে, স্পেন এবং য়োরোপের আর কয়েকটি দেশেও, জংলী ষাঁড়ের লড়াই হয়—কখনও ষাঁড়ে-ষাঁড়ে, কখনও ষাঁড়ে-মানুষে। হতে পারে, লখনউয়ের য়োরোপীয় বন্ধুরাই গাজীউদ্দীন হায়দার বাদশাহর চিত্তে চতুষ্পদীদের লড়াই দেখার শখ জাগিয়ে দিয়েছিল। বাদশাহ তখনই তৈরি হয়ে গেলেন। অল্প দিনের মধ্যেই শাহী বিনোদ-বাসনা এই ভয়ংকর ও বর্বর লড়াইকে সমৃদ্ধ করে তুলতে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখল না। মতিমহলে, ঠিক নদীর ধারে, দুটো নতুন বাড়ি 'মুবারক মঞ্জিল' ও 'শাহ মঞ্জিল' তৈরি করানো হল। তার সামনে, নদীর অপর পারে প্রায় ক্রোশব্যাপী একটি রমণীয় উদ্যান ছিল। লোহার বেড়া দিয়ে ঘিরে সেটিকে করা হল বিশাল 'চরাগাহ' (পশুচরণ-ভূমি)। নানান ধরণের হাজারেরও বেশি জানোয়ার এনে ছেড়ে দেওয়া হল এখানে। হিংস্র বন্য পশুদের রেখে দেওয়া হল খাঁচায় বন্দী ক'রে। সেই সঙ্গে, নদীর ওপারে, শাহ মঞ্জিলের ঠিক সামনে বাঁশ ও লোহার বেড়া দিয়ে সুরক্ষিত করে তৈরি হল বড়ো-বড়ো ময়দান—জংলী পশুদের লড়াবার জন্যে। ওখানে নদীর বিস্তার কম। বাদশাহ, তাঁর অতিথিরা মুসাহেবরা এসে বসতেন শাহ মঞ্জিলের ওপর-অঙ্গনে, 'গঙ্গা-যমুনা' (শাদা-কালো) শামিয়ানার ছায়ায়; বেশ আরাম করে, সুখে মজা দেখতেন। - ওদিকে, নদীতীরে, ঘেরা ময়দানে উপস্থিত করা হত বন্য

হিংস্র জন্তুদের ভয়ংকর লড়াইয়ের রোমাঞ্চকর দৃশ্যের পর দৃশ্য। বন্য পশু মত্ত, হস্তী লড়ানো তো সহজ, কঠিন তাদের সামলানো। খাঁচা খুলে কোন বাঘ বা মত্ত হাতী পালিয়ে গেল তো শহরময় হুলস্থূল, মারাও পড়ত অনেকে। কিন্তু এখানকার লোক এইসব সাংঘাতিক কাজেও খুব হুঁশিয়ার হয়ে গিয়েছিল। ওই সময়ে যে য়োরোপীয় পর্যটক দরবারে অবস্থান করছিলেন, স্বলিখিত গ্রন্থে তিনি স্বীকার করেছেন : জংলী পশুদের পালন করা, বশে আনা, এবং দেখাশোনা করার লোক লখনউয়ের চেয়ে ভালো পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এরা হাতী ও অন্যান্য বন্যজন্তুদের এনে ছেড়ে দিত, বশে রাখত, যুদ্ধ-শেষে বিজেতা ও বিজিত দুজনকেই নিজেদের তাঁবে রেখে দিত। এই কাজের জন্যে শতাধিক বল্লমধারী ও বেত্রধারী নিযুক্ত ছিল। তারা বেত-বল্লম দিয়ে ওদের মারত, আত্মরক্ষাও করত। তাছাড়া লোহার জ্বলন্ত শলাকা ও আগুনের সাহায্যে যেদিকে ইচ্ছে ঘোরাত ওদের, যেখানে ইচ্ছে হাঁকিয়ে নিয়ে যেত, বাঘ-ভাল্লুকদের ফিরিয়ে নিয়ে যেত খাঁচায়। এক কথায়, এইসব লোকেদের ক্ষিপ্রতা, চতুরতা, চলাফেরা, সতর্কতা খোদ জানোয়ারদের লড়াইয়ের চেয়েও বেশি বিস্ময়কর ও মনোরঞ্জক ছিল। দেখে মনে হত : এই সকল বিরাটকায় ভয়ংকর হিংস্র জন্তুদেরও মানুষ কী আশ্চর্যভাবে বশ করেছে!

এইবার লড়াইগুলো একে একে শুনুন—নিরস লাগবে না।

1 বাঘ

নেপালের তরাই থেকে ধরে এনে এনে বাদশাহ অনেক বাঘ জড়ো করেছিলেন। কয়েকটা বেশ বড়োই ছিল। লড়াই জিতে-জিতে কয়েকটা বাঘ বাদশাহর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। লড়াইয়ের সময়, ওদের ময়দানের পাশে এনে খাঁচা খুলে দেওয়া হত। প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন গর্‌গর্‌ করে ঘুরতে ঘুরতে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, দাঁত-নখ দিয়ে আক্রমণ করত, গোঁতাগুঁতি করত। কখনও এ ওকে ফেলে

দিয়ে ওপরে চড়ে বসত, কখনওবা ও একে চেপে ধরত। অনেকক্ষণ ধরে লড়াই হত। শেষে, একজন মারা যেত বা আহত ও শক্তিহীন হয়ে যেত, এবং প্রচুর রক্তপাতের ফলে দুর্বল হয়ে পালাত। তখন বিজয়ী প্রতিদ্বন্দ্বী রেগে ও বেগে পিছু তাড়া করত। এই সময়েই ওদের দুজনকে সামলানোর ও কাবু করার জন্যে লড়ানেওয়ালাদের দৌড়ঝাঁপ, কায়দা-কৌশল এবং বাহাদুরী সত্যিই দেখবার মতো!

প্রায়ই, বাঘের সঙ্গে লড়ানো হত কালোচিতাকে। এরা এতো বলবান ছিল, খুব কম সময়ই বাঘকে জিততে দেখা যেত। তবে, বাঘে-বাঘে লড়াইয়ের মতো বাঘে-কালোচিতায় লড়াইও তুমুল হত। কখনও-কখনও বাঘ ও হাতীর লড়াইও হত। এটাকে কিন্তু সমানে-সমানে লড়াই বলা যায় না; ফলাফলও ছিল অনিশ্চিত ও অপ্রত্যাশিত। হাতী যদি খুব 'জিয়ালা' হত, তার সঙ্গে বাঘ খুব কমই পেরে উঠত। সবচেয়ে আকর্ষণীয় লড়াই হত বাঘ ও গণ্ডারের মধ্যে। গণ্ডারের পেট ছাড়া সমস্ত শরীরটা লোহার মতো শক্ত, বাঘের দাঁত বা নখ কিছুই বসে না। প্রকৃতিদত্ত এই শক্তির অহংকারে গণ্ডার প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীরও পরোয়া করে না। মাথা ঝুঁকিয়ে তার পেটের তলায় ঢুকে নাকের ওপরের শিং পেটের মধ্যে এমন বিঁধিয়ে দেয়, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু হয়। অবশ্য গণ্ডারকে চিৎ করে ফেলে দিয়ে বাঘ নখ ও দাঁত দিয়ে তার পেট চিরে দিয়েছে, এরকমও কয়েকবার হয়েছে। তবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণ্ডারই জিতত।

একটা আশ্চর্যজনক ঘটনার কথা বলি:

নাসীরউদ্দীন হায়দারের শাসনকাল একটা আজব ঘোড়া ছিল— বুনো হিংস্র জন্তুর চেয়েও ভয়ংকর। কাছে যেতে কেউ সাহস করত না; খাবার দেওয়া হত দূর থেকে। একবার যদি ছাড়া পেত, তাহলে আর রক্ষে থাকত না। সামনে যে পড়ত, মেরে, হাড়-পাঁজরা চিবিয়ে ফেলত, এমনভাবে লাশ বিকৃত করে দিত, চেনাই যেত না। কিছুতেই কিছু করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত স্থির হল: ওর ওপর

বাঘ ছেড়ে দেওয়া হোক !

বাঘেদের মধ্যে বাঘ, নাম তার 'ভূরিয়া'। প্রচুর বাজি জিতেছে। বাদশাহর অত্যন্ত প্রিয়। তাকেই ছেড়ে দেওয়া হল। বাঘ দেখে ঘোড়ার ভয় পাবার কথা। উল্‌টে, এ-ঘোড়া লড়বার জন্যে তৈরী হয়ে গেল। বাঘ যেমনি লাফ মেরে ওর ওপর গিয়ে পড়া, অমনি ঘোড়া দেহের সামনেটা দিলে নামিয়ে ; বাঘ পড়ে গেল পেছন দিকে, আর ঘোড়ার মাংসপেশীতে খঞ্জরের মত নখ বসিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে অশ্ববর এমন চাট্ মারল, কলাবাজী খেয়ে গড়াতে-গড়াতে বাঘ গিয়ে পড়ল দূরে। সামলে নিয়ে, কয়েক মিনিট এদিক-ওদিক ঘুরে, আবার লাফ দিয়ে পড়ল ঘোড়ার ওপর ; পুনশ্চ, ঘোড়াটা একই কায়দায় সম্মুখ-দেহ নীচু করে দিল। বাঘ গিয়ে পড়ল পেছনে ; ভাবল, এবার থাবা মেরেই এটাকে ফেলে শেষ করব। কিন্তু ঘোড়ার চাট্ এবারে এতো জোর হল, বাঘের চোয়ালপাটি ভেঙ্গে চৌচাক্‌লা, চার পা ওপর দিকে তুলে ছিট্‌কে পড়ল দূরে। চাটের চোটে কাহিল বাঘ তখন ঘোড়ার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গেল। যারা তামাশা দেখছিল, হতবাক হয়ে গেল !

এরপর একটা বড়ো বাঘকে ছেড়ে দেওয়া হল। সে-তো সামনেই এলোনা। নাচার হয়ে বাঘটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। এবার তিনটে বুনো মোষ একসঙ্গে। তিনের একজনও ধারে-কাছে আসতেই চায়না। তখন সেই সাংঘাতিক ঘোড়া নিজেই এগিয়ে গিয়ে, বিনা বাক্যব্যয়ে, একটা মোষকে এ্যায়সা চাট্ ঝাড়ল, সঙ্গে-সঙ্গে তার বারোটা বেজে গেল। বাকি দুজন এমনভাবে মাথা দোলাতে লাগল, —যেন ঘোড়াটারই প্রশংসা করছে : হ্যাঁ, এইতো !

শেষ পর্যন্ত ঘোড়াটাকে ছেড়েই দেওয়া হল। নাসীরউদ্দীন হায়দার বললেন, "এরজন্যে আমি একটা লোহার খাঁচা বানিয়ে দোব, খাওয়া-দাওয়ারও সব ব্যবস্থা করে দোব। বাপের দিব্যি, বড়ো বাহাদুর ঘোড়া" —"অব্বাজানকে সর কী কসম ইয়ে বড়া বহাদুর হ্যয়্।"

2 চিতা

জানোয়ার মাত্রকেই লড়াইয়ের দু-একদিন আগে থেকে উপবাসী রাখতে হয়। চিতার ক্ষেত্রে এবিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখার দরকার হয়। কারণ, চিতা যতোটা হিংস্র ও ক্রূর, কখনও-কখনও ততোটাই ভীতুও হয়ে ওঠে। বিগড়ে-যাওয়া আমীরজাদাদের মতোই তারা তখন 'খুশামদপসন্দ্' (খোশামোদপ্রিয়)। ময়দানে নেমে, ইচ্ছে হল, লড়ল, যদি না হল তো লাখ জবরদস্তিতেও লড়বেনা।

লড়াইয়ের কায়দাও আছে। প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বীকে এড়িয়ে যেতে থাকে, তারপর হঠাৎ আক্রমণ করে। প্রথমে লাফ মেরে পরস্পরকে জখম করার চেষ্টা চলে। কয়েকবার এইরকম করার পর দুজনেই পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাবা দিয়ে লড়তে থাকে। সে এক ভয়ংকর রক্তারক্তি লড়াই! দুজনে গর্জন করতে-করতে পরস্পরকে থাবা মারে তো মারতেই থাকে। শেষে, জোর যার সে দুর্বল জনকে ফেলে দিয়ে চাঁটি মারতে-মারতে শেষ করে ফেলে। তার নিজেরও পা থেকে মাথা পর্যন্ত তখন ক্ষতবিক্ষত।

3 তেঁদুয়া (কালোচিতা)

'তেঁদুয়া' ছোট সাইজের বাঘ। শোনা যায়, লখনউয়ে এমন কালো-চিতা ছিল, যারা বাঘের সঙ্গে ভয়ংকর লড়াই করত, এবং প্রায়ই তাদের হারিয়ে দিত। এদের লড়াই ঠিক বাঘেরই মতো। লড়তে-লড়তে প্রতিদ্বন্দ্বী দুজন খুব ঘায়েল হয়ে যেত। পরাজিত যেজন, লড়াইয়ের ময়দানেই পড়ে মরে যেত। কখনওবা, দুশমনের কাছে হেরে পালিয়ে যেত রণে ভঙ্গ দিয়ে।

4 হাতী

লখনউয়ে হাতীর লড়াই খুব জনপ্রিয় ও চিত্তাকর্ষক ছিল। এই শখ ক্রমে এতো বেড়ে গিয়েছিল, বাদশাহ নাসীরউদ্দীন হায়দারের সময়ে দেড়শো লড়ায়ে-হাতী ছিল। বাহন হিসেবে এরা উপযুক্ত ছিলনা। লড়াইয়ের জন্যে হাতীর মাতাল হওয়া দরকার। মাতাল না হওয়া পর্যন্ত এরা লড়ে না। যদি লড়েও, তবে দুশমনকে হারানোর এবং জয়লাভের উপযোগী গরম-মেজাজটা ঠিক আসেনা।

লড়াইয়ের সময় হাতীর ঘাড় থেকে লেজ বরাবর একটা মোটা দড়ি বেঁধে দেওয়া হয়। মুখোমুখী হতেই দুজনে লেজ ও শুঁড় তুলে, প্রচণ্ড বৃংহিত ধ্বনির সঙ্গে, পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ও প্রবল ধাক্কা দিতে থাকে। ধাক্কাধাক্কি চলতেই থাকে। অনেক দূর থেকে তার শব্দ শোনা যায়। এরপর শুরু হয়—মুখের কাছে মুখ এনে, দাঁতে দাঁত লাগিয়ে—র‍্যালা আর গুঁতোগুঁতি। এই সময়, দুটো দেহ যেভাবে চক্কর খায়, তা থেকেই বোঝা যায়, কতোটা জোর এতে লাগে। 'ফিলবান' (মাহুত) অংকুশ মেরে-মেরে আরও তাতিয়ে দিতে থাকে। অবশেষে, একজন কমজোর হয়ে যায়; র‍্যালার চোট্ সহ্য করতে না পেরে পড়ে যায় মাটিতে। বিজয়ী হাতী তখন দাঁত দিয়ে তার পেট ফাটিয়ে মেরে ফেলে। তবে, পরাজিত হাতী প্রায়ই শক্তিহীন হয়ে পড়ামাত্রই দাঁত ছাড়িয়ে নিয়ে পালায়। বিজেতা তখন তার পেছনে তাড়া করে। ধরতে যদি পারল তো ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দাঁত দিয়ে পেট চিরে একেবারে শেষ করে দিল। আর, হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল তো বেঁচে গেল।

লখনউয়ে হাতীর সঙ্গে গণ্ডারকেও লড়ানো হত। মুশকিল এই, ওরা পরস্পর কিছুতেই লড়তে চাইতনা। তবে, যদি কখনও চাইত, তাহলে সে লড়াই হত সাংঘাতিক। হাতী যদি গণ্ডারকে ধাক্কা দিয়ে উলটে দিত তো পেটে দাঁত বসিয়ে মেরে ফেলত। আর গণ্ডার যদি

সুযোগ পেয়ে ওপরের শিংটা হাতীর পেটে ঢুকিয়ে দিতে পারত তো অনেকখানি চামড়া ফেটে যেত। তবে, হাতী তার শুঁড় দিয়ে গণ্ডারকে ঠেকাত, তার শিংকে খুব কাছে আসতে দিতনা, এবং এই-ভাবে আত্মরক্ষাও করত।

5 উট

তুনিয়ার সব প্রাণীই লড়তে পারে। কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে উটের চেয়ে অযোগ্য পশু বোধহয় আর নেই। লখনউয়ে সেই উটকেও ক্ষেপিয়ে মাতাল করে তুলে লড়ানো হত। ওদের কাছে সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হল—পড়ে-যাওয়া। আর, সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল : উটের কামড়।

উটের তেজ বোঝা যায় কফ্ বেরোনো এবং ফ্যানা ওড়ানোয়। কফ্ বার করতে-করতে ওরা দৌড়য়, গালাগালি দিতে থাকে, বক্‌বক্ করতে থাকে, পরস্পরের মুখের ওপর থুথু দিতে থাকে, ফ্যানা ওড়ায় —লড়াই শুরু হয়ে যায়। মওকা পেলেই প্রতিদ্বন্দ্বীর লট্‌পটে ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ও সজোরে টানতে আরম্ভ করে। যে-উটের ঠোঁট তার শত্রু দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে নেয়, সে প্রায়ই পড়ে যায় ও হেরে যায়। লড়াইও তখন শেষ হয়।

6 গণ্ডার

গণ্ডারের চেয়ে শক্তসমর্থ জানোয়ার আর নেই। আকৃতিতে বাঘ ও হাতীর চেয়ে ছোট ; কিন্তু এমন লোহার মতো শরীর, তাতে না বসে হাতীর দাঁত, না বসে বাঘের নখ বা থাবা। শুধু পেটের চামড়াটাই নরম। ঠিক ওই জায়গায় আঘাত দিতে পারলে তবে মেরে ফেলা যায়। কিন্তু সেই চেষ্টা করতে-করতেই প্রতিপক্ষের শক্তি যায় ফুরিয়ে। গণ্ডার তখন তার নাকের ওপরের জবরদস্ত

শিং তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে মেরে ফেলে।

লখনউয়ে, গণ্ডার লড়ানো হত হাতী-বাঘ-চিতা এবং খোদ গণ্ডারের সঙ্গে। গাজীউদ্দীন হায়দার বাদশাহর সময়ে, লড়াই ছাড়াও, কিছু গণ্ডারকে ভালো ট্রেনিং দিয়ে গাড়ীতে জোতা হত; হাতীর মতো পিঠে হাওদা বেঁধে তারা সওয়ার নিয়ে যেত। গণ্ডারের স্বভাব ঠিক লড়াকু-জানোয়ারের নয়; যতোদূর সম্ভব, লড়াইকে এড়িয়ে চলে। তবে হ্যাঁ, বিরক্ত করলে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত, এবং জংগী হয়ে ওঠে। নাসীরউদ্দীন হায়দারের রাজত্বকালে লড়াইয়ের জন্যে পনেরো-কুড়িটা গণ্ডার ছিল। তারা থাকত চাঁদগঞ্জে। ট্রেনাররা দুজনকে 'রগ্‌ড়ে দিয়ে' মুখোমুখী করে দিত; ওরা পরস্পরের দিকে দৌড়ে-গিয়ে ধাক্কাধাক্কি করত। দুজনেই চেষ্টা করত, প্রতিপক্ষের পেটের চামড়া শিং দিয়ে ফাটিয়ে দিতে। এই চেষ্টাতেই পরস্পর টক্‌কর, ঠ্যালা, ধাক্কাধাক্কি, গর্জন, শিংয়ে-শিংয়ে ঠোক্কর; শেষে, মাথায় মাথা লাগিয়ে গুঁতোগুঁতি ও ঠেলাঠেলি। যেজন দুর্বল হয়ে পড়ত, আস্তে-আস্তে পিছু হটে যেত। যদি বাঁচতে পারত তো পালাত। কিন্তু যে জিতত, সে রগ্‌ড়ে-রগ্‌ড়ে মার দিত। কমজোরী যে, সে তখন শিং ছাড়িয়ে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে মার দৌড়। মাঠ যদি ঘেরা হত, তাহলে বিজেতা পলায়নপর শত্রুকে আক্রমণ করে করে ফেলে দিত, এবং পেটে শিং ঢুকিয়ে মেরে ফেলত। মাঠ যদি বড়ো খোলামেলা হত, এবং পরাজিত-গণ্ডার পালাতে পারত, তাহলে জানে বেঁচে যেত। সেই সময় রক্ষকরা গরম শলাকা ঠুঁসে-ঠুঁসে মারতে মারতে বিজেতাকে সরিয়ে নিয়ে আসত; পরাজিতের পিছু-ছোটা থেকে বিরত করত।

গণ্ডারের লড়াইয়ের মূলমন্ত্র হল: মাথা নীচু করে রাখবে, এবং পেট বাঁচাবে। যদি ধোঁকা খেয়ে মাথা উঠে গেল তো দুশমন নিজের কাজ মুহূর্তে হাসিল করে নেবে। একবার হয়েওছিল এইরকম। একটা গণ্ডার জিতে গেল, তার প্রতিপক্ষ পালাতে লাগল হার স্বীকার ক'রে। তাই না দেখে, বিজয়ী বীর যেই

মাথা তুলেছে, সঙ্গে-সঙ্গে পরাজিত গণ্ডার বিদ্যুতের মতো দৌড়ে এসে তার পেটে মাথা ঢুকিয়ে পেট একেবারে ফাটিয়ে দিল !

7 হরিণ

হরিণ ছোট্ট, সুন্দর, লাজুক পশু। বোধহয় লখনউ ছাড়া আর কোথাও আমোদের জন্যে, এদের দিয়ে লড়ানো হয় না। তবে, এদের লড়াই খুব সুন্দর। জটিল ও বড়ো শিং, তাই নাম 'বারোশিংগে'।

কবিরা প্রেমিকার সঙ্গে হরিণের উপমা দেন। এদের লড়াইয়েও প্রেমিক-প্রেমিকার মতো হাবভাব প্রকাশ পায়। মুখোমুখী হয়ে দুজনে প্রথমে পাঁয়তাড়া কষে। সে দৃশ্য অদ্ভুত রমণীয়। তারপর চলে 'টক্কর'—শিং তখন কখনও ঢাল, কখনও তলোয়ার। বেশ অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর দুজনের শিং পরস্পর এমন জড়িয়ে যায়, মনে হয়ঃ যেন একটা ছোট্ট ঝোপ তৈরি হয়ে গেছে। এরপর আবার টক্কর ও র‍্যালা। এই করতে করতে একজন শক্তিহীন হয়ে পড়ে। পরাজয়ের আতঙ্ক তাকে এমনভাবে ঘিরে ধরে, যে, সরু সরু পা থরথর করে কাঁপতে থাকে, কেঁপে কেঁপে ওঠে সারা শরীর। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী নির্দয়—জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলতে-ঠেলতে শত্রুকে নিয়ে যায় ময়দানের শেষ প্রান্তে। হেরে-যাওয়া হরিণের তখন সব আশা ফুরিয়ে যায়, দুচোখ দিয়ে দরদর অশ্রু ঝরে পড়ে, শিং থেকে টপ্ টপ্ ঝরে পড়ে রক্তের বিন্দু। তখন, কোনরকমে শিং ছাড়িয়ে নিয়ে লড়াইয়ে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়ে না, শিং দিয়ে তার শরীরে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকে। পরাজিত হরিণ দ্রুত পালাতে থাকে। যতো জোরে পালায়, ততো জোরে বিজেতা ওর পিছু তাড়া করে। এই দৌড় দেখবার মতো। দুজনে ছোটে হাওয়ার সঙ্গে। দেহের ওপর দিয়ে দৃষ্টি পিছলে পিছলে যায়। কিন্তু তবু, নিষ্ঠুর শত্রু পরাজিত প্রতিপক্ষের পশ্চাৎ-ধাবন থেকে নিবৃত্ত হয় না ; যেখানে পায়, অনিবার্য ঘাতকের মতো গিয়ে পড়ে। মারতে-

মারতে একেবারে মেরে ফেলে। মরে গেলে, মৃতদেহটাকে শিং দিয়ে ঝাঁঝরা করে দেয়। তারপর সরে আসে। অহংকার প্রকাশ করে জয়লাভের গৌরবে।

8 ভেড়া

মেঁঢ়া, মেড়া, বা ভেড়া। নেহাৎই সাদাসিধে ও নিরীহ পশু। কিন্তু এর টক্‌কর, সে এক জবরদস্ত ব্যাপার! মনে হয়, যেন দুটো পাহাড় লড়াই করছে। বস্তুত, এই টক্‌কর দেখবার জন্যেই লোকেরা এদের লড়ায়, আজ বলে নয়, অনেক প্রাচীন কাল থেকেই। হিন্দুস্তানে ভেড়ার-লড়াই আমদানী করে বালুচরা; এরাই এই শখকে অন্যত্রও রফ্‌তানী করে।

ভেড়ার পালন-পোষণ, যুদ্ধকৌশল-শিক্ষা—এসবের ভার কসাই ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের ওপর থাকত। আমীর ও সামন্তরা ডাকিয়ে এনে লড়াইয়ের তামাশা দেখত। কথিত আছে, নবাব আসফউদ্দৌলা এবং সাদত আলী খাঁ ভেড়ার লড়াই দেখতে ভালবাসতেন। গাজী-উদ্দীন হায়দার ও নাসীরউদ্দীন হায়দারের সামনেও ভেড়ার লড়াই হত। ওয়াজিদ আলী শাহর কলকাতা-প্রবাসেও এই শখ কিছুদিন ছিল। মুনশী-উস্‌সুলতান বাহাদুর কসাইদের তত্ত্বাবধানে ভেড়াদের অনেকগুলি 'জুটি' সর্বদা প্রস্তুত রাখতেন; এরা বাদশাহর মনোরঞ্জন করত।

জবরদস্ত ভেড়ার টক্‌করের দাপটে প্রতিপক্ষের মাথা ফেটে গেছে—এ আমি কতোবারই দেখেছি। ভেড়া যখন প্রতিদ্বন্দ্বীর এই ধাক্কা সহ্য করতে পারেনা, যখন হেরে যেতে থাকে, তখন টক্‌কর থেকে বেরিয়ে পালাতে থাকে। এখনও আমার মনে আছে—একবার বছরের এক নির্দিষ্ট দিনে বাদশাহর চিঁড়িয়াখানা দেখবার জন্যে কলকাতার কয়েকশত ইংরেজ এসেছিল। বাদশাহ-সলামত স্ব-মর্যাদা-বিরোধী 'বুচা'য় [1] সওয়ার হয়ে বেরিয়ে এলেন, এবং সমাগত

[1] পাল্‌কি-ডোলী জাতীয়।

অতিথিদের আনন্দদানের জন্যে ভেড়ার লড়াইয়ের আদেশ দিলেন। ভেড়া এল। শুরু হল সশব্দ টক্‌কর। তার চেয়েও উচ্চগ্রামে কণ্ঠস্বর তুলে খুশির, হুর্‌রের শোরগোল বাধিয়ে দিল ইংরেজরা। দর্শকদের মধ্যে সে-কী উৎসাহ!

লখনউয়ে নবাবী শাসনের পতনের পরেও নবাব মোহসিনউদ্দৌলা বাহাদুরের অত্যন্ত প্রিয় ছিল এই লড়াই। বর্তমানে শরিফ ও আমীররা এ-খেলার শখ ছেড়ে দিয়েছে। যেটুকু আছে, সে শুধু নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে।

॥ 17 ॥

লখনউয়ে, বন্য চতুষ্পদীদের লড়াই রাজকীয় ও আমীরী দরবার পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। তার কারণ: এদের দেখাশোনা, তৈরি করা, লড়াইয়ের সময় সামলানো, বদমেজাজী আঘাত থেকে বাঁচানো—এসব এমন ব্যাপার, গরীবদের কথা ছেড়েই দিন, বড়ো-বড়ো আমীরেরও ক্ষমতার বাইরে। তাই যতদিন দরবার ছিল, ততদিনই এদের লড়াইয়ের তামাশা। দরবার বরখাস্ত হয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল সেইসব ভয়ংকর দংগল তথা লড়াইও।

কিন্তু দ্বিপদী পাখিদের লড়াই তা নয়। এ-শখ আমীর-গরীব, সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। যে-কোন শৌখীন ব্যক্তি একটু খেটেখুটে লড়াইয়ের যোগ্য মোরগ বা বটের তৈরি করতে পারত। সে সময়ে লখনউয়ে যে সব পাখি লড়ানো হত, সেগুলি হল: (1) মোরগ, (2) বটের, (3) তিতির, (4) লবা, (5) বুলবুল (6) লাল, (7) কবুতর, এবং (8) তোতা। প্রত্যেকটা খেলার আলাদা-আলাদা বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন।

লখনউয়ে 'কবুতরবাজী' ও 'বটেরবাজী' জনসমাজে জনপ্রিয়। এ নিয়ে আজকালকার শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবানরা প্রায়ই হাসাহাসি

করে থাকেন। কিন্তু ওঁরা জানেন না, এখানকার লোকেরা এই খেলার প্রত্যেকটিকে কৃতিত্বের কোন্ পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে দান করেছিল স্থায়ী কলারূপ। ওঁরাই যখন য়োরোপ গিয়ে এই রকম 'বেহুদা' শখের মেলা দেখবেন, তখন স্বদেশী শৌখীনদের উদ্দেশ্যে যেসব শব্দ নিঃসংকোচে ব্যবহার করে বসেন, তার জন্যে নিশ্চয়ই লজ্জিত হবেন।

1 মুর্গ্‌বাজী (মোরগের লড়াই)

যদিও সব জাতের, সব ধরণের মোরগ লড়ে, তবু খাস লড়াকু হল 'অসীল' (কুলীন) মোরগ। এর চেয়ে বাহাদুর প্রাণী দুনিয়ায় আর দ্বিতীয় নাস্তি। এমনকি, বাঘও না। এরা মরে যাবে, তবু লড়াই থেকে মুখ ফিরিয়ে পিঠ দেখাবে না। এই 'অসীল-মোরগ' সম্বন্ধে গবেষকদের সিদ্ধান্ত : এদের পূর্বপুরুষ এসেছিল আরব থেকে। অসম্ভব নয়। কারণ, অসীলের যতোরকম অভিজাত 'নস্‌ল্' (কুল), তার সবগুলি ও সবচেয়ে বেশি এখন আছে হায়দরাবাদ-দাক্ষিণাত্যে। আর কোথাও নেই। এবং, হিন্দুস্তানের ওই একটিই শহর, যেখানে আরবরা বাস করে সবচেয়ে অধিক সংখ্যায়। উত্তরভারতীয় মোরগের আদিপুরুষ এসেছে ইরাণ হয়ে।

লখনউয়ের খ্যাতনামা মোরগবাজদের অন্যতম এক ব্যক্তির মোরগ লড়াইয়ে হেরে যায় ; তাঁর ধারণা : এ-পরাজয় হঠাৎ-ই, সংযোগবশে। আশাহত ও দুঃখ-অভিহত হয়ে তিনি চলে যান ইরাক। সেখানে, 'নজফ-এ-অশরফ'-এ কয়েক মাস ধরে 'ইবাদত' (উপাসনা) ও 'দুয়া' (বর) ভিক্ষা করতে থাকেন, আর প্রার্থনা করেন : 'হে খোদাবন্দ! নিষ্পাপ ইমামের দোহাই! আমাকে এমন একটা মোরগ পাইয়ে দিন, যে লড়াইয়ে কখনও কারও কাছে হারবে না।' এক রাতে, স্বপ্নমাধ্যমে এল 'খুশ্‌খবর' : 'জংগলে যাও।' ভোরে চোখ মেলেই সাহেব ধরলেন বনের পথ, সঙ্গিনী একটি মুর্গী। হাঁটছেন তো হাঁটছেনই। হঠাৎ পাহাড়ী পথে আওয়াজ ভেসে এল

'কোঁকড় কোঁ'। সাহেব তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে মুর্গীকে ছেড়ে দিলেন। মুর্গীর ডাক শুনে মোরগ বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে সাহেব কৌশল করে ধরে ফেললেন। এর জাত এমন ছিল, যে, মোরগবাজকে আর কখনও রণক্ষেত্রে লজ্জায় পড়তে হয়নি।

নবাব শুজাউদ্দৌলার সময় থেকে শাহী শাসনের শেষদিন পর্যন্ত 'মুর্গ্‌বাজী'র শখ অব্যাহত ছিল। নবাব আসফউদ্দৌলার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এই খেলা। নবাব সাদত আলী খাঁ :খুব বুঝেসুঝে চলতেন, তবু মোরগবাজী খুব ভালবাসতেন। তাঁর শখ ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজেও। লখনউয়ের আমীর ও সভাসদরা তো বটেই, যে সব য়োরোপিয়ান সে সময়ে এখানে ছিল, তাদের মধ্যেও এই শখ জেগে উঠেছিল। জেনারেল মার্টিন, যাঁর বাড়ী এখন লখনউয়ের এক দর্শনীয় ইমারত এবং য়োরোপিয়ান শিশুদের পাঠশালা, উচ্চ শ্রেণীর মুর্গবাজ ছিলেন। নবাব সাদত আলী খাঁ এর সঙ্গে বাজী রেখে মোরগ লড়াতেন।

লখনউয়ের মোরগের লড়াইয়ের বিশেষ পদ্ধতি ছিল : মোরগের ঝুঁটি বেঁধে দেওয়া হত, যাতে কোন ক্ষতি না হয় ; ঠোঁট ছুরি দিয়ে ছুলে সরু ও ধারাল করা হত ; তারপর ছেড়ে দেওয়া হত, 'পালী'-তে (সীমাচিহ্নিত রণক্ষেত্রে) ; পেছনে-পেছনে থাকত মোরগবাজ। নিজের মোরগকে অন্য মোরগের মোকাবিলায় ছেড়ে দেওয়াও একটা আর্ট। কেননা, সবসময়ে চেষ্টা থাকে, আমার মোরগ যেন প্রথম চোট্‌ দেবার সুযোগ পায়! পালীতে দুই মোরগ—লড়াই শুরু হত ঠোঁট আর লাথি দিয়ে। মোরগবাবুরা স্ব-স্ব মোরগকে ক্ষেপাত, উত্তেজিত করত, আর চেঁচামেচি করত : "হাঁ, বেটা, সাবাস! হাঁ, বেটা, কাট্‌! ঠিক ওখানেই, আবার!" যুদ্ধের সেই 'ললকার', হুংকৃত চ্যালেঞ্জ মেনে নিয়ে মোরগ এগিয়ে গিয়ে ঠোঁট আর লাথি দিয়ে পবস্পরকে মারত। মনে হত, যেন মালিকের কথা সবই বুঝছে, আর সেইমতোই করছে। লড়তে-লড়তে যখন ঘায়েল ও চুর্‌ হয়ে যেত, তখন দুই পক্ষের সম্মতিতে, কিছুক্ষণের জন্যে, যোদ্ধাদের তুলে

নেওয়া হত। মোরগবাজদের অভিধানে একে বলা হত : 'পানী'। সে সময় মোরগবাজ তার সৈনিকের আহত শির মুছে দিত, তার ওপর জল ঢালত, ক্ষতস্থান চুষে নিত নিজের মুখ দিয়ে। এবং আরও নানারকম সব তদ্‌বির। কয়েক মিনিটের ভেতরেই মোরগদ্বয় তাজা হয়ে উঠত। তখন আবার ছেড়ে দেওয়া হত পালীতে। এইভাবে চলত লড়াই আর পানী, ক্রমান্বয়ে। লড়াই শেষ হত চার-পাঁচ দিন, কখনও-কখনও আট-ন দিন পরে। যখন কোন মোরগ অন্ধ হয়ে যেত, কিংবা এমন চোট খেত, যে, ওঠবার ক্ষমতাও থাকত না, কিংবা অন্য কোন কারণে লড়াইয়ের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলত, তাহলে ধরে নেওয়া হত : সে মোরগ পরাজিত নায়ক! প্রায়ই মোরগদের ঠোঁট ভেঙ্গে যেত। এই অবস্থাতেও, যতোদূর সম্ভব, ঠোঁট বেঁধে লড়ানা হত।

হায়দরাবাদের খেলা কিন্তু অত্যন্ত কঠিন। ওখানে ঝুঁটি বাঁধা হয়না ; তার বদলে, ছুরি দিয়ে চেঁচে বর্শার মতো সূচ্যগ্র করে দেওয়া হয়। তার ফলে, একঘণ্টা দেড়ঘণ্টার মধ্যেই লড়াইয়ের ফয়সলা হয়ে যায়। লড়াই যাতে অনেকক্ষণ চলে, এবং দীর্ঘক্ষণের আনন্দ পাওয়া যায়, বোধহয় সেইজন্যেই লখনউয়ে ঝুঁটি বেঁধে দেওয়ার নিয়ম চালু হয়েছিল।

লড়াইয়ের মোরগ তৈরি করার মধ্যেই মোরগবাজের সবিশেষ কৃতিত্ব। তার খাওয়া দাওয়া, দেখাশোনা করা ছাড়াও, শরীর মালিশ এবং 'ফুঙ্গ' অর্থাৎ ধারা-স্নান (শাওয়ার বাথ) প্রয়োজন। তারপর চোঁচ ও ঝুঁটি তৈরি করা, বা ঝুঁটি বাঁধা ; এবং শরীর টান্‌টান্‌ ও মেজাজ শরীফ্‌ করে দেওয়া। মাটি থেকে দানা খুঁটে খেতে গিয়ে ঠোঁটের কোন ক্ষতি যাতে না হয়, তাই অনেক সময় হাতে করেই দানা খাওয়ানো হয় লড়াকু-মোরগকে।

এ-শখ খুব জোরদার ছিল ওয়াজিদ আলী শাহ পর্যন্ত। মেটিয়া-বুরুজে নবাব আলী খাঁর বাড়িতে মোরগ প্রতিপালিত হত। কলকাতা থেকে কয়েকজন ইংরেজও নিজেদের মোরগ নিয়ে আসত লড়াবার

জন্যে। বাদশাহ, তাছাড়া অনেক রইসেরও মোরগবাজীর শখ ছিল। মির্জা হায়দার, বহু বেগম সাহিবার ভাই নবাব সালারজংগ, হায়দার বেগ খাঁ, নাসীরউদ্দীন হায়দারের সমকালীন মেজর সোয়ারিস, এবং বাদশাহ—এঁদের মোরগের মধ্যে লড়াই হত। আগা বুরহানউদ্দীন হায়দারও মোরগবাজী-প্রিয় ছিলেন। তাঁর বাড়িতে শেষদিন পর্যন্ত তুশো-আড়াইশো মোরগ থাকত। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা হত; দেখাশোনার জন্যে দশ-বারোজন লোক নিযুক্ত ছিল। মিয়াঁ দারাব আলীরও খুব শখ ছিল। নবাব ঘসীটা আমৃত্যু এই শখকে জীইয়ে রেখেছিলেন। মালিহাবাদের উচ্চপদস্থ পাঠানদেরও প্রিয় ছিল খেলাটি। এদের কাছে খুব বড়ো জাতের 'অসীল-মোরগ' ছিল। আপন কলায় পারদর্শী বহু বিখ্যাত মোরগবাজও ওখানে বিদ্যমান ছিলেন। যেমন মীর ইমদাদ আলী, শেখ ঘসীটা মুনব্বর আলী। শেষোক্তজনের কৃতিত্ব ছিল, আওয়াজ শুনেই বলে দিতে পারতেন, কোন্ মোরগ বাজী জিতে নেবে। সফদর আলী, এবং প্রথম কোটির পেন্‌শন্‌ভোগী সৈয়দ মীরন সাহেবও বিখ্যাত ছিলেন। শেষ পর্বের প্রসিদ্ধ মোরগবাজঃ ফজিলে আলী জমাদার, কাদির জীবন খাঁ, হুসেন আলী, নওরোজ আলী, মিয়াঁ জান, দিল, ছংগা, হুসেন আলী বেগ, এহমদ হুসেন, নবাব মুহম্মদ তকী খাঁ (যিনি এখানকার একজন বড় রইস ছিলেন) এঁদের কেউই এখন আর বেঁচে নেই।

এইসব ব্যক্তিই মুর্গবাজীর কলাকে তার শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আমার ধারণাঃ হায়দরাবাদ দাক্ষিণাত্যেই আজকাল মুর্গবাজীর বাড়বাড়ন্ত। ওখানকার অনেক আমীর, জায়গীরদার, মনসবদারের শখ যেমন অফুরান, তেমনি ওদের কাছে যে জাত-মোরগ আছে, যাদের খুব তদারক করা হয়, তারা অদ্বিতীয়।

2 বটেরবাজী (বটেরের লড়াই)

বটেরবাজীর শখ লখনউয়ে এসেছে পঞ্জাব থেকে। পঞ্জাবের কয়েকঘর 'কাঞ্চন'—যাদের স্ত্রী বেশ্যাবৃত্তি করে—নবাব সাদত আলী খাঁর শাসনকালে এখানে আসে। সঙ্গে করে নিয়ে আসে 'ঘাঘস'-বটের। এদের ওরা লড়াত। এখনকার কয়েকজন নামকরা বেশ্যা এই কাঞ্চনদের বংশজাতা।

বটের হয় দুজাতের—'ঘাঘস' ও 'চনংগ'। পাঞ্জাবে কেবল ঘাঘস-বটেরই পাওয়া যায়। চনংগের তুলনায় এরা অনেক শক্তিশালী। লখনউয়ে ঘাঘস ও চনংগ, দুইই আছে। চনংগ আকারে ঘাঘসের চেয়ে ছোট, নাজুকও ; কিন্তু লড়াইয়ে বেশি মজবুত ও সজীব। এদের লড়াই খুব সুন্দর ও জমাটি। ঘাঘস বটের জবরদস্ত ও শক্তিধর কিন্তু লড়াবার জন্যে চনংগ-বটেরই যে বেশি উপযুক্ত. এ তথ্য আবিষ্কৃত হয় লখনউয়েই।

বটেরের লড়াইয়ের জন্যে কোন বড়ো ময়দানের দরকার হয় না। ঘর থেকে বাইরের প্রাঙ্গনে আসারও না। ঘরের ভেতরেই পরিষ্কার মেঝের ওপর সভ্যভব্য হয়ে বসে ওদের লড়াই দেখা যায়। একারণে খেলাটি লখনউ সমাজের খুব পছন্দ। বটেরদের জন্যে খুব সুন্দর ও সূক্ষ্ম কাজকরা 'কাবুক' (কাঠের বাক্স) তৈরি করা হত, হাতীর দাঁতের ছোট-ছোট টুকরো দিয়ে সাজানো। তার মধ্যে বটের রাখা হত।

বটের-খেলার প্রথমে 'মুঠ'—জলে ভিজিয়ে হাতের মুঠোয় অনেকক্ষণ রেখে দিতে হয়। তারপর ওর হতভম্ব ভাব চলে যায়। তখন কথা বলতে থাকে। ঠোঁট দিয়ে ঠোকরাতে থাকে। শরীরকে দুরস্ত করার জন্যে বটেরকে ভরপেট খাওয়াতে নেই, মিশ্রীর মতো দাস্ত সহায়ক জিনিস খাওয়াতে হয়। অতঃপর মাঝ রাতে কানের মধ্যে 'কূ' করে চেঁচাতে হয়। একে বলে 'কূকনা'। এই জাতীয় তদ্‌বিরে বটেরের চর্বি খসে যায়, কাহিলভাব চলে যায়, শরীরের শক্তিও

ক্ষিপ্রতা বাড়ে। এইভাবে ওদের প্রস্তুত করে তুলতে হয়। তদ্‌বির তদারক যতো বেশি ও যতো ভালো হবে, লড়াইয়ের পক্ষে ততোই উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

লড়াইয়ের সময় মেঝের ওপর চারদিকে হালকা হালকা দানা ছিটিয়ে দেওয়া হয়। বটের বেরিয়ে আসে খাঁচা থেকে। দুই বটেরের ঠোঁট ছুরি দিয়ে চেঁচে ধারালো করে দেওয়া হয়, তারপর ছেড়ে দেওয়া হয় মুখোমুখী। বটেরের লড়াই অনেকটা মোরগের লড়াইয়েরই মতো—ঠোঁট দিয়ে ঠোক্কর, থাবা দিয়ে লাথি মারা। বটের ঠোঁট দিয়ে প্রতিপক্ষের মুখ একেবারে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়, কখনও-কখনও থাবা মেরে তার পোঁটা পর্যন্ত ফাটিয়ে দেয়। লড়াই চলে পনেরো-বিশ মিনিট বা তার কিছু বেশি। যে হেরে যায়, সে পালিয়ে বাঁচে, এবং তারপর আর কোন বটেরের সঙ্গে লড়তে চায় না।

বটেরদের লড়াকু করে তোলার তিন স্তর, সেই অনুযায়ী তাদের তিন নামও ঃ প্রথম তো 'নয়া'—যাদের আনকোরা ধরে এনে লড়ানো হয়। যদি দেখা যায়, লড়াইয়ে জিতে যাচ্ছে, এবং হেরে পালাচ্ছে না, তাহলে যুদ্ধ-কাল শেষ হতেই তাকে রাখা হয় সাধারণ খাঁচায়। এই সময়ে ওদের পুরনো পালক খসে গিয়ে নতুন পালক গজাতে থাকে। একে বলে 'কুরীয বিঠানা।' দ্বিতীয় স্তরের প্রস্তুতি। বটেরের নাম তখন 'নোকার'। তৃতীয় বছরে আর একবার 'কুরীয' বসিয়ে যুদ্ধের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরী করে দেওয়া হয়। এরা হল সত্যিকারের 'কুরীয'—সর্বোচ্চ স্তরের, সবচেয়ে বাহাদুর বটের।

সাধারণভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে, যে, 'নয়া'-র তুলনায় 'নোকার,' এবং 'নোকার' এর তুলনায়, 'কুরীয' লড়াইয়ে অনেক বেশি দক্ষ ঠোঁটের জন্যেই নয়ারা কুরীযের সঙ্গে ঠিকভাবে লড়তে পারে না। শৌখীন রইস এবং উচ্চ শ্রেণীর বটেরবাজরা শুধু কুরীয বটেরদেরই লড়ায়। নয়া বটেরদের লড়াই খুবই মামুলী খেলা। লড়াইয়ের সময়ে এদিক ওদিক কিছু জাল-ফাঁদের ব্যবস্থাও থাকে। কেউ কেউ নিজেদের বটেরের মুখে তিক্ত বা বিষাক্ত জিনিস বা আতর

মাখিয়ে দেয়। প্রতিপক্ষী বটের দু এক ঠোক্কর মেরেই পিছু হটে, এবং আর লড়তে চায় না, যদি লড়েও তো বাঁচে না। কিছু লোক আবার নেশার-খেলা খেলে—লড়াইয়ের এক ঘণ্টা আগে বটেরকে এমন উত্তেজক কিছু খাইয়ে দেয়, যে হেরে পালিয়ে যাওয়ার কথা তারা ভুলেই যায়, এবং যতক্ষণ না পালী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাড়িয়ে দিতে পারছে, পাগলের মতো লড়তে থাকে।

লখনউয়ের এই শখ জন্ম দিয়েছিল এমন সব দক্ষ বটেরবাজের, অন্যত্র যাদের জুড়ি পাওয়া ভার। এমন ওস্তাদ লোকও এখানে ছিল, যারা নামী-দামী বটেরকে একনজর দেখেই অন্য এক সাধারণ বটেরকে হুবহু তার মতো চেহারা করে দিত; তারপর, কথায় কথায় হাতসাফাইয়ের কৌশলে বদলা-বদলি করে নিত। এটা তো সোজা চুরি! আবার, এমন ওস্তাদও ছিল, পলাতক-বটেরকে ও তৈরি করে নিয়ে আচ্ছা-আচ্ছা 'কুরীয'—বটেরদের সঙ্গে লড়িয়ে বাজী জিতে নিত। নেশা করিয়ে যারা খেলাত, তাদের মধ্যে এক সাহেব এক ধরণের তেজস্ক্রিয় গুলি (ট্যাবলেট) তৈরি করত! একশো টাকায় দশটা গুলি। শখের জন্যে লোকেরা কিনে নিয়ে যেত।

এইসব লোকেদের ওস্তাদীর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় পাওয়া যায় বটেরের চিকিৎসায়। ছোটখাট শরীর খারাপ তো বটেই, বড়ো-বড়ো অসুখেও এমন ওষুধ দিয়ে সারিয়ে দেয়, এবং এমন-সব পথ্যের ব্যবস্থা করে যে, ডাক্তার-হাকিমও অবাক হয়ে যায়। পালিত বটেরের ডিম থেকে বাচ্চা তৈরির অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু ফল হয় নি।

বটেরদেরনামাবলী ও বড়ো চমকদার: রূস্তম, সোহরাব, শোহরা-এ-আফাক (জগৎ-প্রসিদ্ধ)। পালীতে বাজীও ধরা হয়। এক হাজার টাকা পর্যন্ত বাজী ধরতে আমি দেখেছি। কয়েকজন বাদশাহরও এই শখ ছিল। নাসীরউদ্দীন হায়দার তাঁর সামনে, টেবিলের ওপর বটেরদের লড়াই দেখতে ভালবাসতেন।

প্রাচীন বটেরবাজদের মধ্যে স্মরণীয়: মীর বচ্চু, মীর অমদু, খোজা হাসান, মীর ফিদা আলী, ছংগা, মীর আবিদ এবং সৈয়দ মীরন।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে মেঠিয়াবুরুজে দারোগা গুলাম আব্বাস, ছোটে খাঁ, এবং গুলাম মহম্মদ খাঁ খালিসপুরী প্রভৃতি বৃদ্ধদের এই কলায় পারংগমতা আমি দেখেছি। শেষ পর্বে খ্যাতিলাভ করেন : গালিব আলী বেগ, মির্জা আসাদ আলি বেগ, নবাব মির্জা। মিয়াঁ জান, শেখ মোমিন আলী ও গাজীউদ্দীন খাঁ।

বটের-শিকারও, লখনউবাসীদের কাছে একটা খুব মজার ব্যাপার। প্রথমে এটাও ছিল একটা শখ, যার দৌলতে দুবলা অসক্ত, ঘর কুনো লোকও—যারা কোনদিন শহরের বাইরে পা দেয় নি—এই উপলক্ষে, ক্ষেত ও জংগলের হাওয়া খেয়ে আসত! এখন এরই ওপর অনেকের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ভর করে।

কথিত আছে, বটেররা রাতে পাহাড় থেকে বেরিয়ে আকাশে উড়তে থাকে। শৌখীন শিকারী কিছু উচ্চকণ্ঠ-বটেরকে শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরি করে রাখে। তারা সারারাত চিৎকার করতে থাকে। এই বটেরের নাম 'ফঁছ্যত'। অড়হর ডালের ক্ষেতের আশপাশে জাল পেতে রাখা হয়। ফঁছ্যত এর ডাক শুনে ওপর থেকে বটেররা নেমে এসে ঝুপ্‌ঝাপ্‌ পড়তে থাকে। এইভাবে সমস্ত রাত ধরে অনেক বটের জড়ো হয়ে যায়। ভোর হতেই চারদিক থেকে হাঁকা-হাঁকি করে ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় জালের দিকে। জালে পড়ামাত্রই ধরে ধরে চুব্‌ড়িতে বন্ধ করে নিয়ে যাওয়া হয়।

3 তীতরের (তিতিরের) লড়াই

এটিও খুব আকর্ষণীয় খেলা। অন্য পাখিদের তুলনায় এদের কায়দা একটু অন্যরকম—'তীতর (তিতির) ফুড়ৎ ফুড়ৎ করে লড়ে। তবে, দেহাতী ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যেই খেলাটি জনপ্রিয়; আমীর ও শরিফরা এদিকে কোনদিন আকৃষ্ট হয়নি। তিতিরকে তৈরি করতে হয় ছুটোছুটি করিয়ে। তেজ ও ক্রোধ সৃষ্টির জন্যে উইপোকা খাওয়াতে হয়। তবে, এখেলা উঁচুদরের নয়; সভ্যসমাজেও

কোনদিন কোন মর্য্যাদা পায়নি। ওই নিম্নবর্গের লোকেদের মধ্যেই বহুল প্রচলিত ছিল, এবং এখনও আছে।

4 লবার লড়াই

ঝোপ-ঝাড়ের অধিবাসী লবা আকারে বটের-তিতিরের চেয়েও ছোট, এবং ওই জাতেরই। অন্য পাখিরা লড়াই করে দানার জন্যে, লবা লড়ে মাদীর জন্যে। তাই, ওদের লড়াতে হলে মাদীকে খাঁচায় করে এনে সামনে রাখতে হয়। রেওয়া ইত্যাদি রাজ্যের লোকেদের এই শখ খুব বেশি ছিল। লখনউয়েরও একদা পছন্দ হয়েছিল, এবং বেশ-কিছুটা স্বকীয়ও হয়ে গিয়েছিল। সত্যি বলতে কি, লবার লড়াই বটেরের চেয়েও সুন্দর হয়। এরা জান দিয়ে লড়ে, গুঁতোগুঁতি করে, ফুলের মতো ফুটে-ফুলে ওঠে, তারপর ঝরে পড়ে। লখনউয়ের কিছু আমীরের এই শখ ছিল। মেটিয়াবুরুজে ওয়াজিদ আলী শাহর সরকারে এক ওস্তাদ লবা-লড়ানেওয়ালা অনেক ভালো-ভালো জুটি তৈরি করেছিল। সামনে এনে যখন লড়াত, খুব মজা লাগত। ক্ষুধা এবং লুটোপাটি এদেরও লড়ুয়ে করে তোলে। বটেরবাজীর আগে থেকেই লবাবাজীর রেওয়াজ ছিল। পরে, বটেরবাজী শখ এতো বেড়ে গেল, তার কাছে লবাবাজীর মজা ফিকে হয়ে গেল।

এদের শিকার করার পদ্ধতিও অদ্ভুত। বটেরদের মতো এরাও ওপর-আকাশে উড়তে থাকে; এবং লোকেরাও বটেরের ফঁদেত এর মতো একটা কৌশল করে। ছাদের ওপর একটা ঘড়া বেঁধে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয় জমৃপেশ ঝাঁঝরী দিয়ে, সুতোয় বাঁধা ঘাসের একটা মিহি ডাঁটা ওই ঝাঁঝরীতে লাগিয়ে একধরণের ভোঁ-ভোঁ আওয়াজ বার করা হয়। এই আওয়াজ লবাদের এতো প্রিয়, উড়তে-উড়তে তারা নেমে পড়ে নীচে। সকালে, বটেরদের মতোই জালে ভিড়িয়ে দিয়ে ধরা হয় অধঃপতিতদের।

5 গুলদুম (বুলবুল ?)-এর লড়াই।

সাধারণ লোক 'গুলদুম'কে বলে 'বুলবুল'। এটা ভুল। কারণ, 'বুলবুল' হচ্ছে বদখ্‌শান ও ঈরানের এক গায়ক-পাখি। আর এই পাখির লেজের নীচে একটা লাল ফুল থাকে—নাম তাই 'গুলদুম' [1]। এদের লড়াইও দেহাতী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে অধিকতর প্রচলিত। সভ্য সমাজ একে কখনও সুনজরে দেখেনি। তবে, ওদের লড়াই খুব মজাদার। এরা লড়ে দানার জন্যে লড়তে-লড়তে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ওপরে উড়তে থাকে, তারপর গোঁতাগুঁতি করতে-করতে পড়ে যায়।

6 লাল লড়ানো

লাল খাঁচায় রেখে পোষবার পাখি, লড়াইয়ের ঠিক উপযুক্ত নয়। তবু, স্বার্থপর মানুষ এদেরও পরস্পর লড়িয়ে দিয়ে ক্ষণিকের আনন্দ লাভ করে। লালকে নিয়ে মুশকিলও আছে—খাঁচা থেকে বার করলেই উড়ে যেতে পারে। তাই, বিশেষ সাবধান হতে হয়। দ্বিতীয়ত, একে লড়বার জন্যে প্রস্তুত করে দিতে হলে প্রচুর মাতাল করে তোলা দরকার। ফলত, লড়ানোটাই মুশকিলের। তবে, যদিও যখন এরা লড়ে, উড়ে উড়ে, ঝটাপাটি ক'রে, অনেকক্ষণ ধ'রে লড়ে। এবং অন্যান্য ছোট পাখির তুলনায় এদের যুদ্ধ-কাল দীর্ঘতর। এ খেলার শখ লখনউয়ে জনপ্রিয় হয়নি। দু-একজন ওস্তাদ অবশ্য ছিল। কিন্তু সাধারণ রুচি এর প্রতিকূল ছিল। এবং এর পোষকও ছিল বাজারের লোক ও জনসাধারণ।

[1] গুল-ফুল; দুম-লেজ।

7 কবুতর বাজী

কবুতর বা পায়রা গৃহপালিত পাখি। পায়রার শখ সর্বজনীন, প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত সব দেশে, সব সমাজেই কিছু-না-কিছু ছিল। উড়ুক্কু 'গেরোবাজ' থেকে 'গোলা' পর্যন্ত, নানান জাতের পায়রা হয়। এদের পোষা হয় শুধু সৌন্দর্য ও বর্ণবিভঙ্গের জন্যে। কবুতর-সমাজে শীরাজী, গুলী, গোলা, লক্কা, নেশাবরী, লোটন, চুয়া-চন্দন ইত্যাদি বিখ্যাত। 'ইয়াহু' পায়রা রাতদিন বক্‌বকম্ করে, ডাকে 'ইয়াহু'। এই ডাকের জন্যে এরা উপাসকদের খুব প্রিয় ছিল, এবং ফকির ও শেখেরা প্রায়ই পুষত।

শোনা যায়, 'গিরহবায' (গেরোবাজ) এসেছে কাবুল থেকে। প্রথমে এদেরই ওড়াতো সবাই। গোলা এসেছে পরে; এদের পূর্ব-পুরুষরা থাকত আরব-ইরান-তুর্কিস্তানে। গেরোবাজদের বৈশিষ্ট্য হল: সকালে উড়িয়ে দিলে, বাড়ির ঠিক সামনে, আকাশে চক্‌কর লাগাতে থাকে। উঠোনে কোন পাত্রে জল ভরে রেখে দিন, তার মধ্যে ওদের প্রতিবিম্ব পড়বে থেকে-থেকে। কখনওবা এরা সারাদিন ধরেই ওড়ে, নেমে আসে যখন সন্ধ্যা নামে। বিশ্বাসঘাতকতা করেনা, স্বগৃহকে চিনে নেয় অনায়াসেই। এ বিষয়ে এদের দক্ষতা অসাধারণ। আমারই এখানকার একটা পায়রা একবার উড়তে-উড়তে কোন-এক জায়গায় গিয়ে ধরা পড়ে; সেখানে ওর পাখনাও কেটে দেওয়া হয়। তারপর কেটে গেছে তিন বছর। আবার পাখা গজিয়েছে। এবং যেমনি সুযোগ মিলেছে, সোজা ঘরে ফিরে এসেছে। নিজের সেই পুরনো খোপে ঢুকেই দেখে, সেখানে আরেক পায়রা ঘরবসত করছে। আর কি, তার সঙ্গে বাধিয়ে দিয়েছে লড়াই।

এক-এক ঝাঁকে দশ-বারোটির বেশি গেরোবাজ ওড়েনা। ওদিকে লোকেদের শখ হল: একশো-দুশো ঝাঁকের পায়রা ওড়ানোর। তখন এল 'গোলা'-পায়রা। দিল্লীতে এই কবুতরবাজীর কলাকে এমন উন্নত করা হয়েছিল যা প্রায় অবিশ্বাস্য। শোনা যায়: শেষ

মুগল সম্রাট বাহাদুরশাহ যখন সওয়ার হয়ে বেরোতেন, দুশো পায়রার একটা ঝাঁক আকাশে উড়তে-উড়তে তাঁর সঙ্গে যেত, এবং জাহাঁপনাহর ওপর ছায়া করে থাকত।

কবুতর অত্যন্ত গৃহাসক্ত পাখি। খাঁচাভর্তি পায়রা ঠেলায় করে নিয়ে গিয়ে যেখানে-সেখানে গাড়ি থামিয়ে, খাঁচা খুলে, ওদের ওড়ানো হত, তারপর আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হত খাঁচায়। এই নৈপুণ্য প্রথম দিল্লীতেই দেখা গিয়েছিল।

শাহানশাহ বংশের প্রারম্ভিক কাল থেকেই কবুতরবাজীর সূত্রপাত। এ-বিষয়ে নবাব শুজাউদ্দৌলার খুব শখ ছিল। তাঁর দরবারে দক্ষ কবুতরবাজ বলে আত্মপরিচয় দেন বেরিলীর সৈয়দ ইয়ার আলী; তিনি যথারীতি সমাদৃত হয়েছিলেন। নবাব আসফউদ্দৌলা এবং সাদত আলী খাঁরও শখ ছিল। গাজীউদ্দীন হায়দার ও নাসীরউদ্দীন হায়দারের সময়ে এ খেলা তো রীতিমতো উন্নত পর্যায়ে উপনীত। মীর আব্বাস নামে এক নামজাদা কবুতরবাজ ছিলেন; যে-কেউ পাঁচ টাকা নজর দিয়ে আমন্ত্রণ জানালে, যেখানে থাকুক, 'কাবুক' (খাঁচা) নিয়ে ঠিক পৌঁছে যেতেন, এবং আমন্ত্রণকর্তারই ঘর থেকে পায়রা ওড়াতেন; ওড়াতেন আর শিষ দিয়ে ডেকে নিতেন। পায়রাদের সাধ্য কি অন্য কোন জায়গায় নেমে পড়ে! ক্রমে, শখ এতো বেড়ে গেল, কোন-কোন আমীরের বাড়ী একসঙ্গে প্রায় ন'শো পায়রা উড়ত। কোন-কোন শরিফ এতগুলো বা এর চেয়ে বেশি সংখ্যার পায়রা ওড়াত।

আফগানিস্তানের খোস্ত্ থেকে 'পট্যাত' নামে এক বিশেস রঙের কবুতর এসেছিল। খুব দামী ছিল এ-পায়রা। হাজার-হাজার টাকা খরচ করে রইসরা এদের ওড়াত।

নবীনতা-বিলাসী এক বৃদ্ধ থাকতেন লখনউয়ে। একজোড়া পায়রা নিয়ে তিনি একজনের দক্ষিণ, অন্যজনের বাম পাখ্না কেটে দিলেন, এবং কাটা জায়গায় দুটো পায়রাকে একসঙ্গে সেলাই করে দিলেন। বানালেন 'জোড়-পায়রা'। তারপর, প্রচুর তদবীর অন্তে ওরা একদিন

উড়লও। এইভাবে তৈরি হল আরও অনেক 'জোড়-পায়রা'। নাসীরউদ্দীন হায়দার 'ছত্তর-মঞ্জিল' থেকে বজরায় করে নদী পেরিয়ে যেতেন 'দিল-আরাম'-এ, সেখানে বসে নদীর শোভা দেখতেন। সেই সময় এই কবুতরবাজ উড়িয়ে দিতেন তাঁর এই 'জোড়-পায়রা'। ওরা গিয়ে বাদশাহর কাছে বসে থাকত। ওদের দেখে, খুশি হয়ে, বাদশাহ দিতেন 'ইনাম' (পুরস্কার)।

মীর আমন আলী নামে এক বৃদ্ধ করতেন কি— যে-রং দরকার, পায়রার গায়ে তাই করে দিতেন। জায়গায়-জায়গায় পালখ তুলে ফেলে সেই ছিদ্রে অন্য রঙের পালখ রেখে এমনভাবে জমিয়ে দিতেন, আসল পাখার মতোই পায়রার শরীরে লেগে থাকত। অনেক জায়গায় রং-ও লাগাতেন। সে-রং এতো পাকা ও মজবুত, যে, ফিকে হবার উপায় ছিলনা। অন্তত বছরখানেক পর্যন্ত রং থাকত। কিন্তু 'কুরীয'-এর সময়ে যখন পালখ খসে পড়ত, তখন আসল রং বেরিয়ে আসত। এই রকম পায়রা তিনি বিক্রী করতেন এক-একটা পনেরো-কুড়ি টাকায়। আমীররা কিনত। ওস্তাদজী পায়রাদের চেহারাও বদলে দিতে পারতেন ; বর্ণের ভিন্নতা ও কণ্ঠের গড়নের দিক থেকে এগুলি হত দ্বিতীয়রহিত। তবে, এরকম পায়রা লাখে একটাই বেরোত।

নবাব পালে ছিলেন পয়লা নম্বর কবুতরবাজ। গেরোবাজদের তিনি ওড়াতেন গোলা পায়রাদের মতো। যে-জায়গায়, যে-বাড়ির ওপরে খুশি, ছীপী[1]-র ইশারায় ওদের খেলাতেন ; কবুতররা ডিগবাজী খেতে থাকত শূন্যে-শূন্যে।

ওয়াজিদ আলী শাহ মেটিয়াবুরুজে অনেক পায়রা জড়ো করেছিলেন। শোনা যায়, একজোড়া রেশমপাখা-পায়রা তিনি কিনেছিলেন পঁচিশ হাজার টাকায়, এবং একজাতের সবুজ পায়রার বংশবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। যখন তাঁর দেহান্ত হল, তখন তাঁর ছিল

কাপড় বা বাঁধা ছড়ি, যাদিয়ে পায়রা ওড়ানো হয়।

ত্রিশ হাজারেরও বেশি পায়রা, তাদের জন্যে একশোর ও বেশি কবুতরবাজ চাকর, এবং সবার ওপরে দারোগা গুলাম আব্বাস—কবুতরবাজীর কলাবিদ্যায় যাঁর জবাব ছিলনা।

শৌখীন ও অভিজ্ঞ লোকেরা রঙীন পায়রা পুষত, এবং এ ক্ষেত্রেও অসাধারণ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এক বর্গ-গজের একটা খাঁচার লম্বা-চওড়া সবটা ভরে যেত এমন বড়ো শীরাজী, বারো বছরের মেয়ের··চুড়ির মধ্যে দিয়ে গলে যেত এমন ছোট গুলী-পায়রা,—শোনা কথা নয়, এ আমার নিজের চোখে দেখা॥

॥ 18 ॥

পাখিদের লড়িয়ে আকর্ষণীয় ক্রীড়ার প্রবর্তন এবং তদ্দ্বারা চিত্তের বিনোদন লখনউয়ের সংগতিপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় শখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পায়রা ও বটেরদের তৈরি ক'রে লড়ানোর ব্যাপারে এরা কৃতিত্বের এমন স্বাক্ষর রেখেছিল, এবং আজও রাখে, যে হিন্দুস্তানের যেকোন শহরে কোন রইসের এবিষয়ে শখ জাগলে (এই হতচ্ছাড়া শখ অদূরদর্শী ধনীদের মধ্যেই সংখ্যাগুরু) লখনউ থেকেই ওস্তাদদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারই তত্ত্বাবধানে নির্বাহিত হয় তদ্‌বির-তদারক, যুদ্ধ-প্রস্তুতি, লড়াই, তাবৎ কাজ।

তোতা

পক্ষীর লড়াইয়ের শখও যথারীতি নবীনতার জন্ম দিতে থাকে। কিছু শৌখীনের মনে প্রশ্ন হল: কবুতরকে দিয়ে যে কাজ করানো হয়, তা আর কোন্‌-কোন্‌ পাখি দিয়ে হতে পারে? মীর মুহম্মদ আলী নামে জনৈক বৃদ্ধ তখন তোতাকে দিয়ে পায়রার কাজ করাতে লাগলেন, এবং সফলও হলেন।

প্রকৃতিগতভাবেই, তোতা-পাখি কৃতঘ্ন। সারা জীবন রেখে দিন, লালন-পালন করুন, খাঁচা থেকে একবার উড়তে পারল তো এমুখো আর কোনদিন হবেনা। তাই, বিশ্বাসঘাতকের নামই হয়ে গেছে 'তোতা-চশ্‌মী'। তোতা-পাখি পড়ে, কথা বলে, অন্য পশু-পাখির কথা নকল করে, যে-বাক্য শেখানো হয়, 'পাখিপড়া'র মতো পুনরাবৃত্তি করে। কিন্তু ওড়ানোর কাজে একেবারে বেকার। তার কারণ, খাঁচা থেকে বেরোলে আর কারও কথা শোনে না। খুদা জানেন, কোন্‌ ধরণের তদ্‌বির-তদারকের জোরে মীর সাহেব ওদের স্বভাব বদলে দিয়েছিলেন! তিনি তোতার ঝাঁক ওড়াতেন—একসঙ্গে দশ কি বারোটা: শিষ দিয়ে 'আ' করলেই আকাশ থেকে নেমে সোজা খাঁচার মধ্যে ঢুকে যেত। অবাধ্য হবার সাহসই ছিলনা! তিনি তোতাদের প্রত্যহ নিয়ে আসতেন হাসানাবাদে, এবং এইভাবে ওড়াতেন।

পাখিদের এই 'তৈরি করা'র কথা বলতে গিয়ে একটা মন্তব্য না করে পারছিনা: লখনউয়ের লোকেরা পাখিদের তৈরি করার জন্যে যে মেহনত করেছে, তা যদি আত্ম-প্রস্তুতির জন্যে ব্যয় করত, তাহলে আজ যে পরিণামের প্রান্তে তারা উপনীত, তা কোনদিনই হত না।

পতংগ্‌বাজী

'কনক্যওআ' ওড়ানোর শখ সারা হিন্দুস্তানেই অল্প-বিস্তর বিদ্যমান। আজকালকার বালক ও যুবকদের কাছে এর আকর্ষণ খুব বেশি। জনপ্রিয়তার এইরূপ দেখে মনে হতে পারে, এটা এখানকার অনেক পুরোনো খেলা। আসলে কিন্তু তা নয়। একশো বছর আগেও এই কলা এখানে ছিল, একথা বলা যায় না। এর উন্নতির কেন্দ্র লখনউ।

য়োরোপের ছেলেছোক্‌রারা এক ধরণের 'কনক্যওআ' ওড়ায়—দড়ি ধরে দৌড়লে তবে উড়তে থাকে, দাঁড়ালেই মাটিতে পড়ে যায়।

এ খেলা ওখানে কবে থেকে প্রচলিত এবং কোথা থেকে এসেছে, কেউই সঠিক বলতে পারে না।

শোনা যায়ঃ প্রথম শাহ আলমের শাসনকালে দিল্লীতেই এই শখের সূত্রপাত। প্রথম-প্রথম ধনীরাই ওড়াত। ফানুস তৈরি করাটাও খুব শখের ও আমোদের ব্যাপার ছিল

দুটো 'তুক্‌কল' (ফানুসের কাগজ) একটার ওপর আরেকটা ধারে-ধারে সমান জুড়ে নেওয়া হত। জোড়ের মাঝখানে লাগানো হত 'ঠুড্‌ডা', ওপরে ও নীচে দুটো করে নরম 'কাঁপ', এবং মধ্যবর্তী স্থানে-স্থানে ছোট-ছোট 'খপাচ' আড়াআড়ি। 'ঠুড্‌ডা-কাঁপ-খপাচ, সবই হত চাঁচাছোলা বাঁ্যাকারির। তুক্‌কলের আকৃতি হত—তিনদিকে গোলাকার। ওপরের কাঁপের আকৃতি হত ধনুকের মতো, নীচেরটা তার উল্‌টো। অবশেষে, চারদিক থেকে কাগজ মুড়ে দেওয়া হত। তৈরি হয়ে যেত 'নুকীলী (ছুঁচলো) কঁদীল'। তার ভেতরে, তার দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত তেলে-চোবানো কাপড়ের গোলা। সেই গোলা জ্বালিয়ে দেওয়া হত রাত্রে, রেশমী বা অন্য কোন মজবুত সুতো দিয়ে ওড়ানো হত 'কঁদীল'। এতো সুন্দর দেখতে হত, মনে হতঃ আকাশে একটা লণ্ঠন উড়ছে। 'গুব্‌বারা' বা ফানুসটার মধ্যে হাওয়া ভর্তি থাকত। হাওয়ায় কখনও বেঁকত, কখনও সোজা হয়ে থাকত। সূত্রবন্ধের জন্যে ওটা থাকত ওড়ানোওয়ালার এখ্‌তিয়ারেই—যখন হচ্ছে উড়িয়ে দিত, ইচ্ছে হল তো নামিয়ে নিল।

এই সময়েই, কিছু লোক, এইভাবে মানুষ-পুতুল তৈরি করেও ওড়াতে লাগল। বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের বক্তব্যঃ এই কাগুজে পুতুলও দিল্লীর আবিষ্কার। এথেকে আর একধাপ এগিয়ে তৈরি হল 'চংগ্‌'। লম্বায়-চওড়ায় সমান বলে এটা ওড়ানো এবং হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখা খুব সহজ। এ-শখটা হিন্দুদেরই ছিল বেশি—হয়তো ওদের ধর্ম তথা সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত, হয়তো 'আকাশদীপ' থেকে এসেছে ব'লে। এই চংগ্‌কে কাটবার এবং দিনের বেলা ওড়াবার জন্যে 'তুক্‌কল' উড়তে লাগল, যা আসলে আধা-চংগ্‌ বা 'চংগের' একদিকের অংশ।

'তুক্‌কলের' সুবিধে হল : 'চংগের' চেয়েও সহজে ওড়ানো যেত ; আসমানে হাওয়ায় নাচত, চলত-ফিরত, দূরে-দূরে পরিভ্রমণ করত। 'চংগ' থাকত এক জায়গায়, অর্থাৎ স্থাবর। তুক্‌কল হল আকাশ-যাযাবর, কেবলই এধার-ওধার করত। অথচ, একে অতি সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যেত ; ইচ্ছে করলে, সুতোয় রগ্‌ড়ে অন্যের চংগ্‌কে কেটেও দেওয়া যেত।

'তুক্‌কল' এসে ভুলিয়ে দিল আলোর পুতুল, 'রওশন-পুত্‌লা' কঁদীল ওড়ানোর শখকে। এর গুণ হল : আকাশে উড়িয়ে দিয়ে একে নিজের দখলে রাখা যায়, আসমানের ইতি-উতি যেমন ইচ্ছে দৌড়-নাচ করানো যায়। ফলে লোকেরা সহজেই আকৃষ্ট হল। শখ বেড়ে গেল মুসলমান আমীর ও পদস্থ হিন্দুদের। প্রচুর অর্থব্যয় হতে লাগল। এবং উন্নত ধরণের তুক্‌কলের নাম হল 'পতংগ্‌'। এর ঠুড্‌ডার জন্যে সেকালে ব্যবহৃত মুর্শিদাবাদী বাঁশ, দাম লাগত আশী টাকা। কাগজ লাগত দু'টাকার ; তৈরির খরচ পাঁচ টাকা, 'ঝলঝল'-এর জন্যে কুড়ি টাকা। অর্থাৎ একটা 'পতংগ্‌' জন্ম নিত একশো সাত টাকার বিনিময়ে।

এসব উন্নতি দিল্লীতেই। সেখান থেকে চলে আসে লখনউ ; সঙ্গীসাথী অনেক শৌখীন ব্যক্তিও।

অতঃপর 'পতংগ্‌'-ওড়ানো থেকে শখ জন্মালো 'পতংগ্‌'-লড়ানোর। এমন জোরদার 'তুক্‌কল' তৈরি হতে লাগল, যাকে সামলানো সাধারণ শক্তির লোকের পক্ষে খুবই মুশকিল। চর্‌খীতে জড়িয়ে নেওয়া হত আট পাকের মজবুত সুতো, তার সাহায্যে সমলানো হত 'তুক্‌কলকে'। লড়াইয়ের কায়দা-কানুনও ছিল—দুটো 'তুক্‌কলের' দুটো সুতো, একটা আরেকটার ওপর ফেলে 'ঢীল্‌ (ঢিলে) দেওয়া হত ; 'তুক্‌কল' দুটো লাট খেতে-খেতে অনেক ওপরে উঠে যেত ; দুদিকে চরখীর পর চরখী খালি হতে থাকত।

'পতংগের' শখ লখনউয়ে কেমন ছিল, তার একটা আন্দাজ পাওয়া যায় নবাব আসফউদ্দৌলার 'তুক্‌কল' থেকে—প্রত্যেকটায় পাঁচ টাকা

দামের সোনারূপোর তারের ঝিলিমিলি লাগানো থাকত। যে ধরে নিয়ে আসত, পাঁচ টাকা করে পেতো। যদি নাও নিয়ে আসত, যেখানে ইচ্ছে পাঁচ টাকায় বেচে দিতে পারত।

লখনউ-পতংগ্‌বাজীর পুরনো নামী ওস্তাদ ছিলেন মীর অমদ্‌। খোজা মিটঠন ও শেখ ইমদাদ। এক তাঁতিও এই কলায় খুব দক্ষ ছিল; আমীরদের কাছে তার কদর ছিল প্রচণ্ড।

আমজাদ আলী শাহর সময়ের আবিষ্কার বাদাম-সদৃশ 'গুড্‌ডী'। তুক্কলের চেয়েও সহজ ছিল এর নির্মাণ-প্রক্রিয়া। তুক্কলের দুটো কাঁপ ও একটা ধুড্‌ডা; গুড্ডীর একটা কাঁপ, একটা ধুড্ডা। ওয়াজিদ আলী শাহর সময়ে দেড়গুণ 'কনক্যওআ' তৈরি হত, যার সাইজ এখনকার কনক্যওআর মতো। শুধু, তুক্কলের স্মারক হিসেবে, নীচে কাগজের ছোট্ট মতো লেজ হত। নবাব মুহম্মদ হুসেন খাঁ সালারজংগী, আগা আবু তোরাব খাঁ, আরও দু-একজন শৌখীন রইস লেজের জায়গার পাত্তা লাগিয়ে ওকে করে দিলেন কমক্যওআ। এটাই এখন প্রচলিত। এর পরে আর কোন বিবর্তন এখনও পর্যন্ত চোখে পড়ে নি। আজকাল সারা হিন্দুস্তানে উড়তে দেখা যায় এই 'পত্তেদার' বা 'ফুঁদনেদার' (পাতাওলা বা লেজওলা) 'কনক্যওআ' যাকে বলে 'ডেঢ় কন্না'। এদের জন্ম লখনউয়েই। এখান থেকেই অন্যত্র গেছে ও লোকপ্রিয় হয়েছে।

'কন্‌ক্যওআর' লড়াইতেও প্রথমে 'তুক্কলের' মতো ঢিল দেবার রেওয়াজ ছিল। বড়ো-বড়ো কন্‌ক্যওআ তৈরি হত, আর সের-সের সুতো খেয়ে নিত। শাহী শাসনের শেষ এবং ইংরেজী শাসনের শুরুতে ছিলেন বিখ্যাত ওস্তাদ বিলায়ত আলী, যাঁকে বলা হত 'বিলায়তী'। ইলাহীবখ্‌শ্‌ খ্যাতি অর্জন করেন মেটিয়াবুরুজ গিয়ে। এছাড়া আরও অনেকে ছিলেন, যাঁদের নাম আমার মনে নেই।

সত্যি কথা বলতে কি, সুতো-ছেড়ে-খেলাটাই ছিল প্যাঁচের লড়াইয়ের বাদশাহ। ইংরেজী শাসনের প্রারম্ভে শুরু হল টেনে-কাটার লড়াই। যাদের কাছে সুতো কম, সেইসব ছেলেই এই

পদ্ধতির আবিষ্কারক—এরা অন্যের কন্‌ক্যওআর সঙ্গে প্যাঁচ্ লাগিয়ে নিজেদের ছোট সুতো দিয়ে টান দিত আর কেটে দিত। পুরনো ওস্তাদরা এদের তখন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত, নিজেদের কনক্যওয়াকে রাখত ওদের থেকে শতহস্ত দূরে। কিন্তু শেষে, টেনে কাটাটাই কনক্যওয়াবাজীর[1] সর্বশ্রেষ্ঠ কলা বলে মেনে নেওয়া হল। এতেও বড়ো-বড়ো ওস্তাদের আবির্ভাব ঘটেছে। লখনউয়ে এমন কুড়িরও বেশি ব্যক্তি আছে, যারা এই শখের পেছনে লাখ-লাখ টাকা উড়িয়ে দিয়ে ওস্তাদ বনে গেছে, এবং যথাসর্বস্ব খুইয়ে, তার বিনিময়ে, প্রতিষ্ঠা পেয়েছে—'কনক্যওআ লড়াইয়ের ময়দানে' এদের সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়, খুব খাতির যত্ন করা হয়, এবং চোখের মণি করে রাখা হয়।

॥ 19 ॥

বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য, সংগীত: সংগীতবিদ ও সংগীতরসিক, এবং বলা বাহুল্য, লখনউয়ে এদের স্থান।

মানব প্রকৃতি সবার আগে যার সন্ধানে ফিরেছিল, সে হল গান। হৃদয়ভাব যখন শব্দে ব্যক্ত হতে চায়, তখন মানুষ গান গায়; যখন সে প্রকাশমান হতে চায় হাবে-ভাবে, ক্রিয়া-কলাপে, তখন মানুষ নাচ শুরু করে দেয়। সর্বোত্তম উৎসাহ ও একাগ্রতা আছে আরাধনায়; সর্বাধিক অসহ্য উৎসাহ ও যন্ত্রণা থাকে প্রেম-প্রণয়ের অভিব্যক্তিতে। তাই আদিকাল থেকেই গানের বিষয়: আরাধনা ও প্রেম। হিন্দুস্তানে তো গানের সূত্রপাতই আরাধনা থেকে। এখানকার প্রথম গায়ক ছিল ব্রাহ্মণ, যারা উপাসনা করার ও করানোর সময় ভজন গান করত

[1] কন্‌ক্যওআ কাগজের তৈরি প্যারাচুট ফানুস এবং ঘুড়িও। পতংগ ফানুস, ঘুড়ি।

আরাধ্যের স্তুতিতে। কৃষ্ণের জন্ম তাঁর প্রেমকে পূজায় পরিণত ক'রে প্রেম-সংগীতের সৃষ্টি করেছে।

মুসলমান এদেশে এসেছিল সঙ্গে গান নিয়ে। সে-গানের প্রথম স্রষ্টা 'ইবনে মুসহ্‌হ্‌জ'। পরে, ইরাকে যখন আব্বাসী দরবার প্রতিষ্ঠিত হল, তখন আরবী ও ফারসী সংগীত মিলে গিয়ে এক নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব ঘটল। আবির্ভাব প্রসারিত, প্রচারিত হল দিগ্‌বিদিকে। এ-ই হল ইরানী সংগীত। এই শিল্পকেই মুসলমানরা নিয়ে এসেছিল হিন্দুস্তানে, সেইসঙ্গে গায়কদেরও। এদেরই স্মৃতি 'কাওয়াল' এবং সংগত : সারংগী, সরোদ, শহনাঈ, রবাব চংগ্[1] ও বরবত[2]'।

হিন্দুস্তানের তাবৎ ক্ষেত্রেই মুসলমানদের প্রভাব পড়েছিল, যার ফলে বিদ্যা ও শিল্পের তথা সংস্কৃতির সমস্ত কিছুই বদলে গিয়েছিল। কিন্তু এই প্রভাব খুবই কম ছিল সংগীতক্ষেত্রে। তার একটি কারণ : এখানকার গান এতো নিয়মবদ্ধ, উচ্চকোটির এবং স্থায়ী রূপ নিয়ে বিদ্যমান ছিল, যে, বহিরাগত কোন-কিছুকেই সে গ্রহণ করতে পারে নি। বাস্তব কারণ হল : কোন দেশ বা কোন ভাষার সংগীতের প্রতি বহিরাগত প্রবাসীর চিত্ত একাগ্র হয়ে ওঠে তখনই, যখন সে ওই দেশের নিবাসী হয়ে যায়। ওখানকার ভাষায় ও সংস্কৃতির রঙে রঞ্জিত হয়ে ওঠে। সুতরাং, আক্রমণকারী মুসলমানরা এখানে আসার পর যতোদিন আরবী বা ইরানী রয়ে গেল, ততোদিন তাদের দৃষ্টি গেল না স্থানীয় সংগীতের দিকে। এবং যখন দৃষ্টি দিল, চিত্ত একাগ্র হল, তখন ভারতীয়তা তাদের ভেতরে ঢুকে গেছে ; ততোদিনে স্বদেশের রাগ-রাগিণী তারা ভুলে গেছে, মুগ্ধ হয়েছে এখানকার গানে। অপিচ এখানকার গানের কোনরকম আলোচনা বা তার পরিবর্তন করার যোগ্যতাও তখন আর তাদের ছিল না।

ক্রমশ, ইরানী কাওয়ালদের অনেক গান হিন্দুস্তানী সংগীতকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করেছে। অনেক রাগ ভারতীয় সংগীতের

[1] সেতারের মতো তারের বাজনা। [2] ময়ূরমুখী তারের বাজনা।

শামিল হয়ে গেছে। জংগুলা (জংগ্‌লা), জীফ, শাহানা, দরবারী, খিলা (খমাচ বা খাম্বাজ) ইত্যাদি প্রসঙ্গে বলা হয় ; এগুলি মূলত ইরানী রাগ-রাগিনী, কাল প্রবাহে মিশে গেছে স্থানীয় সংগীতস্রোতে।

আমীর খুসরো দুধরণের গানই শিখেছিলেন, এবং দ্বি-ধারাকে মেলাবার জন্যে নানাবিধ চেষ্টা করেছিলেন। কথিত আছে, তিনিই 'সিতার' আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি যে অনেক 'ধুন' সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানকার গানের কোন্ কোন্ বিশেষ দিকে তিনি সমৃদ্ধি এনেছিলেন, তা সঠিক করে বলা মুশকিল।

মনে হয়ঃ মুসলমানদের মধ্যে, বাদশাহদের আগে শেখ ও সুফীরাই সংগীতের প্রতি মনোযোগ দেন। ইরান্ ও ইরাকের প্রাচীন ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ভক্তিভাবিত পবিত্রতার সঙ্গে নৃত্য-গীতের যে সম্মেলন হত, হিন্দুস্তানেও তার পুনরাবৃত্তি হতে লাগল। স্থানীয় যেসব গায়ক, এরও আগে, এখানকার মন্দিরে ভজন গাইত, তারাও এইসব মুসলমান ভক্ত ও সুফীদের সংগতিতে ব'সে 'মারিফত'-এর গজল (অধ্যাত্ম সংগীত) গাইতে লাগল।

বাদশাহর দরবারেও স্থানীয় গায়ক এবং নৃত্য-গীত পটীয়সী বেশ্যারা থাকত। এদের পরিচালক প্রায়ই ইরাণী গায়করা হত। এবং সে এদের গানের ওপর কিছু-না-কিছু প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করত। মুহম্মদ তুগলকের শাসনকালে দরবারের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন আমীর শম্‌সুদ্দীন 'তবরেযী' ; সংগীতমণ্ডলীর সমস্ত নারী-পুরুষ তাঁর অধীন ছিল। তখন দেবগড় তথা দৌলতাবাদের পাশে সংগীত শিল্পীদের একটা পুরো উপনিবেশই ছিল, যাকে বলা হত 'তরবাবাদ'। তরবাবাদের মূল বাজারের ঠিক মাঝখানে একটা 'বুরুজ' (উচু জায়গা) ছিল। রোজ তৃতীয় প্রহরে সেখানে এসে বসতেন সংগীত-মণ্ডলীর প্রধান, সামনে যতো গায়ক ও বেশ্যার দল—একে-একে এসে গান গাইত। এদের মধ্যে সংখ্যাগুরু মুসলমান—রোজা-নমাজ-নিষ্ঠ। বসতির মাঝে-মাঝে মসজিদ ; রমজানের শুভ মাসে সেখানে পড়া

হত 'তরাবীহ'[1]। বড়-বড় রাজা এখানে এসে গান শুনতেন। এই সংগীত-সমাজের নায়ক ও অধ্যক্ষ অধিকাংশত মুসলমান হত। এথেকে বোঝা যায়ঃ আরবী, ঈরানী ও হিন্দুস্তানী গান তখনই কিছুটা মিলেজুলে গেছে।

উত্তর ভারতে হিন্দু সংগীতের কেন্দ্র ছিলঃ মথুরা, অযোধ্যা ও বেনারস। এইসকল স্থানে ধার্মিকতার প্রবলতার জন্যে সংগীতশিল্পের চর্চা সর্বদাই উর্ধ্বরেখ ছিল। জৌনপুরের শর্কী সুলতানদের মধ্যে সুলতান হুসেন শর্কী ছিলেন সংগীতপ্রেমী; নিজেও বড়ো গাইয়ে; এবং অযোধ্যা ও বেনারস, দুটোই তাঁর রাজ্যের মধ্যে ছিল। হিন্দুস্তানের এই শিল্পকে তিনি নিশ্চয়ই সমৃদ্ধ করেছিলেন।

এই শিল্পের একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আকবর। তাঁর 'নও-রতনের' অন্যতম ছিলেন তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ গায়কঃ তানসেন। এক মুসলমান শাহানশাহর এই শখ ও চিত্তের আগ্রহ দেখে তিনি নিজে ও তাঁর পুত্র বিলাস মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। এই দরবারী প্রোৎসাহনের ফলে ভারতীয় সংগীতের বিকাশ ঘটতে থাকে। পরবর্তী দরবারেও এই ঘরানার সংগীতজ্ঞদের সম্মান অব্যাহত ছিল। এঁরা এখনও নিজেদের মুসলমান দরবারের শামিল বলে মনে করেন। তবু, বোঝা যায়, এই সাংগীতিক বংশীয়দের মাধ্যমেই হিন্দুদের এই কলা মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। তবে, আগে যে-কথা বলেছি, তা থেকে এটা খুবই পরিষ্কার, যে, এঁদেরও আগে মুসলমানরা এই ভারতীয় কলায় শিক্ষালাভ করেছিল। ফলত, হিন্দুস্তানী সংগীতের প্রায় সমস্ত প্রবীণ গায়কই মুসলমান।

এই শিল্প প্রসঙ্গে প্রথম গ্রন্থ 'শমস্‌-উল-অসওআত' লেখা হয় দিল্লীতে, শাহজাহাঁর শাসনকালে। বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয় আকবরের সময়ে মির্জা খান নামে জনৈক জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তি পণ্ডিত ও সংস্কৃতজ্ঞদের সহযোগিতায় লিখেছিলেন 'তুহফা-তুল-হিন্দ'। এর

---

[1] রমজান-মাসে রাত্রিকালীন নমাজের পর পঠিতব্য নামাজ, যাতে কুরান পড়া হয়।

দু-একটা কপি কারও-কারও কাছে হয়তো থাকতে পারে। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন ভারতীয় কলার বর্ণনা একত্রিত করা হয়েছে; জ্যোতিষ, সমুদ্রবিদ্যা, স্বর-সুর, কোকশাস্ত্র, নায়িকাভেদ, ইন্দ্রজাল ইত্যাদি বিদ্যার আলোচনার সঙ্গে ভারতীয় সংগীত বিষয়েও জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

দিল্লীতে এই পর্যন্ত প্রগতি হতেই এই রুচিস্নাত কলা পৌঁছে গেল লখনউ দরবারে। নবাব শুজাউদ্দৌলার গুণগ্রাহিতা ও উদারতার কারণে হিন্দুস্তানের সংগীতকারগণ সমবেত হতে লাগলেন অওধে। এখানে, অযোধ্যা ও বেনারসের সংগীতের পুরনো ঘরানা আগে থেকেই ছিল। জৌনপুরের শর্কী বাদশাহদের কদরদানীর কিছু-না-কিছু স্মৃতিচিহ্নও অবশিষ্ট ছিল। যখন দিল্লীর বড়ো-বড়ো গাইয়ে এবং ইয়াসীন খাঁর ঘরানার সংগীতাচার্যরাও এখানে এসে মিলিত হলেন, তখন তো আসর জমজমাট। গানের জগতে এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হল।

'তারীখ-এ-ফয়জাবাদ'-এর লেখক বলছেন: 'শুজাউদ্দৌলার নাচ গানের খুব শখ ছিল। দিল্লী ও অন্যান্য দূর-দূর অঞ্চল থেকে হাজারে হাজারে গায়িকা-বেশ্যা এখানে এসে জড়ো হতে লাগল। ক্রমে, রেওয়াজই দাঁড়িয়ে গেল: প্রধান মন্ত্রী ছাড়া আর সমস্ত আমীর ও ফৌজী সরদাররা কোন দিকে যাত্রা করলে সঙ্গে-সাথে যেত নাচিয়ে গাইয়ের দল, বারবনিতাদের শিবির।

এর সুফলও হয়েছিল। নবাব আসফউদ্দৌলা বাহাদুরের সময়েই ফারসী ভাষায় 'উসূল-উল-নগ্‌মাত-উল-আসফিয়া' নামে বই লেখা হল। ভারতীয় সংগীতের ওপর এর চেয়ে ভালো বই আজ পর্যন্ত আর লিখিত হয় নি। এর খুব বেশি কপি পাওয়া যায় না। আমার কাছে একটি আছে, এবং আমি পড়েছিও। লেখক বিদ্বান, অভিজ্ঞ। এও বোঝা যায়; আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, তিন ভাষাতেই তাঁর পরিপূর্ণ অধিকার ছিল। এবং তাঁর আজীবনের প্রয়াস ছিল: ভারতীয় সংগীতকলা প্রতিটি ব্যক্তির কাছে সহজ ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তাঁর প্রয়াস সার্থক হয়েছিল। সম্প্রতি পরলোকগত আসাদ উল্লাহ খাঁ 'ক্যকব' ছিলেন সংগীতের ধুরন্ধর পণ্ডিত, এবং কলকাতায় ভারতীয় সংগীতের খ্যাতনামা অধ্যাপক। এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে একটি পত্রে তিনি আমাকে লিখেছিলেনঃ 'সংগীত বিষয়ক এই ফারসী গ্রন্থটি আমার কাছে আছে। শাস্ত্রের আদিম স্রোত-স্বরূপ যেসব পুস্তক প্রামাণিক, তাদের ভিত্তি করে এবং প্রচুর গবেষণা-অন্তে এটি লিখিত হয়েছে।' (আফশোসের কথা, এই অতুলনীয় গ্রন্থটি আজও অমুদ্রিত রয়ে গেছে। এটি এতো তুর্লভ, এখনই মুদ্রণের ব্যবস্থা না করলে বিনষ্ট হয়ে যাবে। কোন ধনবান ব্যক্তি যদি এদিকে দৃষ্টি দেন, তাহলে দেশের এবং স্বকীয় প্রাচীন ইতিহাসের মহৎ উপকার হবে)।

আসফউদ্দৌলার শাসনকালে সংগীতের বিকাশ কতোদূর হয়েছিল, তার সুস্পষ্ট চিত্র পুস্তিকাটিতে পাওয়া যায়। বোঝা যায়; লেখক উচ্চশ্রেণীর গবেষক ছিলেন। তিনি ইবনে সীনার চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তক থেকেও উপাদান গ্রহণ করেছেন, এবং ফারসী সংগীতের নিয়মাবলী স্পষ্টরূপে বিবৃত করেছেন। 'দিলগুদায'-এর এই রচনাটিকে পূর্ণতা দেবার জন্যে আমি স্বর্গত অধ্যাপক 'ক্যকব'-এর সাহায্য চেয়েছিলাম। উত্তরে, তিনি আমাকে যা লিখেছেন, সমস্তই হুবহু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তা থেকে, লখনউয়ের সংগীতকলার স্বরূপ অবস্থা ভালো ভাবেই বোঝা যাবে। তুঃখের বিষয়, তিনি আর বেঁচে নেই। নইলে, তাঁর কাছ থেকে আমরা আরও অনেক সাহায্য পেতাম। বিশেষ করে সংগীতকলার ওপর তাঁর নতুন বইটি আমাদের এখানেই ছাপতে চেয়েছিলেন। আসফউদ্দৌলার সময়েই স্থানীয় সংগীতের প্রগতি হয়েছিল, এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে তিনি লিখছেনঃ

'নবাব সাদত আলী খাঁর সময়ে সংগীত ছিল কুয়াসায় আবৃত। গাজীউদ্দীন হায়দারের রাজত্বকালে এই কলার এক বড় আচার্য লখনউয়ে ছিলেন। তাঁরও নাম ছিল হায়দারী। ইনি সর্বদাই অন্যমনস্ক থাকতেন; তাই এঁর নাম হয়ে গিয়েছিল 'সিড়ে হয়দরী খাঁ'

(ছিটিয়াল হায়দারী খাঁ)। থাকতেন গোলাগঞ্জে। গাজীউদ্দীন হায়দারের খুব ইচ্ছে ছিল এঁর গান শোনার ; কিন্তু সুযোগ পাননি কখনও। একদিন তৃতীয় প্রহরে গাজীউদ্দীন হায়দার 'হওআদার' (কাহার বাহিত পাল্‌কি) চড়ে নদীতীরে বেড়াতে বেরিয়েছেন। 'রূমী দরওআযা'র নীচে লোকেরা দেখে কি, সিড়ে হয়দরী খাঁ চলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহকে নিবেদন করে : 'কিব্‌লা-এ-আলম ! ইনিই হায়দারী খাঁ।' বাদশাহ তো উৎসুক ছিলেনই ; হুকুম দিলেন : 'বুলাও', ডেকে আনো। ডেকে নিয়ে আসতে বললে লোক ধরে আনে, সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। বাদশাহ বলেন : 'আরে মিয়াঁ হায়দারী খাঁ, আমাকে আপনার গান শোনাবেন না ?' উত্তর দিলেন : 'জী হাঁ, কেন শোনাব না ? কিন্তু আমি তো আপনার বাড়ি চিনি না।' শুনে বাদশাহ হেসে উঠলেন, এবং বললেন : 'আচ্ছা, আমার সঙ্গে চলো, আমি নিজেই তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যাব।'— 'বহুত খুব' ! এই বলে, কোনরকম শিষ্টাচারের পরোয়া না করেই, তাঁর সঙ্গ নিলেন। 'ছত্তর মঞ্জিলে'র কাছে পৌঁছতেই হায়দারী খাঁর মেজাজ গেল বিগড়ে। শুধোলেন : 'আমি তো যাচ্ছি ; কিন্তু পুরীও মালাই যদি খাওয়ান, তবে গাইব।' বাদশাহ কথা দিলেন। অতঃপর মহলে উপনীত, এবং গান। কিছুক্ষণ শুনেই বাদশাহ খুব আনন্দিত হলেন, গানের মধ্যে ডুবে তন্ময় হয়ে গেলেন। তাই দেখে হায়দারী খাঁ গান বন্ধ করলেন। তাঁকে চুপ করতে দেখে বাদশাহ আবার গাইতে বললেন। তখন জবাব দিলেন 'হুজুর, আপনার 'পেচওআনে' (নলে) যে তামাক ভরা রয়েছে, খুব ভালোই মনে হচ্ছে। আপনি কোন্‌ দোকান থেকে কেনেন ?' গাজীউদ্দীন হায়দার নিজেও ছিলেন 'সিড়ী', ছিট্‌গ্রস্ত। প্রশ্ন শুনে তিনি তো নারাজ হয়ে গেলেন। তখন মোসাহেবরা বলল ; 'কিবলা-এ-আলম, এটা একটা উন্মাদ, এখনও পর্যন্ত বুঝতেই পারে নি, কার সঙ্গে কথা বলছে !'

'বাদশাহর কথায় লোকেরা হায়দারী খাঁকে অন্য কামরায় নিয়ে গেল। পুরী, মালাই খাওয়াল। তামাক খাওয়াল। তিনি একপো

পুরী, আধপো মালাই, এক পয়সার চিনি কিনিয়ে আনিয়ে স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন (এটা ওঁর সর্বজনীন নিয়ম ছিল) যতক্ষণ এইসব কাজ হচ্ছিল, বাদশাহ পেয়ালা ভরে শরাব পান করছিলেন। নেশা জোর হতেই হায়দারী খাঁকে মনে পড়ল। তখনই ডাকিয়ে এনে গানের হুকুম দিলেন। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি গান আরম্ভ করেছেন, থামিয়ে দিয়ে বললেন : 'হায়দারী খাঁ, শুনছো ? তুমি যদি আমাকে খালি খুশিই করতে থাকো, কাঁদাতে না পার তো, মনে রেখো— গোমতীর জলে তোমাকে ডুবিয়ে দেব।' এইবার হায়দারী খাঁর আক্কেল গুড়ুম—বাদশাহ! বললেন : 'হুজুর অল্লাহ্ মালিক।' তারপর গাইলেন সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে। খুদার 'কুদরত', কিংবা বলতে পারেন, হায়দারী খাঁর তখনও পরমায়ু ছিল। অচিরেই বাদশাহর ওপর গানের প্রভাব বিস্তারিত, তিনি কাঁদতে লাগলেন। তারপর খুশি হয়ে বললেন : 'হায়দারী খাঁ, কী চাও, বলো ?' নিবেদন : 'যা চাইব, দেবেন ?' বাদশাহ শপথ করলেন। হায়দারী খাঁ তিন-সত্য করিয়ে নিলেন। তারপর জানালেন : 'হুজুর, এই চাই, যে, আমাকে আর কখনও ডাকিয়ে পাঠাবেন না। গানও শুনবেন না।' তাজ্জব হয়ে বাদশাহ শুধোলেন : 'কেন ?' শেষ উত্তর : 'আপনার আর কী—আপনি মরে গেলে আর একজন "হায়দার" তখুনি বাদশাহ বনে যাবেন : কিন্তু আমাকে মেরে ফেললে আমার মতো আর একজন "হায়দারী খাঁ" আর জন্মাবে না !' এই জবাব শুনে গাজীউদ্দীন হায়দার ব্যাজার হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। সেই সুযোগে হারদারী খাঁ নিজের জান নিয়ে পালালেন, একেবারে সোজা স্বগৃহে।

'অর্থাৎ গাজীউদ্দীন হায়দারের সময়ে লখনউয়ে একজন বড়ো সংগীতাচার্য ছিলেন। নাসীরউদ্দীন হায়দারের সময়ে গায়ক অনেক ছিল, কিন্তু ওই স্তরের কেউ না। মুহম্মদ আলী বাদশাহ এবং আমজাদ আলী শাহর জমানা তো বুড়োদের জমানা। কারণ, মুহম্মদ আলী শাহ- বার্ধক্যের জন্যে চেতনাশূন্যের মতো হয়ে গিয়েছিলেন ;

এবং আমজাদ আলী শাহ পিতাকে না জিজ্ঞাসা করে কোন কাজ করতেন না। সুতরাং, এঁদের সময়ে শহরের শৌখিন রইসদের কেউ যদি নাচ-গানের ভক্ত থেকেও থাকত, লুকিয়ে চুরিয়ে গান শুনত। এইজন্যে, এই কলার যেটুকু সমাদর মিলেছিল, তা ওয়াজিদ আলী শাহর যুবাবস্থাতেই, লখনউয়ের বিলাসিতা যখন চরম সীমায় উপনীত, তখন নেভবার আগে শেষবারের মতো জ্বলে উঠেছিল প্রদীপ।'

নাসীরউদ্দীন হায়দার ও তাঁর পরবর্তী শাসকদের সময়কার গান প্রসঙ্গে আমি আরও কিছু যোগ করতে চাই। কিন্তু তার আগে আসাদ উল্লাহ খাঁ 'ক্যকব'-এর পত্রের অবশিষ্ট অংশও পাঠকদের শুনিয়ে দেওয়া উচিত বলে মনে করি। এতদ্বারা, লখনউ-সংগীত প্রসঙ্গে একজন অধিকারী-সংগীতজ্ঞের রায় জানা যাবে। তিনি লিখছেন :

'ওয়াজিদ আলী শাহর শাসনকালে লখনউয়ে সংগীতাচার্য্যদের একটা বড়ো দল গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দরবারের সঙ্গে যেসব গায়কের সম্বন্ধ ছিল, এবং খেতাব পেয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের কেউ সংগীতকলায় পারংগম ছিলেন না। কেবলমাত্র, রামপুরের প্রধান কলাবিদ কুতব-উদ্দৌলা ভালো সেতার বাজাতেন। অনীসউদ্দৌলা, মুসাহেবউদ্দৌলা ও রজ্জীউদ্দৌলা যদিও গান করতেন, সেরকম কৃতবিদ্য ছিলেন না। বাদশাহর কৃপাপাত্র বলেই তাঁদের নাম হয়েছিল। গানের আচার্য যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন—প্যারে খাঁ, জাফর খাঁ, হায়দার খাঁ এবং বাসিত খাঁ। এঁরা সবাই মিয়াঁ তানসেনের খানদানের স্মৃতিবাহক। এই বংশের দুজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আজও বেঁচে আছেন। একজন হলেন রামপুর রাজ্য নিবাসী উজীর খাঁ; দ্বিতীয়জন পরসন্তা রাজ্যে চাকুরিরত মুহম্মদ আলি খাঁ। এঁরই পিতা হলেন পূর্বোল্লিখিত বাসিত খাঁ।'

এই সূত্রে স্বর্গত ক্যকব খাঁ লিখছেন : "আমার পিতা নেমতউল্লাহ খাঁ এই বাসিত খাঁর কাছে সংগীত শিক্ষা করেছিলেন। নেমতউল্লাহ খাঁ মেটিয়াবুরুজে ওয়াজিদ আলী শাহর কাছে প্রায় এগার বছর ছিলেন ; তারপরে ত্রিশ বছর ছিলেন নেপাল দরবারে।"

তারপর আবার : ওয়াজিদ আলী শাহর সময়ে সংগীতের খুব সমাদর ছিল। কিন্তু সংগীতশাস্ত্র তখন স্বস্থানচ্যুত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে নিবিষ্ট হতে আরম্ভ করেছে। লখনউয়ে কদরপিয়া 'ঠুম্‌রি' লিখে-লিখে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সংগীতের ধারাকে অবরুদ্ধ করে দিয়েছেন। ফলে, অধিকাংশ সংগীত-প্রেমিক উচ্চকোটির রাগ-রাগিনী ছেড়ে দিয়ে কদরপিয়া-ঠুম্‌রিকেই পছন্দ করতে আরম্ভ করেছে। সংগীতের এই অবনতির সূচনা মুহম্মদ শাহ রংগীলার সময় থেকেই। এখন মিয়াঁ সারংগ, 'খেয়াল' রচনা করেছেন, যার ফলে পতন ঘটেছে সংগীতকলার। তবে খেয়ালে ততোটা লোকসান হয় নি, যতোটা হয়েছে কদরপিয়ার ঠুম্‌রিতে। এখন কী জনসাধারণ, কী সামন্তবৃন্দ, ভালো গান যদি শোনেও, শখের বা ভালো লাগার জন্যে কদাপি নয়। এখন এসব আর ওদের পছন্দ নয়। এইতো হচ্ছে পরিস্থিতি।

ওয়াজিদ আলী শাহর সভানায়কদের মধ্যে অনীসউদ্দৌলা ও মুসাহেবউদ্দৌলা সংগীতশিক্ষা নিয়েছিলেন প্যারে খাঁর কাছে। প্যারে খাঁ ছিলেন বড়ো সংগীতাচার্য; শিষ্যদের যা কিছু শিখিয়েছিলেন, অবশ্যই উঁচু ধরণের গান। কিন্তু দরবারে যে এগান কেউ শুনতেও চায় না—তার উপায় কী! ক্যয়সরবাগে যে 'রহস' (রাস) হত, যাতে ওয়াজিদ আলী শাহ স্বয়ং কৃষ্ণ সাজতেন, সেখানে যে গান হত, খুবই নিম্নশ্রেণীর। তবে, এতে কোন সন্দেহ নেই—আসক্তি না থাকলেও শাহী দরবারে কলাকারদের প্রভূত আদর-সম্মান হত। তার কারণ, ওয়াজিদ আলী শাহও গান শিখেছিলেন বাসিত খাঁর কাছে, এবং নিজে প্রথম শ্রেণীর সংগীতবোদ্ধা ছিলেন। প্রখর বুদ্ধির অধিকারী বাদশাহ তাঁর নিজস্ব ঢঙে নতুন-নতুন রাগিনী সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের নাম রেখেছিলেন আপন রুচি অনুসারে : 'কন্নড় (শ্যাম), জুহী, যোগী, 'শাহপসন্দ' ইত্যাদি। বস্তুত, ওয়াজিদ আলী শাহকে এই শিল্পের আচার্য মনে করা হত। কিন্তু সংগীতমর্মজ্ঞ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে যে-দোষ—যা থেকে তিনি কোনদিন মুক্ত হতে

পারেন নি—নিম্নশ্রেণীর রুচি, তাই দিয়ে তিনি লখনউ সংগীতকে তার স্বস্থান থেকে নামিয়ে সাধারণের স্তরে এনে ফেলেছিলেন। কালের এই রীতি দেখে সুরুচিসম্পন্ন গায়করাও কষ্টসাধ্য রাগ-রাগিনী পরিত্যাগ করে ছোট-ছোট, সরল সুখদ, জনগণের পক্ষে সুগম গান রচনা করতে লাগলেন। উপেক্ষিত হল ধ্রুপদ, হোরীর মতো কঠিন সব রাগ; বাজারচল্ হল গজল, ঠুম্‌রি। খাম্‌বাজ, ঝিঁঝ্যটী (ঝিঁঝিট) ভৈরবী, সুনিদ্রা, তিলক, কামোদ, পীলু ইত্যাদি তন্বী, মজাদার রাগিনী বাছাই করা হল সংগীত-প্রেমীদের জন্যে। এসব বাদশাহরও পছন্দ, যেহেতু তাঁর স্বভাব-অনুগ এরা। এইসব রাগিনী লখনউয়ের সংগীতসমাজের এতো প্রিয় ছিল, যে, লখনউয়ের শাদা খরমুজার মতো লখনউয়ের ভৈরবীও বিখ্যাত হয়ে গেল গোটা হিন্দুস্তানে। সত্যি বলতে কি, ভৈরবী লখনউয়েরই বৈশিষ্ট্য। এমন ভৈরবী হিন্দুস্তানের কোথাও গাওয়া হয় না। মুহর্‌রমের সময় 'সোয্' কবিতা পাঠকও জনপ্রিয় ও জন-সুগম এই রাগিনীগুলির চর্চা করতে নামলেন। ফলে, ধর্মের সেতুপথে এরা গিয়ে আশ্রয় নিল অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাদের কণ্ঠেও। এমন কি, তাদের 'মর্সিয়া' গান শুনে বড়ো-বড়ো ধুরন্ধর গায়কও বিস্মিত হয়ে যেত। সোয্-পাঠকদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল প্যারে খাঁ ও হায়দার খাঁর শিষ্য।

'সংগীতের একটা মুখ্য অঙ্গ হল 'লয়', অর্থাৎ সময়। ওয়াজিদ আলী শাহর এই বোধটি অনেক বেশিই ছিল, যাকে প্রকৃতিদত্ত বলা যেতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই লয়ের জ্ঞান অল্প-বিস্তর বিদ্যমান। কবি যে-ছন্দ ব্যবহার করেন, তারও সম্বন্ধ লয়ের সঙ্গে। ছন্দশাস্ত্রও লয়ের ওপর স্থিত। যে-ব্যক্তির মধ্যে এই লয়ের বোধ সাধারণের চেয়েও অনেক বেশি থাকে, তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনায়াস গতি-বিভঙ্গেই তার প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্ত, তার প্রতি অঙ্গ চঞ্চল হয় লয়ের তালে। সাধারণ মানুষের চোখে এই প্রতিক্রিয়া নিরর্থক মনে হতে পারে; কিন্তু যে প্রকাশ করে, সে না ক'রে পারে না। জেনেশুনেও করে না। তার শরীর আপনা-আপনিই লয়ে নেচে ওঠে।

ওয়াজিদ আলী শাহর অবয়বেও এইরকম প্রতিক্রিয়া হত। লোকে বলত : 'নাচছেন'! আসলে, তিনি নাচতেন না, লয়ের মধ্যে লীন হয়ে যেতেন, অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে উঠত তারই হিল্লোল। গানের সঙ্গে যার পরিচয় নেই, সে-ই বলবে : বাদশাহ নাচছেন। কিন্তু ওয়াজিদ আলী শাহ কখনও, কোন কালেই, নাচেন নি। এ-ই ছিল তাঁর নাচ। ফলত, যতো বড়ো গায়কই হোন, লয়দারীতে বাদশাহর সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা কারোরই ছিল না। তাঁর সন্নিধি-ধন্য বিশ্বাসভাজন গায়কদের কাছে আমি শুনেছি—ঘুমন্ত অবস্থাতেও বাদশাহর পায়ের আঙ্গুল নাকি লয়ের তালে চলত!

নৃত্য, যাকে বলে 'ভাব বনানা' (ভাবের নির্মাণ), এও গানের একটা মুখ্য অঙ্গ। নাচের উদ্দেশ্য : হাব-ভাব ও সংকেতের সাহায্যে স্বগত বক্তব্যকে অভিব্যক্ত করা, ইংরেজরা যাকে বলে 'মোশন'। বড়ো-বড়ো ধুরন্ধর বক্তা ও ভাষণদাতাদের মধ্যেও এই মোশন থাকে। কেউ তাদের নিন্দা করে না। বেচারী ওয়াজিদ আলী শাহই কেবল আপন লয়দারীর জন্যে বদনামের ভাগী হয়েছেন।

লখনউয়ের সংগীত এবং ওয়াজিদ আলী শাহ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় ক্যকবের এই মন্তব্য পাঠ করে আমার যা মনে হয়েছে, তা হল : একথা স্পষ্ট, যে, লখনউয়ে হয়তো উচ্চবিত্ত সংগীতের চর্চা হয় নি। কিন্তু তার সংস্কারসাধনে ও লোকপ্রিয়তা সৃষ্টিতে এই শহর একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র বলে গণ্য হয়েছিল।

গাজীউদ্দীন হায়দারের সময়েই এখানে বড়ো-বড়ো বিখ্যাত সব কাওয়াল ছিলেন। ছজ্জু খাঁ, গুলাম রসূল খাঁ ওস্তাদ বলে গণ্য ছিলেন। দশ্বরী আর-এক জবরদস্ত কলাকার ছিলেন; তিনিই 'পট'-এর আবিষ্কর্তা বলে মনে করা হয়। বখ্শূ ও সালারী ছিলেন সেকালের তবলার গুরু। তাঁদের সামনে আর কারও তবলা ছোঁবার সাহসই হত না!

কালের সেই শেষ প্রহরে সাদিক আলী খাঁকে সারা হিন্দুস্তান গুরু বলে মান্য করত। ছোটে ও বড়ে মুন্নে খাঁ নিজেদের আর্ট ভালো

করে জানতেন ; তাঁদের গানের এমন স্বাদ ছিল, অনভিজ্ঞ অনধিকারী ব্যক্তিকেও গান গেয়ে মুগ্ধ করে দিতেন।

মেটিয়াবুরুজে ওয়াজিদ আলী শাহর দরবারে যেসমস্ত গায়ক ও বাদক নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের সকলের গান আমি নিজে শুনেছি। এহমদ খাঁ, তাজ খাঁ ও গুলাম হোসেন খাঁ সে সময়কার ধুরন্ধর সংগীতকার ছিলেন। ছুল্লী খাঁ—যিনি সারা কলকাতাকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর জাদুভরা কণ্ঠ দিয়ে ছোট-বড়ো সবাইকে মোহিত করে দিয়েছিলেন—লখনউয়েরই ছিলেন, ওখানকার সংগীত-শালাতেই শিক্ষালাভ করেছিলেন।

পুরুষ-গায়ক ছাড়া কয়েকজন বারবনিতাও সংগীতে এমন কৃতিত্বের অধিকারিণী ছিল, বড়ো-বড়ো গায়ক তাদের সামনে মুক হয়ে যেত। জোহরা এবং মুশ্‌তরীর গানের জবাব ছিল না। এঁরা কবিও ছিলেন। চুনেওয়ালী হায়দারীর এতো নামডাক ছিল, তাঁর কণ্ঠে 'সোয' শোনবার জন্যে লোকেরা দিন গুণত মহর্‌রমের। ওই সময়ে শত শত হাজার-হাজার গুণমুগ্ধভক্ত বাইরে থেকে লখনউ এসে হায়দারীর ইমামবাড়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রত্যাশা নিয়ে বসে থাকত : কখন হায়দারী তাঁর শোক-গীত শুরু করবেন।

শেষ পর্যায়ের তবলিয়াদের মধ্যে 'ওস্তাদ' মুহম্মদজী হিন্দুস্তানে প্রসিদ্ধ ছিলেন। বছর ত্রিশেক আগেকার কথা হবে—চকের মধ্যে এক মারাঠা ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল পরিধানে কোট-প্যাণ্টলুন। কোন উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। দেখা হতেই আমাকে বললেন : "লখনউয়ের গায়কদের কৃতিত্ব দেখব বলেই আমি এখানে এসেছি।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম : "আপনার পরিচয় ?" বললেন : "আমি গাইয়ে-বংশের ছেলে। আমাদের বাপ-দাদা শিবাজীর দরবারে গায়ক ছিলেন। এখন ইংরেজি শিক্ষা পেয়ে চাকরি করছি। কিন্তু আমাদের প্রাচীন শিল্পকে আমি জানি। সংযোগবশত, এই সময়ে আর একজন এসে গেলেন ; তিনি লখনউয়ের প্রসিদ্ধা গায়িকা মুহম্মদীর ওখানে যাতায়াত করতেন।

শুনে বললেন ঃ "চলুন আমার সঙ্গে।" মারাঠা সাহেব আমাকেও সঙ্গে টেনে নিয়ে গেলেন। মুহম্মদীর বাড়ি পৌঁছলাম। যোগাযোগ! সাদিক আলী খাঁও তখন ওখানে ছিলেন। সবাই গান করলেন। স্বয়ং মারাঠাও গাইলেন। তারপর আমরা গেলাম চৌধুরাইনের বাড়ি, যেটিকে কলাকারদের সবচেয়ে বড়ো ক্লাব বলে মনে করা হত। ওখানে ছুই মুন্না খাঁকে ডেকে পাঠানো হল। তাঁরা দুজনে গেয়ে শোনালেন। শেষে মারাঠা বললেন ঃ "একটা ইচ্ছেই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে—আমি একটা তারানা গাইব আর মুহম্মদজী তবলা বাজাবেন।" মুহম্মদজীকে তখনই ডাকিয়ে আনা হল। মারাঠা ভদ্রলোকের গান ও মুহম্মদজীর বাজনায় উপস্থিত সকলে আনন্দিত হলেন, বিস্মিতও। অবশেষে, মারাঠা স্বীকার করলেন ঃ "আমি সব জায়গাতেই গেছি। কিন্তু মুহম্মদজীর মতো এমন অভিজ্ঞ তবলা-বাদক আজ পর্যন্ত দেখিনি।"

লখনউয়ে সংগীতের এতাদৃশ বিকাশের জন্যে অন্য শহরের রইস ও ধনীদের তুলনায় এখানকার ধনীদের রুচি অনেক ভালো ও সুস্থ; তারা শিল্পটিকে উত্তমভাবে জানে, রাগ-রাগিনী-ধুন চিনতে পারে, এবং দু-একটা তান শুনেই বুঝতে পারে—গায়ক কোন্ দরের। এখানকার সংগীতসভায় মামুলী গায়কদের কেউ পাত্তাই দেয় না। সাধারণ লোক, বিশেষ করে ছেলে-ছোকরারা—যারা পথের ওপর বা চৌরাস্তার মোড়ে গান করে ফেরে—তারাও অনেক গান এমন-এমন সব সুরে নির্ভুল গায়, মনে হয়—লয় ও রাগিণী ওদের কণ্ঠে অবতীর্ণ। অধিকাংশ শহরে সেইসব লোকই সংখ্যাগুরু, যারা কবিতাই সঠিক পড়তে পারে না। এখানে তার বিপরীত। এখানে এমন একজন মূর্খও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে যথাযথ আবেগ দিয়ে কবিতা পড়তে পারে না। অর্থাৎ, এখানকার বাচ্চাদেরও রক্তে-মজ্জায়-শিরায় লয়দারী ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। কখনও কখনও রাস্তার ছেলেরাও ভৈরবী সোহনী, বেহাগ বা অন্য কোন সুর এতো সুন্দরভাবে গাইতে থাকে, শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে যায়, বড়ো-বড়ো গায়করাও ঈর্ষ্যা করে তাদের।

সংগীতের আলোচনা প্রসঙ্গে সহযোগী বাজনা এবং অন্যান্য বাদ্যের বর্ণনা অবশ্যকর্তব্য।

সংগীতের দুটি জিনিস—সুর ও লয়। গানে এতদুভয়ের বিকৃতি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। সুতরাং, এদের রক্ষার জন্যে দুরকম বাজনার প্রয়োজন হয়—সুরে থাকার জন্যে সারংগীর সহযোগ, লয়ে থাকার জন্যে তবলার কারুকাজ ;

সুরকে সাহায্য করার জন্যে হিন্দুস্তানের পুরনো বাজনা ছিল : 'বীন'—কাঠের একটা নলী, তার দুদিকের দুমাথায় দুটো 'তুম্‌বি' (খোল), তার ওপর সাত সুরের সাত তার টানা ; গানের শব্দাবলী নলীর ভেতর দিয়ে দুদিকে দৌড়ে দুই খোলের মধ্যে গুঞ্জরিত হতে থাকে। মুসলমানরা সঙ্গে করে এনেছিল রবাব, সরোদ ও চংগ্‌। 'রবাব' বোধহয় আরবী বাদ্য ; আব্বাসীদের শাসনকালে এর সমৃদ্ধি ঘটেছিল। 'চংগ্‌' ও 'সরোদ' ইরাণী বাদ্য। তার মধ্যে চংগ্‌ অনেক প্রাচীন বাজনা ; সীরিয়া, বাবিলন, মিশর ও রোম ইত্যাদি স্থানে এর ব্যবহার ছিল বলে মনে হয়। সরোদ শুদ্ধত ফারসী বাদ্য, যাকে আব্বাসীকালীন গায়করা স্বগত করে নিয়েছিল এবং সমৃদ্ধও করেছিল। হিন্দুস্তানে আগমনের পর যখন হিন্দু ও মুসলমান সংগীতের মিল-মিশ ঘটল, তখন প্রথমে তৈরি হল 'তম্‌বুরা' (তানপুরা)—বীনেরই এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। এর কাজ শুধু সুরকে ধরে রাখা, এটি বাজাবার জিনিস নয়। কিছুদিন পরে আমীর খুসরো আবিষ্কার করলেন 'সিতার'—বীন ও তানপুরার মাঝামাঝি একটা সমন্বয়। সাধারণ লোকের খুব পছন্দ হল এটি। কিন্তু বীনই হোক, তানপুরাই হোক বা সেতার, কণ্ঠকে পুরোপুরি সঙ্গ দেবার ক্ষমতা কারোরই নেই। এই দেখে, মুহম্মদ শাহ রংগীলার দরবারের বিখ্যাত ও দুর্ধর্ষগায়ক মিয়ঁা সারংগ আবিষ্কার করলেন 'সারংগী'—তাঁরই নামেই এর নাম। সারেংগী এসে পেছনে হটিয়ে দিল বীন, তানপুরা, সেতার সবাইকে। নাচ-গানের আসরে এর এতো নাম হল, যে, পুরনো 'সায' (বাজনা) যারা বাজাত, তারাও লুপ্ত হয়ে গেল। এইসব পুরনো বাজনার মধ্যে

'কানুন'-ও ছিল, যেটিকে মুসলমানরা নিঃসন্দেহে সিরিয়া ও ইরাক থেকে সঙ্গে করে এনেছিল। এর দু-একজন বাদক এখনও নজরে পড়ে। কিন্তু গান-বাজনার আসর থেকে সারেংগী এদের বিতাড়িত করেছে। তথাপি প্রাচীন বাদ্যবৃন্দের গরিমা এখনও রয়ে গেছে। বড়ো-বড়ো ওস্তাদ-গাইয়েদের মধ্যে কখনও-কখনও এমন এক-আধজন সাংগীতিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাঁরা বীন বা সরোদ, রবাব বা কানূন বাজানোয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেন।

সেতার থেকে গেল নবযুবকদের মনোরঞ্জনের জন্যে। এখন গান ছাড়াই এটি বাজানো হয়। কখনওবা গান যোগ দেয় বাজনার সঙ্গে।

রইল বাকি তবলা।

লয়ের জন্যে তবলা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু এই ধরণের কোন কিছুর অস্তিত্ব অন্য দেশের প্রাচীন জাতিদের মধ্যে ছিল না। লড়াইয়ে বাজত চংগ্ ও দুন্দুভি, নহবতে বাজানো হত নাকাড়া। সেই পুরনো কালে, নাচ-গানের সঙ্গে তবলার মতো বাদ্য একমাত্র হিন্দুস্তানেই ছিল, আর কোথাও না। আরবে প্রচলিত ছিল 'দফ্' (ঢপ্), গানের সঙ্গে বাজানো হত। মনে হয়, এখানেও গানের সঙ্গে প্রথমে ঢপই ছিল, বীনের সঙ্গে বাজত, এবং লয়-রক্ষায় সাহচর্য দিত। তারপরে, সেই সেকালেই আবিষ্কৃত হল 'মৃদংগ'। এটি বোধহয় শ্রীকৃষ্ণের যুগের, যখন যমুনার তীরে, ব্রজের অরণ্যে তাঁর বাঁশরীর সঙ্গে মৃদংগের ধ্বনিও শোনা যেত। মৃদংগের পরবর্তী উন্নতি ঘটল 'পখাওজ' (পাখোয়াজ)-এর আবিষ্কারে। উচ্চকোটির সংগীতের যোগ্য উত্তম সংগত।

অতঃপর, জনসাধারণ ও ঘরের মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত হল 'ঢোল'। ঢোল এসেছে মৃদংগ ও পাখোয়াজ থেকে এবং জনগণমন জয় করে নিয়েছে। অন্যপক্ষে, বিশিষ্ট সংগীত-মণ্ডলীর সংগীতকারদের সংগতদানের জন্যে আবিষ্কৃত হল 'তবলা'। পাখোয়াজের দুই মুখ দুটো আলাদা-আলাদা বাজনায় ভাগ ক'রে খ্যাত হল 'দহনা' (ডাঁয়া) ও 'বাঁয়া' নামে।

তবলার আবিষ্কার নিশ্চয়ই মুসলমান-আগমনের পরেই হয়েছে। কিন্তু এইসব লয়দারী বাজনার যে-বিবর্তনের কথা আগে বলেছি, সেসব কবে হল, এবং কার হাত দিয়ে, তা আমার জানা নেই।

॥ 21 ॥

লখনউয়ে গানের সঙ্গে নাচেরও প্রগতি হয়েছিল।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই নাচের অনুশীলন সব জাতিই করত। মিশরের ফারাওদের সামনে সুসজ্জিতা সুন্দরী নারীরা বাজনার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করত। হযরত খ্রীষ্টের সময়ে, দীক্ষা-দাতা জনের মাথা রাজা হেরোড কাটিয়েছিলেন নাচেরই প্রভাবে।[1] এবং এ-তথ্য সর্ববাদি সম্মত যে হিন্দুস্তানে সংগীতের মতো নৃত্যেরও প্রয়োগ ছিল ভক্তি-ভাবিত, এবং তার ক্রম-বিকাশও ঘটেছে ধর্মেরই মাধ্যমে। এই জন্যে, এই শিল্পের তত্ত্ববিদ ও প্রয়োগবিদ ছিল ব্রাহ্মণেরাই। কথকের কেন্দ্র ছিল অযোধ্যা ও বেনারস; 'রহসধারী' (রাস) কেন্দ্রীভূত ছিল ব্রজ ও মথুরায়। ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে নারী দেব-দেবীর মূর্তির সামনে প্রত্যহ নৃত্য নিবেদন করত। বড়ো-বড়ো মন্দিরে তখন নর্তকীদের এক-একটা বিরাট দল সর্বদা

[1] বাইবেলখ্যাত রাজা হেরোড বিবাহ করেন তাঁর ভ্রাতৃবধূকে। খ্রীষ্টীয় ধর্মগুরু সেণ্ট জন তাঁর দীক্ষান্ত-সভায় সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করলে ক্রুদ্ধা রাণী রাজাকে এর প্রতিকারে প্রতিশোধ নিতে বললে তিনি অসম্মত হন। তখন রাণী তাঁর জন্মদিনে এক উৎসবের ব্যবস্থা করেন। সেই উৎসবে রাজকন্যার নাচ দেখে রাজা খুশি হন এবং পুরস্কারদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মাতার শেখানো বুলি পুনরুচ্চারণ করে কন্যা: সেণ্ট জনের কাটা মাথা এনে দিতে হবে। রাজা চমকিত হন, ইতস্ততঃ করেন। কিন্তু বাক্যদান করেছেন। তাই, শেষ পর্যন্ত সৈন্য পাঠিয়ে সেণ্ট জনের কর্তিত মুণ্ড আনার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। (অনু.)

মজুত থাকত। এবং, আশ্চর্যের কথা, এই নৃত্যকলার গুরু প্রায়শ পুরুষই হত। তারা নাচ শেখাত এইসব যুবতী-স্ত্রীলোকদের।

শারীর-ক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণের নামই নৃত্য। অনেক লোক মিলে একসঙ্গে যখন এই শারীর-ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে, তখন হয় 'ড্রিল' বা সামরিক ব্যায়াম। য়োরোপের 'মিউজিক হল'-এর যে-নাচ, তার নাম 'ব্যালে'। ব্যালে, অধুনা হিন্দুস্তানের থিয়েটারে প্রায়ই দেখা যায়। শারীরিক ক্রিয়ার এই নিয়ন্ত্রণকে যখন সংগীতের ধ্বনি-লয়ের আরোহ-অবরোহের অনুরূপ করে গড়ে তোলা হয়, তখন তাকে বলেঃ নৃত্য। ভারতীয় নৃত্য হলঃ গানের, কবিতার চড়াই-উৎরাইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে শরীরের ক্রিয়াকলাপ। এইই এখানকার আসল নাচ, উন্নত শিল্পরূপে যা ক্রমশ-বিকশিত। এবং তৎসহ আবিষ্কৃত শতশত 'গৎ', 'তোড়', 'টুকড়া'। পরে আসে 'সংকেত', যার মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয় ভাব-ভাবনা-কল্পনা। অনেক ক্ষেত্রে গান হয়ে উঠেছে নাচের ব্যাখ্যা। অতঃপর সুন্দরী নারীদের নৃত্য স্বাভাবিকভাবেই যখন লোকেদের 'মনপসন্দ' হয়ে গেল, তখন প্রেমিকাদের মতো হাব-ভাব দেখানো এবং এইভাবে ভাবনাকে ব্যক্ত করাও এর অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠল। এই বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে লখনউয়ে স্ত্রী ও পুরুষের নৃত্য-মণ্ডলী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। সূক্ষ্ম কারুকলার সঙ্গে 'বর্ণনা' করা, প্রেমিকার মতো ছলা-কলা প্রদর্শন, এবং তাবৎ আচরণে প্রেম প্রণয়ের ভাবটিকে তুলে ধরাঃ নর্তকীদের বিশেষত্ব হিসেবে পরিগণিত হল। এর বিপরীতে পুরুষ-নর্তকদের সীমা টেনে দেওয়া হল যেখানে, সেখানে রইলঃ লয়ের অনুগ শরীরের গতিভংগি সৃষ্টি ক'রে তদনুযায়ী 'চলত-ফিরত' (মুভমেণ্ট) দেখানো, এবং কবিদের মতো আকর্ষণীয়-ভাবে মনোভাবকে ব্যক্ত করা। অবশ্য, একটা পর্যায় পর্যন্ত উভয়ের শিল্পকলাই পরস্পর আত্মীয়তায় আবদ্ধ। তবু দুই দলের মধ্যবর্তী ভেদ-রেখা অত্যন্ত স্পষ্ট।

নৃত্যগীতপটীয়সী বারবধূরা এবং নৃত্য-গীত-মণ্ডলী অওধ ও লখনউয়ে এসে জড়ো হয়েছিল, একথা আমি আগেই বলেছি। নবাব

শুজাউদ্দৌলার সময়ে এই সমাগম উপনীত হয় চরম সীমায়। এছাড়া, আশেপাশে ছিল অযোধ্যা ও বেনারসের কথক নাচ। দরবারের ইত্যাকার খাতির দেখে এরাও আকৃষ্ট হল ওইদিকে। উভয়ের মিল-মিশে নৃত্য বিকশিত হল পরিপূর্ণ রূপে।

এখানে নর্তকদের দুটো দল আছে—একটি, হিন্দু কথক ও রাসধারী ; অন্যটি, মুসলমান কাশ্মীরী 'ভাণ্ড্'। কথকই হল আসল নাচ। অন্যদিকে, 'নক্কালী' (ভাঁড়ামি)কে চূড়ান্ত করার জন্যে কাশ্মীরী মণ্ডলী নিজেদের দলে অতিরিক্ত সংযুক্ত করেছে এক নব-যুবককে—এরা চুল রাখে মেয়েদের মতো, খোঁপা বাঁধে, ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নেচে, মেয়েলী হাব-ভাব দেখিয়ে আসরে প্রাণ সঞ্চার করে, তাজা করে তোলে দর্শক-হৃদয়।

এখানে বরাবরই হিন্দু কথকের কোন-না-কোন ওস্তাদ থাকতেনই। এঁদের বিশ্বাস : এঁদের শিল্পের সংস্থাপক মহাদেব, পার্বতী ও কৃষ্ণ। শুজাউদ্দৌলা ও আসফউদ্দৌলার শাসনকালে খুশী মহারাজ ছিলেন বড়ো নৃত্যবিশারদ। নবাব সাদত আলী খাঁ, গাজীউদ্দীন হায়দার ও নাসীরউদ্দীন হায়দারের সময়ে ছিলেন হিলালজী, প্রকাশজী এবং দয়ালুজী। মুহম্মদ আলী শাহ থেকে ওয়াজিদ আলী শাহ পর্যন্ত প্রকাশজীর দুই পুত্র দুর্গাপ্রসাদ ও ঠাকুরপ্রসাদের নাচের খুব প্রসিদ্ধি ছিল। দুর্গাপ্রসাদ সম্পর্কে বলা হয়, ইনি ওয়াজিদ আলী শাহর নৃত্যশিক্ষক ছিলেন। দুর্গাপ্রসাদের দুই পুত্র : কাল্কা ও বান্দাদীন ; এঁরাও খ্যাতিমান ছিলেন। এঁদের প্রসঙ্গে সর্ববাদীসম্মত অভিমত : সারা হিন্দুস্তানে এঁদের চেয়ে বড়ো নাচিয়ে আর কেউ নেই। প্রাচীন ওস্তাদরা বিখ্যাত হয়েছিলেন এক একটা বিশেষ বিষয়ে বা দিকে। কিন্তু এই দুই ভাই, বিশেষ ক'রে বান্দাদীন, নৃত্যকলার সমস্ত বিভাগেই অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে, সর্বপ্রকারে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। বর্তমানের বেশিরভাগ প্রখ্যাত নর্তকই এই দুই ভাইয়ের শিষ্য। এঁদের গৃহ হিন্দুস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃত্য-বিদ্যালয়।

কিছুদিন হল, কাল্‌কার দেহান্ত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বান্দাদীনের নাচের যে আনন্দ, কমে যাচ্ছে। বান্দাদীনের বয়স এখন সাতাত্তর। তবু, নৃত্য-রসিকরা আজও তাঁর নৃত্য-দর্শনকে জীবনের একটি স্মরণীয় আনন্দ বলে মনে করে। গতের ওপর নাচ, নাচের ওস্তাদী যাতে সেই তোড়া ও টুক্‌ড়ার আসল রূপ প্রদর্শন, যে ঘুঙুর ইচ্ছে বাজিয়ে ঘুঙুর বাজানোর ওপর দখল দেখানো, তারপরে প্রত্যেকটি শব্দ ও প্রতিটি বিষয়-উপবিষয়ের ব্যাখ্যা-বর্ণনা—এসব এমন আর্ট যা বান্দাদীনের পরেই শেষ হয়ে গেছে। এক একটি বিষয়কে তিনি শত শত হাবভাব ও শৈলীর সাহায্যে, সূক্ষ্ম ও হৃদয়গ্রাহী সংকেতের মাধ্যমে, প্রস্ফুটিত করে তোলেন। তার মধ্যে বিরাজ করে এমন নবীনতা-কোমলতা, নাজুক কল্পনা যে, দর্শক যদি প্রাজ্ঞ না হয়, বুঝতেই পারবেনা। তাই এঁরা করতেন কি—বান্দাদীন নাচতেন, আর কাল্‌কা পাশে দাঁড়িয়ে তার ব্যাখ্যা করতেন। তাঁর এই ব্যাখ্যা থেকেই লোকেরা বুঝতে পারত, বান্দাদীন তাঁর কলাশিল্পে কী অপূর্ব চমৎকৃতির সৃষ্টি করে চলেছেন!

নাচের সময় তাঁর পা খুব হাল্‌কা নরম হয়ে মেঝের ওপর পড়ত। প্রসিদ্ধি আছে: কখনও কখনও তিনি তলোয়ারের ধারের ওপর নাচতেন; এবং তবু পদতল অনাহত, অক্ষত পদ্মজোড়।

॥ 22 ॥

নর্তকদের দ্বিতীয় দল 'ভাণ্ড' (ভাঁড়)। এদের নাচের নতুনত্ব: একটি সুন্দর তরুণ কিশোর, মেয়েদের মতো লম্বা চুল, পরিধানে রঙীন ঝক্‌মকে শাড়ী, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচে-গায়। সংগতের বাজনা লয়ের মধ্যে ডুবে থাকে, চিত্তকে উত্তেজিত করে তোলে। এদের নাচে থাকে অসাধারণ গতিভঙ্গ ও রসের হুল্লোড়বাজী। গানও এই রুচি-রঙ্গের অনুরূপ। বাদ্যকর। সেই সঙ্গে সাত-আট জন কি

তারও বেশি. ভাঁড়। তারা পেছন থেকে নাচ-গানের সচিৎকার বাহবা দেয়, তাল দেয় এবং প্রায়ই অসভ্যতা-সহকারে এদের হাব-ভাব-মুদ্রার ওপর হাস্যকর মন্তব্য করতে থাকে। নাচ-গান শেষ হলে সামনে এসে এদের নকল করে, 'চুটকুলেবাজী' ও 'নক্‌কালী' (হাসি-মশ্‌করা-ভাঁড়ামি)র চূড়ান্ত করে :

লখনউয়ে এদের ছুটো দল আছে—একটা কাশ্মীর থেকে আগত কাশ্মীরী ; অন্যটা, এখানকারই—আদিতে এদের পেশা অন্যকিছু ছিল। এখন নক্‌কালীই এদের বিশিষ্ট কলা।

'নক্‌কালী' তথা ভাঁড়ামি, বিশেষ ক'রে নাচ-গানের সঙ্গে ভাঁড়ামি ভারতের এক অতি প্রাচীন শিল্প। হযরত যীশুরও আগে, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় এর উন্নত রূপ বিদ্যমান ছিল। তখন এর মাধ্যমে উচ্চকোটির নাটক প্রদর্শিত হত, এবং স্বরূপত, খুবই শিষ্ট ও সভ্য ভাঁড়ামি ছিল। ভারতের নিম্নজাতির উৎসবে আজও একটা নিয়ম প্রচলিত: ওরা নিজেরা যখন নাচ-গান করে, তার সঙ্গে তার হাস্যাস্পদ নকলও করে।

মুসলমান যুগে, মুগলদের আগে 'নক্‌কাল' গোষ্ঠীর ভাঁড়দের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে, থাকাটাই সম্ভব। সমকালীন ইতিহাস-লেখকরা হয়তো এদের উল্লেখযোগ্য বলে মনে করেন নি। যাই হোক, মুগলদের সময়ে ভাঁড়রা খ্যাতিলাভ করেছিল। এদের সংবাদ পাওয়া যায় আওরঙ্গজেবের পর থেকে। যখন পররাজ্য-আক্রমণ ও যুদ্ধ-জয়ের ঝঞ্ঝাট থেকে ছুটি পাওয়া গেল, তখন আমীর ও সুলতানরা দরবার-সাজানো এবং ভোগবিলাসে জীবন-কাটানোটাই তাঁদের পৈত্রিক অধিকার বলে মনে করতে লাগলেন। সেই সময়েই, এখানকার ভাঁড়রা আজব-আজব সব কাজ করেছে। এ-ই এখানকার 'জাতীয় প্রহসন'। ইংল্যণ্ডে 'স্পেক্‌টেটর'[1] ও 'টাইটলার'[2] যে কাজ করেছিল, এদের কৃতিত্বও প্রায় তারই কাছাকাছি। মুহম্মদ শাহর সময়ে ছিলেন দিল্লীর সর্বপ্রথম ভাঁড়, স্বনামখ্যাত করেলা। কোন

[1] [2] ছুটি ব্যঙ্গাত্মক পত্রিকা

কথায় বা ঘটনায় বিরক্ত হয়ে মুহম্মদ শাহ হুকুম দিলেন : ভাঁড়-গুলোকে আমার রাজ্য থেকে বার করে দাও। পরদিন বাদশাহ বেরোতেই ওপর থেকে ভেসে এল ঢোলের বাজনা এবং ভাঁড়েদের গানের আওয়াজ। বিস্ময়ে বাদশাহ মাথা তুলে দেখেন, করেলা এবং আরও কয়েকজন ভাঁড় একটা খেজুর গাছে চড়ে ঢোল বাজিয়ে গাইছে। জিজ্ঞাসা করলেন : "এ কী 'গুস্তাখী'? আমার হুকুম তামিল হয়নি কেন?" নিবেদিত হল : "কিব্লা-এ-আলম! গোটা দুনিয়াটাইতো জাহাঁপনাহর কব্জায় রয়েছে, যাই কোথায়? তাই ঠিক করলুম, ওপর দিকেই যাই। এটা হল তার প্রথম তলা।" উত্তর শুনে, বাদশাহ, মোসাহেবরা সবাই হেসে উঠলেন। মাফ করা হল অপরাধ।

লখনউ-আগমনের পর এদের এমন কদর হল, এটাই হল এই মণ্ডলীবর্গের কেন্দ্র। যতোদূর জানি, দিল্লীতে এখন আর ভাঁড় নেই; থাকলেও খুব কম এবং লুপ্তপ্রায়। হ্যাঁ, বেরিলীতে প্রাচীনকাল থেকেই ভাঁড়েদের দল বিদ্যমান। লখনউয়ের বেশির ভাগ ডোম-ঢুলী এসেছে বেরিলী থেকে। এথেকে মনে হয়, রোহিলাখণ্ডের পাঠানরাও গান ও অন্যান্য ললিতকলার সমাদর করত, যার জন্যে এইসব লোক বেরিলী ও মোরাদাবাদে খুব উন্নতি করেছিল এবং ওখান থেকেই এই কলায় প্রবীণ ঢুলী ও নক্কালরা লখনউ এসেছিল। এখন লখনউ এদের প্রধান ঘাঁটি।

এদের 'লতীফ' (চুট্কি), 'নোকঝোকঁ' (ব্যঙ্গাত্মক বাক্য), এবং ভাঁড়ামির নিপুণতা লখনউয়ে সুপ্রসিদ্ধ। নবাব সাদত আলী খাঁর ইশারায়, ওই সময়ের শ্রেষ্ঠ বীরের সামনে এক ভাঁড় চোট্-দেওয়া প্রাণঘাতী বাক্য উচ্চারণ করেছিল। ওই সময়ের আর একটা স্মরণীয় ঘটনা : জনৈক রইস্ একবার একটি দোশালা 'ইনাম' (পুরস্কার) দিয়েছিলেন। দোশালাটি পুরনো-ছেঁড়া ছিল। এক নক্কাল (ভাঁড়) ওটা হাতে নিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে-দেখতে দেখাতেই ডুবে গেল। আর একজন নক্কাল শুধোল: "দেখছিস্ কী?"

বলল : "দেখছি, এতে কিছু লেখা আছে।" প্রশ্ন : 'কী লেখা আছে?' প্রথমজন একটা চশমা বার করে চোখে লাগাল, তারপর অনেক কষ্টে আটকে-আটকে পড়ল : "লাইলাহা ইল্লল্লাহ"[1]। পুনশ্চ-প্রশ্ন : "ব্যস, এইটুকু? মুহম্মদ-উর-রসূলিল্লাহ[2] লেখা নেই?" পুনশ্চ উত্তর : "মুহম্মদ-উর-রসূলিল্লাহ লেখা থাকবে কি ক'রে? এ দোশালাটা তো আমাদের হযরতেরও আগেকার!"

এক নবাব-সাহেবের বাড়ির কাছে একটা 'গঢ়' (গড়, গর্ত) ছিল; তাই তিনি 'গঢ়্যাইয়া কা নওআব' নামে বিখ্যাত ছিলেন। একটা উৎসব উপলক্ষে তাঁর বাড়িতে নাচ-গান হচ্ছিল। হঠাৎ এক ভাঁড় ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেরিয়ে এল বাইরে, এবং সাথীদের বলল : "ওঠো, ওঠো, সম্মান করো।" সবাই বলল : "কাকে সম্মান করব? এখানে মাননীয় কে আছে?" তখন বলল : "নবাব সাহেব আসছেন।" এই বলে একটা হাঁড়ি খুলতেই একটা কেঁদো ব্যাং লাফিয়ে উঠে মাইফেলের মধ্যে বসে পড়ল। তখন সে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল : "জল্‌দী ওঠো, জল্‌দী ওঠো!" আর, সঙ্গীরা দোহার দিল : "চিনতে পারছো না? ইনি হচ্ছেন গাড্ডার নবাব।"

এরা যে জন্যে বিখ্যাত, তা হল : যার বাড়ি গিয়ে নাচত তারই নকল করত। ফলত, আঘাত দেওয়া অসম্ভব ছিলনা। তবে, এও সত্য, রইস ও আমীরদের যেরকম সুন্দরভাবে এরা শিক্ষা দিয়েছে, তাদের দোষ উল্লেখ করে সাবধান করে দিয়েছে, তা আর কোনভাবেই সম্ভব হত না। এই ধরণের নক্কালীতে এরা যার নকল করত, এমন অবিকল তার রূপ ধরত, এমন নিখুঁত চরিত্র ফুটিয়ে তুলত, লোকে স্তব্ধ হয়ে যেত! আজকাল ইংরেজ সহবতে 'বাবুজ্ ইংলিশ' নিয়ে যেমন মজা করা হয়, তখনকার দিনে তেমনি ঠাট্টা করা হত কায়স্থদের ফারসীনিষ্ঠ উর্দু নিয়ে। এদের নকল এবং বিশেষ করে 'দেওয়ানজীর চরিত্র' এই ভাঁড়রা এমন সুন্দর দেখাত, লোকেরা

---

[1] আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই'। [2] মুহম্মদ আল্লাহর রসূল (পয়গম্বর)।

অবাক মানত। নাসীরউদ্দীন হায়দারের সময় পর্যন্ত এখানে আর একজন করেলা-ভঁাড় ছিল। তার পরবর্তী সজন, ন্যশাহ্, বিবি কদ্র্, কায়েম দায়েম বিখ্যাত হয়। একবার আলী নকী খঁা এসেছেন কায়েমের সবীল[1] দেখতে; সঙ্গে তাঁর বিবি; বিবির খুব নামডাক। সাজানো-গোছানো 'সবীল'; সবাইকে শরবৎ খাওয়ানো হচ্ছে। বিশিষ্ট অতিথি দুজনকে দেখে কায়েম এগিয়ে এসে করজোড়ে নিবেদন করে: "খুদা নওআব সাহব কো সলামত অ্যর বেগম সাহিবা কো কায়েম রখেঁ"—'খোদা নবাব সাহেবকে সলামত (জীবিত-সুরক্ষিত) এবং বেগম সাহেবাকে কায়েম (জীবিত-সুরক্ষিত; অন্যার্থে, কায়েম নামক ব্যক্তি) রাখুন।'[2]—খুবই না-মোলায়েম বাক্য! কিন্তু, উপায় নেই—নবাব ও বেগম, দুজনকেই পুরস্কার দিতে হল। কায়েমের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব—একবার একটানা সাড়ে তিন ঘণ্টা নানা ধরণের মূকাভিনয় প্রদর্শন করেছিল।

শেষদিকের প্রখ্যাত মণ্ডলী: ফজলে হুসেন, 'খিল্যনা', 'বাদশাহ-পসন্দ' ইত্যাদি। আলী জান এখনও কৃতিত্ব প্রদর্শন করে চলেছে। 'খিল্যনা, বাদশাহপসন্দ'—এগুলি হল এই মণ্ডলীর প্রধান নর্তকদের নাম। নাচে এরা এতো দক্ষ ও প্রসিদ্ধ ছিল, এদের নামেই দলের নাম হয়ে যায়।

লখনউ-সমাজের ওপর এদের সকলের প্রভাব পড়েছিল। তবে, সবচেয়ে বেশি পড়েছিল ডোমনীদের। শহর-নগরীর বিবাহ-উৎসবে স্ত্রী-'গায়েন'[3] ও 'মীরাসিনী'দের[3] উপস্থিতি দীর্ঘদিনের একটি প্রথা। এদের চালচলন-সাজ-পোষাক 'ডফালী'[3]দের মতোই একইরকম থেকে

[1] মহরমে যেখানে শরবৎ খাওয়ানো হয়। [2] 'কায়েম' শব্দটির খেলা লক্ষণীয়। [3] পরিধানে পায়জামা, ওড়না, ঠোঁটে পান, কাঁধে ঢোলক—এরা হল 'মীরাসিনী'। এরা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বাজাত, গাইত। 'গায়েন'-রা কোথাও যেতনা, নিজেদের ঘরে বসেই শোনাত। 'ডফালী'-রা বাজাত নাকাড়ার মতো মাটির 'ঢপ', তাই 'ঢপউলী'। সেইসঙ্গে গাইত। 'ডোমনী'-রা বাজাত, গাইত, নাচত, নাচের সঙ্গে বাজাত, গাইত। (অনু.)

গেল চিরকাল। পরিবর্তন ঘটল এবং উন্নতিও হল, যখন ডোমনীরা এল। ঢোলকে বাতিল করে দিয়ে এরা গণিকা এবং পুরুষ-দলের মতো তবলা-সারেংগী-খঞ্জনী ব্যবহার করতে লাগল। গানের সীমান্ত পেরিয়ে ধরল নাচও। তাতেও তৃপ্ত না হয়ে, ভাঁড়দের মতো নকল করতে লাগল মহিলা-মহলের আসরে আসরে। বিবাহের যাবতীয় আচার অনুষ্ঠানে এরা হয়ে উঠল মুখ্যতম অঙ্গ। নাচে গানে ভাঁড়ামিতে ধনীগৃহের বেগমদের এমন মুগ্ধ করে দিল যে এমন একটা মহল ছিলনা, এমন একটা দেউড়ী ছিল না, যেখানে ডোমনীদের কোন না কোন দল নিযুক্ত থাকত না। এদের মধ্যে অনেকেই খুব ভালো নাচ গান করত। অনেকে এমন কণ্ঠ পেয়েছিল, যার দৌলতে 'যনানী মহফিল' (জেনানা আসর) পুরুষদের জলসার আসরের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল, অসীম আনন্দজনক ও মনোহর হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে এদের 'শোখী' (চুটকি বা শ্লেষ বাক্য) এবং নতুন নতুন কথা এতো হৃদয়গ্রাহিণী হত, যে, পুরুষরাও উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠত—কেমন করে ডোমনীদের মুজরা দেখার সুযোগ পাওয়া যায়! তার কারণ, পুরুষ-সান্নিধ্যে নাচগান ডোমনীরা আদৌ পছন্দ করত না। এখনও ডোমনীরা সংখ্যায় ভারী, এবং তেমনি জমাটি। তবু, সেই কৃতিত্ব আর দেখা যায় না। যেসব লয়দার ও সুকণ্ঠী ডোমনী একদা এখানে বিদ্যমানা ছিল, সেরকম গায়িকাও বোধহয় আর কোথাও ছিলনা।

23

যদিও নাচের গুরু বিশেষভাবে পুরুষরাই, তবু সব মিলিয়ে, নাচিয়ে-গাইয়ে বেশ্যারা এর যে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল, তা পুরুষের পক্ষে সম্ভব ছিলনা! যেহেতু, নৃত্যকলা নারীদেরই অধিকতর অনুকূল। হিন্দুস্তানের সব শহরেই এই শিল্পের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে; কিন্তু লখনউয়ে নর্তকী-গায়িকা বেশ্যাদের যে ভিড়, এমন বোধহয় আর

কোন শহরে হয়নি। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে লখনউয়ের এক প্রখ্যাতা বারবণিতা 'মুনসরিম ওয়ালী গ্যহর' কলকাতায় গিয়ে খুব নাম করেছিল। একটা আসরে আমি দেখেছি : পুরো তিন ঘণ্টা ধরে একই বিষয় গ্যহর এমন সুন্দরভাবে 'বিবৃত' করে গেল, দর্শকেরা (মেটিয়াবুরুজের সমস্ত ঢুলী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ) আদ্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে বসেছিল; ছোটরাও তন্ময় হয়ে গিয়েছিল। 'জোহরা' ও 'মুশ্‌তরী' শুধু কবি বা গায়িকাই নয়, সুদক্ষা নর্তকীও ছিল। এবং 'জদ্দন' নৃত্য-গীতে অন্তহীন মোহিনী।

এখানকার গণিকারা, সাধারণভাবে, তিন জাতের ছিল। একতো 'কাঞ্চনী'—সতীত্ব বিক্রী করা এদের পেশা, এরাই হল আসল বেশ্যা। আদি বাসভূমি দিল্লী ও পাঞ্জাব; সেখান থেকে আসতে আরম্ভ করে শুজাউদ্দৌলার সময় থেকে। শহরের নামকরা দেহোপজীবিনীদের অধিকাংশই এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তা। দ্বিতীয়—'চুনেওয়ালী'। এদের আসল পেশা ছিল চুন বিক্রী করা; ক্রমে বারবণিতাদের দলভুক্ত হয়ে যায়; পরিশেষে খ্যাতিও লাভ করে। এদেরই একজন ছিল চুনেওয়ালী হায়দার, সুখ্যাতা সুকণ্ঠী; যার মতো গলা আর কারও ছিল না বলে মনে করা হয়। এর অধীনে স্বশ্রেণীর বারবণিতাদের একটা বড়ো দল ছিল। তৃতীয় 'নাগরানী'। এই তিন শ্রেণীর গণিকাদের তিনটে আলাদা দল; প্রত্যেকেই নিজ নিজ শ্রেণীর মেয়েদেরই 'বিরাদরী' (গ্রুপ) রাখে। অন্য গোষ্ঠীর যেসব স্ত্রীলোক অসহায় অবস্থায় পড়ে এখানে আসে, তারা এই তৃতীয় দলের (নাগরানী) শামিল হয়ে যায়।

নাচিয়ে গাইয়ের দল ছাড়া এখানে আর এক ধরণের গোষ্ঠীও আছে; তারও বিকাশ লখনউতেই। এবং একে যদি লখনউয়ের একটা বৈশিষ্ট্য বলা যায়, তাহলে বোধহয় খুব ভুল হবে না। এই দলটি হল : 'রহসওয়ালা' (রাসওয়ালা)। 'রহস' বা 'রাস' খাস মথুরা ও ব্রজের শিল্প। ওখানকার 'রাসধারী'রাই এখানে এসে এসে লখনউকে এই শখে বিলসিত করেছে।

রাস ভালো লেগেছিল ওয়াজিদ আলী শাহর। নিজ রুচিসম্মত একটি কাল্পনিক প্লট তৈরি করে তিনি লিখলেন এক নতুন রাস। দর্শক ছিল জনগণ। তাদের মনে নতুন চেতনা জাগল। এতদিন তারা যে প্রেমকাহিনীর সঙ্গে পরিচিত ছিল, তাতে পরীরা আসত প্রেম ও সৌন্দর্য নিয়ে; এবার তারা দেখল: ওই প্রেমকে বাস্তব রূপেও দেখা ও দেখানো যেতে পারে। দর্শক-সাধারণের এই প্রবণতা দেখে, শব্দালংকার প্রয়োগে সিদ্ধ কবি মিয়াঁ 'আমানত' লিখলেন 'ইন্দর সভা'—হিন্দু পৌরাণিক কথা ও মুসলমানদের ফারসী রুচির সমন্বয়ের প্রথম নিদর্শন।

'ইন্দর সভা' প্রদর্শিত হল শহরে। লোকেরা পাগল হয়ে উঠল। অচিরাৎ শহরে কুড়িটারও বেশি 'সভা' গজিয়ে উঠল। দেখতে-দেখতে এতো জনপ্রিয় হয়ে গেল, গায়ক এবং নর্তকী-গণিকাদের বাজার কিছুদিনের জন্যে মন্দা পড়ে গেল। 'আমানত' ছাড়া আরও অনেক লোক নতুন-নতুন 'সভা' রচনা করতে লাগল। এতদ্বারা উর্দু কবিতা হয়তো বিকৃত হল, কিন্তু ভাষায় মাজা পড়ল এবং পূর্বাঞ্চলের দেহাতী ও কারিগরদের উপনিবেশে-উপনিবেশে ছড়িয়ে পড়ল সেই রুচি, সে-ভাষা। এই রুচিই শক্ত করে দিল ড্রামা ও থিয়েটারের বুনিয়াদ। শাহী শাসন যদি আর কিছুদিন টিঁকে থাকত, তাহলে হিন্দুস্তানী নাটক এমন এক নিজস্ব রূপ ধারণ করত, যা হত একেবারে নতুন, এক বিশেষ রঙে স্নাতক।

লখনউয়ের সভ্য-সমাজে পুরনো গান ছিল দৃঢ়প্রোথিত। এই সমাজ এইসব নব্য অভিনয়ের মধ্যে অশ্লীলতার গন্ধ পেল—হঠাৎই। ফলে, গানপাগল সহৃদয়দের দৃষ্টি আবার ঘুরে গেল নৃত্যগীত মণ্ডলীর অভিমুখে। আর, নাট্যগুণে অন্বিত এই নতুন কলাটি সীমিত হয়ে গেল জনতায়, হাটে-বাজারে। প্রাচীন রুচিই এই নব্য রুচির ব্যবহারিক রূপ প্রদর্শনে একদা উৎসাহ দান করেছিল; তার ফলে, এই শহরে একটি বিশিষ্ট দলের জন্ম হয়েছিল, আজকের ভাষায় যাদের 'অ্যাকৃটর' বলাই অধিকতর যুক্তিসংগত। আমাদের এই

অভিনেতারা প্রথম দিকে সভ্য-সমাজের সহৃদয়তা লাভ করেছিল ও উর্দূ ভাষাকে বিকশিত করে তুলছিল। কিন্তু এখন যখন তার স্থান হল বাজারের নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে, তখন এর সেই শিষ্ট ভাষা স্বভাবতই পলাতকা। তথাপি বাজারী ভাষাতেও এইসব লোক আজও বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান দেখিয়ে চলেছে।

আমাদের এই অভিনয়-শিল্পীদের অশ্লীল হয়ে যাবার সবচেয়ে বড়ো কারণ হল—বোমবাইয়ের পারসীদের ইংরেজী ঢঙের থিয়েটার। সত্যি বলতে কি, এতে না ছিল সংগীতকলা, না সত্যিকারের 'অ্যাক্‌টিং'। কিন্তু সুব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা, জাদুভরা প্রদর্শনী এবং ঝল্‌মলে-ঝক্‌মকে পর্দা ইত্যাদি আমাদের জাতীয় নাটকের—যে আজও শৈশবের দোলনায় শয়ান—গলা টিপে ধরল। ওপরতলার লোক জাঁকজমকভরা নাটকে মোহিত হয়ে ভুলে গেল সুস্থ রুচিকে।

সত্যি কথা যদি বলতে হয়, বোম্বাই থিয়েটার ভারতীয় ললিত-কলার দুই অঙ্গ, নৃত্য ও গীতের প্রভূত ক্ষতি করেছে। প্রথমে জবাই করেছে গানকে; এমন-এমন সব মুক্তবন্ধ গান তৈরি করে বাজারে ছড়িয়ে দিয়েছে, যা বাজে বক্‌বকম্ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর পরে ওরা শেষ করতে চেয়েছে আমাদের উচ্চকোটির কলা-নৃত্যকে। স্টেজের ওপর, নাচের নামে চালু করেছে য়োরোপের ড্রিল, যাতে কতিপয় ছেলে ক্রম ও বেশভূষা বদল করে-করে মনোরঞ্জন করতে থাকে। যদ্যপি রাসওয়ালাদের গান ও অভিনয়, দুইই নিম্নকোটির, তথাপি স্বদেশী রঙে অনুরঞ্জিত, জাতীয় রুচিতে পরিস্নাত। ওরা তো পরিত্যজ্য নয়; বরং ওদের সংস্কারের আবশ্যকতা আছে।

সংগীত আলোচনার সূত্রে 'সোয্‌খোআনী'র উল্লেখও অবশ্য-প্রয়োজনীয়।
এই নতুন ধার্মিক কলাটিকে, সংগীতের নিয়ম-অনুসারে, শিল্পের অন্তর্গত করা অনুচিত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সোয্‌খোআনী এক বিশেষ ধরণের গানই। মহর্‌রমে হযরত ইমাম হোসেনের স্মৃতিকে সজীব করার ব্যাপারটি হিন্দুস্তানে, বিশেষ ক'রে শীয়ারাই আরম্ভ করে। এর সূচনা সেই সময় থেকে যখন 'ইসনা অশরী' ধর্মমত ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হল এবং সেখান থেকে লোকের পর লোক এসে হিন্দুস্তানী দরবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে লাগল। অন্যদিকে, দিল্লীর শাহীবংশের ধর্ম ছিল সুন্নী। ফলে শীয়া-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যেসব ক্রিয়াকলাপ, সেগুলি ওখানে বিকশিত হতে পারে নি। এই কলা প্রশ্রয় পেয়েছিল লখনউয়ের পুরনো শীয়া দরবারে এবং শহরে।
ধর্মীয় সংস্পর্শে 'মর্সিয়াগোঈ' এবং অ-গীত কবিতা-পাঠের রীতি কাব্যজগতে প্রচলিত হয়েছে। ঠিক সেইভাবেই সংগীতের জগতে জন্ম হয়েছে 'সোয্‌খোআনীর'। পুনশ্চ, ওই দুটি কলাবিদ্যা সমৃদ্ধ হতে-হতে শিল্পরূপে বিবর্তিত হয়েছে এবং হয়েছে আদ্যন্ত লখনউতেই। 'তহতুললফ্‌য্‌খোআনী' (না-গেয়ে-পাঠ্য মর্সিয়া) গম্ভীর স্বরে ও সহজ-ভাবে পড়া ও কথকতা ক'রে শোনানো হয়—যেভাবে মুশাইরায় কবি শোনান স্বরচিত গজল এবং 'সোয্‌খোআঁ' (সোয্‌গায়ক) গানের সঙ্গে শোনান 'সোয' আদ্যন্ত।
প্রাচীন ও আসল 'মর্সিয়াখোআনী' আদিতে 'সোযখোআনী'ই ছিল। মজলিসে গানের সঙ্গে তখন হামেশাই 'মর্সিয়া' শোনানো হত। এর রেওয়াজ শুধু দিল্লী নয়, হিন্দুস্তানের সব শহরেই, যেখানে শীয়াদের বসবাস, বিদ্যমান ছিল। মাদ্রাজ ও দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত এই ধরণের 'মর্সিয়াখোআনী' বেশ প্রবলতার সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হত। দেড়শো বছর আগের লেখা 'মর্সিয়া' আজও রয়েছে। শাইরীর শের (কবিতার শ্লোক) পড়ার মতো 'মর্সিয়া' পাঠ লখনউয়েরই আবিষ্কার।

এক্ষেত্রে, মীর 'অনীস', মির্জা 'দবীর' প্রভৃতি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তার বর্ণনা আমি কবিতা-প্রসঙ্গে করেছি।

'সোয্খোআনী' সব জায়গাতেই ছিল এবং অনেক আগে থেকেই ছিল। তবু, লখনউয়ে এর এমন শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে যে এই কলাটিও তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। লখনউ-ঘরানার দৌলতেই হিন্দুস্তানের পুরনো 'সোয্খোআনী' এতোদূর উন্নতি করল, 'সোয্খোআঁ'দের দাপটে পেশাদার গাইয়েদের বাজারে মন্দা দেখা দিল।

অন্যান্য কলাকারদের মতো 'সোযখোআঁ'রাও এখানে এসেছিলেন নবাব শুজাউদ্দৌলার সঙ্গে অথবা তাঁর শাসনকালে। ফয়জাবাদের ইতিহাসে লিখিত আছে: শুজাউদ্দৌলার পত্নী বহূবেগম সাহিবার মহলে মজলিশ হত এবং তাঁর দেউড়ী ও গোটা এলাকার 'মুখ্তার' (তত্ত্বাবধায়ক) জহর আলী খাঁ 'খোআজাসরা' 'মর্সিয়াখোআঁ'দের 'মর্সিয়া' শুনতেন। তবে, তখনও পর্যন্ত এখানকার 'সোযখোআনী' অন্যান্য স্থানের মতোই ছিল।

কেউ-কেউ বলেন: এই কলার প্রবক্তা খোজা হাসান মওদূদী। ইনি ছিলেন 'নগমাত-উল-আসফিয়া'র লেখকের গুরু। যদিও ইনি পেশাদার গায়ক ছিলেন না, কিন্তু সংগীতকলায় এঁর সমকক্ষ পাওয়া ভার[1]। ধর্মে ছিলেন সুন্নী; তথাপি সংগীতপ্রিয় ছিলেন এবং মৌলিক

[1] সংগীতে এঁর দক্ষতার নিদর্শন নীচের ঘটনাটি থেকে পাওয়া যায়: মারাঠারা তখন চারদিকে লুটপাট করছে। খোজা হাসান মওদূদী পাল্কি চড়ে লখনউ থেকে চলেছেন এটাওআ। পথের মাঝে একটা গ্রামে প্রবেশ করেই শুনলেন, মারাঠারা গ্রামটির ওপর হামলা করছে। যে-কাহাররা তাঁকে অনেক দূর থেকে নিয়ে আসছিল, হঠাৎ পাল্কি নামিয়ে রাখল, এবং বলল: আমাদের আর এগোবার সাহস হচ্ছে না। হাজারবার বলা হল: এ-জায়গা বিপজ্জনক। একটা কথাও কানে নিল না। তখন খোজা সাহেব জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে ওজু করলেন, সন্ধ্যার নমাজ পড়লেন। তারপর বসে বসে শুরু করলেন আলাপ। কাহারদের ওপর সেই গানের এমন প্রভাব

সুর সৃষ্টি করে শিষ্যদের শেখাতেন। তারই ফলে, এই কলা একটি নিয়মিত রূপ ধারণ করল। তারপর 'সিড়ে' হায়দারীর জমানা। নিয়ম করেই, প্রতি মহর্‌রমে তিনি নিজ মনোমত সুরে 'মর্সিয়া' গান করতেন। তিনি ছিলেন বড়ো ও নামী গায়ক, দরবারেও সমাদর ছিল ; তাই তাঁর প্রয়াস সার্থক হতে পেরেছিল। তখন বোঝা গেল, আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারলে, এই কলাকেই একটি স্বতন্ত্র শিল্প-রূপে দাঁড় করানো যায়। অতএব, সংগীতের হাজার-হাজার সুরের মধ্যে থেকে সেইসব সুরই বেছে নেওয়া হল, শোক-সন্তাপের বিবৃতি ও অভিব্যক্তির পক্ষে যেগুলি উপযুক্ত ; তাদের সংস্থাপন করা হল শতশত 'সোযে'র অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে। হায়দারী খাঁ তাঁর এই 'সোয্‌খো-আনী'র উত্তরাধিকারী করে গেলেন সৈয়দ মীর আলী সাহেবকে। শরীফ সৈয়দ ধর্মীয় আবেগে এর আরও উন্নতি বিধান করলেন। স্ব-কালে ইনি খুব বড়ো গায়ক বলে খ্যাত ছিলেন। নবাব সাদত আলী খাঁর সময়ে কোন একটা কথায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি লখনউ ছেড়ে যাবার সংকল্প করলেন। ইন্‌শাল্লাহ্‌ খাঁ তাঁর বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী 'কবি-স্বর' ও সরস উপহাসের মাধ্যমে তাঁকে অনুরোধ করলেন ; নবাবও আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়ে সসমাদরে তাঁকে ফিরিয়ে আনলেন।

এর পরে, তানসেনের বংশের এক গায়ক নাসির খাঁ লখনউয়ে এসে নাম করেছিলেন। স্থানীয় লোকেদের 'সোয্‌খোআনীর' প্রতি প্রীতি দর্শন করে তিনিও আপন সাংগীতিক দক্ষতাকে 'মর্সিয়াখোআনী'তে প্রয়োগ ক'রে লোকপ্রিয় ও লোকপ্রসিদ্ধ হলেন। প্রতিবেশিনী এক দরিদ্র বিধবা সৈয়দার (সৈয়দ বংশের স্ত্রী) প্রতি করুণা-পরবশ হয়ে তার দুই শিশুপুত্র মীর আলী হাসান ও মীর বান্দা হাসানকে 'সোয্‌খোআনীর' তালিম দিতে লাগলেন। কালক্রমে, এঁরা দুজনেই

পড়ল, তারা নতুন উৎসাহে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল, এবং তাঁকে পৌঁছে দিল সুরক্ষিত স্থানে।

হয়ে উঠলেন 'সোয্‌খোআনী'র অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ; এঁদের দক্ষতা প্রাচীন সমস্ত ওস্তাদকে অতিক্রম করে গেল। এঁরাই 'সোয্‌খো-আনীকে পরিণত করলেন একটি উচ্চকোটির রাগে। মূল রাগের বোল তো প্রায়-গায়কদেরই স্মরণে নেই। কিন্তু 'সোয্‌খোআঁ'দের কাছে এমন-সব সোয্‌গান আছে, যা ওইসব রাগেরই বোল, যা শুনে মূল রাগ ও সুর পরিষ্কার বোঝা যায়।

এইসকল প্রধান ওস্তাদদের দৌলতে লখনউয়ে সোয্‌খোআনীর শিল্প সাধারণ গায়কদের কাছ থেকে চলে এল অভিজাতদের মধ্যে। সোয্‌খোআনীতে পারদর্শী, এমন লোকের সংখ্যা বেড়ে গেল। এরা ডোম-ঢুলী নয়, সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। গায়কদের বাজার ম্লান হয়ে গেল।

বর্তমানে মনৃঝু সাহেব এবং আর দু-একজন শিল্পী সোয্‌খোআনীতে অসাধারণ দক্ষতা ও খ্যাতির অধিকারী। হিন্দুস্তানের সর্বত্র গুণমুগ্ধরা এঁদের আগমনের অপেক্ষায় উৎসুক হয়ে থাকে। মহর্‌রমের মাসে ও শোকের বিশেষ দিনগুলিতে অন্য নগরবাসীরা যে-সমাদর বর্ষণ করে এঁদের ওপর, লখনউ-ভক্তদের আপ্যায়ন তার কাছে কিছুই না।

এই রুচির সর্বাধিক প্রভাব পড়েছিল লখনউ-রমণীদের ওপর। সোযের অমোঘ ও হৃদয়কে টুক্‌রো-টুক্‌রো-করে-দেওয়া সুর মীর আলী হাসান ও মীর বান্দা হাসানের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত হয়েই আশ্রয় নিল শত-শত শরিফ পুরুষের গলায় এবং সেখান থেকে হাজার-হাজার শীয়াবংশীয়া সম্ভ্রান্ত রমণীদের মধুর কণ্ঠে। গীত-বাদ্যে রমণীকুলের আসক্তি স্বভাবতই অধিক ; তাদের কণ্ঠও সংগীতের অধিকতর উপযোগী। নিয়মবদ্ধ 'মর্সিয়াখোআনী' মহিলামহলে উপনীত হতেই তার চিত্তাকর্ষকতা গেল বেড়ে। শুধু শীয়া নয়, নিম্নবর্গের সুন্নী রমণীদের মধ্যেও এই শখ সঞ্চারিত হল। ক্রমে অবস্থা দাঁড়াল—মহর্‌রমে এবং অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনাদির সময়ে লখনউয়ের অলিগলির বাড়িতে-বাড়িতে আজ ওঠে সুরশ্রী তান ও হৃদয়হরণী সংগীতের ধ্বনি। গান হচ্ছে না—এমন স্থান কোথাও খুঁজে পাওয়া

14

যাবে না। যে কোন গলিতে দাঁড়িয়ে আপনি কান পাতুন—এমন মনকাড়ানিয়া ধ্বনি, এমন মাতাল-করে-দেওয়া গান শুনতে পাবেন, সারা জীবনেও ভুলতে পারবেন না। কতিপয় খাস সুন্নীর এবং হিন্দুদের বাড়ি চুপচাপ। বাকি যেদিকে কান দেবেন, 'মর্সিয়াখো-আনীর' উচ্চকণ্ঠ গীত-ধ্বনি আপনার শ্রবণ স্পর্শ করবেই।

'মর্সিয়াখোআনী'র উপলক্ষ্য ঃ 'তাজিয়াদারী'। অতএব, শীয়া ও সুন্নী, উভয় সম্প্রদায়ের ঘরেই মর্সিয়াখোয়ানীর চর্চার সূত্রে তাজিয়াদারী হতে লাগল এবং শুধু সুন্নী মুসলমান নয়, সংখ্যাহীন হিন্দুও তাজিয়াদারীকে আপন করে নিয়ে 'মর্সিয়া' গান করতে লাগল। এ থেকে, বোঝা যায়—লখনউয়ে তাজিয়াদারীর বহুলতা ও বিকাশের কারণ ঃ মর্সিয়াখোআনী।

লখনউয়ে শরিফ, সুশিক্ষিতা ও শিষ্টা কতিপয় মহিলা আছেন, যাঁরা উঁচুদরের 'সোয্‌খোআঁ'। পর্দার বাধা যদি না থাকত, তাহলে এঁদের সামনে পুরুষ-'সোয্‌খোআঁরা' দাঁড়াতেই পারত না।…অনেকদিন আগেকার কথা। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে একবার 'চেহল্লুম'[1]-এর সময় গিয়েছিলাম তালকাটোরার কারবালায়; ওখানেই একটা শিবিরে রাত্রিবাস করি। রাত তখন দুটো। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই কানে এলো সুমনোহর একটি গীত। বন্ধুরাও জেগে উঠেছেন। গান শুনে সবাই বিবশ। সেই অলৌকিক ধ্বনি-শ্রবণে উৎসুক হয়ে আমরা শিবিরের বাইরে এলাম। দেখি ঃ রাত নিঃঝুম, মাঠ জুড়ে চাঁদের আলো, আর তার মধ্যে দিয়ে তাজিয়া নিয়ে আসছে একদল রমণী—অনবগুণ্ঠিতা, আলুলায়িতকুন্তলা। মাঝখানে এক রমণী, হাতে 'শামা'[2]। পাশে, দীর্ঘদেহিনী এক অপূর্বসুন্দরী নারী, সেই আলোয় কাগজের পাতা থেকে প'ড়ে প'ড়ে 'মর্সিয়া' গাইছেন। অন্য কয়েকজন রমণী তাঁর সঙ্গে গলা মেলাচ্ছেন। সেই নৈঃশব্দ্য, সেই সময়, সেই চাঁদনী, সেই নগ্নশির সুন্দরীর দল, আর সেই সুরশ্রীময়ী গান, সব মিলে

[1] কারবালায় শহীদত্বের চল্লিশতম দিন। [2] চর্বির বা মোমের বাতি।

এমন এক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, যার বর্ণনায় আমি অক্ষম। নাজুক-অভিব্যক্তির এই সমাবেশ যে-মুহূর্তে কারবালার তোরণে প্রবেশ করল, সেই দীর্ঘতনু আশ্চর্যসুন্দরী নারী পরজের সুরে শুরু করলেন এই মর্সিয়াটি:

জব কারওআন-এ-শহর মদীনা লুটা হুআ
পহুঁচা করীব শাম কে ক্যায়দী বনা হুআঁ
নেযে পে সর হুসেন কা আগে ধরা হুআ
অ্যর্ পীছে পীছে বীসিয়োঁ কা সর খুলা হুআ

মদিনা-শহর-কাফিলা যখন লুণ্ঠিত হল রে হায় হায়
বন্দী হইয়া সিরিয়া দেশের নিকটে আইল রে হায় হায়
বর্শাফলকে গাঁথা ত্যাখো, হায়, হোসেনের শির রে হায় হায়
পশ্চাতে ত্যাখো রমণীর দল খোলা শিরে যায় রে হায় হায়

এই 'মর্সিয়া,' এই শোকগীতি, যা সর্বপ্রকারে সেই পরিস্থিতির অনুকূল ছিল, মুহূর্তে একটি আবেশ জাগিয়ে দিল। সন্দেহ হতে লাগল: এই গানের মধ্যে দিয়ে ওই রমণীরা কি কারবালার ঘটনাকেই চিত্রিত করছেন, অথবা, সেই শোক-সমারোহে, সেই আদি কারবালাতেই নিজেদের প্রবেশ-মুহূর্তের বর্ণনা করছেন!

বস্তুত, লখনউয়ের নারীসমাজ এবং সেই সঙ্গে পুরুষদের ওপর 'সোযখোআনী' ও 'তাজিয়াদারী' যে গভীর ছায়া বিস্তার করেছিল, তেমন আর কোন কিছুতেই করে নি। এর প্রথম সুফল: এখানকার যতো রমণী, সবাই হয়ে গেল সুকণ্ঠের অধিকারিণী, এবং সংগীতের নিয়ম-অনুসারেই 'মর্সিয়াখোআনী' করতে লাগল। দ্বিতীয় সুফল: কী নারী, কী পুরুষ, শহরের সমস্ত মানুষ সংগীতমনস্ক হয়ে উঠল। এই-যে লখনউয়ের গলিঘুঁজিতে দেখা যায়, নিম্নশ্রেণীর বালক ও হাটে-বাজারের লোকেরা প্রায়ই চলতে ফিরতে গান গাইছে, গলার এমন কাজ দেখাচ্ছে, কঠিন-কঠিন সুর এতো সহজে নকল করছে,

যা দেখে বাইরের লোক বিস্মিত হয়ে যায়, এর আসল কারণ মর্সিয়াখোআনী ও সোয্‌খোআনীর রুচি। এর মধ্যে যেটা প্রশংসনীয়, তা হল: জনগণ ও নিম্নশ্রেণীর মূর্খদের মধ্যে যদিচ সোয্‌খোআনীর বিকাশ, তবু সে বরাবরই নিয়মের অনুগত থেকেছে, এবং সংগীতের যথাযোগ্য স্তর ছেড়ে কোনদিন নীচে নামতে পারে নি। অথচ সেই সময়ে, অন্য অনেক শিল্প জনতায় উত্তীর্ণ হওয়ামাত্রই নিয়মবিহীন এবং ফলত অপকৃষ্ট হয়ে গেছে।

যদ্যপি শীয়ারা 'সোয্‌খোআনী'কে পুণ্যকর্ম বলে মনে করে, শীয়া পণ্ডিতরা আজ পর্যন্ত একে শুদ্ধির ফতোয়া দেন নি। শাস্ত্রনিষ্ঠাই এই কঠোর নিষেধের কারণ। এখনও শিষ্ট ও বিদ্বানদের মজলিসে শুধু 'হাদীসখোআনী' তথা 'তহ্‌তুললফ্‌য্‌খোআনী'[1] হয়। জনতার যে মজলিসে ধর্মশাস্ত্রী শরিক হন, সেখানেও তাঁর সামনে 'সোয্‌খোআনী' হয় না। তবু; একথা অনস্বীকার্য যে লোকপ্রিয়তা হেতু 'সোয্‌খোআনী' পণ্ডিতদের ফতোয়ার ওপর জয়ী হয়েছে—পরিপূর্ণভাবেই। মুশকিলটা হচ্ছে অন্যত্র। সুন্নী-হদিসে বিদ্বান ও সুফীদের জন্যে সংগীত-চর্চা বিহিত। কিন্তু 'ইসনা অশরী' ধর্মশাস্ত্রে এই অবকাশটুকুও নেই। নতুবা, এই কলা আজ ধর্মীয় অনুমোদনও লাভ করত।

॥ 25 ॥

কলাকার, সংগীতশাস্ত্র, এবং তা থেকে সঞ্জাত কলাবিদ্যাগুলি প্রসঙ্গে আমি অনেক কিছু লিখেছি। এই ধারায় এখনও বাকি আছে: ভাড়াটে বাজনা—'বাজারী বাজা'। এর স্বরূপ, অবস্থা এবং প্রভাবাদির বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সংগীতের ওপর এই আলোচনা শেষ করব।

বিবাহাদি শোভাযাত্রায় বাজনার যে 'জোড়' (পার্টি) যায়, তারা হল ছয় শ্রেণীর: (১) ঢোল-তাশা, (২) র‍্যাওশন চ্যওকী,

---

[1] যে-গান গাওয়া হয় না, পড়া হয়।

(৩) ন্যবত, (৪) তুর্‌হী ও করনা, (৫) ডংকা ও বিগুল, (৬) ইংরেজি বাজনা, যাকে বলা হয় 'আর্গন বাজা', যার প্রচলন দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ঢোল-তাশা ভারতের প্রাচীন জাতীয় বাদ্য, ইংরেজরা যাকে 'ইণ্ডিয়ান টমটম' নাম দিয়ে অজ্ঞতাবশত উপহাস করে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যণ্ডের 'আর্লস্ কোর্টে' এক প্রদর্শনীতে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং কলা ও শিল্পের অনেক নমুনা দেখানো হচ্ছিল। এই বাজনাও সেখানে ছিল। তার যে নমুনা আমি নিজে চোখে দেখেছি—জনৈক ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি, পরণে শুধু একটা ময়লা লেংটি; সেই অবস্থায় দর্শকদের সামনে দাঁড়িয়ে, গলায় একটা ঢোল। লোকটা খুব অসভ্য ঢঙে, পাগলের মত মাথা ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে একটা কাঠি দিয়ে জোরে জোরে ঢোলটাকে পিটছে—তার না আছে কোন লয়, না কোন বাঁধুনী—আর বলছে: এই হচ্ছে হিন্দুস্তানের বাজনা 'টম টম'। বলা বাহুল্য, এটা ওদের অজ্ঞতা ও নিবুর্দ্ধিতার পরিচয়। নিঃসন্দেহে, ঢোল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাদ্য, এবং এর বাজনা অবশ্যই কলা, যাতে উঁচু জাতের লয় রক্ষিত হয়।

লখনউয়ের জোড়ে সাধারণত দুই, কখনও তিন বা চারটে করে বড়ো ঢোল থাকে; কম-সে-কম এক, নইলে দু-তিনজন তাশাওয়ালা এবং কম করে একজন ঝাঁঝওয়ালা। ঝাঁঝের সন্ধান পাওয়া যায় ইরানে, তাশা প্রচলিত মিশর প্রভৃতি দেশেও। ঢোল বিশুদ্ধ ভারতীয় বাদ্য। সেনাবাহিনী এবং সংগতিপন্ন লোকেদের সঙ্গে এবাজনা এসেছে দিল্লী থেকে লখনউ। দিল্লীতে ঢোল আর ঝাঁঝ ছিল 'জোড়'; তাশা যুক্ত হল লখনউয়ে। এবং চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতো প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য বলে গণ্য হল, মনে হল: তাশা এসেই এই বাজনায় প্রাণ সঞ্চার করে দিল। অধিকাংশ শহরে যখন শুধু ঢোল আর ঝাঁঝ বাজত, লখনউয়ে তখন তাশাও হত তার অভিন্ন অঙ্গ। তাশাবিরহে ঢোল এখানে বাজেই না। এ থেকে স্পষ্ট, যে, এই বাজনায় কৃতিত্ব দেখায় তাশা-বাদকই। তাশা লয় রক্ষা করে, ঢোল বাজে তার

অনুসরণে। তাশা বাজানোর গুণ-লক্ষণ হচ্ছে, এতো দ্রুত চোট পড়ে যে, দুই চোটের মধ্যে তফাৎ করা যায় না। লাগাতার চোট্ এবং ধ্বনির ওঠা-নামা থেকে জাত হয় লয় ও সংগীত। লখনউয়ে এই বাজনার এমন সব বাদক আছে, যাদের সামনে কোন শহরের ঢুলি দাঁড়াতে পারে না।

লখনউয়ে 'চেহল্লুম'-এর পরে একটা তাজিয়া ওঠে, যাকে বলা হয় 'বখ্‌শূ কা তাজিয়া'। শীয়া-সুন্নী বিবাদের জন্যে এখন এর রূপ অন্যরকম হয়ে গেছে। কিন্তু দশ-বারো বছর আগে এর খুব জাঁকজমক ছিল। তাজিয়াটি শাহী বংশের বিগতকালীন এক প্রেমিকের স্মৃতিবাহী, এবং এটি ওঠাত গরীব লোকেরা। এই কারণে এবং পুণ্যকর্ম ভেবে, যাবতীয় বাজনার বড়-বড় ওস্তাদরা এতে যোগ দিত এবং শহরবাসীদের নিজ নিজ কলানৈপুণ্য দেখাত—এটিও পুণ্য-কর্ম বলে বিবেচিত হত। পথ চলতে চলতে এরা একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াত, মুহূর্তে ভক্তরা ঘিরে ফেলত। এরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওইখানে দাঁড়িয়ে এই দাবিই ঘোষণা করত : কোঈ হ্যয়, আমাদের সামনে এসে বাজাবে ? বড়ো-বড়ো গাইয়ে এদের প্রশংসা করত ; উদ্বোধিত হয়ে এরা আরও জমিয়ে বাজাত। বিশেষ ক'রে তাশাবাদক ছিল দক্ষ ঢুলী ও সংগীতে প্রবীণ ; গৎ-এ সে নবীনতার সঞ্চার করত।

ঢোল-তাশা বাজানোর আর্ট যে কতো গুরুতর ও নিয়মবদ্ধ ছিল, তার প্রমাণ আমি কলকাতায় নিজের চোখে দেখেছি। মহর্‌রমের সপ্তম দিনে, যেদিন আসমানী কোঠী থেকে 'মেহদীর শোভাযাত্রা' রওনা হত, অওধের শেষ শাসক, সর্বজনমান্য সংগীতাচার্য ওয়াজিদ আলী শাহ স্বয়ং গলায় তাশা ঝুলিয়ে বাজাতেন। বড়ো-বড়ো গায়কদের গলায় ঝুলত বড়ো-বড়ো ঢোলক। আশপাশে দাঁড়িয়ে দরবারের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। এতো সুন্দর তাশা তিনি বাজাতেন, অনভিজ্ঞ যে, সেও শুনে বিস্মিত-স্তব্ধ হয়ে যেত। আর গাইয়েদের প্রশংসাধ্বনি তো আমাদের মুশাইরার শোরগোলকেও হার মানাত। এইরকম কয়েকবার আমি ওঁকে ঢোলও বাজাতে দেখেছি।

হিন্দুস্তানের এই প্রাচীনতম বাজনারও অল্প পরিবর্তন করেছে লখনউ। সে-পরিবর্তন জনপ্রিয়ও হয়েছে। এবং তার প্রয়োজনও ছিল। কোন ব্যক্তি যদি এখানে এসে তাশা-বাদকের পারদর্শিতা দেখে তো বুঝতে পারবেঃ এই পরিবর্তন কতো উপযুক্ত হয়েছে, ঢোল ও ঝাঁঝকেই বা কতো প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় জোড়ঃ 'র‍্যওশন চ্যওকী' (রোশন-চৌকী) এটিও অনেক পুরনো বাজনা। মুসলমানরা, সবগুলি না হলেও, এর প্রধান অঙ্গ-গুলিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, যার মধ্যে 'শাহনাঈ' মুখ্য। এর আবিষ্কর্তা হিসাবে শেখ-উর-রইস ইবনে সীনার নাম উচ্চারিত হয়। সানাই মনুষ্যকণ্ঠ-উপম। এ থেকে সুর যতো নিখুঁত স্বরে নির্গত হয়, তেমন আর কোন বাজনায় হয় না। রোশন চৌকীতে কম করেও, দুজন সানাই-বাদক থাকে, আর একজন তবলচী, যার কোমরে ছোট-ছোট দুটো তবলা বাঁধা থাকে। এই তবলা লয়কে ধরে রাখে। মূল সুরকে ধরে রাখার জন্যে একজন সানাই-বাদক সুর দিতে থাকে। অন্যজন ধ্বনিকে নানাভাবে খেলায়, গমক-গিটকিরি আদি দেখাতে থাকে। এই বাদকই আসল ব্যক্তি, যে আশ্চর্য আকর্ষণীয় সুর-লহরীতে গজল, ঠুমরি ইত্যাদি রূপায়িত করতে থাকে।

রোশন-চৌকী ছিল হিন্দুস্তানের খাস দরবারী বাদ্য। বাদশাহ ও বড়ো-বড়ো আমীরদের ভোজনকালে বাজত। রাতে বিশ্রামের সময় শাহী মহলের চার পাশে চৌকি বা চক্কর দিত; দূর থেকে ভেসে আসা তার সেই সংগীত আরামকে করে তুলত আনন্দিত। মুগল শাসনে বাদ্যটি তাই আনন্দবিধায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হত। তবে, খুদাই জানেন, দিল্লীতে এর রেওয়াজ কবে থেকে। ওখান থেকেই যে লখনউয়ে রোশন-চৌকী-বাদক এসেছিল, তাতে কোন সংশয় নেই। এই কলার প্রবীণ শিল্পীরা লখনউয়ের আশ-পাশের এলাকায়ও ছিল অনেকদিন থেকে। বেনারসের অধিকাংশ মন্দিরে আজও ভোরে রোশন-চৌকী বাজে। ভোর হবার মুখে, আঁধারে-আঁধারে কাছে গিয়ে যদি শোনেন, আনন্দের অবধি থাকবে না।

লখনউয়ে বিয়ের জুলুসে রোশন-চৌকীদাররা সাধারণত বরের কাছাকাছি থাকে। বিশেষ ক'রে, হিন্দুদের বরযাত্রায় পথের ওপরেই, পদে-পদে ওদের পুরস্কার দেওয়া হয়। আমার জ্ঞান ও ধারণামতো বলতে পারি, লখনউয়ের চেয়ে ভালো রোশন-চৌকী-বাজনদার আর কোথাও পাওয়া যাবেনা। যে লয়দারী, মনোহারিণী ধুন এবং বিশুদ্ধ সুরের সহযোগে লখনউওয়ালা বাজাতে থাকে, অন্য কোন স্থানের রোশন-চৌকী-বাদক তেমন পারে না। এদের কৃতিত্ব ও কলাদক্ষতার পরিচয় তখনই পাওয়া যায়, যখন কেউ শখ করে শোনে এবং তারপরেও প্রশংসা করতে থাকে। পূর্ববর্ণিত 'বখ্‌শূ কা তাজিয়া'য় এরাও আপন আপন দক্ষতা দেখাত; এমন প্রাণ দিয়ে বাজাতে চেষ্টা করত, যাতে ওদের পর আর কারও সানাইয়ে মজা পাওয়া না যায়।

তৃতীয় জোড় : 'ন্যবত' (নহবৎ)। এটি আমাদের পুরনো বাদ্য-বৃন্দের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ব্যাণ্ড। এতে থাকে দু-তিনজন সানাই-বাদক, এবং একজন 'নক্‌কারা'-বাদক—দুটো বড়ো-বড়ো ভারী 'নক্‌কারা' (নাকাড়া) সামনে ঝুলিয়ে নিয়ে কাঠি দিয়ে দুটোকে একসঙ্গে বাজাতে থাকে। এর আওয়াজ খুব জোর ও ভারী হওয়ায় পারিপার্শ্বের অনেক দূর পর্যন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। এদের সঙ্গে একজন ঝাঁঝওয়ালাও থাকে।

নহবৎও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাজনা। ঐশ্বর্য-প্রদর্শনের জন্যে দীর্ঘদিন ধরে এর ব্যবহার চলে আসছে। ইসলামের ইতিহাসে মিশর, বাগদাদ ও দামাস্কাসের দরবারে এদের অস্তিত্বের সংবাদ পাওয়া যায়। বাগদাদে, আব্বাসী শাসনের মধ্য পর্বে সামন্তদের দেউড়িতে-দেউড়িতে নহবৎ বাজত। তখন এটি ছিল আদর সম্মানের প্রতীক। মুসলমানদের সঙ্গেই এটি হিন্দুস্তানে এসেছে বলে মনে হয়। হিন্দুস্তানে আগে থেকে প্রচলিত থাকাও অসম্ভব নয়। তার সঙ্গে হয়তো সানাই ছিল না; খালি নাকাড়া ও ঝাঁঝই বাজত। এর যে বর্তমান রূপ, তা গড়ে উঠেছে ইরানে-ইরাকে, তারপর এদেশে এসেছে।

বাদশাহ ও পদস্থ সামন্তদের শোভাযাত্রায় সৈন্যাদির সঙ্গে নহবৎ-বাদ্য অপরিহার্য ছিল। পরাক্রান্তশালী সম্রাটদের শোভাযাত্রার আগে-আগে হাতীর ওপর নহবৎ বাজাতে-বাজাতে যেত। যুদ্ধে বিজয়ী পক্ষ নিজেদের জয় ঘোষণার জন্যে জোরে জোরে নহবৎ বাজাত। শাহানশাহ আওরঙ্গজেব হায়দরাবাদ জয় করে নিকটবর্তী একটা পাহাড়ের ওপর নহবৎ বাজানোর ব্যবস্থা করেছিলেন ; এটা আজও 'ন্যবত পহাড়' নামে বিখ্যাত। মুগল শাসনে, উচ্চতম শ্রেণীর ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিদের বাদশাহর পক্ষ থেকে অধিকার দেওয়া হত নহবৎ বাজানোর। তাঁদের দেউড়ীতে এবং যাত্রাকালে নহবৎ বাজত। নহবৎ বাদকদের জন্যে উঁচু জায়গা নির্বাচন করা হত। প্রায়শঃই, শাহী মহলের তোরণের ওপর 'ন্যবতখানা' তৈরি করা হত। যেসব শহরে একদা কোন বড় দরবার ছিল, সেখানেই এর নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।

এই পুরাতন প্রথার অনুসরণ আজও লখনউয়ে দ্রষ্টব্য—কোন ধনী ব্যক্তির বাড়ীতে বিবাহ বা অন্য কোন উৎসব হলে, তার দরজার ওপর লম্বা-লম্বা বাঁশ বা খুঁটি দাঁড় করিয়ে, এবং লাল কাপড়, পাতা ইত্যাদি দিয়ে মুড়ে এক অস্থায়ী 'নহবৎখানা' নির্মাণ করা হয়। সারা দিন ধরে, বিভিন্ন সময়ে, থেকে থেকে, নহবৎ বাজতে থাকে বারবার। বরযাত্রা এবং তাজিয়ার জুলুসেও এইভাবে তক্তার ওপর কৃত্রিম নহবৎখানা বানানো হয় ; কাহাররা কাঁধে নিয়ে আগে-আগে চলে ; তার ওপর নহবৎ যায় বাজতে-বাজতে সারাটা পথ।

পুরনো দিনে, বিশেষ করে লখনউ-দরবারে, এই নহবৎ সময় জ্ঞাপন করত। এখন ইংরেজি ঘড়ির চল, চব্বিশ ঘণ্টায় দিন। তখন কিন্তু সময়কে এভাবে ভাগ করা হত না। তখন সময়-বিভাজন ছিল এই রকম : দিন ও রাত মিলিয়ে আট "পহর"[1] ; চার 'পহর' দিন, চার 'পহর' রাত। আট "ঘড়ীতে" এক পহর। নহবৎখানায় একটা নাদায় জল ভরে রাখা হত ; তার মধ্যে রাখা হত সছিদ্র একটা খালি

[1] প্রহর

ঘটি। ঘটিটা ভাসত; এবং নীচের ওই ছোট্ট ছ্যাঁদা দিয়ে আস্তে-আস্তে জল ঢুকত বাটিতে। ছিদ্রটা এমন আন্দাজে করা হত, জল ভরতে-ভরতে, এক "ঘড়ী" সময়ের মধ্যেই ঘটিটা ভর্তি হয়ে ডুবে যেত। অর্থাৎ, একেবারে গোড়া থেকে পানিয়া-ভরণ শুরু হয়ে ঘটিটা যখন প্রথমবার ডুব মারত, তখন 'এক ঘড়ী' বাজত। দ্বিতীয়বার ডুবুরী হলে, 'দু-ঘড়ী'। এইভাবে চলতে-চলতে যখন অষ্টম-ঘড়ীতে পৌঁছতো সময়, তখন বাজানো হত 'গজর'—প্রথমে বিশেষ ঢঙে আটবার আঘাত ক'রে তারপর ঘড়ীর ওপর খুব তাড়াতাড়ি একসঙ্গে অনেকবার মারা হত। এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হত; 'পহর' পুরো হয়ে গেছে। ঘড়ীর ক্রম আবার এক থেকে শুরু হত।

যে-দেউড়ীতে নহবৎ বিরাজ করত, পহর শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় 'এক ঘড়ী' পর্যন্ত নহবৎ বাজত। রাত-দিনের আট পহরে আট নহবৎ। আসলে কিন্তু সাতটা নহবৎই বাজত। প্রথম নহবৎ বাজত ভোরের নমাজের সময়, প্রথম পহরের আরম্ভে; এই প্রভাতী নহবতের নাম ছিল 'সুবহ কী ন্যবত'। দ্বিতীয়বার বাজত, বেলা যখন এক পহর; তাকে বলা হত 'পহরে঳া চঢ়ে কী ন্যবত'। তৃতীয়বার, ঠিক বারোটার সময়, সূর্য যখন মধ্যাহ্ন গগনে; এটি ছিল 'দোপহর কী ন্যবত'। এর পরে যখন আট ঘড়ী পূর্ণ হয়ে যেত, তখন বাজত 'তীসরে পহর কী ন্যবত'। সূর্যাস্তের সময় চতুর্থ পহর শেষ হলে 'শাম কী ন্যবত' বাজত। পঞ্চম পহরে পঞ্চম নহবৎ 'পহর রাত গয়ে কী ন্যবত'। ষষ্ঠ নহবৎ যখন বাজত, তখন 'আধীরাত/দোপহর কী ন্যবত'। এর পরে যখন সপ্তম পহর পুরো হয়ে যেত, রাত পৌঁছত তৃতীয় পহরে, সে সময়ে লোকের বিশ্রামে যাতে ব্যাঘাত না পড়ে, তাই নহবৎ বাজত না। শুধু 'গজর' বাজানো হত। সবশেষে, অষ্টম পহরের সমাপ্তি; 'সুবহ কী ন্যবত'।

যতদিন রাজ-রাজত্ব ছিল, মুগল দরবারে এবং-লখনউ রাজ্যে সময়ের এই হিসেবই প্রচলিত ছিল। কলকাতায়ও ওয়াজিদ আলী শাহ যতদিন জীবিত ছিলেন, এই হিসাব মতোই 'পহর' ও 'ঘড়ী'

বাজত। এতে দীর্ঘদিন ধরে এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, যে, পহর ও ঘড়ীর হিসাব জানে না, এমন লোক এখনও পাওয়া দুষ্কর। এই অভ্যাসের কুফলও হয়েছে—দিন-রাত্রির সময়-বিভাজন বদলে গেছে, তবু পুরনো পদ্ধতি আমাদের রক্তে-স্নায়ুতে আজও রয়ে গেছে। আমরা বলি: "ঘড়ীভর মেঁ আউংগা; দোপহর কো সোউংগা; পহর দিন চড়ে খানা খাউংগা।" কিন্তু আমরা জানিনা, 'পহর' কতোটা, 'ঘড়ীই' বা বলে কাকে! আমরা অনবরত শুনি 'পহরা বসে গেছে' এবং 'পহারার সিপাই'; কিন্তু জানিনা, যে, এই 'পহর' থেকেই এসেছে 'পহরা' (পাহারা) শব্দ। তখন প্রত্যেককেই 'পহরে পহরে পাহারা' দিতে হত।

সময়-বিভাজনের এই পুরনো হিসেব হিন্দুদের। ইরাণেও প্রাচীন কাল থেকে এই হিসেবই প্রচলিত ছিল, এবং এই হিসেব মতোই নহবৎ বাজানো হত। আমাদের বর্তমান হিসেবের অনুযায়ী এক পহর (প্রহর) হত তিন ঘণ্টার।

লখনউয়ের নহবৎ-বাজনদাররা ছিল উচ্চশ্রেণীর। তাই সমস্ত শহর ও জায়গায় এখান থেকেই বাজনদার যেত, কিংবা এই ওস্তাদদের সাগরেদ হত স্থানান্তরের শিক্ষার্থী। তবু, এখানে নহবতের বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। বাজনদারদের সংখ্যা সেই একই থেকে গেছে, বাদ্য সেই এক, বাজাবার পদ্ধতিও। তবে, এটুকু অবশ্যই হয়েছে—লখনউয়ের সংগীত-সভা যেসব গান ও যেসব ধুন বাছাই করে সমাজে লোকপ্রিয় করে দিত, সেইসব গান ও ধুন নহবৎখানায়ও শোনা যেতে লাগল। তা বলে, নহবৎ বাজনার পুরনো পদ্ধতি যে পরিত্যক্ত হল, মোটেই তা নয়—স্বস্থানে স্থায়ী হয়েই সে থেকে গেল। আমীর খুসরো তাঁর কবিতায় সমকালীন নহবৎ বাজনার যে ছবি এঁকেছেন, তা থেকে ওই সময়ের বাজনার ঢং কী ছিল, অনুমান করা যায়। এখনও সেই শৈলীই চলিত, খুব বেশি বদলায়নি। তত্রাচ, এখানকার সানাইয়ে যে ধুন ও গীত বাজানো হয়, তার ওপর লখনউ-সংগীতের প্রভাব স্বত আপতিত। শোনামাত্রই তা ধরা যায়।

'তুরহী' ও 'করনা' হিন্দুস্তানের অতি প্রাচীন রাষ্ট্রীয় বাদ্য। এর ব্যবহার হত বিশেষভাবে সৈন্যদের সঙ্গে। 'তুরহী' (তুরী)র চেহারা দেখে বোঝা যায়, এটা হিন্দুস্তানে এসেছে ইংরেজদের সঙ্গে, এবং পদার্পণমাত্র প্রচলিত হয়ে গেছে। কিন্তু 'কর্না' (কাড়া, শংখ) খাস ইরানী বাজনা। এর আওয়াজের মধ্যে এমন একটা 'রোয়াব' আছে, যা, যুদ্ধক্ষেত্রে দাপট সৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত। লখনউয়ের জুলুসে দুই বাজনারই রেওয়াজ আছে ; তবে স্থায়ী বাদ্য রূপে নয়। ফৌজ বা পলটনের সঙ্গে থাকত একজন করে তুরী-বাদক বা কাড়া-বাদক, তারা থেকে থেকে বাজাত, এবং স্বপক্ষের উপস্থিতি বিঘোষিত করত। এই বাজনা দুটির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত হিন্দুদের পুরনো বাজনা 'নরসিংঘা' (শিঙা)। হিন্দুদের ধর্মীয় সমারোহেই এটি বেশির ভাগ বাজে। তুরী-কাড়াও এসেছে দিল্লী থেকে, যেমনকে তেমনিই আছে। এর উন্নতিবিধানের কোন অবকাশই বোধহয় নেই।

অধুনা লখনউয়ের বিবাহ-সমারোহে 'বিগুল' (বিউগল) ও ডংকাও নজরে পড়ে। এরা নতুন-পুরাতন বাজনার নিকৃষ্ট সমন্বয়। ডংকার চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যময় বাদ্য নাকাড়া, যেটি প্রাচীনকালে সেনা ও বিজেতাদের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে থাকত। এর ওপর চোট্ পড়ামাত্রই এমন সাংঘাতিক মার্-মার্-রব উঠত, যে, সাহসী হৃদয়ও কেঁপে উঠত সীমাহীন আতঙ্কে। বিউগ্ল্ হল ইংরেজী ফৌজের বাজনা ; এর সাহায্যে, দরকার মতো, সৈন্যদের মার্চ এবং অন্য কাজের আদেশ দেওয়া হত! এখন ডংকার সঙ্গে একে জুড়ে দিয়ে একটা নতুন 'জোড়' তৈরি করা হয়েছে—যে জোড় বিয়ের শোভাযাত্রায় দ্রষ্টব্য। কিন্তু যারা বাজায়, তারা অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীর লোক, এবং ভাড়া খাটে। এদের ঘোড়া, পোষাক, এমনকি চেহারা পর্যন্ত এতো বাজে, যে, শোভা সত্ত্বেও, একটি ঘৃণাস্পদ দৃশ্য উপস্থিত হয়।

সবশেষে, এবং সর্বাধিক প্রগতিশীল বাদ্য : ইংরেজী বাজনা। এটি আগে কখনও এদেশে ছিলনা। ইংরেজরাই নিয়ে আসে। লখনউয়ে, কেন জানিনা, এর বাজনদাররা হচ্ছে মেথর ; এরা পায়খানা সাফ্

করে, এবং এই কাজও করে। এর কারণ বোধহয় ; হিন্দু ও মুসলমান, উভয় পক্ষই খ্রীষ্টানদের তখন এতো ঘৃণা করত, কোন পাত্রে ওদের হাত লাগলেই তা চিরকালের জন্যে অস্পৃশ্য হয়ে যেত! তার ওপর, এই বাজনা শিখতে হত ইংরেজদের কাছে, এবং ওতে মুখ লাগাতে হত। তাই, মেথর ছাড়া আর কারও পক্ষে এই বাদ্যমণ্ডলীকে আপন করে নেওয়ার সাহস হয়নি। ফলে, বাজনাটি এখন মেথরদেরই মুখ্য পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বাজা-বাজনা এমন একটি সম্প্রদায় গ্রহণ করেছে, সমাজে যারা সর্বাধিক তিরস্কৃত, এবং গানের সঙ্গে যাদের সামান্যতম সম্পর্কও নেই। এদের হাতে এই কলার যে আদৌ কোন উন্নতি হবে, এমন ভরসা কারও ছিলনা। বস্তুতপক্ষে, তা কিন্তু হয়নি। উন্নতি বিধানের বাসনা মেথরদের নিজেদের মধ্যেই জেগে উঠল। শহরের সর্বত্র গান ও তার সুর ছিল ছড়িয়ে, সামাজিক রুচির অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। মেথররাও তার ব্যতিক্রম নয় ; তারাও বাধ্য হল পাশ্চাত্য 'আর্গন' বা 'অরগ্যন' (কনসার্ট)-এ দেশী ধুনের প্রয়োগ-প্রকাশে। ইংরেজী সামরিক বাদ্যকরদের কাছ থেকে ওরা এই বাজনায় রপ্ত হওয়াটা শিখেছিল ; হয়তো, পাশ্চাত্ত্য সংগীতের দু'চারটে সুরও। এখন ওরা হিন্দুস্তানী সুরে প্রচলিত গান বাজায়। এবং তাতেই প্রতিদিন উন্নতি করে চলেছে।

অন্যান্য স্থানের ইংরেজী বাজনা আমি শুনেছি। সর্বত্রই, সকলেই ইংরেজী ব্যাণ্ড-মাস্টারের কাছে শেখা ইংরেজী গান বা সুরই বাজায়। ভারতীয় সংগীতের ধাঁচে এই বাজনাকে ব্যবহার করতে কাউকে আমি দেখিনি। কিন্তু লখনউতে দেখতে পাবেন ঃ রোশন-চৌকীদার যে গজল বা ঠুম্‌রি প্রকাশ করছে সানাইয়ের মাধ্যমে, হুবহু সেই জিনিসই ইংরেজী বাজা-ওয়ালা বার করছে তার বাজনা থেকে ; এবং এতো সুন্দরভাবে, যে বারবার শোনার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

বাজনদার মেথররা। লখনউয়ে তাই ইংরেজী ব্যাণ্ডের অসংখ্য দল। -কোন দলে পঁচিশ, কোন দলে ত্রিশ, কোথাওবা চার, পাঁচ

বা ছ' সাতজন বাজনদার। গোরাদের উর্দীকে বদলে এরা নিজেদের জন্যে ভারতীয় করে নিয়েছে—রীতিমতো ঝকমকে। যখন নতুন ও পরিষ্কার এই পোষাক পরে, বরযাত্রার সঙ্গে ব্যাণ্ড বাজাতে বাজাতে এরা চলতে থাকে, সে এক আলাদা জাঁকজমক সৃষ্টি হয়।

উর্দীর এই বিশেষত্ব একমাত্র এদেরই আছে। অন্য বাজনা যারা বাজায়, নিজেদের জন্যে উর্দী তৈরি করে নেওয়ার কোন খেয়ালই তাদের নেই। উল্টে, তারা খুব নোংরা, বেঢপ জামাকাপড় পরে থাকে। অন্যদিকে, ইংরেজী ব্যাণ্ড-ওয়ালা মেথররা নিজেদের জন্যে নানান রকম উর্দী বানিয়ে নিজেদের গ্ল্যামার বাড়িয়ে নিয়েছে। এবং ভারতীয় সংগীতকে ইংরেজী বাদ্যের শামিল করে লোকসমাজে তাদের কদরও বাড়িয়ে নিয়েছে।

॥ 26 ॥

মানবসমাজে সবচেয়ে দরকারী ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: 'খানা-পীনা'। উন্নতিশীল জাতি বা সম্প্রদায়মাত্রেই স্বকীয় রুচি, শিষ্টাচার এবং নবীনতার সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি ঘটে খাবার টেবিলে কিংবা 'দস্তর-খোআন' বা 'দস্তরখান'[1]-এ। তাই, এখন আমার বক্তব্য: লখনউয়ের প্রাচীন দরবারের আওতায় 'বাওঅরচীখানা' (বাবুর্চী-খানা) ও 'দস্তরখোআনের' বিধি ব্যবস্থা কেমন ছিল, কী-কী আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং এই কলায় এখানকার লোকেরা কতোদূর উন্নত হয়েছিল।

অওধের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয়েছে শুজাউদ্দৌলা থেকে, এবং তাও তাঁর শাসনকালের শেষ প্রান্ত থেকে—যখন বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইংরেজের সঙ্গে নতুন চুক্তি করে তিনি চুপ্‌চাপ্‌ হয়ে গিয়েছিলেন, যখন সৈন্য চালনার দিক থেকে

[1] বিশেষ ধরণের বস্ত্র, যার ওপর আহার্য রাখা হয়।

তাঁকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়েছিল। সেই সময়ে তাঁর বাবুর্চীখানার 'মুনৃতযিম' (ব্যবস্থাপক) ছিলেন হাসান রেজা খাঁ ওরফে মির্জা হাসনু। ইনি এসেছিলেন দিল্লীর এক বনেদী ঘর থেকে। উন্নাও জেলার সফীপুরের জনৈক শেখজাদা মৌলভী ফজলে আজীম লখনউয়ে এসেছিলেন তালিম নিতে। সৌভাগ্যক্রমে, তিনি এসে উঠেছিলেন মির্জা হাসনুর কাছে। দুজনে একসঙ্গে খেলাধুলা করে বড় হয়েছিলেন। মির্জা হাসনু নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে বাবুর্চীখানার 'নায়েব মুনৃতযিম' (সহকারী ব্যবস্থাপক) করে দিয়েছিলেন। তাঁর কাজ ছিল: 'খাসা'[1]-র 'খোআন' (থালা) ঠিকমতো সাজিয়ে এবং তার ওপর স্বনামের 'মোহর' লাগিয়ে নবাবী দেউড়ীতে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে বহুবেগম সাহিবার দেউড়ীর খাস 'মেহরী' (দাসী) ধনিয়া, পনিয়া ও মীনার কাছে সমর্পণ করে দেওয়া। মৌলানা এই মেহরীদের সঙ্গে 'ভাইচারা' (ভাইবোন সম্বন্ধ) পাতিয়ে নিয়েছিল। অনেক জটিল পরিস্থিতিতে এরা তাঁকে সাহায্য করেছে, বাঁচিয়ে দিয়েছে অনেক সঙ্কট থেকে।

নবাব শুজাউদ্দৌলা অন্দর-মহলে পত্নী বহুবেগম সাহিবার সঙ্গে আহার করতেন। এটা তাঁর নিয়মই ছিল। মেহরীরা থালাগুলো বহুবেগম সাহিবার সামনে নিয়ে গিয়ে খুলত এবং 'দস্তরখানের' ওপর সাজিয়ে দিত।

নবাব ও বেগমের জন্যে প্রত্যহ ছ'টা বাবুর্চিখানা থেকে 'খানা' আসত। প্রথমটি হল সদ্য-বর্ণিত নবাবী বাবুর্চীখানা, যার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন মির্জা হাসনু, এবং যেখান থেকে 'খাসার খোআন' (বাদশাহী খানার থালা) মৌলবী ফজলে আজিম স্বয়ং নিয়ে গিয়ে দেউড়ীতে পৌঁছে দিতেন। এখানে রোজ দু হাজার টাকার রান্না হত। তার অর্থ: বাবুর্চী ও চাকর-বাকরদের বেতন ছাড়া, শুধু খাদ্য সামগ্রী এবং খাওয়া-দাওয়া বাবদই খরচ হত মাসে ষাট হাজার, বছরে সাত লাখ কুড়ি হাজার টাকা। দ্বিতীয়টি হল: সরকারী ছোট বাবুর্চীখানা।

---

[1] বাদশাহের জন্য বিশেষ খাদ্য।

আগে এর দেখাশোনা করতেন 'তোশাখানার'[1] প্রবন্ধক মির্জা হাসান আলী ; পরে ভার দেওয়া হয় অম্বর আলী খাঁ 'খোআজাসরা'কে। এখানে খানা তৈরির খরচ ছিল রোজ তিনশো, বছরে এক লাখ আট হাজার টাকা। তৃতীয় বাবুর্চীখানা ছিল খোদ বহুবেগম সাহিবার অন্দরমহলে। এর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বাহার আলী খাঁ 'খোআজসরা'। চতুর্থ খানা আসত নবাববেগম সাহিবা অর্থাৎ শুজাউদ্দৌলার মায়ের বাবুর্চীখানা থেকে। পঞ্চম, মির্জা আলী খাঁর বাবুর্চীখানা এবং ষষ্ঠ নবাব সালারজংগের বাবুর্চীখানা থেকে। শেষ দুজন ছিলেন বহুবেগম সাহিবার ভাই এবং শুজাউদ্দৌলা বাহাদুরের শ্যালক।

এর সবগুলিই ছিল শাহী বাবুর্চীখানার স্তরের। অত্যন্ত যত্নের ও সূক্ষ্ম কারিগরীর সঙ্গে নবাবের জন্যে নানাবিধ মুখরোচক খানা এখানে প্রস্তুত করা হত। একবার বড়ো সরকারী বাবুর্চীখানার খাবারে মাছি বেরিয়েছিল, নবাব সাহেবের সামনেই। ক্রুদ্ধ নবাব সাহেব জানতে চাইলেন, এ-খানা কোথা থেকে এসেছে ? সরকারী বাবুর্চীখানার নাম করলে মৌলানা-ভাইয়ের কপালে দুর্ভোগ ঘটবে—এই ভেবে, ধনিয়া বলল : "হুজুর, এ খানা এসেছে নবাব সালার-জংগের ওখান থেকে।"

নবাব শুজাউদ্দৌলার পরে ফয়জাবাদ থেকে দরবার চলে এল লখনউয়ে। নবাব আসফউদ্দৌলা এসে মির্জা হাসান রেজা খাঁকে দিলেন 'সরফরাজদ্দৌলা' খেতাব এবং উজীরীর খেলাত। এই নতুন সম্মান লাভের পর স্বাভাবিকভাবেই বাবুর্চীখানার তত্ত্বাবধায়কের পদ আর মানায় না। অতএব, তিনি মৌলভী ফজলে আজীম সাহেবকে সরকারী বাবুর্চীখানার স্থায়ী প্রবন্ধক নিযুক্ত করে দিলেন। মৌলভী ফজলে আজীম সাহেব আগে যেমন বাদশাহী খানার থালা নিয়ে বহু-বেগম সাহিবার দেউড়ীতে হাজিরা দিতেন, ঠিক সেইভাবে লখনউয়েও নবাব আসফউদ্দৌলা বাহাদুরের দেউড়িতেও হাজিরা দিতে লাগলেন।

---

[1] যেখানে পোষাক-পরিচ্ছদ থাকে।

তিনি আপন আত্মীয়দের ডেকে এনে তাদেরও কাজে লাগিয়ে দিলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন তাঁর সহোদর ভাই মৌলভী ফায়ক আলী, এবং খুড়তুতো ভাই গুলাম আজীম ও গুলাম মখদুণ। এই চার ভাই ক্রমান্বয়ে দেউড়ীতে বাদশাহী খানা নিয়ে যেতেন।

আসফউদ্দৌলা বাহাদুরের পরে উজীর আলী খাঁর স্বল্পকালীন শাসনে উজীর নিযুক্ত হয়েছিলেন তফজ্জুল হুসেন খাঁ। তিনি এসেই সফীপুরের ভাইদের সরিয়ে নিজের আনা গুলাম মুহম্মদ ওরফে বড়ে মির্জাকে বাবুর্চীখানার 'আধিকারিক' করে দিলেন।

এইসব তথ্যের নির্গলিতার্থ ঃ লখনউয়ে প্রথম থেকেই বড়ো-বড়ো জবরদস্ত ও শখের বাবুর্চীখানা ছিল, এবং তার ফলে প্রথম শ্রেণীর বাবুর্চীও এখানে আবির্ভূত হয়েছিল। নতুন নতুন খানার আবিষ্কার এবং রন্ধনে বৈচিত্র্য সম্পাদন তখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। দিল্লী এবং অন্যত্র থেকে আগত প্রবীণ রসুইকররাও স্থানীয় প্রথা-পদ্ধতির অংশীদার হয়ে যেত, এবং স্বপ্রস্তুত খাদ্যে নব-নব সৌকর্য ও বিশেষ ধরণের স্বাদ সৃষ্টি করে রন্ধনকলায় সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করত।

কাজ করতে করতে দক্ষতা বাড়ে, কর্মে আসক্তি জাগে—এটা একটা সর্বসাধারণ কথা। ওপরে যাঁদের বাবুর্চীখানার কথা বলেছি, সেই সমস্ত রইস হচ্ছেন লখনউয়ের আদি ভোজন-রসিক। লোকে বলে, স্বয়ং হাসান রেজা খাঁ সরফরাজউদ্দৌলার 'দস্তরখান' নাকি বিশাল-আয়তন ছিল। খাওয়াতে তিনি ভালবাসতেন। তাঁর এই রুচি দেখেই সবচেয়ে বড়ো সরকারী বাবুর্চীখানার ভার তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। স্বকীয় কলায় নতুনত্ব সম্পাদনের এবং নব-নব আবিষ্কারের সুযোগ তিনি কি আর এখানে পান নি!

ফলস্বরূপ, সংখ্যাহীন ভোজন-রসিক রইস যেমন এই দুনিয়ায় জন্ম নিল, তেমনি 'নেমতখানা'[1]-র আবিষ্কার ও তার উন্নতিবিধানের জন্যে নবাব সালারজংগের বংশধরদের খ্যাতি শেষ পর্যন্ত অম্লান ছিল।

---

[1] পাকশালা, ভাঁড়ার।

বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, নবাব সালারজংগের যে বাবুর্চী শুধু তাঁরই জন্যে খানা তৈরি করত, মাসে বারোশ' টাকা মাইনে পেত। আজও হিন্দুস্তানের বড় বড় দরবারের কোন বাবুর্চীই এ-বেতন পায় না। বিশেষ করে নবাবেরই জন্যে এমন 'ভারী' পোলাও বানাত, তিনি ছাড়া আর কেউ হজম করতে পারত না। একথা শুনে নবাব শুজাউদ্দৌলা একদিন তাঁকে বললেন: "তুমি নিজের জন্যে যে পুলাও তৈরি করাও, তাতো কোনদিন আমাকে খাওয়াও নি?" সালারজংগ জবাব দিলেন: "ঠিক আছে, আজই হাজির করব।" বাবুর্চীকে বললেন: "রোজ যতোটা পুলাও তৈরি করো, আজ তার দুনো করো।" বাবুর্চী বলল: "আমি তো আপনারই খানার জন্যে নিযুক্ত। অন্য কারও জন্যে রাঁধতে পারব না।" মালিকের বক্তব্য: "নবাব সাহেব ফরমাইশ করেছেন। ওঁর জন্যে নিয়ে যাব না, তা কি সম্ভব?" বাবুর্চীর উত্তর: "যিনিই হোন, আমি আর কারও জন্যে রাঁধতে পারব না।" সালারজংগ যখন আরও জোর দিয়ে বললেন, তখন বাবুর্চীর উত্তর: "বেশ! তবে শর্ত আছে—হুঁজুর নিজে নিয়ে গিয়ে সামনে বসে খাওয়াবেন, কয়েক গ্রাসের বেশি খেতে দেবেন না, এবং 'আবদারখানা'র[1] যাবতীয় ব্যবস্থা ঠিক মতো ক'রে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।" সালারজংগ শর্ত মেনে নিলেন। 'পুলাও' তৈরি হল। সালারজংগ নিজে নিয়ে গিয়ে দস্তরখানের ওপর খানা পেশ করলেন। মুখে দিয়েই শুজাউদ্দৌলা খুব তারিফ করলেন, এবং বেশ আগ্রহের সঙ্গেই খেতে লাগলেন। এইভাবে দু-চার গ্রাস খেয়েছেন, অমনি সালারজংগ এগিয়ে গিয়ে হাত ধরে ফেললেন, বললেন: "ব্যস্, আর খাবেন না।" বিস্মিত শুজাউদ্দৌলা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন: "এই চার গ্রাসে কী হবে?" এই বলে জোর করে আরও দু-এক গ্রাস খেয়ে নিলেন। এইবার পেল তৃষ্ণা। সালারজংগ সঙ্গে করে এনেছিলেন আবদারখানা; তাই থেকে বারংবার জল পান করাতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে,

[1] জলের ঘড়া ইত্যাদি।

'খোদা খোদা' বলে পিপাসার নিবৃত্তি হল। সালারজংগ ফিরে এলেন ঘরে।

আধুনিক রুচির দৃষ্টিকোণ থেকে এটা খাদ্যের পুষ্টিকরতার কোন লক্ষণ নয়। সেকালে, পুরনো রুচির ভোজনরসিকদের কাছে পৌষ্টিকতার নিরিখ ছিলঃ খাদ্য হবে সুস্বাদু; তারপরে পুষ্টিকর ও গরিষ্ঠ—সব উদর তা সহ্য নাও করতে পারে।

এছাড়া আরও কৃতিত্ব ছিল। যেমন, যে কোন একটা খাদ্যবস্তুকে অনেক রকম করে দেখানো হত। দস্তরখানের ওপর রেখে দিলে মনে হত, দশ-বিশ রকমের খাবার রয়েছে; জিবে দিয়ে চাখুন, দেখবেন—সব একই জিনিস। বিশ্বস্তসূত্রে শোনা একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মির্জা খুর্‌রম বখ্‌ত্‌-এর পুত্র, দিল্লীর অন্যতম শাহজাদা মির্জা আসমান কদ্র্‌ লখনউয়ে এসে শীয়া ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, এখানে কয়েকদিন থেকে বেনারস চলে যান, এবং ওখানেই বসবাস করতে থাকেন। তাঁর লখনউ প্রবাসের সময় ওয়াজিদ আলী শাহ তাঁকে একবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। দস্তরখানের ওপর একটা 'মুরব্বা' এনে রাখা হল—দেখতে তো খুবই ভালো, সুন্দর ও স্বাদু মনে হচ্ছিল। মির্জা আসমান কদ্র্‌ এক গ্রাস মুখে দিতেই মাথা ঘুরতে লাগল। আসলে, ওটা মোরব্বা ছিলনা, ছিল গোশ্‌ত্‌'-এর (মাংসের) কোর্‌মা। রসুইকর তৈরি করে দিয়েছিল, ঠিক যেন মোরব্বা। এইভাবে ধোঁকা খেয়ে তিনি তো লজ্জিত। আর ওয়াজিদ আলী শাহ খুশি—দিল্লীর এক খানদানী রাজকুমারকে ধোঁকা দিতে পেরেছেন ব'লে।

দু'চার দিন পরে মির্জা আসমান কদ্র্‌ পাল্‌টা নিমন্ত্রণ করলেন ওয়াজিদ আলী শাহকে। ওয়াজিদ আলী শাহ এটা বুঝেই এসেছিলেন, যে, তাঁকেও নিশ্চয়ই ঠকানো হবে। তাই, গোড়া থেকেই তিনি সতর্ক ছিলেন; তবু ঠকে গেলেন। দস্তরখানের ওপর হরেক রকমের খাদ্য সাজানো: পুলাও,[1] যর্দা[2], বিরিয়ানী[3], কোর্‌মা[4], কাবাব, তরকারী,

[1] চাল ও মাংস দিয়ে তৈরি খাদ্য। [2] মিষ্টি চাল। [3] চাল ও মাংস দিয়ে তৈরী মশলাদার খাদ্য। [4] মাংসের তরকারী।

চাটনী, আচার, রুটি, পরোটা, শীরমাল[1]—অর্থাৎ সবরকম রান্না। কিন্তু যেটাই চাখেন, চিনির তৈরি—'সালন' (সব্‌জি) ছিল, চিনির; চাল ছিল, চিনির ; আচার ছিল, চিনির ; রুটি ছিল, সেও চিনির। এমনকি, এও শোনা যায়—সমস্ত বাসনপত্র, দস্তরখান, 'সিলফচী'[2], মায় লোটা পর্যন্ত ছিল চিনির ! ওয়াজিদ আলী শাহ একটা জিনিসে হাত দেন, ঘাবড়ে গিয়ে আরেকটা জিনিসে, আর ধোঁকার পর ধোঁকা খেতে থাকেন।

আগেই বলেছি ঃ নবাব শুজাউদ্দৌলা বাহাদুরের 'খাসার' জন্যে ছ' জায়গা থেকে খানার 'খোআন' (থালা) আসত। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই এ-প্রথা শেষ হলনা। তাঁর পরেও প্রথাটি চালু ছিল—অনেক আমীর, বিশেষত শাহী খানদানের লোকেরা শাহী খাসার জন্যে বিশেষ-বিশেষ ধরণের খানা তৈরি করে প্রতিদিন পাঠিয়ে দিত। এদের পক্ষে এটা একটা বড়ো সম্মান ছিল।

আমার বন্ধু নবাব মুহম্মদ শফী খাঁ সাহেব বাহাদুর ন্যশাপুরী এইরকম একটি বাদশাহী খানার উল্লেখ করেছেন। তাঁর দাদু নবাব আগা আলী হাসান খাঁ সাহেব ছিলেন ন্যশাপুরী-পরিবারের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ও মানী ব্যক্তি। তাঁর ঘর থেকে বাদশাহর জন্যে যেত—ঘি ও 'রোগনী' রুটি। এতো সুন্দর ও সুদৃশ্য করে 'রোগনী' রুটি তৈরি হত, মোটা কাগজের চেয়ে বেশি মোটা হত না, কোথাও তার কাঁচা থাকত না, একছিটে দাগও পড়ত না। মিষ্টি ঘিও একটা বিশেষ জিনিস ছিল, যা খুব যত্ন সহকারে তৈরি করা হত।

বিরিয়ানীর রেওয়াজ দিল্লীতেই বেশি ছিল, এবং এখনও আছে। লখনউয়ে তৈরি হত 'পুলাও'—এতো সুন্দর করে যে, বিরিয়ানীকেও ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল। সাধারণ লোকের চোখে দুটোই এক জিনিস। কিন্তু, বিরিয়ানীতে চালকে অলংকৃত করা হয় অনেক মশলা এবং সব্‌জি সহযোগে ; তুলনায়, পুলাও খুব সাধাসিধে এবং তবু এতো স্বাদ, যে, তার সামনে বিরিয়ানীকে মনে হয় যেন 'মলগোবা',

[1] দুধে-ময়দায় তৈরি খামিরী রোগনী রুটি। [2] হাতমুখ ধোওয়ার পাত্র।

ঘ্যাটের মতো। অবশ্য মামুলী ধরণের পুলাওয়ের চেয়ে বিরিয়ানী ভালোতর। এ-ধরণের পুলাওকে মনে হয় 'খুশ্কা'—সেদ্ধ করা চাল মাত্র; এই দোষ বিরিয়ানীতে হয় না। কিন্তু সূক্ষ্ম সৌন্দর্যপ্রিয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে, বড়ো জাতের পুলাওয়ের কাছে বিরিয়ানী অতিশয় কুৎসিত ও নোংরা। শুধু এই পার্থক্যের জন্যেই লখনউয়ে পুলাওয়ের চলন বেশি হয়ে যায়।

বলতে গেলে, এখানে সাত রকমের পুলাও বিখ্যাত। তার মধ্যে গুলযার পুলাও, নূর পুলাও, কোকো পুলাও, মোতী পুলাও ও চম্‌বেলী পুলাও। এই কটার নাম আমার এখন মনে আছে। বস্তুত, এখানকার ধনীগৃহে দস্তরখানের ওপরে বিভিন্ন কেতার পুলাও থাকত। মুহম্মদ আলী শাহর পুত্র মির্জা আজীম উশ্‌শান এক বিবাহ অনুষ্ঠানের অবকাশে 'সমধি মিলাপ'[1]-এর আয়োজন করেন; খোদ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহও ছিলেন নিমন্ত্রিতদের দলে। এই নিমন্ত্রণে, দস্তরখানের ওপর, ঝাল ও মিষ্টি মিলিয়ে মোট সত্তর রকমের পুলাও ছিল!

গাজীউদ্দীন হায়দার বাদশাহর সমসাময়িক এবং নবাব সালার-জংগের বংশের রইস নবাব হুসেন আলী খাঁ ছিলেন প্রথম শ্রেণীর ভোজন-বিলাসী, বিশেষত পুলাওয়ের। তাঁর দস্তরখানের ওপর বিংশতাধিক পদের পুলাও বিরাজ করত। এসব এতো সুচারুভাবে তৈরি হত, শহর জুড়ে তার খ্যাতি ছিল। রইস বা আমীরদের মধ্যে কারোরই তাঁর সঙ্গে পাল্লা দেবার সাহস হতনা। স্বয়ং বাদশাহ তাঁকে ঈর্ষা করতেন। এই আহার-বিলাসের জন্যে তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল 'চাওঅল ওয়ালে'।

নাসীরউদ্দীন হায়দারের শাসনকালে বাইরে থেকে এক বাবুর্চী এসেছিল; সে বাদাম-পেস্‌তার খিচুড়ী রান্না করত। বাদামকে সুডৌল ও পরিষ্কার ক'রে কেটে বানাতো চাল, পেস্তাকে করত ডাল।

[1] শ্বশুর বাড়ীর কুটুম্বদের সঙ্গে মিলন

এতো কায়দা করে রাধত, মনে হত : খুব উচু জাতের মিহি গোটা-মাষের খিচুড়ী। কিন্তু খান তো—এমন স্বাদ আর এমন লজ্জত্ আপনার জিহ্বা সারা জীবনেও ভুলতে পারত না।

নবাব সাদত আলী খাঁর সময়ে এক কৃতী বাবুর্চী ছিল। সে চালের 'গুলাত্থী' রান্না করত। কিন্তু সে এমন গুলাত্থী, শাহী দস্তরখানের শোভা বাড়িয়ে দিত। তাই, তৎকালীন নবাবের খুব প্রিয় ছিল। এর এক গ্রাস মুখে দেবার জন্যে শহরের সমস্ত রইসের মন ছট্ফট্ করত। শোনা কথা—নবাব আসফউদ্দৌলার সামনে জনৈক নবাগত বাবুর্চীকে হাজির করা হয়েছিল। যখন জিজ্ঞাসা করা হল : "কী কী রাঁধতে পারো?" জবাব দিল : "শুধু গোটা মাষকলাই রাঁধি।"। প্রশ্ন করা হল : "কতো মাইনে নেবে?" বলল : "পাঁচ শো টাকা।" নবাব তাকে নিযুক্ত করলেন। তখন সে বলল : "আমার কাজের কয়েকটা শর্ত আছে।" "কী শর্ত?" "হুজুরের যখন আমার হাতের ডাল খাবার ইচ্ছে হবে, একদিন আগে হুকুম দিতে হবে ; তৈরি হয়েছে ব'লে যখন খবর দোব, হুজুরকে তখনই খেয়ে নিতে হবে।" নবাব শর্তও মঞ্জুর করলেন। কয়েক মাস পরে ডাল রান্নার হুকুম হল। তৈরি করে বাবুর্চী খবর দিল নবাবকে। তিনি বলে পাঠালেন "আচ্ছা, দস্তরখোয়ান বিছা।" কিন্তু নবাব কথাতেই মেতে রইলেন। সে গিয়ে আবার খবর দিল : "খাসা তৈয়োয়ার হ্যয়।" নবাব তখনও আসেন না। তৃতীয়বার খবর দিল। তখনও যখন নবাব এলেন না, বাবুর্চী ডালের হাঁড়ি তুলে নিয়ে একটা শুকনো গাছের গোড়ায় ঢেলে দিল এবং কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেল। তখন নবাবের আফশোস হতে লাগল, অনেক খোঁজাখুঁজি করালেন, কিন্তু কোথাও সন্ধান পেলেন না। ওদিকে, কয়েকদিন পরে দেখা গেল—যে-গাছের নীচে ডাল ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সে একেবারে সবুজে-ফলে-ফুলে ঝলমল! সন্দেহ নেই, এই কাহিনীর মধ্যে অত্যুক্তি আছে, যা একে নিয়ে গেছে অসম্ভাব্যের পর্যায়ে। তবে, এ থেকে এটা বেশ বোঝা যায়, এই দরবারে তখন বাবুর্চীদের কী ধরণের কদর হত, এবং

কোন পাকা বাবুর্চী এলে কতো উদারতার সঙ্গে তাকে গ্রহণ করা হত।

আমীরদের শখ দেখে বাবুর্চীরাও নতুন-নতুন ধরণের খাদ্য আবিষ্কার করতে লাগল। একজন আবিষ্কার করেছিল 'আনারদানা পুলাও': প্রত্যেকটা চাল অর্ধেক লাল—যেন রত্ন, অর্ধেক সাদা—কাঁচের মতো ঝক্‌মকে। দস্তরখানের ওপর সাজিয়ে দিলে মনে হত: প্লেটের ওপর রঙীন জহরত রাখা আছে। আর একজনের আবিষ্কার ছিল 'নওরতন পুলাও': বিখ্যাত নবরত্ন-পাথরের মতো ন'রঙের চাল মিলিয়ে তৈরি; বর্ণের স্বচ্ছতা ও শোভা এক আশ্চর্য স্বাদের জন্ম দিত। এইভাবে, খোদা জানেন, আরও কতো রকমের খাদ্যবস্তু ঘরে-ঘরে ও বাবুর্চীখানায় আবিষ্কৃত হয়েছিল।

ভোজন-বিলাসী প্রবীণ রইসদের অন্যতম নবাব মির্জা খাঁ ন্যশাপুরী মাসিক চোদ্দ হাজার টাকা পেনশন পেতেন বলে কথিত আছে। উত্তম আহারের শখের চূড়ান্ত তিনি দেখিয়েছিলেন ভালো-ভালো বাবুর্চী সংগ্রহ ক'রে। তাঁর দস্তরখান প্রসঙ্গে শহরময় হৈচৈ পড়ে গিয়েছিল। আর একজন ছিলেন—মির্জা হায়দার। ইনিও ন্যশাপুরী এবং সম্মানিত রইস ছিলেন। ন্যশাপুরী বংশের সবাই তাঁকে 'সরতাজ' (শ্রেষ্ঠ) ও 'বুযুর্গ' (জ্ঞানবৃদ্ধ) বলে মান্য করত। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল: কোথাও কারও নিমন্ত্রণে গেলে, সঙ্গে যেত তাঁর 'আবদারখানা' (জলপাত্র), পান-পাত্র, একশো-দেড়শো হুঁকো। বিচিত্র শখ! তাতে কিন্তু লাভই হত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের। তাই তারা তাঁকে খোশামোদ করে, যেমন করে হোক, নিমন্ত্রণে রাজি করাত। তাঁর সম্মতির অর্থ: আসরে হুঁকো, পান ও জলের তাবৎ ব্যবস্থা তাঁর জিম্মায়। আর, সে এমন ব্যবস্থা, বড়ো-বড়ো ধনীর পক্ষেও অসম্ভব ব্যাপার ছিল।

খানা তৈরি করত যারা, তাদের তিনটে দল ছিল। প্রথমত, 'দেগ্‌শোর': এদের কাজ 'দেগ' (ডেক্‌চি ও অন্যান্য বড়-বড় রন্ধন-পাত্র)-ধোওয়া এবং বাবুর্চীদের ফরমাইশ খাটা। দ্বিতীয়, 'বাওঅরচী'

এরা বড়ো-বড়ো ডেক্‌চিতে রান্না করত ও নামাত। তৃতীয় দল 'রকাবদার': সাধারণত, ছোট ছোট হাঁড়িতেই এরা রাঁধত, বড়ো দেগ বা ডেক্‌চি নামানোকে নিজেদের মর্যাদার চেয়ে নীচু কাজ বলে মনে করত। অবশ্য, বাবুর্চীরাও ছোট-ছোট হাঁড়িতে রান্না করত; কিন্তু রকাবদাররা রান্না করত কেবলমাত্র ছোট হাঁড়িতেই। এরা নিজ নিজ কলায় অভিজ্ঞ হত; মেওয়ার ফুল কাটায়, খানা বার করায় এবং সাজানোয় এরা কায়দা, সৌকর্য ও সৌন্দর্য জাহির করত; 'রকাব'[1] ও রেকাবীতে যে পুলাও রাখা হত, তার ওপর মেওয়া এবং অন্য সব দিয়ে ফুলের কাজ ও নকৃশা করত। এরা খুব সুন্দর ও স্বাদু মোরব্বা ও আচারও তৈরি করত। এবং রন্ধনে আসক্তির জন্যে হরেক রকমের নতুন-নতুন জিনিস বানাত।

অওধের "প্রথম বাদশাহ" গাজীউদ্দীন হায়দার পরোটা ভালবাসতেন। তাঁর বাবুর্চী প্রত্যহ ছ'টা ক'রে পরোটা বানাত এবং প্রতি পরোটা পিছু পাঁচ সের ক'রে মোট ত্রিশ সের করে ঘি রোজ নিত। একদিন প্রধান মন্ত্রী মোতমদউদ্দোলা আগা মীর শাহী বাবুর্চীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আরে ভাই, এই ত্রিশ সের ঘি কী হয়?" বলল: "হুজুর, পরোটা তৈরি করি।" বললেন: "ভালো; আমার সামনে রাঁধো দিকি।" সে বলল: "বহুত-খুব।" পরোটা তৈরি হল। যতোটা ঘি দরকার, নিল; যা বাঁচল, ফেলে দিল। ব্যাপার দেখে মোতমদউদ্দোলা আগা মীর বিস্মিত হয়ে শুধোলেন: "সব ঘি তো খরচ হয়নি!" জবাব দিল: "এখন এ ঘি তো একেবারে তেল হয়ে গেছে। এর আর এমন কোন গুণ নেই, যা দিয়ে অন্য খাবার তৈরি করা যায়।" উত্তর মনঃপুত হলনা উজীরের। তিনি হুকুম দিলেন: "এবার থেকে পাঁচ সের ক'রে ঘি দেওয়া হবে; পরোটা পিছু এক সের ঘিই যথেষ্ট।" বাবুর্চীর উত্তর: "ভালো, এইটুকু ঘি দিয়েই আমি রান্না করে দেবো।" উজীরের বাধাদানে মেজাজ এমন

[1] ডোঙার মতো পাত্র।

বিগড়ে গেল, অতঃপর মামুলী ধরণের পরোটা রান্না করে বাদশাহর খানার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে লাগল। এইরকম চলল বেশ কিছুদিন। অবশেষে, বাদশাহ অভিযোগ করলেন: "এ পরোটা এখানে আসছে কি ক'রে?" বাবুর্চীর আর্জি: "হুজুর, নবাব মোতমদউদ্দৌলা যেরকম পরোটার হুকুম দিয়েছেন, সেই রকমই রান্না করছি।" বাদশাহ যখন আসল কারণ জানতে চাইলেন, সব বলে দিল। মোতমদউদ্দৌলার ডাক পড়ল তখনই। তিনি পেশ করলেন: "জাহাঁপনাহ, লোকটা অকারণে ঘি লুটে নিচ্ছে।" একথার জবাবে বাদশাহ প্রথমেই উপহার দিলেন পাঁচ-দশ থাপ্পড় ও ঘুষি। খুব ঠুকলেন ও বললেন: "তুমি লোটো না? তুমি যে গোটা রাজ্য ও সারা দেশটাকে লুটছ, সে খেয়াল নেই? ও যে একটু বেশি ঘি নেয়, এবং তাও আমার খানার জন্যে, এ আর তোমার সহ্য হচ্ছে না?" মোতমদউদ্দৌলা দোষ স্বীকার করলেন, নিজের কান ধরলেন, তখন খেলাত এল—তা থেকে বোঝা গেল, জাহাঁপনাহ ক্ষমা করেছেন। তারপর তিনি ঘরে ফিরে এলেন।

এরপর আর কোনদিন তিনি ওই রকাবদারের কোন কাজে আপত্তি করেননি। আর, সেও তেমনিভাবেই রোজ ত্রিশ সের ক'রে ঘি নিতে থাকল।

॥ 27 ॥

নবাব আবুলকাসেম খাঁ ছিলেন শৌখীন রইস। তাঁর বাড়িতে খুব 'ভারী' পুলাও তৈরী হত। চৌত্রিশ সের গোশ্‌ত্‌ ফুটিয়ে তার 'ইয়খ্‌নী' (সুরুয়া) বার করে নিয়ে তাইতে চাল 'দম' (সেদ্ধ) করা হত। মুখে দিতে না দিতেই মনে হত, তামাম চাল গলে গিয়ে নিজেই হজম হয়ে গেছে! সেই সঙ্গে, এতো হাল্‌কা, বোঝবার সাধ্য কি ওতে কোন্‌ ধরণের গরিষ্ঠতা আছে! এতোটাই, কিংবা এর চেয়েও বেশি

ডাকতের পুলাও ওয়াজিদ আলী শাহর বিবি খাসমহল সাহেবার জন্যে রোজ তৈরী করা হত।

অওধের অ-পদস্থ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহর সঙ্গে মেটিয়াবুরুজে এক রইস থাকতেন, যাঁর খেতাব ছিল 'মুনশী উস্‌সুলতান বাহাদুর'। অত্যন্ত সুদর্শন, শৌখীন, এবং 'নফীস-মিযাজ' (সূক্ষ্ম মেজাজী)। প্রচণ্ড ভোজনরসিক তো ছিলেনই। তাঁর বাড়িতে কয়েকজন পাকা বাবুর্চী ছিল ; তবু দু-একটা পদ নিজে হাতে না করে নিলে আহারে তাঁর মজা আসত না। তাঁর খানার খ্যাতি এতোদূর ছড়িয়ে গিয়েছিল, যে, ওয়াজিদ আলী শাহ পর্যন্ত বলতেন : "আমি কী আর এমন ভালো খাই, ভালো খান তো মুনশী উস্‌সুলতান !" ছোটবেলায় বছর ছয়-সাত পর্যন্ত মেটিয়াবুরুজে আমি এঁরই কাছে ছিলাম, একসঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করতাম। তাঁর দস্তরখানের ওপর ত্রিশ-চল্লিশ রকমের পুলাও, দশ-বিশ রকমের তরকারি পড়তে দেখেছি। তার মধ্যে এমন কয়েকটা ছিল, যা পুনরায় খাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ইনি সোহন হালুয়াও খুব ভালবাসতেন। তার কথা যথাস্থানে বলব।

শেষ জমানায় ও গদরের পর লখনউয়ের 'মরহুম' (স্বর্গত) হকীম বান্দা মেহদীর খাওয়া ও পরার খুব শখ ছিল। বড়ো-বড়ো ধনী ও শৌখীন ব্যক্তির বিশ্বাস : উনি যেরকম খানা খেতেন, এবং যেরকম কাপড় পরতেন, সে সময়ের খুব কম লোকেরই সে সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার এক বয়স্ক বন্ধু বলেছেন : "আমাদের সঙ্গে হকীম সাহেবের খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। একদিন হকীম সাহেব আমার 'ওআলিদ' (পিতা) ও 'চাচা'কে বলে পাঠালেন : একজন পালোয়ানকে নিমন্ত্রণ করেছি ; আপনারাও আসুন, মজা দেখবেন। পিতাজী গেলেন। তাঁর সঙ্গে আমিও গেলাম। ওখানে গিয়ে শুনলাম : পালোয়ানটি রোজ সকালে কুড়ি সের করে দুধ খান, তারপর আড়াই তিন সের মেওয়া অর্থাৎ বাদাম পেস্‌তা ; দুপুরে ও রাত্রে খান আড়াই সের আটার রুটি এবং মাঝারি আকারের একটা পাঁঠা। যেমন আহার, তেমনি আকৃতি। তিনি অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন 'নাশ্‌তা'-র (প্রাতরাশের) জন্যে।

তাড়াতাড়ি খানা আনাবার জন্যে মুখ ফুটে বললেনও বারবার। সব বুঝেও হকীম সাহেব ব্যস্ততার ভাব দেখালেন না। শেষে, ক্ষিধের চোটে এমন অস্থির হয়ে উঠলেন, বিরক্ত হয়ে উঠেই পড়লেন। হকীম সাহেব তখন "এখুনি খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি" বলে অন্দরে চলে গেলেন। সেখানে আরও একটু দেরি করলেন। যখন দেখলেন, পালোয়ানজী আর ক্ষিদে সহ্য করতে পারছেন না, তখন দাসীর হাত দিয়ে একটা থালা পাঠিয়ে দিলেন। তাই দেখে পালোয়ান সাহেবের 'জান মেঁ জান' (ধড়ে প্রাণ) এল। কিন্তু যখন খুললেন, দেখলেন, একটি ছোট 'তশ্‌তরী' (রেকাবী), তাতে অল্প একটু পুলাও—এক ছটাকের বেশি হবেনা বোধহয়। দেখেই তো সেই ঔদরিক মেহমানের খুব রাগ হল—এতো তাঁর এক গ্রাসের পক্ষেও যথেষ্ট নয়! উঠে, চলে যাওয়াই স্থির করলেন। সবাই মিলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনরকমে তো ঠেকানো হল। বাধ্য হয়ে তিনি সেই রেকাবী উঠিয়ে মুখে ঢেলে দিলেন পুলাও, মুখ না চালিয়েই গিলে ফেললেন। পাঁচ-মিনিট। জল চাইলেন। তার পাঁচ মিনিট পরে আবার জল খেলেন। ঢেঁকুর তুললেন। এবার অন্দর থেকে এল খানার থালা। 'দস্তরখান' বিছানো হল। হকীম সাহেবও এসে পড়লেন। খাবার পরিবেশিত হল। হকীম সাহেবের সামনে প্লেটে করে রাখা হল দেড়পো চালের সেই পুলাও, যার এক গ্রাস আগে পাঠানো হয়েছিল। হকীম সাহেব প্লেটটা ধরে দিলেন পালোয়ানের সামনে, এবং বললেন: "দেখুনতো এটা কি ওই পুলাও, না, আলাদা?" তিনি স্বীকার করলেন: "সেইটাই"। হকীম সাহেব বললেন: "তাহলে আরম্ভ করুন। আমার দুঃখ রইল—এটা তৈরি করতে দেরি হয়ে গেল, আপনাকে কষ্ট দিলাম।" পালোয়ান বললেন: "এবার তো আমাকে মাফ্‌ করতে হয়। ওই প্রথম গ্রাসেই আমি তৃপ্ত হয়ে গেছি। আর একটা চালও খেতে পারবনা।" বারবার অনুরোধ করা হল। প্রতিবারই তিনি হাত তুলে বাধা দেন আর বলেন: "খাব কি করে? পেটে জায়গা থাকলে তবে তো!" তখন হকীম সাহেব নিজে সব খেয়ে নিলেন,

এবং তাঁকে বললেন : "কুড়ি সের. ত্রিশ সের খেয়ে যাওয়াটা মানুষের খাদ্য নয়, গরু-মোষের খোরাক। মানুষের খোরাক হল : কয়েক গ্রাস খাবে, তা থেকেই এমন শক্তি সামর্থ্য হবে, বিশ-ত্রিশ সের আনাজ খেয়েও যা হয় না। এর এক গ্রাসেই আপনি তৃপ্ত হয়ে গেলেন। কাল আবার আপনার নিমন্ত্রণ রইল। কাল এসে বলবেন, কুড়ি সের দুধ, সের সের মেওয়া, মাংস ও আনাজে যে তাকত হয়, এই এক গ্রাসে ঠিক ততোটাই বোধ হয়েছিল কিনা, কিংবা তার চেয়ে কম?" হকীম সাহেব আমাদেরও আসতে বললেন। পরদিন পালোয়ান এসে জানালেন: "কাল থেকে আজ পর্যন্ত শরীরে এমন বল ও উৎসাহ বোধ করছি, সারা জীবনেও তা কোনদিন করি নি।"

অন্তিম কালের শাহী খানদানীদের মধ্যে নবাব মোহসীনউদ্দৌলা এবং নবাব মুমতাজউদ্দৌলা বাবুর্চীখানার ও দস্তরখানের শখে ও পরিপাট্যে অনন্য বলে গণ্য হতেন। এঁদেরই বাবুর্চী হকীম বান্দা মেহদী সাহেবের জন্যে ওই পুলাও রান্না করত। সেই সময়ে 'মালকা যমানিয়া'র জমিদারীতে যে বিখ্যাত বাবুর্চীখানা ছিল, সেখানে রোজ তিনশো টাকার রান্না হত। এবং শাহজাদা ইয়াহিয়া আলী খাঁর সরকারে আলম আলী নামে এক বাবুর্চী ছিল। এমন তুলনাহীন 'মছলী মুসল্লম' রাঁধত, রইস-সমাজে তার খ্যাতি ছিল ঈর্ষণীয়। অন্য সরকারের তথা জমিদারের বাবুর্চীরা কতো চেষ্টা করেছে, ও জিনিস তৈরি করতে পারেনি।

নাসীরউদ্দীন হায়দারের সময়ে মহমুদ নামে এক বহিরাগত এসে ফিরিংগী মহলে খাবার দোকান দিয়েছিল। তার তৈরি 'নহারী'[1] এতো নাম করেছিল, বড়-বড় রইস ও শাহাজাদারা তার কদর করত। এই সমাদরে তার সাহস বেড়ে গেল, আবিষ্কার করল 'শীরমাল'[2]— যেটি আজও লখনউয়ের একটি বৈশিষ্ট্য। রুটির অনেক শ্রেণী আছে, বিভিন্ন শহরে তারা প্রচলিতও। ইরাণ থেকে মুসলমানরা হিন্দুস্তানে

[1] এক ধরণের 'শোরবেদার' তথা রসা মাংস, যা সকালে নাশ্তার সময় খামীরী রুটির সঙ্গে খাওয়া হয়। [2] দুধে আটা মেখে তৈরি রোগ্নী রুটি।

এসেছিল 'খামীরী রোটী' খেতে খেতে এবং 'তনূদুর' গাড়তে-গাড়তে। তবে, সে সময় পর্যন্ত রুটি ছিল সাধারণ, ঘি লাগানো হত না। হিন্দুদের ঘি ও তেলে ভাজা পুরী দেখে মুসলমানরা তাওয়ার রুটিতে ঘিয়ের পুর দিয়ে 'পরাঁঠা' আবিষ্কার করল; তাতে অনেক পাট ও পরত দিতেও শুরু করল। এই পরোটার প্রথম উন্নতি হল 'বাকিরখানী'[1]। অচিরেই আমীরদের দস্তরখানের একটি বিশিষ্ট পদ হয়ে উঠল। লখনউয়ে মহমুদ এই 'বাকিরখানী'কেই সমৃদ্ধ করে বানাল 'শীরমাল'। স্বাদে-গন্ধে-সৌকর্যে 'শীরমাল' বাকিরখানী এবং ওই জাতের তাবৎ রুটির শিরোমণি হয়ে উঠল। এখন লখনউ ছাড়া আর কোথাও শীরমাল তৈরি হয় না: যদি হয়ও, এমনটি আর হয় না। অল্প দিনেই শীরমাল অভূতপূর্ব লোকপ্রিয়তা অর্জন করল, চিহ্নিত হল 'ন্যাশনাল রুটি' রূপে। যে নিমন্ত্রণে 'শীরমাল' অনুপস্থিত, আজও তাকে মনে করা হয় অসম্পূর্ণ।

শীরমালের আবিষ্কারে মহমুদের কদর বেড়ে গেল। শাহী উৎসবে, সমারোহে কখনও কখনও দিনে এক লাখ শীরমালেরও অর্ডার আসত। সেও সেই রকম ব্যবস্থা করে রাখত; যত শীরমাল চাওয়া হত, সরবরাহ করত। মহমুদের উত্তরাধিকারী আলী হুসেন। মাস কয়েক হল মারা গেছে। এদের দোকানে আজও যে রকম উৎকৃষ্ট শীরমাল পাওয়া যায়, অন্যত্র তা দুর্লভ।

শীরমালের চেয়েও স্বাদু 'নান জলেবী'। খুব হিসেব করে এটি রান্না করতে হয়, এবং একমাত্র অভিজ্ঞ 'রকাবদারই' তেমন রান্না করতে পরে।

লখনউয়ের বাবুর্চী ছাড়া আর কেউ ভালো 'নান জলেবী' তৈরি করতে পারে না—এটা ওদেরই দাবি। পরোটায় অন্য শহরের যে কৃতিত্ব, লখনউয়েরও তাই; এক্ষেত্রে কোন লক্ষণীয় উন্নতি হয় নি। কথিত আছে, দিল্লীর ভালো 'নানবাঈ' (রুটিওয়ালা) উৎকৃষ্ট জাতের পরোটা তৈরী করতে পারে। এক সের আটায় এরা এক সের ঘি

[1] দুধ, চিনি, ময়দা মিলিয়ে তৈরি রোগ্‌নী রুটি।

দেয়। দিল্লীতে থাকার সময় বিখ্যাত 'নানবাঈ'দের দিয়ে আমি কয়েকবারই পরোটা তৈরি করিয়েছিলাম। তারা সত্যিই অনেক ঘি খরচ করেছিল, কিন্তু আটার ভেতরে ঘি দেয় নি। ফলে, যতক্ষণ তাজা খাওয়া যায়, ততক্ষণই খাবার যোগ্য ; ঠাণ্ডা হতেই একেবারে চামড়া।

রুটি ভেঙ্গে, তার মধ্যে ঘি ও চিনি মিলিয়ে 'মল দেওয়া' এক মামুলী ও সাধারণ খাদ্য। 'ফাতিহা'[1] এবং 'নিয়ায'[2]-এই এর রেওয়াজ বেশি। তবে, শাহী বাবুর্চীখানার বাবুর্চী এক ধরণের স্বাদু ও উত্তম বাদশাহপসন্দ্ 'মলীদা' তৈরি করত ; মুখে দিতে না-দিতেই শরবত হয়ে যেত ; মনে হত চর্বণের বা মুখ চালাবার কোন প্রয়োজনই নেই। সত্যিই 'তারীফ্' করার মতো !

রুটির সূত্রেই এখানে আর-একটি প্রগতি হয়েছিল ; 'দূধ কী পুরিয়াঁ' (দুধের পুরী), যাতে আটার নামগন্ধও নেই। দুধের পনীরকে ঠেসে ঠেসে ময়দার মতো বানানো হত। আরও হয়েছিল —'দূধ কী গিল্যরিয়াঁ'[3] এবং আরও কয়েকটি জিনিস। এই রকম আর-একটি : 'দূধ কী পঞ্জীরী', শুধু দুধের মিঠাই আসত দস্তরখানের ওপর—যেমন সুন্দর, তেমনি মনোহর।

মুসলমানদের 'ন্যাশনল ডিশ' তথা কৌমী খাদ্য : পুলাও এবং কোর্মা। সুতরাং, এই দুটি জিনিসেই সুকুমারতা ও সূক্ষ্মতার চূড়ান্ত প্রদর্শিত হয়। পুলাও প্রসঙ্গে আমি অনেক কথাই লিখেছি, তবু কিছু বাকী রয়ে গেছে। ধনী ও শৌখীন আমীরদের জন্যে মুর্গী তৈরি করা হত কেসর ও কস্তুরীর গুলি খাইয়ে-খাইয়ে। এমন পরিমাণ খাওয়ানো হত, ওর মাংসে এই দুই বস্তুর 'খুশবূ' (সু-গন্ধ) জমে বসে যেত, স্নায়ুতে শিরায় ছড়িয়ে থাকত আতরের বাস। তারপর ওর সুরুয়া বার করে নিয়ে তাতে চাল দম করা হত।

'মোতী পুলাও'-এর বৈশিষ্ট্য ছিল : মনে হত, চালে এসে মিলেছে

---

[1] মৃতের আত্মার শান্তির জন্যে কুরানের অংশবিশেষ পাঠ। [2] মৃতের বাৎসরিকী বা অন্য কোন অবকাশে প্রস্তুত খাদ্য। [3] দুধের খিলি।

'আবদার-মোতী' (তরল মোতি)। এই 'মোতী' তৈরি করার এক বিশিষ্ট কৌশল ছিল : তোলা-ভর্ রূপোর 'বরক'[1] ও মাষা-ভর্ সোনার 'বরক'[1] 'য্‌র্দী'[2]-তে বেশ্ করে ফেটিয়ে নিয়ে মুর্গীর গলার নলীর মধ্যে ভরে দিয়ে নলীর সমস্ত জোড় মিহি সুতো দিয়ে কষে বেঁধে দেওয়া হত ; তারপর একটু সেদ্ধ করে ছুরি দিয়ে নলীর চামড়া চিরে দেওয়া হত—বেরিয়ে আসত সুডৌল 'আবদার মোতী' ; এই জলমোতিকে পুলাওয়ে মাংসর সঙ্গে সেদ্ধ করা হত। কোন কোন বাবুর্চী 'পনীর কে মোতী' বানাত, তার ওপর রূপোর পাতলা পাত বিছিয়ে দিত। এইভাবে এরা এমন সব নতুনত্ব বারংবার দেখাত যা অন্য কোন জায়গার লোকেদের কল্পনাতেও আসত না। কেউ কেউ পুলাও-তৈরিতে অন্যবিধ বিশেষত্বও দেখাত : 'গোশ্‌ত'এর (মাংসের) ছোট-ছোট পাখি বানিয়ে খুব সাবধানে রান্না করত যাতে আকৃতি বিকৃত না হয় ; তারপর বসিয়ে দিত প্লেটে, চাল হতো দানার মতো ; মনে হত, অতিথিদের সামনে প্লেটে-প্লেটে পাখি সব নিরবে বসে দানা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। সরকারী ডিনার—টেবিলের ওপর ফুলে ওঠা 'সমোসা' (সিঙ্গাড়া) ; ভাঙ্গতেই, ভেতর থেকে 'লাল' বেরিয়ে এসে ডানা মেলে উড়ে গেল—আনন্দিত পদস্থ ইংরেজ অফিসার ও তাঁদের লেডীরা। (হায়দরাবাদ-দাক্ষিণাত্য অথবা লখনউয়ের) বাবুর্চী পীর আলীর রচনা এটি। এর আবিষ্কার সর্বপ্রথম হয় নাসীরউদ্দীন হায়দারের দস্তরখানে। তবে, ওপরে বর্ণিত 'চিড়িয়াঁওয়ালা পুলাও' এর চেয়ে বড়ো দরের আর্ট।

আর-এক বাবুর্চীর কৃতিত্ব : দস্তরখানের ওপর উপস্থিত বড়ো-বড়ো সের-সের ওজনের ভাজা ও সেদ্ধ ডিম ; সাধারণ ডিমের মতোই সাদা অংশ, হলদে কুসুমও আকৃতির অনুপাতে। অন্য বাবুর্চীদের তৈরি 'বাদাম কা সালন' : হুবহু সিমের বীচির মতো, তার চেয়েও স্বাদু। প্রধানমন্ত্রী র‍্যওশনউদ্দৌলার বাবুর্চী কাঁচা ভুট্টার 'লচ্ছা' (সরু লম্বা টুকরো) নিটোল করে কাটত, কোথাও যাতে ভেঙ্গে না

[1] রূপো এবং সোনার পাত। [2] ডিমের কুসুম।

যায়, এবং তাই দিয়ে এমন চমৎকার 'রায়তা' বানাত, যে চেখেছে, সে আর ভুলতে পারে নি।

খুশনবীস মুনশী শাকির আলী সাহেব চালের দানার ওপর 'কুল-ও-আল্লাহ'[1] লিখে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এবং এক শাহী বাবুর্চী পোস্তর দানার চারদিকে ছারপোকার মতো চারধারে কাঁটা বানিয়ে বিশেষ কৌশলে রান্না করে দস্তরখানের ওপর পেশ করেছিল।

লখনউয়ের বিখ্যাত বাবুর্চী পীর আলী ছিল হুজুর নিজামের বাবুর্চী-খানার 'মুলাজিম' (কর্মচারী)। খুব দামী ও স্বাদু অড়র ডাল রান্না করত। এ জিনিস তৈরি হত লখনউয়ের পুরনো বাদশাহদের বাবুর্চী-খানায়, এবং প্রসিদ্ধ ছিল 'সুলতানী দাল' নামে।

কোন কোন বাবুর্চী এতো সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছন্নভাবে 'মুসল্লম করেলে' বানাত, দেখে মনে হত: গায়ে এতোটুকু ভাপ লাগেনি, যেমন-কে-তেমনি সবুজ, কাঁচা রেখে দেওয়া হয়েছে। কেটে খেয়ে দেখুন—যেমন স্বাদু, তেমনি মজাদার। এই রকম একটি ঘটনা সম্প্রতিই আমাদের দোস্ত সৈয়দ আলী 'অ্যসত'-এর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাঁর বিবৃতিটি এইরূপ: লখনউয়ের বর্তমান খানদানী রইসদের অন্যতম নবাব আলী নকী খাঁ একদিন আমাকে বললেন: "একটু অপেক্ষা করে রাতের খানা খাবেন, আমি কিছু পাঠাব।" রাত্রে খাবার সময়, কথামতো, তাঁর লোক একটা থালা নিয়ে এল। আমি তো সামনে আনিয়ে সাগ্রহে খোলালুম—শুধু একটা প্লেট, তার ওপর রাখা রয়েছে একটা কাঁচা কুমড়ো। দেখে, খুব দুঃখ হল। আশাহত হয়ে 'মামা'-[2]কে বললুম: "এটা নিয়ে রেখে দাও। কাল রান্না হবে।" শাহজাদা সাহেবের লোকটি হেসে বলল: "রান্নার দরকার নেই; কেটে, এখনই খান।" কাটলুম, দেখলুম, খুবই স্বাদু আর মজার জিনিস। এমন কখনও খাইনি।

বস্তুত, এখানকার বাবুর্চীরা নানান ধরণের সব আজ্‌ব-আজব কৃতিত্ব দেখিয়েছে। পীর আলী 'রকাবদার' বানাত 'মিঠাই-কে-আনার':

---

[1] কুরানের চারটি ছোট 'আয়ত' বা বাক্য। [2] দাসী।

ওপরের খোসা, ভেতরের দানা, তার ক্রম, এবং বীজের পর্দা, সব আসল মনে হত। দানার বিচি হত বাদামের, নাশপাতির ক্বথ্ থেকে দানা, তার মধ্যেকার পর্দা, ওপরের ছিল্‌কা, দুইই হত চিনির।

বাবুর্চীরা মোরব্বা, আচার, ইত্যাদি এবং নানান ধরণের মিঠাইও তৈরি করত। তারও মধ্যে থাকত নানাবিধ কায়দা-কৌশল, বিস্ময়কর সৌকুমার্য। আমের মোরব্বা তো সবাই খেয়েছেন। এখানে বাবুর্চীরা তৈরি করত গোটা, সবুজ 'ক্যারিয়োঁ কা মুরব্বা'—তার ওপরের খোসাটা যেমন-কে-তেমনই থাকত। মনে হত, কাঁচা আম ('ক্যারী') সদ্য পেড়ে আনা হয়েছে এবং পাতলা গুড়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

॥ 28 ॥

'তকল্লুফ' শব্দের অর্থ সৌজন্য, সামাজিকতা, প্রথা, শিল্পকলা। এই তকল্লুফের দিক থেকে নিমন্ত্রণ ও তত্ত্বতাবাশের জন্যে যেসব 'খানা' সাধারণ্ত নির্দিষ্ট ছিল, তাদের একসঙ্গে বলা হত 'তোরা'। এক-একটি 'তোরায়' নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি অপরিহার্য ছিল: (১) পুলাও, (২) 'মুযাফর'[1], (৩) 'মুতঞ্জন'[2], (৪) শীরমাল, (৫) সফেদা[3], (৬) 'বূরানী[4]কে প্যালে', (৭) 'শীরবিরঞ্জ[5]-কে, খোআঁচে'[6], (৮) কোর্‌মা (৯) 'তলী হুঈ অরবিয়াঁ[7] গোশ্‌ত্ মেঁ', (১০) শামী কাবাব, (১১) মোরব্বা (১২) আচার বা চাটনী।

অধিকাংশ তোরায় এর থেকে কিছু জিনিস কম-বেশি করা হত। তবে, লখনউয়ে এই খানাই সর্বসাধারণ এবং অধিকতর প্রচলিত ছিল। 'দাওঅত'[8] ও 'হিসসা'য়[9] এ-ছাড়া আর কোন জিনিস কমই থাকত।

---

[1] মিষ্টি পোলাও। [2] পিঠে-পোলাও যাতে টকও দেওয়া হয়। [3] মিষ্টি ভাত যাতে জাফরানের রং দেওয়া হয় না। [4] বেগুনের রায়তা। [5] দুধে রান্না করা চাল, ক্ষীর। [6] থালী। [7] ভাজা কচু। [8] নিমন্ত্রণ। [9] শরিকানী ভাগ বা তত্ত্ব-তাবাশ।

নিমন্ত্রণ বাড়িতে এই সমস্ত জিনিস প্রত্যেক অভ্যাগতের সামনে দস্তরখানের ওপর আলাদা-আলাদা প্লেটে সাজিয়ে দেওয়া হত। যখন 'হিস্‌সা' হিসেবে কোথাও পাঠানো হত, কাঠের থালায় 'তোরা' রেখে ভালোমতো গুছিয়ে দেওয়া হত।

ইংরেজ-সমাজে খাবার টেবিল সাজানো হয় ফুল, 'গুলদস্তা' (স্তবক) এবং অন্য নানাবিধ জিনিস দিয়ে। এর নিদর্শন এখানেও ছিল—আমীর, নবাব ও শাহজাদাদের যে 'তোরা' দেওয়া হত, তাতে, থালার মাঝখানে কাগজের ফুলের একটা 'গুলদস্তা'ও রেখে দেওয়া হত। অবশ্য, জনসাধারণ এটিকে অতিরিক্ত, অনাবশ্যক বিধায় ছেড়ে দিয়েছে।

যে সমস্ত বনেদী ঘর এবং উচ্চ কোটির দেউড়ীতে খানা যেত, সামাজিক মর্যাদা ও শ্রেণী অনুসারে তাদের তোরায় রাখা খাদ্যের সংখ্যাও যেত বেড়ে। বাদশাহর মহলে খাস জাহাঁপনার জন্যে যেত একশো-একটি খানার 'তোরা', যার খরচের পরিমাণ ছিল পাঁচশো টাকা। অওধের শাসকদের মধ্যে ওয়াজিদ আলী শাহর পিতা আমজাদ আলী শাহ অত্যন্ত সংযমী, নমাজী, সদাচারী শাসক ছিলেন। ধর্মে যা নিষিদ্ধ, সেগুলি থেকে দূরে থাকতেন; শরীয়ত[1]-এর পরিপূর্ণ অনুগত ছিলেন; এবং পিতার অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করতেন না। এই সংযমের জন্যে দেশের টাকা নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করাকে তিনি 'হারাম' (পাপ) মনে করতেন, এবং আত্মীয়দের কাছেও প্রত্যাশা করতেন: "দাওয়াতে, খানার বদলে তোমরা আমাকে নগদ টাকা পাঠিয়ে দিও।" ফলে, লোকেরা পাঁচশো টাকা পাঠাত। তার সঙ্গে, নবাব সাহেবের জন্যে একটা 'তোরা'ও অবশ্য পাঠাত। তবে, সেটা যে একশো একটা থালাই হতে হবে, এমন কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না।

'খোআন' অর্থাৎ থালা সাজানোর প্রক্রিয়াও ছিল বিধিবদ্ধ—

---

[1] ধর্মশাস্ত্র।

কাঠের থালা, তার ওপর রঙীন 'তীলী'[1]-র গম্বুজাকৃতি 'ঝাবা'[2], তার ওপরে 'চোটী' (চূড়ায় বাঁধা শাদা কাপড়) জড়ানো। শাহী বাবুর্চীখানা এবং উচ্চপদস্থ আমীরদের ঘরে ওই বাঁধনের ওপর গালা লাগিয়ে শীলমোহর করে দেওয়া হত, যাতে মাঝপথে আর কেউ ওগুলো খোলার সুযোগ না পায়। পুনশ্চ, সবার ওপর থাকত ধব্‌ধবে পরিষ্কার, রঙীন ও রেশমী 'খোআনপোশ'[3]। বড়ো সরকারে, এই 'খোআনপোশ' অনিবার্যরূপে হত 'অতলস' ও 'কম্‌খোআব' বা 'যরবফ্‌ত্‌' অর্থাৎ রেশমী কাপড় ও ব্রোকেড বা এমব্রয়ডারী-করা সিল্কের। কখনও শুধু 'লচ্‌কা'[4] টেঁকে দেওয়া হত, বা কারুকাজ-করা হত।

এই রীতির সূত্রপাত, সম্ভবতঃ মুগল দরবারে, এবং সেখান থেকে লখনউ আসে। তবে, লখনউয়ে এই শিল্পকলার যে বহুলতা দেখেছি, দিল্লীতে তা অদর্শন। এখানকার ছোট-ছোট খানা-পীনাতেও এই প্রথা স্বাভাবিক এবং বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। একজন সামান্য ব্যক্তি যদি শুধু জলই চায়, তাহলেও চাকর জলভর্তি পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে গ্লাস একটা থালীতে রেখে ও ঢেকে নিয়ে আসবে এবং সাদরে সামনে ধরবে।

এই শখ, এই 'তকল্লুফ' (প্রথা, সৌজন্য, আর্ট), এই সৌকুমার্য একশো বছরের মধ্যেই লখনউয়ে এমন সব দক্ষ বাবুর্চীর জন্ম দিয়েছে, হিন্দুস্তানের প্রতিটি শহরে ও দরবারে যাদের কদর ও খ্যাতি ছিল। হিন্দুস্তানের তাবৎ মুসলমান দরবার ও রাজ্যের যেখানেই আমি গেছি, লখনউয়েরই বাবুর্চীকে দেখেছি—যারা খাস আমীর নবাব প্রভৃতিদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। ফলত, তাদের অসীম সমাদর। অবশ্য, একথা সর্বস্বীকার্য, যে, হায়দরাবাদ-দাক্ষিণাত্য, ভূপাল ও রামপুরে বড়-বড় বাবুর্চী বিদ্যমান; কিন্তু তাদের আসল

[1] শুকনো লম্বা ঘাস। [2] ঝুড়ি। [3] খুন্‌চেপোশ [4] রূপোলী পাতের ফিতে।

পরিচয়ের খোঁজ যদি আপনি নেন, তাদের বংশের সন্ধান নেন, এবং তাদের প্রগতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করেন, তাহলে নিশ্চয়ই দেখবেন : সে বাবুর্চী হয় লখনউয়ের, কিংবা লখনউ থেকে আসা বাবুর্চীর বংশধর, অথবা কোন লখনউঈ বাবুর্চীর সাগরেদ।

অথ বাবুর্চীখানা-কথা সমাপ্ত। বাকি শুধু মিঠাইয়ের বর্ণনা।

মিঠাই তৈরি করা হিন্দু 'হলওআঈ'য়ের (ময়রার) কাজ। এদেরই মিঠাইয়ের সঙ্গে জনসাধারণ পরিচিত। পরে, মুসলমান রকাবদাররাও মিঠাই তৈরিতে উন্নতি করেছে। তারা অবশ্য জনতার প্রয়োজন মেটাতে পারে না, এটা করে হিন্দু হালুইকর। রকাবদাররা মিঠাই বানায় আমীর ও শৌখীনদের জন্যে। সেগুলি অত্যন্ত স্বাদু ও অতুলনীয়।

লখনউয়ে হিন্দু ও মুসলমান দুই শ্রেণীরই মিষ্টান্ন-প্রস্তুতকারক আছে। সাধারণ ধরণের মিঠাইয়ের ক্ষেত্রে মুসলমান 'হলওআঈয়ের' জিনিস হিন্দু 'হালুইকরদের' দোকানের চেয়ে ভালো হয় না। কিন্তু ফরমাইশ করে বিশেষ ধরণের মিঠাই তৈরি করাতে চান তো হিন্দু হালুইকরদের মিষ্টান্নের চেয়ে এদের মিঠাই অনেক ভালো ও সুস্বাদু হয়। লখনউয়ের 'জলেবী', 'ইমরতী' ও 'বালুশাহী' (জিলিপি, অমৃতি, বালুশাই) খুব ভালো।

কোন্ মিঠাই আসলে হিন্দুর, আর কোন্‌টা মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুস্তানে এসেছে—তফাৎ করা খুবই কঠিন। তবে, নাম ও রুচি-বিশেষ ধ'রে যদি বিচার করা যায়, তাহলে বোঝা যায় : 'হলওআ' (হালুয়া) বিশুদ্ধ আরবী মিঠাই, আরব ও ইরান হয়ে হিন্দুস্তানে এসেছে, সঙ্গে করে আপন নামটিও এনেছে। তবে, এও যে খুব নিশ্চয় করে বলা যায়, তা নয় ; কারণ, এ বিষয়ে মতভেদও আছে। হালুইকরদের দোকানে যে সপ্‌সপে হালুয়া পাওয়া যায়, পুরীর সঙ্গে যা খাওয়া হয়, সেটা খাঁটি হিন্দু মিষ্টি ; ওরা একে 'মোহন ভোগও' বলে। কিন্তু 'হলওআ সোহন'-এর যে চার উপজাতি—'পাপড়ী, জুযী, হাব্‌শী, দুধিয়া'—এরা নির্ভেজাল মুসলমান মিঠাই বলেই মনে

হয়। দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ ক'রে মাদ্রাজে, যে 'অরবী হলওআ' এখন প্রচলিত, সেটা যে কোথাকার, তা সঠিক বলা যায় না। বাস্তবে, আরবী হালুয়া হল সেটাই, যেটা আরব থেকে সোজা চলে এসেছে হিন্দুস্তানে। সেইসঙ্গে ইসলামী যুগের অবদান: 'বালুশাহী, খুর্মা, সুক্তি, গুলাবজামুন, দরবহিশ্ত্' ইত্যাদি মিষ্টান্নও।

'জলেবী' (জিলিপি)-কে আরবীতে বলে 'যলাবিয়া'। পরিষ্কার বোঝা যায়, 'যলাবিয়া' থেকে বিকৃত হয়েই 'জলেবী' শব্দ তৈরি হয়েছে। এইজন্যে একেও আরবী মিঠাইয়ের শামিল করে নেওয়া দরকার। 'প্যাঁড়া' বিশুদ্ধরূপে হিন্দু মিঠাই, 'ইমরতী'ও হিন্দু। তবে, আমাকে বলা হয়েছে যে, 'ইমরতী' (অমৃতি) আবিষ্কৃত হয়েছে লখনউতেই। যদিচ, এই মিঠাইয়ের জন্যে লখনউয়ের এখন আর কোন বিশেষত্ব নেই। 'নান' ভারতের অন্য বড়ো বড়ো শহরে যেমন হয়, লখনউয়েও কিছুটা সেইরকম।

এই প্রসঙ্গে একটা আজব তামাশা চোখে পড়ে—লখনউয়ে আগ্রার ও পাঞ্জাবের হালুইকররাই বেশি বিখ্যাত, আর, অন্য শহরে দেখেছি: লখনউ ও তার আশপাশের হালুইকরদেরই সমধিক প্রতিষ্ঠা! বস্তুত, এই খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে দোকান চালু থাকার ওপর—যে হালুইকরের দোকান যতো বেশিদিন ও যতো ভালো চলে, মিষ্টান্নের উন্নতিবিধানে তার সুযোগও তেমনি ততো।

এটা নিশ্চিত, যে, হিন্দু ময়রা বা হালুইকরদের শ্রেণী অনেক উন্নত। মিষ্টির আদর হিন্দুরা যতোটা করে, মুসলমানেরা ততোটা না। বোধহয় 'গোশ্ত্' (মাংস) খাবার জন্যেই মুসলমানরা 'নমকীন' (ঝাল-নোনতা) বেশি ভালবাসে। অন্যপক্ষে, হিন্দুরা বেশি ভালবাসে মিষ্টি। এরা শুধু মিষ্টি দিয়েই পেট ভরাতে পারে ; মুসলমানদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। হিন্দুদের এই মিষ্টান্ন-প্রিয়তার জন্যে হিন্দু তীর্থস্থান মথুরা, বেনারস, অযোধ্যা মিষ্টির নানা শ্রেণীর ও বিশিষ্ট স্বাদের দিক থেকে অন্যান্য নগরের চেয়ে অধিকতর প্রসিদ্ধ।

'হালুয়া-সোহন' তৈরিতে মুসলমান 'রকাবদার' ছাড়া অন্য লোকেরাও

খ্যাতি অর্জন করেছে। শেষ পর্বের বিখ্যাত 'খুশনবীস' মুনশী হাদী আলী সাহেব 'পাপড়ী হালুয়া সোহন'-এ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এক সের সুজিতে তিনি ত্রিশ সের ঘি মাখতেন, এবং তার 'টিকিয়া'[1]র ওপর আশ্চর্য সব নক্‌শা করতেন। 'হালুয়া সোহন' তৈরির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খুশনবীসী ও 'নক্‌কাশীর (অক্ষর-লেখন ও নকশার) কৃতিত্ব এতদ্বারা জাহির হত।

লখনউয়ের রইসজাদা মুনশী উস্‌সুলতান বাহাদুর তখন মেটিয়াবুরুজে। আমি নিজের চোখে বহুবার তাঁকে দেখেছি এক ছটাক সুজিতে দু-আড়াই সের, অর্থাৎ সের প্রতি চল্লিশ সেরের মতো, ঘি দিতে। তাঁর 'পাপড়ী হালুয়া সোহন' হত হলদে, ধোয়া কাপড়ের মতো উজ্জ্বল ও পরিষ্কার।

॥ 29 ॥

খানা ও বাবুর্চীখানার বিবর্তন, আবিষ্কারাদি প্রসঙ্গে আমি অনেককিছু লিখেছি। আর একটু বলার আছে। এখানে, এবং এশিয়ার সব দেশেই, সু-স্বাদ সৃষ্টির পাশে-পাশে আরও কয়েকটি বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। তা হল : স্বাদের সঙ্গে-সঙ্গে খাদ্যে থাকবে উচ্চশ্রেণীর আনন্দদায়ক সুগন্ধি, রং হবে সুন্দর ও আকর্ষণীয়, দর্শনে রুচিসম্মত ও মনোমুগ্ধকারী। অবশ্য, হিন্দুস্তানের সব শহরে, যেখানেই ভোজনবিলাসের শখ আছে, এইসব বিষয়ে লোকেরা সদাসচেষ্ট। তবু, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সফল লখনউ। এখানে প্রায় প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যেই সুরুচি সহজাত। তার ফলে, শুধু যে ভালো বাবুর্চীই আবির্ভূত হয়েছে, তা নয়, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোকদের মধ্যেও রসুইকর-হালুইকরদের তুলনায় অধিকতর কর্মকুশলতা, পরিচ্ছন্নতা ও সুকুমারতা স্ফূর্ত হয়েছে, এবং

[1] প্রতি টুকরো।

তা হয়েছে স্বভাবগতভাবেই। এমন একটাও বনেদী পরিবার নেই, যেখানে মহিলারা রন্ধনে অনিপুণা অথবা উত্তম খাদ্য-প্রস্তুতিতে অপারদর্শিনী।

রন্ধন কর্ম একটা আর্ট। তার সমান বা তার চেয়েও বড়ো আর্ট —সুচারুরূপে খাদ্যবস্তু নিষ্কাষণ এবং তার কারুমণ্ডিত পরিবেষণ। য়োরোপে আজকাল টেবিল সাজানোর খুব চল—টেবিলের ওপর জায়গায় জায়গায় গুল্‌দস্তা (পুষ্পস্তবক) বসিয়ে দেওয়া হয়; নানা রঙে রং করা কাঁচা চাল দিয়ে স্থানে স্থানে অক্ষর ও নক্‌শার শিল্পসম্মত কাজ থাকে। পাত্রাদিও খুব পরিষ্কার, দামী, এবং রূপোর হয়। কিন্তু আসল যে জিনিস সেই খাবার সাজানোর দিকে ইংরেজ বাবুর্চী-খানসামাদের কোন খেয়ালই থাকে না। শুধু বিয়ের কেক ছাড়া। আমীর ও লর্ডদের বিয়ের ভোজে সুদৃশ্য গম্বুজ কিংবা সুন্দর ইমারতের নকলে কেক তৈরি করে ডিনারের টেবিলে হাজির করা হয়।

এর বিপরীতে, হিন্দুস্তানে, 'দস্তরখান' সাজানোর দিকে মনোযোগ কমই দেওয়া হয়। কিন্তু খোদ খানা সুপরিচ্ছন্নভাবে বেড়ে নিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়, তার ওপর সংলগ্ন সোনা রূপোর পাত। বাদাম পেস্তার পাতলা টুকরো দিয়ে নানাবিধ নক্‌শা ও রং-বেরং ফুল তৈরি করা হয়। নারকোলের শাঁস পাতলা করে কেটে সুন্দর ডিজাইনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই কলায় রকাবদারদের বিশেষ দক্ষতা আছে। বস্তুত, যতো ভালো করে এরা রাঁধে, তার চেয়েও অধিক কুশলতার সঙ্গে খাবার সাজায়, অলংকৃত প্লেটকে বানিয়ে দেয় এক-একটি ফুলের তোড়া।

লখনউয়ে এই তকল্লুফের (শিল্পসম্মিতির) আরম্ভ পেশাদার বাবুর্চী ও রকাবদারদের মধ্যে; তাদের মাধ্যমে পৌঁছেছে শরিফ ব্যক্তিদের ঘরে ঘরে; এবং এখানকার ঘরণী রমণীরা এ বিষয়ে এমন যোগ্যতা অর্জন করেছে, প্লেট-সাজানোয় এমন পারদর্শিতা, খোদ্ রকাবদাররাও তেমনটি দেখাতে পারবে না—যদিও এটি

বিশেষ ক'রে তাদেরই ঘরানার শিল্প। য়োরোপের গবেষক প্রমাণ করে দিয়েছেন—ললিতকলায় স্ত্রীজাতির সহজাত অধিকার। সুন্দরভাবে কোন জিনিসকে সাজানো ও যথাযোগ্যভাবে পেশ করার ব্যাপারে তারা, স্বভাব-পটুতা বশত, পুরুষদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এর প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দুস্তানেই, লখনউ রমণীর স্বভাবে—খানার সাজসজ্জায় অলংকরণে যারা কৃতিত্ব দেখিয়ে থাকে।

বিয়ের কেকের কথা একটু আগেই বলেছি। হিন্দুস্তানের উৎসব মুখরিত বিবাহে বর-বধুর সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে রক্ষিত হয় যে কেক, তাও এইসব রমণীরা এমন পরিচ্ছন্নতা ও কুশলতার সঙ্গে সাজিয়ে দেয়, মন চায়—বসে বসে দেখি, কেবলই দেখি।

খানার সঙ্গেই 'আবদারখানা'র ও তার বিবর্তনের উল্লেখ বিকর্ষণীয় হবে না। বাদশাহ ও আমীরদের জলের ব্যবস্থার নাম: "আবদার-খানা"। সেকালে বরফ ছিলনা; কোন কোন ঋতুতে ঠাণ্ডা জলও পাওয়া যেত না। তাই জলের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হত। নতুন ঘড়ায় জল ভরে রাখা হত; জল পানের জন্যে থাকত নাজুক ও পরিষ্কার মাটির পেয়ালা। ঘড়া ও পেয়ালায় লাল কাপড় জড়ানো থাকত; এই কাপড় ভিজে রাখা হত; হাওয়া লেগে ভিজে কাপড় খুব ঠাণ্ডা হয়ে যেত; উষ্ণ বাতাস ও লু যতো গরম, কাপড়ও ততোই ঠাণ্ডা; আর ঠাণ্ডা কাপড় ভেতরের জলকেও শীতল রাখত। অনেক সময় ঝাঁঝরী ও সুরাই এমনকি ঘড়ারও মুখে কাপড় বেঁধে কোন গাছের ডালে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হত। ভেতরে হাওয়া না যাওয়ায় জল পড়তনা এবং খুব ঠাণ্ডা হয়ে যেত। বর্ষাকালে এ-তদ্‌বীরেও কাজ দিত না। তখন জলভর্তি ঘড়া কুয়োর মধ্যে ঝুলিয়ে দেওয়া হত, তাতে জল খুব ঠাণ্ডা হয়ে যেত।

এ ছাড়া অন্য জটিল ব্যবস্থাও ছিল। 'জস্ত'[1]-এর হাল্‌কা সুরাই থাকত; 'নাদা'য়[2] শোরা ও জল ঢেলে 'ফেরানো' হত।

[1] দস্তা। [2] মটকার মতো পাত্র

কিছুক্ষণ পরেই জল বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যেত এবং খুব স্বাদু হত। এই প্রক্রিয়াকে বলা হত 'সুরাহী[1] কা ঝুলনা'।

পরবর্তীকালে বরফ সংগ্রহেরও একটা ভালো পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। শীত যখন প্রচণ্ড, রাতের বেলায়, মাটির রেকাবী ও পেয়ালায় গরম-গরম জল ভরে ক্ষেতে বা খোলা ময়দানে রাখা হত; ভোরে জমে যেত। আগে থাকতেই গর্ত করা থাকত সেখানে। সেই বরফ তখনই সেই গর্তে রেখে মাটি চাপা দেওয়া হত। যতদিন বরফ এইভাবে রাখা হত, গলে যেতনা। এইভাবে, সারা বছরের পক্ষে প্রয়োজনীয় যথেষ্ট বরফ মাঠে রেখে দেওয়া হত; দরকার মতো রোজ বার করে নেওয়া হত। তবে, জলের সঙ্গে মেলাবার মতো ততো পরিষ্কার হতনা এ বরফ। তাই, শোরা ও লবণ মিলিয়ে সুরাই-ঝুলোনো হত কিংবা জমিয়ে 'কুলফী' বানানো হত।

তবে, এসব ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ছিল বাদশাহ এবং ওই পর্যায়ের আমীরদের মধ্যে। গরীব লোকেরা এতে লাভবান হত না। দরিদ্র ও মধ্যবিত্তরা তাই জল ঠাণ্ডা রাখার সনাতন পদ্ধতিই অবলম্বন করত। এবং এটাই অল্প-বিস্তর সব ঘরে প্রচলিত হয়ে যায়।

যাই হোক, সেদিনকার লখনউয়ে জলের এই ব্যবস্থাই ছিল। তার বিশিষ্ট রীতি-রূপও ছিল। মাটি ও দস্তার সুরাই এবং পেয়ালার ওপর সাধারণতঃ 'টুলের কাপড়' চড়ানো থাকত, তার ওপর সুন্দরভাবে জড়ানো রূপোলী 'গোটা'[2]। সব মিলিয়ে এমন আকর্ষণের সৃষ্টি হত, জল পান তো দূরের কথা, জলপাত্রের রূপ দেখেই চোখ জুড়িয়ে যেত!

আমি ঠিক জানিনা, আবদারখানার এই ব্যবস্থা—যার বর্ণনা দিলাম—পুরোপুরিটাই দিল্লীতে ছিল কিনা। ছিল নিশ্চয়ই। ওখান থেকেই এসব লখনউ এসে থাকতে পারে। তবে, এই ব্যবস্থা ও বাসনপত্র আমি লখনউয়ের যতো লোকের ঘরে দেখেছি, দিল্লীতে

[1] সুরাই। [2] ফিতে।

তার সাক্ষাৎ পাইনি। হতে পারে, ওখানেও এইরকম ছিল। তবে, এতে কোন সন্দেহ নেই, যে, লখনউয়ে এসেই মৃৎপাত্রের সৌকুমার্য ও সুক্ষ্মতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। লখনউয়ের মাটি উৎকৃষ্ট ; তাই এখানে যেমন নাজুক ও সুন্দর মাটির পাত্র তৈরি হতে পারে, অন্যত্র তা সম্ভব নয়। দিল্লীবাসীদের দস্তার যে 'সুরাহী', তা এইরকমই। কিন্তু এমন মৃৎপাত্র ওদের ছিলনা। [এই মাটির পাত্রের কথা আমি পরে সময়মতো বলব।]

বাদশাহ যখন যেখানে যেতেন, তাঁর সঙ্গে যেত বাবুর্চীখানা ও আবদারখানা। অন্যান্য আমীরদের ঘরেও আবদারখানার ব্যবস্থাদি উন্নত হয়ে গিয়েছিল। এমন অনেক আমীর ছিল, যারা সঙ্গে নিজেদের আবদারখানা রাখত। মির্জা হায়দার সাহেবের আবদারখানা ও 'ভিণ্ডীখানা'[1] গড়েই উঠেছিল তাঁর দানশীলতার প্রবৃত্তির ওপর। যে-বিবাহে তিনি যেতেন, গোটা আসরকে জল ও তামাক খাওয়ানোর দায়িত্বও তাঁর ওপরেই বর্তাতো। ফলত, কোন আসরে তাঁর যোগদান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে এক অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ বলেই গণ্য হত।

॥ 30 ॥

এবার আমার আলোচ্য একটি চিত্তগ্রাহী বিষয় : লখনউ ও তার দরবারের 'লিবাস'—বেশভূষা।

প্রথমে যে আরব-মুসলমান এখানে এসেছিল, তারা পরত কুর্তা, চুগা (চোগা), তহমত (লুংগি)। এদেশের পোষাকের তুলনায় কিছুমাত্র শ্রেষ্ঠতর নয়। পোষাকে-আশাকে উন্নতির সূত্রপাত সেইদিন থেকে, যখন সাসানী সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে বাগদাদের আব্বাসী দরবার আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জন্যে আবিষ্কার করল

[1] হুঁকো-তামাকের ব্যবস্থা।

'পায়জামা', 'চুগা' ও সুদৃশ্য 'অমামা' (পাগড়ী)। এ-পোষাক সাসানী দরবারের আমীর ও সরদারদের বেশের নকল ছিল। অল্প দিনের মধ্যেই এই নিবাসই মিশর থেকে সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা মুসলমানদের বেশভূষা হয়ে দাঁড়াল। অতঃপর এই পোষাক পরেই এরা এল হিন্দুস্তানে। গোড়ার দিকের মুসলমান শাসকদের যে পোষাক ছবিতে দেখা যায়, তা ইরানী ও আব্বাসী আমীর ও শাসকদের পরিধেয়ের প্রায়-সদৃশ। তফাৎ শুধু এইটুকু ছিল—এখানকার রাজা-রাজড়াদের অনুকরণে এঁরা হীরে-জহরৎটা বেশি পরতেন।

দিল্লীর মুগল দরবারের শেষ পর্বের পোষাক সম্পর্কে যতোটা আমি জেনেছি, তা হল: মাথায় পাগড়ী, দেহে 'নীমাজামা'[1] পায়ের গাঁট-ছুঁই-ছুঁই 'তংগ্‌মোহরীর'[2] পায়জামা, পায়ে উঁচু 'এড়ী'[3]-র 'জূতা', কোমরে জামার ওপর 'পট্‌কা'[4]। ব্যস, এইই ছিল দিল্লীর শরিফদের বেশভূষা। মুহম্মদ শাহ রংগীলার সময় পর্যন্ত এর কোন রদবদল হয়নি। আর, যদি হয়েও থাকে তো চোখে পড়ার মতো নয়।

এইসব পরিধেয়ের মধ্যে 'নীমা' ছিল কনুই পর্যন্ত আধা-আস্তীনের 'শলূকা'[5], সামনে, বুকের ওপর কাপড়ের বোতাম বা ফাঁস, নীচে 'নীমাজামা'। তার ওপরেই পরা হত 'পায়জামা'—আসলে যা ইরানী চোগার সংশোধিত রূপ। এতে 'গরীবান'[6] থাকত না; দুদিকের কিনার বা 'পর্দা' একটা অন্যটার ওপর তির্যকভাবে এসে বুককে ঢেকে দিত। বুকের ওপরের অংশ তথা গলার নীচেটা খোলাই থাকত—আজকাল যেমন ইংরেজী কোটে খোলা থাকে। এবং, আজকালকার 'কমীস'[7] যেমন বুকের ওপরদিকটা ঢেকে রাখে, তখন সেইরকম ঢেকে রাখত 'নীমা'। বুকের ওপর জামার যে পর্দা

[1] জামার নীচেকার পরিধেয়। [2] সরু বেড়ের। [3] গোড়ালী। [4] কোমর বন্ধ
[5] ছোট কুর্তা; বডিস। [6] কলার। [7] কামিজ।

বাঁদিক থেকে আসত, তলায় থাকত এবং ডান পাশের ফিতের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত। তার ওপর থাকত দক্ষিণের পর্দা ; সেটি বাঁধা হত বাঁপাশের ওপরে। কোমরে 'দামন'[1]-এর পরিবর্তে একটা স্কার্টের মতো জুড়ে দেওয়া হত—সেটা ঝুলে থাকত পায়ের গাঁটের ওপর পর্যন্ত ; ঘের খুব বড়ো হত, তাতে 'চুন্নট'[2] দেওয়া হত। জামার আস্তীন আধা-হাত পর্যন্ত সেলাই না করে খোলা রেখে দেওয়া হত, লটপট করত দুদিকে। তার নীচে সরু মুহুরীর পায়জামা। সাধারণ লোকের পায়জামা হত সাদাসিধে, আমীররা বানাত 'মশরূ', 'গুলবদন' ইত্যাদি রেশমী কাপড় দিয়ে। জামার ওপর কোমরে 'পট্‌কা' বেঁধে নেওয়া হত।

দু-তিন শতক আগে আমাদের বৃদ্ধদের, হিন্দুস্তানের আমীর ও শরীফদের এইই ছিল 'লিবাস'। টুপি, পাগড়ী ও পায়জামার যে সংস্কার হয়েছে, তার বর্ণনা আমি পরে দেব। এখন আমি বলছি শরীরের মধ্যভাগের পরিধেয়ের কথা। সত্যি কথা বলতে, এটাই আসল পরিধেয়, যা দিয়ে মানুষের বেশভূষা স্থির হয়। এবং এইই ছিল এই পর্বের দরবারী পোষাক, যা পরিধান করে নবাব বুরহান-উল-মুল্‌ক্‌ এবং শুজাউদ্দৌলা দিল্লী থেকে অওধে এসেছিলেন। জামা হত মিহি মল্‌মলের। হিন্দুস্তানের বিভিন্ন শহরে তখন খুব মিহি, হাল্‌কা সুন্দর মল্‌মল তৈরি হত। গোটা বিশ্বে তার খ্যাতি ছিল। ঢাকার 'মল্‌মল' ও 'জামদানী' উচ্চশ্রেণীর আমীর ও বাদশাহরাই পরিধান করতেন।

এর পর ইরানী 'কবা'[3] (কাবা)র অনুকরণে 'বালাবর' আবিষ্কৃত হয়। এতে গোল 'গরীবান' একেবারে খোলা থাকত—যেহেতু, বুক ঢাকার জন্যে নীচে পরিহিত নীমাই যথেষ্ট ছিল। 'দামন' যাতে সামনে না খোলে, তাই ঘের ও চুন্নট বাদ দেওয়া হল।

---

[1] জামার নিম্নাংশ। [2] কুঁচি। [3] চোগা

'দামনে', ডানদিকে, একটা চওড়া 'কলী'[1] লাগানো হত। এই 'কলী'রই বিবর্তিত রূপ আজকালকার শেরোয়ানীর কলী, যেটিকে বাঁদিকে তলা থেকে নিয়ে গিয়ে ফিতের সঙ্গে বাঁধা বা হুকে আটকে দেওয়া হয়। 'বালাবরও' দিল্লীর আবিষ্কার।

এই বালাবরের পরবর্তী রূপ: 'অংগরাখা' (আংগরাখা), জামা ও বালাবর মিলিয়ে তৈরি এক নতুন পরিচ্ছদ। এও দিল্লীরই। এতে, বুকের চোলী নেওয়া হয়েছে 'কাবা' থেকে। তবে, বুক খোলা না রেখে গোল ও লম্বামতো একটা 'গরীবান' (কলার) জুড়ে দেওয়া হল; এবং তার ওপরে, গলার নীচে আর একটি অর্ধচন্দ্রাকার 'কণ্ঠা' (কলার) লাগানো হল—যেটি আটকানো হত বাঁদিকের ঘাড়ের পাশে 'ঘুঁড়ী-তক্‌মা'[2] দিয়ে। 'চোলী' থাকত নীচে; প্রথমে ডানদিকের পর্দা বগলের নীচে ফিতের সঙ্গে বাঁধা হত; ওপরেও ফিতে থাকত, হুদিকের পর্দা বুকের নীচে ঠিক মাঝখানে নিয়ে এসে বেঁধে দেওয়া হত। এতে বাঁদিকের বুক একটু খোলা থাকত। চোলী থাকত তলায়। নীচে দামন হত কাবারই মতো। তবে, পুরনো জামার স্মৃতিতে হুপাশে বগলের নীচে চুন্নট অবশ্যই থাকত।

এ হল পুরনো আংগরাখা, দিল্লীর অন্তিম পর্বে যার রেওয়াজ ছিল, এবং ওখান থেকে সারা হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়েছিল। লখনউয়ে আসার পর এই আংগরাখা আরও কাট-ছাঁট ও 'চুস্ত্', (চোস্ত, টাইট) করা হল। চোলীও খুব গোল, উঁচু এবং টান্‌টান্ হয়ে গেল। বগলের চুন্নট বরবাদ হয়ে গেল। দামন না মুড়ে 'সন্‌জাফী গোট'[3] টেঁকে দেওয়া হল। চোলীর নীচে ফিতে লাগানোর জায়গায় যে একটা 'কমরতোঈ'[4] থাকত, তার জায়গায় প্লেটের মতো তিন-তিনটে 'কমরতোঈ' লাগিয়ে দিল নবাবজাদা এবং বেশভূষাপ্রিয় লোকেরা। স্থানে-স্থানে গোট এবং কমরতোঈর পাশে থাকত 'কাটাইয়ের কাজ'।

---

[1] ত্রিকোণ বস্ত্রখণ্ড। [2] কাপড়ের গোল বোতাম ফাঁসে আটকানো। [3] 'ফ্লন্‌স্'-এর মতো বর্ডার। [4] ফোল্‌ড, প্লেট, ভাঁজ।

দিল্লীতে আংগরাখার পর 'নীমা' বিদায় নিয়েছিল। সেসময় বুকে বাঁদিক খোলা থাকা খারাপ তো ছিলই না, বরং ফ্যাশান হয়ে গেল। লখনউয়ে, এর তলায় 'নীমা'র বদলে এলো 'শলুকা'—ছোট কুর্তা বা বডিস—তার সামনের দিকে বোতাম লাগানো। ততোদিনে য়োরোপের বোতাম এখানে পৌঁছে গেছে। শলুকায় ফ্যাশান দেখানো যেত। নাজুকমেজাজ লোক পরত 'জালী' তথা 'বাবরলেট'-এর চুস্ত্ 'শলুকা; তাতে কাঁচা সুতোর 'বেল-বুট'-এর (নকশার) কাজ। কিছু লোক রঙীন শলুকাও পরত। 'তন্‌জেব[1]-এর শাদা আংগরাখার নীচে থেকে তার রং ও 'বেল-বুটের' ঝলক দৃশ্যমান হয়ে এক বিশেষ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করত।

দ্বিতীয় সংশোধন হল বালাবরের। লখনউয়ে দরবার চলে আসার পর 'চিকন' নামে এক 'চুস্ত্-কবা'র আবিষ্কার হল। এতে ওই রকমই গোল 'গরীবান' রাখা হল, আংগরাখার মতো বুকের ওপর পর্দাও লাগানো হল। তবে, সে পর্দা, ডানদিকে, অর্ধবৃত্তাকারে বোতামের সঙ্গে আটকানো হত। ফলে, ডানদিকে গলার পাশ থেকে বোতামের এক সুন্দর ধনুক গোল হয়ে কোল পর্যন্ত নেমে আসত। অন্যদিকের অর্ধবৃত্তটি আসল 'কবার' মতোই সেলাই-দেওয়া হত। এতেও বালাবরের মতো চওড়া 'কলী' ওপরে লাগানো হত, এবং বাঁদিকে বগলের নীচে বোতাম বা ঘুঁটি দিয়ে আটকানো হত। এই 'চিকন' হত 'জোশালী' বা অন্য কোন ভারী কাপড়ের। ফলত এটি শীত ঋতুর পক্ষে খুব উপযোগী। একটা সময় ছিল, যখন দরবারী, কর্মচারী প্রভৃতিদের এটিই ছিল মর্যাদাসম্পন্ন বেশভূষা। এ-পোষাক ইংরেজদের খুব ভালো লেগেছিল, এবং অনেকদিন পর্যন্ত তাদের চাকরবাকরদের পরাত।

সবশেষে, লখনউ-এর একেবারে অন্তিম পর্বে 'চপকন' (চাপকান) ও আংগ্রাখা, দুটিকে মিলিয়ে দিয়ে আবিষ্কৃত হল 'অচকন'

[1] মসলিন-জাতীয়

(আচকান)। এতে, আংগ্‌রাখা ও চাপকানের মতো 'গরীবান' রেখে দেওয়া হল, মাঝখানে সোজা কেটে দুদিকে আধা-আধি সেলাই করে দেওয়া হত। সেলাইয়ের জায়গার ওপর 'সনজাফী গোট' (ফল্‌স্‌) থাকার ফলে গরীবানের (কলারের) গোলাই ও কাট্‌ থেকে গেল। গলা থেকে কোল পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্যবর্তী 'চাক' বোতাম দিয়ে আটকানো হত। বালাবরে যে 'কলী' লাগানো হত ওপরে, এতে তাকে নিয়ে আসা হল নীচে—যাতে 'দামন'ও না খোলে, আবার বালাবরের ওপরে কলী লাগানোয় যে কুরুচি প্রকট হত, তাও দূর হয়ে যায়। আচকানের নিম্নভাগ একেবারে চাপকান ও আংগ্‌রাখার মতো। এবং শৌখীন লোকেরা এতেও ওইরকম গোট এবং ওই ধরণের তিন 'কমরতোঈ' ও 'কাটাইয়ের কাজ' লাগিয়ে নিত।

এই শেষ আবিষ্কার 'আচকান'—লোকেদের খুব পছন্দ হয়ে গেল। এর রেওয়াজ শহর থেকে আরম্ভ হয়ে গ্রামে গিয়ে পৌঁছল, দেখতে-দেখতে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। এই আচকানই হায়দরাবাদ পেঁাছে, স্বল্প হেরফের অন্তে, হয়ে দাঁড়াল : 'শের্‌ওআনী' (শেরোয়ানী)। আস্তীন তার ইংরেজী কোটের মতো। গোট-লাগানো যে গরীবান বুকের ওপর রাখা হত, বার করে দেওয়া হল। কাট-ছাঁট করে ইংরেজী কোটের শৈলী নিয়ে আসা হল 'দামনে', জামার নিম্নভাগে, এবং অন্যত্রও। আবিষ্কৃত হল সেই পরিধেয়, যা বর্তমান হিন্দুস্তানের হিন্দু-মুসলমান তামাম লোকের জাতীয় পোষাক হবার যোগ্য। কয়েকদিন পরে, লখনউয়ের লোকেরাও নিজেদের পুরনো কৃতির হায়দরাবাদী সংস্করণ, যা সত্যিই উপযোগী, দেখে পছন্দ না করে পারল না। অচিরেই, সমস্ত শহর ও নগরীর মতো লখনউয়েও চালু হয়ে গেল শেরোয়ানী।

আংগ্‌রাখার নীচে যে 'শলুকা' (ছোট জামা) পরা হত, তার বদলে প্রথমে পরিধেয় ছিল ঢিলে ও ছোট 'কুর্তা'। কিছুদিন পরে, পশ্চিমী প্রভাবে, 'কুর্তা' চলে গিয়ে চল হল ইংরেজী 'কামিজের', যাতে কাফ্‌ ও কলার থাকে। কামিজ ও কলারের রেওয়াজ

শেরোয়ানীর কাট্‌কে আরও বদলে দিল—শেরোয়ানীর ওপরের অংশ সামনে হুক দিয়ে আটকে কামিজের সেই উপরস্থ বোতামের নীচে রাখা হল যাতে কলার লাগানো হয়। শাদা কলার বেরিয়ে রইল ওপরে। আস্তীন ততোটাই রইল, যাতে কাফের কিছুটা বেরিয়ে থাকে। অন্য শহরের মতো লখনউয়েও শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের আধুনিক পোষাক এই শেরোয়ানী। এটা লখনউয়ের নিজস্ব পরিধেয় নয়, তার কোন বিশেষতাও এতে নেই। কারণ, লখনউয়ের আবিষ্কার তো আচকানেই শেষ হয়ে গেছে; তার যে-কিছুটা চল্ ছিল, তাও আজ অচলিত ॥

॥ 31 ॥

মধ্য-শরীরের পরিধেয়ের কথা আমি বলেছি। এবার আসছি বেশভূষার সেই অংশে, যার সম্বন্ধ মাথার সঙ্গে।

হিন্দুস্তানে শিরোভূষণের খুব ইজ্জত। গোটা শরীরের তুলনায় মাথা যেমন মুখ্য, তেমনি তার বেশ-ভূষণেরও প্রাধান্য পাওয়া উচিত। প্রাচীন কাল থেকেই তাই হিন্দুস্তানে পাগড়ী বাঁধার রেওয়াজ চলে এসেছে। যদিও আরব ও ইরানীরা মাথায় 'অমামা' বেঁধেই এখানে এসেছিল এবং তাদের শাসন কায়েম হওয়ার ফলেই এখানকার পাগড়ীতে অনেক-কিছু পরিবর্তন হয়েছে, তবু মুসলমান আসার আগে এদেশে পাগড়ী ছিলনা, একথা বলতে পারা যায়না।

প্রথম দিকের মুসলমানদের 'অমামা' (পাগড়ী) ছিল বড়ো-বড়ো। সে-কারণে, তখনকার সব অর্থবান লোক, সামন্ত ও ধনিকদের পাগড়ীও সম্ভবত বড়ো-বড়োই হত, যার নীচে, আফগানিস্তানে আজকাল যেমন প্রচলিত, প্রাচীন তুর্কী ঢঙের ছুঁচলো ও শংকু-আকার 'টোপী' থাকত। এই থেকে ডিজাইন নিয়েই আমাদের হিন্দুস্তানী ফৌজের উর্দীর শামিল করে নেওয়া হয়েছে।

মুঘল শাসনকালে পাগড়ী দিন-দিন ছোট হতে থাকে। তার কারণ: ঠাণ্ডার দেশে—শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্যে পোষাক-পরিচ্ছদ যেমন দিন-দিন ভারী ও ময়লা হয়ে যেতে থাকে, তেমনি গরমের দেশে পোষাক হালকা ও ছোট আরও ছোট হয়ে যেতে থাকে। প্রাচীন মুসলমানরা যেসব ভারী ও মোটা কাপড় পরে এখানে এসেছিল, সেগুলির ওজনের আন্দাজ আমরা শুধু কল্পনাতেই করতে পারি। ইংরেজদের এবং তাদের স্ত্রীদের পোযাক দিন-দিন কতো স্বল্প ও হাল্‌কা হয়ে যাচ্ছে, তাতো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি।

এই সূত্র ধরেই এখানকার পাগড়ী দিন-কে-দিন ছোট ও হালকা হতে লাগল। দেশব্যাপী এই প্রবণতা দরবারের ফ্যাশানকেও প্রভাবিত করল। মুঘল দরবারের অন্তিমকালে আমীর ও মনসব-দারদের পাগড়ী খুব পাতলা হয়ে গিয়েছিল। স্বল্পবাসের এই প্রবৃত্তি থেকে আবির্ভূত হল পাগড়ীর অসংখ্য ফ্যাশান। অধিকাংশ আমীর নিজেদের জন্যে বানিয়ে নিল ছোট ছোট পাগড়ী, যেগুলি হত বিশেষ ধরণের ও বিশেষ গড়ণের।

পাগড়ী ছোট হতেই তুর্কী টুপি অচল হয়ে গেল। পাগড়ীর নীচে টুপি থাকতই না; আর যদি পরতও কেউ-কেউ তো সে এতো মিহি কাপড়ের ছোট্ট-একটুখানি টুপি, যে, ফুঁ দিলেই উড়ু-উড়ু! এই টুপি কী ফ্যাশানের হত, তা আমি নিশ্চিতরূপে জানিনা। অধুনা শেখ ও ফকীরদের মাথায় যে ধরণের ও গড়ণের টুপি থাকে, এও বোধহয় সেইরকম ছিল—মাথা ঘিরে ছ-সাত আঙ্গুল চওড়া একটা পট্টি, ওপরের দিকে চুনট দিয়ে ভাঁজ করা।

কিছুদিনের মধ্যেই, ঘরে ও অন্তরঙ্গ আসরে পাগড়ী খুলে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। অথচ, 'নংগে শির' (অনাবৃত মস্তক) থাকাটাও অসভ্যতা। কোন-না-কোন রকমের টুপি মাথার ওপর থাকা চাইই। এই প্রয়োজনকে মেটাবার জন্যে দিল্লীতে তাজের আকারের অনুকরণে বানানো হল 'কমরখী টোপী'। এতে, মাথায় পরা গোল

ঘেরের চারিদিকে চার কোণ বেরিয়ে থাকত। দিল্লীর কিছু আমীর ও শাহজাদার মাথায় এই ফ্যাশানের টুপি আজও চোখে পড়ে। রূপের সঙ্গে মিলিয়েই এই টুপির নাম: 'চ্যগোশিয়া'—চারটে ত্রিকোণের টুকরো দিয়ে তৈরি টুপি। বেশিদিন গেলনা, এরও রদবদল হতে লাগল। দিল্লীতেই 'কমরখা'র কোণ বাদ দিয়ে গোল 'কবা'-র মতো টুপির আবিষ্কার হল। এতে, চারটে পান এমনভাবে তৈরি করে ও কেটে নিয়ে তারপর জোড়া হত, মনে হত মাথার ওপর বিরাজমান লম্বামতো একটা 'কবা'। এই টুপি পরেই লোকেরা লখনউ এসেছিল, এবং সেইদিন থেকে এর ওপর লখনউ দরবারের প্রভাব লক্ষণীয় হয়ে উঠল। প্রথম পরিবর্তন: পানের জোড়ের ওপর লম্বা সুরাহী (সুরাই, কুঁজো), সুরাহীর মধ্যে সুন্দর চাঁদ। এদের বানানো হত এইভাবে: নরম 'তনৃযেবে'র তৈরি পান, তার ওপর 'নয়নসুখের' চাঁদ ও সুরাহী কেটে বসিয়ে ভেতর দিকে টেঁকে দেওয়া। দৃষ্ট হত উৎকৃষ্ট কারুকার্য ও সরলতা। এই টুপি এখানে খুবই প্রিয় হয়ে উঠল। ফলে, লোকেরা হঠাৎই পাগড়ী বাঁধা ছেড়ে দিল, এবং তাবৎ সভ্য ও শিষ্ট ব্যক্তির মাথায় এই টুপিই দর্শনীয় হয়ে উঠল।

লোকপ্রিয়তা থেকে জাত হয় সংশোধন-বাসনা। এই টুপির গড়ণেও তাই হল। আগে ছিল লম্বা, এখন হল গোল, যা খুবই উপযোগী ছিল। সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হল কাঠের ও তামার 'সাঁচা' (খাঁচা), যার ওপর টেনে পরিয়ে কবার মতো ও গোল করে নেওয়া হত 'চ্যগোশিয়া টোপী' (যেটি দিল্লীর পুরনো 'কমরৃখী টোপী'র নাম সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল)।

ইতিমধ্যে নাসীরউদ্দীন হায়দারের জমানা এসে গেল; লখনউয়ের শীয়া ধর্ম তখন যথেষ্ট উন্নত। ধর্ম-রাজনীতি-সংস্কৃতি-সমাজব্যবস্থা, সমস্ত কিছুই তার অনুগামী। আরবের খলীফাদের বিরোধ এবং 'পঞ্জতন'[1]-

[1] হযরত মুহম্মদ, হযরত আলী, তাঁর পত্নী হযরত ফাতিমা, দুই পুত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন—এই পাঁচ জন।

এর প্রতি ভক্তি লখনউয়ের সমাজে চার সংখ্যাকে অপ্রিয় এবং পাঁচ সংখ্যাকে প্রিয় করে তুলেছিল। তার প্রভাব পড়ল টুপির ওপরেও। কিছু প্রামাণিক হাদীসকে ভিত্তি করে স্বয়ং জাঁহাপনাহ নির্দেশ দিলেন—চ্যগোশিয়া টুপিতেও চারের বদলে পাঁচ পান করে দিতে হবে। তদনুযায়ী, চ্যগোশিয়ার হল পাঁচ পান ও পাঁচ সুরাহী। নামও 'চ্যগোশিয়া'র বদলে হয়ে গেল 'পঞ্জগোশিয়া'। এই সংস্করণই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হল। চারপানের টুপি একেবারে নষ্ট হয়ে গেল ; কারও মনেও রইল না—ওতে কোনদিন শুধু চারটে পানই ছিল। চ্যগোশিয়া নামটি কিন্তু লুপ্ত হল না—আজও মুখে মুখে উচ্চারিত হয়। কিছু লোক অবশ্য পঞ্জগোশিয়া বলে। তবে এই পাঁচ পানের টুপিকে চ্যগোশিয়া বলে যারা, তারাই সংখ্যাগুরু।

অওধ-শাসক নাসীরউদ্দীন হায়দার এই 'পাঁচপানওয়ালী টোপী' গোড়ায় শুধু নিজের জন্যেই আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, কোন প্রজার সাহস ছিল না এই টুপি পরিধান করে। কিন্তু এই নয়া ফ্যাশান শহরবাসীদের এতো পছন্দ হয়ে গিয়েছিল, তিনি চোখ বুজতেই ছোট-বড় সকলেই এটিকে আত্মসাৎ করে নিল। লখনউয়ের সমস্ত সভ্য ও শিষ্ট ব্যক্তিদের মাথায় এই গোল 'কবা-নুমা' (কবার মতো) টুপি পরিদৃশ্যমান হতে লাগল।

অতঃপর শীত ঠেকাবার জন্যে এই ধরণেরই একটা খুব সুন্দর কাজকরা টুপি আবিষ্কৃত হল—পাঁচ পান, জরির কাজ করা সিল্কের ওপর অন্য রঙের রেশমী জমি, ফিতে দিয়ে বানানো চাঁদ-সুরাহী। শীতের সময় 'ফ্যাশান্‌বল' লোকেদের মাথায় এছাড়া অন্য কোন টুপি উঠতই না। এর পর যখন 'চিকনের' রেওয়াজ হল, তখন গ্রীষ্মকালের জন্যে, এই রকমই কাজকরা সুদর্শন উৎকৃষ্ট শৈল্পিক 'চ্যগোশিয়া টোপী' তৈরি হতে লাগল। বছরভোর মেহনত করে এগুলি বানানো হত, দাম উঠত দশ-বারো টাকা পর্যন্ত।

ওই সময়ে দিল্লীর এক শাহজাদা লখনউ এসেছিলেন। দরবারে ও সমাজে তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। তিনি পরিধান করতেন

'দুপলড়ী টোপী'—মাথার দৈর্ঘ্যের অনুরূপ দুটো লম্বা 'পল্লা' (অংশ) ডিমের আকৃতিতে কেটে জুড়ে দেওয়া। অন্য টুপির চেয়ে সরল তো বটেই, তৈরি করাও সোজা। এটুপি তাই অনেকের পছন্দ হল। প্রচলিত হয়ে গেল। জনগণের মধ্যে এর রেওয়াজ এতো বেড়ে গেল, লোকোক্তিই দাঁড়িয়ে গেল: "দুপলড়ী টোপীওয়ালে শাহযাদে"। অসংখ্য লোকের মাথায় এই ছাঁটের টুপিই দেখতে পাওয়া যায়। শাহী শাসনের শেষ পর্বে এই 'দুপলড়ী টোপী' থেকেই একটা খুব ছোট পাতলা টুপি আবিষ্কৃত হয়েছিল, যার সামনে-পেছনে, দুদিকে দুটো 'নোক' (কোণ) বেরিয়ে থাকত; একে বলা হত 'নুক্কেদার টোপী'। এই ধরণের ভারী কাজকরা টুপি খাস শাহজাদা, রইস, উচ্চকোটির নবাবজাদা এবং শাহী বংশীয়রাই ব্যবহার করতেন।

সিপাহীবিদ্রোহ পর্যন্ত, লখনউবাসীদের মধ্যে দুধরণের টুপির রেওয়াজ ছিল—এক তো 'চ্যগোশিয়া', যা পরতেন ধর্মনিষ্ঠ ও শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ; অন্যটি হল 'দুপলড়ী'—শাহজাদা থেকে আরম্ভ করে নিম্নবিত্ত ব্যক্তি পর্যন্ত অল্পবিস্তর পরিবর্তনসহ যার চল্ ছিল। এবং আজও এটি 'আম লিবাস'—সর্বসাধারণের শিরোভূষণ।

সম্ভবত গাজীউদ্দীন হায়দার অথবা নাসীরউদ্দীন হায়দারের সময়ে কিছু লোক এক ধরণের গোল টুপি ব্যবহার করত, যাকে বলা হত 'মিন্দীল'। এর গড়ন ছিল 'ডফ্লী বা ঢপের মতো; কাজ করাও হত। কতিপয় নবাবজাদা ও ধনী ব্যক্তি অধিকতর জাঁকজমকপূর্ণ মনে করে একে গ্রহণ করে এবং এতো প্রাধান্য দেয় যে, বাদশাহ ও শাহাজাদাদের সামনে কোন ব্যক্তিই পাগড়ী না বেঁধে বা এই কাজকরা 'মিন্দীল' না পরে যেতেই পারত না। অর্থাৎ মিন্দীলকে দরবারে স্থান দেওয়া হয়েছিল। এই 'মিন্দীল টোপী'র আধারেই প্রস্তুত সেই গোল টুপি, যার ওপরের কোণ একটু গোল হত, যাকে বলা হত 'জযীলী টোপী'। এগুলি সচরাচর কালো মখমলের হত, তার ওপর সুন্দর ও সাচ্চা 'কলাবতুন'[1]এর উত্তম কাজ থাকত। আসলে,

---

[1] সুতো বা রেশমে জড়ানো সোনা-রূপোর তার।

এ টুপি ইংরেজ সরকারের ফৌজে গোরাদের দেওয়া হয়েছিল ; বাইরে থেকে দেখলে, এতে উর্দীর আদলও ছিল। এই ফৌজী 'জয়ীলী টোপী' শাহজাদা ও খানদানী আমীরদের বেশভূষায় ঢুকে পড়েছিল। ইংরেজদের অনুকরণের এটাই বোধহয় প্রথম নমুনা বা নিদর্শন।

অওধের শেষ শাসক ওয়াজিদ আলী শাহ তাঁর দরবারের খেতাব-ধারী সদস্যদের জন্যে আবিষ্কার করেছিলেন একটা নতুন ও আজব ধরণের টুপি—প্লেন 'অতলস' কাপড়ের, কখনওবা এমব্রয়ডারী কাজকরা, এবং কাগজের পট্টি দিয়ে তৈরি একটা গোল ঘের ; ঘেরটা মাথার ওপর অনেকটা উঁচু হয়ে থাকত ; 'তনযেব', বা 'গ্রান্ট্' কাপড়ের একটা বড়ো জালী বানিয়ে তার ওপর জুড়ে দেওয়া হত ; পরলে, জালীটা মাথার পেছনদিকে ঘাড় পর্যন্ত লুটিয়ে পড়ে থাকত। এই দরবারী টুপির নাম বাদশাহ রেখেছিলেন 'আলম পসন্দ'। লোকেরা বলত 'ঝূলা'। আসলে এটা এতো এমন অপ্রিয় ও অপছন্দ ছিল, যে, ওয়াজিদ আলী শাহ জীবিত থাকতেই, যাদের এটা দেওয়া হয়েছিল, তাদের মাথাতেও বিরাজ করতে দেখা যেত না। তাঁর পরে তো উঠেই গেল ; আজকালকার কেউ বোধহয় দেখেও নি।

গদরের পর লখনউয়ের শিরোভূষণের জগতে হঠাৎ একটা 'ইনকলাব' (বিপ্লব) এল। কিছুদিন পর্যন্ত তো চ্যগোশিয়া, দুপলড়ী ও মিনদীল বা পাগড়ী ছাড়া মাথায় আর কোন ভূষণই ছিল না। তার পরে হঠাৎই চ্যগোশিয়ার রেওয়াজ কমতে আরম্ভ করল। কমতে কমতে এখন এর কদর মাত্র কয়েকটি প্রাচীন ফ্যাশানপন্থী মাথাতেই এসে ঠেকেছে। যেসব মাথা থেকে 'চ্যগোশিয়া টোপী' সরে গেল, সে জায়গা নিল 'দুপলড়ী টোপী'। কিছু লোক তাতেও নবীনতা সঞ্চার করল। কিছুদিন চলল মীরাটে তৈরি মিনদীলের মতো টুপি। তারপর ইংরেজদের 'নাইট ক্যাপ' অথবা কাশ্মীরী আলপাকার তৈরি লম্বাটে, গোলমতো 'চাঁদওএদার টোপী'। পরে এরই গড়নের অনুরূপ 'গ্রান্ট্' বা সাটিনের পাতলা-পাতলা টুপি ; ছোট হতে হতে এও পৌঁছে গেল দুপলড়ীর কাছাকাছি। অতঃপর শুরু হল ইংরেজী

পর্বের ফ্যাশান ; বেশভূষার সঙ্গে মেলে, এমন নতুন ধরণের শিরো-ভূষণের সন্ধান চলল। কিছু বৃদ্ধ তো চোখ বুজে, বিনা দ্বিধায় 'হ্যাট' অর্থাৎ ইংরেজী নাইটক্যাপ পরিধান শুরু করে দিল !

এলো 'তুর্কী টোপী'র পর্বাঙ্গ। স্যর সৈয়দ আহমদ খাঁ এটি পরতেন। মুসলমান ভদ্রজনের জন্যে একে মেলানো হয়েছিল কোট-প্যাণ্টের সঙ্গে। একারণে, প্রথম-প্রথম একে খুব ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হত। এবং এর নাম দেওয়া হয়েছিল : 'নেচরিয়োঁ কী টোপী'[1] বা 'ভৌতিক-বাদী টুপি'। কাগজে-কাগজে বর্ষিত হতে লাগল বিদ্রূপ। কিন্তু স্যর সৈয়দের দৃঢ়তা একে প্রচলিত করে তবে ছাড়ল। তাঁর জীবিত-কালেই সংখ্যাহীন ব্যক্তি এই টুপি গ্রহণ করে। লখনউয়েও এসে পৌঁছয়। এখানেও বিরোধিতা কম ছিল না ; তবু অনেকে পরতে আরম্ভ করে দিল। ভেতরে-ভেতরে অন্যরাও এর দিকে ঝুঁকতে লাগল। আজ সারা হিন্দুস্তানের বেশির ভাগ শিক্ষিত ও সভ্য মুসলমান এই টুপি ব্যবহার করে।

হিন্দুস্তানের অন্যান্য শহরের তুলনায় প্রতিষ্ঠাবান, সুশিক্ষিত ও শিষ্ট শীয়ার সংখ্যা লখনউয়েই বেশি। সব ব্যাপারেই সুন্নীদের থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখব, এমনকি আচার-ব্যবহারও ওদের থেকে ভিন্ন স্বতন্ত্র রাখব—এই বোধ এখানকার সুন্নীদের চেয়ে শীয়াদের মধ্যেই বেশি। এর সঙ্গে এটাও আছে—সুন্নীরা যেমন পশ্চিমী তুর্কীদের শাসনের পক্ষপাতী, শীয়ারা তেমনি 'কাচর' বংশের শাসনের সমর্থক ও তদনুগামী। সুতরাং লখনউয়ে যখন 'তুর্কী টোপী'র রেওয়াজ বাড়তে আরম্ভ করল, তখন ফ্যাশানূবল্ শীয়াদের খেয়াল হল : এতো তুর্কী টুপি ! তাঁরা তখন তুর্কী টুপির বদলে ইরানী দরবারের 'কুলাহে-পাপাখ' (কালো টুপি) নিজেদের জন্যে নির্বাচন করলেন। এই প্রবৃত্তি তার কাজ করে গেল। অবস্থা

[1] স্যর সৈয়দ আহমদ খাঁর ক্রান্তিকারী সংস্কারের বিরোধী মৌলবীরা তাঁকে অভিহিত করতেন 'দহরিয়া' (নাস্তিক), 'নেচরী' (ভৌতিকবাদী) ইত্যাদি নামে।

দাঁড়াল—যেসব মুসলমান পুরনো টুপি ছেড়ে নতুনের দিকে ঝোঁকে, তারা যদি সুন্নী হয় তো 'তুর্কী টুপি' পরে; যদি শীয়া হয় তো ইরানের 'পার্সিয়ান ক্যাপ' ব্যবহার করে। এই দুই দলের মধ্যে এমন-কিছু কল্পনাপ্রবণ, আশাবাদী লোক আছে, যারা মুসলমানদের এই আভ্যন্তরীণ মতভেদ দূর করতে চায়। এরা, সুন্নী হলেও ইরানী টুপি, শীয়া হয়েও তুর্কী টুপি পরিধান করে। তবে, এমন লোক খুবই সংখ্যালঘু। শীয়ার ইরানী টুপি, সুন্নীর তুর্কী টুপি—শহরের আধুনিক রুচিসম্পন্ন মুসলমানদের মধ্যে এটাই সাধারণ প্রথা দাঁড়িয়ে গেছে।

মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেকার এই মনোমালিন্য দেখে শিক্ষিত হিন্দুরা গোল মিন্‌দীলের মতো 'ফেল্‌ট্‌ ক্যাপ' ব্যবহার করতে লাগল। এ টুপি কিছু মুসলমানও পরে থাকে। তবে এটি হিন্দু ও ইংরেজ, এদেরই ফ্যাশানের অন্তর্গত। তাই ইংরেজরা এর নাম রাখল: 'বাবুজ্‌ ক্যাপ্‌'। এদিকে, সাধারণ লোক—হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, শীয়া হোক অথবা সুন্নী—'দুপলড়ী টোপী'ই পরিধান করে।

লখনউ-সোসাইটীর কাছে গদর-উত্তর জমানা, উপদ্রবের জমানা। আচার-ব্যবহার ও স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে লোকদের বেশভূষা ও চাল-চলনও বদলে যেতে লাগল। শিক্ষিত সমাজে এমন লোকের সংখ্যাই বেড়ে যেতে লাগল, যারা স্বকীয় জীবনযাপন পদ্ধতির সমতালে সনাতন বেশভূষাও নিঃশেষে ত্যাগ করল। না রইল তাদের পরিধানে পায়জামা, না দেহে আংগরাখা, না রইল পায়ে 'চঢ্যওআ জুতা', না মাথার ওপর টুপি বা পাগড়ী। মাত্র একটি লাফেই সাত সমুদ্র ডিঙ্গিয়ে তারা হিন্দুস্থান থেকে গিয়ে পড়ল 'ইংগলিস্তানে'—পরিধেয় হল কোট-প্যাণ্ট, বুট-হ্যাট। কিন্তু জনপদের অধিকাংশ লোক স্ব-স্ব প্রথাকেই বাঁচিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিল। এতদ্‌-সত্ত্বেও, তারা বুঝতে পারুক আর নাই পারুক, তাদেরও বেশভূষায় পরিবর্তন এল—আংগরাখার বদলে 'শেরোয়ানী' হয়ে গেল সর্ব-সাধারণ পরিধের। তবে মাথার জন্যে এমন কোন ভূষণ আজ

পর্যন্তও নির্বাচিত-নির্ধারিত হতে পারে নি, যা সকলেই নিঃসংকোচে গ্রহণ করতে পারে।

এই ঝগড়া-বিবাদ ও রদবদলের সময় লখনউয়ে নানাবিধ টুপির জন্ম হয়েছিল, যেগুলি, হয় এখানকারই আবিষ্কার অথবা অন্য কোন স্থান বা জাতির কাছ থেকে গৃহীত। এদের মধ্যে যেগুলি কিছুদিনও টিঁকে থাকতে পেরেছিল, লখনউ-রুচি তাদের বিবিধ পরিবর্তনও ঘটিয়েছিল। কিন্তু ধীরে-ধীরে এও শেষ হয়ে গেল। সব জিনিসই যতদূর সম্ভব, নরম-সূক্ষ্ম-চোস্ত, 'নাযুক-নফীশ-চুস্‌ত্‌', ছোট হাল্‌কা মোলাম হবে—এ-ই হল লখনউবাসীদের স্বাভাবিক বৃত্তি। এই বৃত্তিরই একমেব নির্দেশে এরা যাবতীয় রীতি-পদ্ধতি ও বেশভূষার পরিবর্তন সাধন করেছিল। ফলত, অধিকাংশ টুপিকেও এইভাবে বদলে দেওয়া হয়েছিল। পারেনি শুধু তুর্কী ও ইরানী টুপি এবং হ্যাটের আকারে-প্রকারে। তার কারণ, এসব টুপি তৈরি করে অন্যরা, এবং আসে বাইরে থেকে। তাই কোন পরিবর্তন হতে পারে নি। আর তা হয়নি বলেই, আমার ধারণা, এর একটাও এখানকার লোকায়ত জন-ভূষণ হতে পারবে না। যদিও এদের প্রচলন প্রচুর, তবু এরা লখনউ-রুচি থেকে একেবারে অন্য জাতের। এই কারণেই, স্থানীয় দর্জিরা টুপির সমস্যা নিয়ে আজও মাথা ঘামাচ্ছে।

॥ 32 ॥

যদিও হিন্দুস্তানে, এবং বিশেষ ক'রে লখনউয়ে শিরোভূষণ হচ্ছে টুপি, তবু তা থেকে এটা যেন মনে না হয়, যে, এখানকার সৌন্দর্যপ্রিয় ব্যক্তিরা পাগড়ীকে বিদায় দিয়েছে। দরবারে তো পাগড়ীরই ব্যবহার বেশি ছিল। অবশ্য, দিল্লীর সেই বহুসম্মানিত 'সামন্তী পাগড়ী' এখানে ছিল না, এবং আমীর ও শাহী বংশীয়দের মাথার ওপর শোভমান ছিল স্রেফ্‌ টুপিই। তবু শেষদিন পর্যন্তও, দরবারের জন্যে

পাগড়ী তো ছিলই ; এমনকি, চাকর-বাকর-কর্মচারীরাও যখন স্ব-স্ব মালিকের সামনে যেত, মাথায় পাগড়ী বেঁধেই যেত। এটাই ছিল প্রচলিত নিয়ম ; এবং আজও অনেকাংশে আছে।

নবাব সাদত আলী খাঁর সময় পর্যন্ত শাসকদের মাথায় ছিল পুরনো পাগড়ী। নবাব বুরহান-উল-মুলক, নবাব শুজাউদ্দৌলা, এবং নবাব আসফউদ্দৌলার শিরোপরি স্থিত ছিল দিল্লীর সরকারী 'ওহ্‌দেদার' (কর্মচারী)দের মতো পাগড়ী। দরবার-কালে, তার ওপর থাকত হীরের 'কল্‌গী'[1], এবং সুসজ্জিত 'জীগা'[2]। পাগড়ী শাদাই হত। নবাব সাদত আলী খাঁর মাথায় এক নতুন ধরণের পাগড়ী দেখা যেতে লাগল, যাকে লখনউবাসীদের ভাষায় বলে 'শমলা' (শামলা)। এটা তৈরি হত এইভাবে—'স্টাফিং' তথা ভরাট-অংশ, ভেতরটা খালি ও খোলা ; তার চারদিকে, মাথার মাপে কাপড়ের একটা পাতলা ও চওড়া বর্ডার ; সূক্ষ্ম রেশম কিংবা 'শালী' কাপড়, পাতলা-পাতলা খুব লম্বা পল্‌তে বা দড়ির মতো বানিয়ে ও পাকিয়ে নিয়ে, কাপড়ের ওই ঘেরের ওপরে নীচে-ওপর জড়িয়ে টেঁকে দেওয়া হত ; ঘেরের ওপরের দিকে, ওইরকমই রেশমী বা 'শালী' কাপড়ের একটা চওড়া পট্টি জুড়ে দেওয়া হত, যাতে ঘেরটা নেমে না আসে। কিন্তু, এতে সব মাথাটা ঢাকা পড়ত না। তাই, এর তলায় একটা সাধারণ 'দুপলড়ী' বা 'চ্যগোশিয়া' টুপি পরতেই হত। এ হল লখনউয়ের আসল শামলা, যা সাদত আলী খাঁ প্রথমে পরেছিলেন। এর উৎস বোধ হয় মধ্যভারতের হিন্দু-মুসলমান দরবারের সেই পাগড়ী—যা তৈরি হত সূক্ষ্ম রঙীন কাপড় দিয়ে শত শত গজের পল্‌তে তৈরি করে এবং সেই পল্‌তে বিশেষ ক্রমে জড়িয়ে-জড়িয়ে। এ পাগড়ী নবাব সাদত আলী খাঁ শুধু যে নিজেই পরতেন তা নয়, দরবারের প্রতিষ্ঠাবান সদস্য ও উজীরদেরও পরিয়েছিলেন।

গাজীউদ্দীন হায়দারকে বাদশাহ বানিয়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে

---

[1] পাগড়ীর অলংকার। [2] এটিও পাগড়ীর অলংকার—জরির কাজকরা ভেল্‌ভেটের ওপর মণিমানিক্য খচিত সোনার পাত লাগানো।

'তাজ' পরার সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু এ তাজ হিন্দুস্তান বা এশিয়ার শাহী তাজ নয়। য়োরোপেরই এক ধরণের তাজ। সেইদিন থেকে অওধের শাসকরা শামলা এবং 'দস্তার' (পাগড়ী) চিরতরে পরিত্যাগ করলেন। তাঁদের দেখাদেখি যতো শাহজাদা এবং শহরের প্রতিষ্ঠাবান লোকেরাও পাগড়ীকে বিদায় দিল। বিশেষ বিশেষ অবকাশে শাহজাদা তাজ পরত; অন্য সময়—জাঁকজমকপূর্ণ কাজ করা সূচ্যগ্র টুপি। শহরের অন্যান্য মানী লোকেরাও তাদের অনুকরণ করত। কিন্তু রাজ্যের যতো উজীর, কর্মচারী, সকলের ওপর হুকুম ছিল: শামলা পরে সুলতান ও উজীরদের (অর্থাৎ স্ব-স্ব প্রভুদের) দরবারে তাদের আসতে হবে। গাজীউদ্দীন হায়দারের সময় থেকে আমজাদ আলী শাহর শাসনকাল পর্যন্ত সমস্ত কর্মচারীর মাথায় থাকত সেই শামলা, যার শাব্দিক চিত্র আমি পাঠকদের দেখিয়েছি। যখন ওয়াজিদ আলী শাহ তাঁর দরবারের জন্যে খাস টুপি 'আলম পসন্দ' ('ঝূলা') আবিষ্কার করলেন, তখন দরবারের সঙ্গে যাদের অধিক ঘনিষ্ঠতা হত, এবং 'দৌলা' খেতাব মিলত, তাদের 'আলম পসন্দ'ও প্রদান করা হত। এটা নিয়মেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এদের পরবর্তী স্তরের লোক যারা দরবার পর্যন্ত পৌঁছতে পারত এবং কোন 'মহকূমা'র (বিভাগের) ভারপ্রাপ্ত 'দারোগা' হত, দারোগা খেতাবের সঙ্গে তাদের দেওয়া হত শামলা। এরা সেই পুরনো শামলা পরেই হাজির হত, যা প্রথমে নবাব সাদত আলী খাঁর মাথায় লোক দেখেছিল। বাকি সমস্ত লোকেদের ওপর হুকুম ছিল: যেকোন ধরণের পাগড়ী পরে দরবারে আসতে হবে, এবং পাগড়ী না হলে টুপি খুলতে হবে। কর্মচারীদের যে শামলার বর্ণনা আমি করেছি, সেই ধরণের শামলা সম্ভবত মুর্শিদাবাদের দরবারেও ছিল। এবং তারই প্রভাব আমি দেখেছি আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতা হাইকোর্টে—বাঙ্গালী উকিলদের পরিধানে ওইরকমই শামলা। সে শামলা অওধ দরবারের শামলার চেয়েও হালকা, এবং আমাদের দৃষ্টিতে একটু ওঁচা!

'ওহদেদার'-গোষ্ঠী তথা কর্মচারী-সম্প্রদায় ছাড়া আর সমস্ত শৌখীন

লোক এবং শহরের প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ পাগড়ীকে ত্যাগ করেছে। শরীফদের মধ্যে ব্রোকেডের কাজকরা শামলার রেওয়াজ অবশ্য আজও আছে। তবু, আজও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাহকালে বরের মাথার ওপর পাগড়ী বিরাজমান হয়। অর্থাৎ দরবারের এবং জনগণের হৃদয়ে পাগড়ীর সম্মান যে স্থায়ী হয়েছিল এবং এখনও আছে, এর চেয়ে তার বড়ো প্রমাণ আর কী হতে পারে!

এখানকার দরবার বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্যে ওপরে বর্ণিত পাগড়ী ছাড়া আলাদা-আলাদা ঢঙের পাগড়ীও নির্ধারিত করে দিয়েছিল। মুহুরীদের জন্যে ছিল পূর্বোল্লিখিত শামলার মতো শাদা মল্‌মলের পাগড়ী। দরবারের 'হরকার' এবং 'চোবদার'রাও এই গড়নের পাগড়ী পরত। (এরা পাগড়ী বাঁধত না, টুপির মতো পরত)। হরকারদের পাগড়ী হত লাল, চোবদারদের পাগড়ী দুগ্ধফেননিভ শাদা, সামনে, ডানদিকে 'মুক্যাশ'[1]-এর একটা ফুলও টেঁকে দেওয়া হত। হরকারদের পাগড়ীর সঙ্গে মিল ছিল কাহারদের পাগড়ীর। এদের পাগড়ীতে, ডানদিকে, ধারে রূপোর মাছ আটকে দেওয়া হত। পরণে থাকত লাল 'বানাত'[2]-এর ঢিলেঢালা চোগা।

এছাড়া তামাম ফৌজ এবং প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গের সেবকদের মধ্যেও পাগড়ীর রেওয়াজ ছিল; যে যার নিজের মতো আলাদা-আলাদা।

সর্বাধিক আদর-সম্মান ছিল বিদ্বানদের পাগড়ীর। পাগড়ীর কথা বলতে-বলতে এই সুযোগে স্থানীয় বিদ্বানদের বর্ণনা দেওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে। লখনউয়ে দুই সম্প্রদায়ের বিদ্বান আছেন; এক, সুন্নীদের 'উলেমা'; দুই, শীয়াদের 'মুজ্‌তহিদ'। উভয়ের আচার-ব্যবহার বিভিন্ন। সুন্নীদের দৃষ্টিতে, আরবীদের বেশভূষাতেই ধার্মিক পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠতা; শীয়াদের দৃষ্টিতে, তার অবস্থান ফারসী পণ্ডিতদের পোষাকে। এবং এই রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারেই দুই সম্প্রদায়ের বিদ্বানদের বেশভূষা গড়ে উঠেছে।

---

[1] সোনা-রূপোর চওড়া তার। [2] এক ধরণের মোটা উলের কাপড়।

"আঁহযরত সল্লম" (হযরত মুহম্মদ সাহেব)-এর সময়ে আরবদের পাগড়ী ছিল—মাথার ওপর একটা ছোট্টমতো কাপড় জড়িয়ে নেওয়া। ব্যস্, এইটুকু। না কোন ফ্যাশান, না কোন কাটছাঁট। আব্বাসী খলিফাদের সময়ে যখন ইরাক হল খিলাফতের কেন্দ্র, তখন আরবের নেতা ও প্রতিষ্ঠাবান লোকেদের মধ্যে ইরানী ও সাসানী পোষাকের চল হল। বস্তুত, খিলাফতের সময়ে আরবের বিদ্বান ব্যক্তিগণ যেসব বড়-বড় জাঁকালো পাগড়ী ও 'ত্যলিসান'[1] ইত্যাদি ব্যবহার করতেন, তাদের আরবী বেশভূষা বলা খুবই মুশকিল। হিন্দুস্তানের সুন্নী 'উলেমা' অনেক আগেই আরবী পোষাক ছেড়ে দিল্লীর দরবারী চলন গ্রহণ করেছিলেন এবং তদবধি এমন নিষ্ঠার সঙ্গে এই বেশভূষা ব্যবহার করে এসেছেন, যে হিন্দুস্তানের সবাই ছেড়ে দিলেও এঁরা এখনও একেই আপন করে রেখেছেন।

সুতরাং 'ফিরংগীমহলে'র উলেমাদের অদ্যাবধি বেশভূষা হল: শিরোপরি একটা সোজা গোল 'অমামা'—কপালের ওপর মেহরাবের মতো আকৃতি-দানের বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই যার গড়ণে; দেহে বিগত যুগের জামা—যা আজ সব জায়গায় স্বপ্ন হয়ে গেছে; পরিধানে পায়ের গাঁট থেকে উচু, চওড়া ঢিলে পায়জামা, কণ্ঠলগ্ন একটা পাতলা দুপট্টা। এই পোষাক পরেই আমাদের 'ফিরংগী মহলের' দু-একজন বৃদ্ধ আজও জুমার নমাজ পড়াতে আসেন। ঘরে পরিধান করেন: মামুলী, সরল দুপলড়ী বা চ্যগোশিয়া টুপি, আংগরাখা বা লম্বা কুর্তা (মাঝখানে 'গরীবানের চাক'[2]) এবং ঢিলে পায়জামা। সম্প্রতি 'ফিরংগীমহলের' উলেমারা এই বেশ পরিত্যাগ করে কাবার উলেমা এবং মিসর ও সিরিয়ার নেতাদের বেশভূষা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছেন। মৌলানা শিবলী নোমানীও এই পোষাককে জনগণ ও সরকারী দরবারীদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এই বৃদ্ধদের পায়ে জুতোও তখন শক্ত ছিল। আর এখন তো 'যেরুপাইয়া' (স্লিপার)

[1] ব্যাখ্যান দেবার সময় ব্যাখ্যানদাতা যে চাদর বা দুপাট্টা কাঁধের ওপর রাখেন। [2] গোল কলার।

কিংবা লখনউ বা দিল্লীর 'চড়্যওআঁ' জুতোই পদলগ্ন।

শীয়া উলেমাদের পোষাক একেবারে স্বতন্ত্র। এঁরা প্রথমে মাথায় পরতেন 'দুপলড়ী'। তবে সাধারণ লোকের উলটো; অর্থাৎ এর সেলাই সামনে থেকে পেছনে না হয়ে, 'আড়ী' তথা এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত হত; তার ওপর অনেকখানি উঁচু কূঁজের মতো 'অমামা'—ইরানী পাগড়ীর গঠনের সঙ্গে এর মিল আছে। দেহে লম্বা 'কুর্তা'—যার 'গরীবানের চাক' বুকের মাঝখানে না হয়ে বাঁ-কাঁধের পাশে থাকে। প্রাচীনকালে শীয়া উলেমাদের কুর্তায় গরীবানের স্থান ছিল দুই কাঁধের ওপর; এখন পরিত্যক্ত। যে-উলেমা ইরান ও কারবালা হয়ে এসেছেন, তিনি কুর্তার ওপর আগেকার 'ত্যলিসান' পরেন—এখানে যাকে বলে 'কবা'; পায়ে ঢিলে পায়জামা; এবং 'জুতী'[1]। এর কথা বলব জুতো প্রসঙ্গে।

॥ 33 ॥

মাথার এবং দেহের মধ্য-ভাগের পরিধেয়ের পূর্ণ বিবরণ আমি দিয়েছি। এবার আসছি শরীরের নিম্নাঞ্চলের দিকে। তারপর অন্য অতিরিক্ত বেশ ও বিভিন্ন দলের বিশেষ-বিশেষ বেশভূষার উল্লেখ করব। একেবারে শেষে স্ত্রীলোকদের বেশবাস-প্রসঙ্গ।

দেহের নিম্নাংশের জন্যে আরবে 'তহমত' (লুংগি) ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। আরবী 'তহমত' ও হিন্দুদের ধুতি, দুটোই সেলাই-না-করা পাতলা চাদর। পার্থক্যের মধ্যে—'তহমত' স্রেফ কোমরে জড়িয়ে আটকে রাখা যায়, এবং ধুতি—হিন্দুস্তানের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধুতি পরার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি। এর একটা প্রান্ত নীচে থেকে ফেরতা দিয়ে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, অন্য প্রান্তটি কেউ কেউ কোমরে জড়িয়ে নেয়। পরবর্তীকালে আরবী তহমতের উন্নতি হল—দুই প্রান্ত সেলাই করে একটা ঘের বানিয়ে নেওয়া হল; তার মধ্যে

[1] ছোট জুতো; নাগরা।

দুই পা ঢুকিয়ে কোমরে কষে বেঁধে নিতে হয়।

ইসলামের আবির্ভাবের সময় এবং তারও আগে বহুবছর ধরে, নিম্নভাগের জন্যে আরবদের এইই ছিল জাতীয় পরিচ্ছদ। বাদশাহ, উজীর, আমীর, গরীব সকলেরই পরণে 'তহমত'। তফাৎ শুধু এইটুকু: আরবের আমীর ও বড়ো বড়ো লোকদের 'তহমত' পা ঢেকে মাটি ছুঁয়ে থাকত, মাথা বা খুঁট দুটো মাটিতে লুটিয়ে রগড়ে রগড়ে চলত। এটা ছিল ওদের গর্ব ও দম্ভের প্রকাশ। দম্ভের এই গন্ধ ছিল বলেই, যে ব্যক্তি এইভাবে 'তহমত' পরে বেরোত সে অপরকে আপনার সামনে হেয় ও ঘৃণিত মনে করত বলে, ইসলাম এই পোষাককে নিষিদ্ধ করে দিল, সেইসঙ্গে নির্দেশ দিল; 'ইজার' (তহমত) পায়ের গাঁটের নীচে যেন না আসে। এই নির্দেশের ভিত্তিতে উলেমারা সম্প্রতি এই ফতোয়া দিয়ে রেখেছেন যে, পায়জামা তথা নিম্নভাগের কোন পোষাকই যেন পায়ের গাঁটের নীচে না আসে। অথচ, সেযুগে "পায়জামা" ছিলই না! ফলত এটি এই নির্দেশের আওতায় পড়ে না। তার অন্যতম কারণঃ বড় এবং মাটিতে লুটিয়ে-যাওয়া 'ইজার' পরে আরব আমীরদের মধ্যে অহংকারের যে ভাব জেগে উঠত, হিন্দুস্তানের ঝুল-পায়জামা পরিহিত ব্যক্তিদের মধ্যে তার পুনর্জাগরণ হতেই পারে না।

হযরত মুহম্মদ সাহেবের সময়েই অন্য দেশ থেকে পায়জামা আরবে পৌঁছে যায়, এবং পরবর্তীকালে বাগদাদী দরবারের ও প্রবাসী আরবদের জাতীয় পরিচ্ছদ হয়ে যায়। মুসলমান আসার আগে হিন্দুস্তানে ধুতি ছিল, পায়জামা ছিল না। মুসলমান বিজেতারা এটিকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। এদের মধ্যে এমন কয়েকজন সংযমী, ভক্ত, ধার্মিক নেতা ছিলেন, যাঁরা হযরত মুহম্মদ সাহেবের আদেশ পালন করতেন এবং 'তহমত' পরেই এই মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন। 'তহমত' ছিল 'সুন্নত',[1] তাই বিশুদ্ধ ধর্মীয় বেশ; এবং নিঃস্বার্থ ও ধর্মপরায়ণ মুসলমান, এবং বিদ্যার্থীদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল।

---

[1] হযরত মুহম্মদ এবং তাঁর সঙ্গীদের কর্মের পদ্ধতি।

কিন্তু এখানকার সমাজে পায়জামার এমন চল হল, মুসলমান তো বটেই, হিন্দু এবং অন্যান্য জাতিদের মধ্যেও এর রেওয়াজ হয়ে গেল।

এখন দেখা দরকার—মুসলমানদের আদি ও অকৃত্রিম পায়জামার কাট-ছাঁট কেমন ছিল। সম্ভবত ছোট মুহুরীর 'উটংগা'[1] পায়জামা, যাকে 'শরঈ পায়জামা' বলা হত। এর প্রচলন সুন্নীদের মধ্যে। এটিই মুসলমানদের প্রথম পায়জামা। বাগদাদে এটাই প্রচলিত ছিল। এরই প্রচলন হয় ইরানে, তুর্কিস্তানে। এবং এই পায়জামা পরেই মুসলমানরা আসে হিন্দুস্তানে।

হিন্দুস্তানে, শেষ পর্বে এর কাট-এর অনেক পরিবর্তন হয়, যার ফল: পায়ের প্রান্তিক মুহুরী দেহের সঙ্গে লেপটে থাকত। কিন্তু ওপরের ঘের হত পুরনো শরঈ' পায়জামার ঘেরের কাছাকাছি। কিছুদিন পরে এই মুহুরী কিছুটা লম্বা হয়ে নীচে নেমে গেল; তবে গাঁট পেরিয়ে গেলনা। দিল্লীর শেষ দিন পর্যন্ত এবং সারা হিন্দুস্তানে মুসলমানদের এই পায়জামাই ছিল। হিন্দুদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে নিম্নবর্গের মুসলমানরা ধুতি পরত, এবং প্রতিষ্ঠাবান হিন্দুরা, ইচ্ছে করলে, ঘরে ধুতি পরত। কিন্তু শিষ্টমণ্ডলীতে আসার সময় পায়জামা পরেই আসত।

তখনকার দিনে কাবুল ও কান্দাহারে দুই ভিন্ন প্রকারের পায়জামা প্রচলিত ছিল। কাবুলীদের পায়জামার নিম্নপ্রান্ত মুহুরীর কাছে টান্‌টান্‌, এবং ওপরে ঘেরের কাছে এতো ঢিলে হত যে দেহের নিম্নাংশ গায়েব হয়ে যেত একটা বড়ো ঝুল্‌দার বেলুনের মধ্যে। এক-একটা পায়জামার জন্যে এক থান, দুথান কাপড় লাগত। আফগানদের আজও এই পায়জামা পরতে দেখা যায়। কান্দাহার-বাসীদের পায়জামা ছিল এর বিপরীত—ওপরের ঘের তো বেশি হতই না; কিন্তু দুই পা বা 'পাঁয়চা' কলী বা বর্ডার জুড়ে-জুড়ে এতো বড়ো ও এতো ঘেরের করে নেওয়া হত যে, ঘুরিয়ে না নিলে, বা হাত দিয়ে না সামলালে, চলাই দুষ্কর হত!

---

[1] বিশদৃশ ছাঁটের।

দিল্লীর দরবারে কান্দাহারীরা আসত ভারী-ভারী সংখ্যায়। চাকরি নিত সেনাবাহিনীতে। এরা খুব বীর বলে গণ্য হত। তাই এখানকার সেনাবাহিনীতে এদের আচার-আচরণ, চালচলন, বেশভূষা, অনুকৃত হতে লাগল। দিল্লীর 'বাঁকা'রাও[1] পরতে লাগল বড়ো-বড়ো কলী দেওয়া পাঁয়চার পায়জামা—এটা ওদেরই অবদান ও সান্নিধ্যের ফল। দিল্লীর শেষ পর্বে, বাহাদুরী এবং সাজগোজ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল। দলে-দলে শরীফজাদা গিয়ে ভিড়ল এইসব 'বাঁকা'দের দলে, ওদের ফ্যাশান গ্রহণ করল। যারা স্বরীতিতেই স্থিত রইল এবং যারা বাঁকা বনে গেল, দুদলের শরীফই লখনউয়ে এসেছিল।

লখনউয়ে এসে হঠাৎ একটা ঢিলে 'পাঁয়চা'র[2] পাজামা জন্ম নিল। সুজাউদ্দৌলা, আসফউদ্দৌলা এবং সাদত আলী খাঁর সময় পর্যন্ত এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মনে হয়, গাজীউদ্দীন হায়দার অথবা তাঁর পুত্র নাসীরউদ্দীন হায়দারের সময়ে—যখন এখানকার বেশভূষায় আচারব্যবহারে পরিবর্তন চলছিল—'ফ্যাশানৃব্ল্' কলীদার পায়জামাকে ছোট করে এই পায়জামা প্রস্তুত করা হয়। এই পায়জামা এতো ঢিলে নয় যে এক-এক থান খরচ হয়ে যাবে ; আবার তেমন টানৃটানৃও নয়, কিংবা চুস্ত্-মুহুরী পুরনো পায়জামার মতো এতো টাইট নয় যে 'পাঁয়চা' ওপরে ওঠানোই অসম্ভব। এই নয়া পায়জামা হাল্কা-ফুল্কা, হিন্দুস্তানের গরমে খুবই আরামদায়ক। স্বল্পদিনেই আমীর ও সভ্য লোকেদের মধ্যে এটি অত্যন্ত লোকপ্রিয় হয়ে গেল। 'বাঁকপন' (ফ্যাশান) দেখানোর বাতিক যাদের, তারা ছাড়া, তাবৎ সংযমী, বিদ্বান, সদাচারী এবং কুলীন ও সামন্তদের পোষাক-পরিচ্ছদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই পায়জামা।

লখনউয়ে তখন দুরকম পায়জামা : এক তো ফ্যাশানদুরস্তদের 'কলীদার পায়জামা' ; আর, শিষ্ট ব্যক্তিদের চওড়া 'পাঁয়চার পায়জামা'। সভ্য, শিক্ষিত লোকেরাও 'গুলবদন'[3] ও 'মশরূঅ'[4]

[1] বীর, বাহাদুর, বিলাসী, চালিয়াৎ। [2] পাজামার পা।
[3] ডোরাকাটা রেশমী বস্ত্র। [4] ডোরাকাটা সূতীবস্ত্র।

সেলাই করিয়ে নিত, পাঁয়চায় লাগাত চওড়া বর্ডার বা ফিতে। নাসীরউদ্দীন হায়দারের বেশভূষার অন্তর্গত ছিল প্রথমটি অর্থাৎ ফ্যাশনওয়ালা পায়জামা। ইংরেজী পোষাকের শখও তাঁর ছিল; কোট প্যাণ্টও পরতেন। আর, 'কলীদার পায়জামা', পাঞ্জাবীরা আজকাল যাকে বলে 'গরারেদার পায়জামা', নাসীরউদ্দীন হায়দারের এতো প্রিয় ছিল, যে, ইংরেজদের গাউনের মতো করে তিনি মহলের বেগমদের এটি পরাতে আরম্ভ করলেন। মহলের বেশভূষার শামিল হয়ে যাবার ফলে এর প্রভাব পড়ল শহরের রমণী-সমাজেও; তারাও এটি পরিধান করতে লাগল। এর কথা বলব রমণীয় বেশভূষা-প্রসঙ্গে।

শাহী শাসনকালেই অওধের সেনা পাঞ্জাব-বিজয়ে গিয়েছিল ইংরেজের সঙ্গে, এবং শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। শিখেরা পরত কোণাকুণি, তের্‌ছাকাট-এর 'তংগ্'[1] ও 'চুস্ত'[2] পায়জামা, যার নাম ছিল 'ঘুটন্না'। পাঞ্জাবে যারা গিয়েছিল, তাদের অনেকেরই পছন্দ হয়ে গেল এই তেরছাকাট; ঘরে ফিরে 'ঘুটন্না' পরতে লাগল। স্থানীয় অনেকেরও ভালো লাগল। হঠাৎ এর রেওয়াজ বেড়ে গেল—লখনউয়ের তাবৎ শৌখীন ও আমীরজাদা পরতে লাগল 'ঘুটন্না'—খুব টাইট, চুস্‌ত্, পায়ের গাঁটের ওপরে স্থিত প্লেটে একাধিক 'চুড়ী'।

লখনউয়ে যখন এই তিন পায়জামার চলন, ইংরেজী শাসন চালু হল। পুরুষদের বড়ো ঘেরের পা-ওলা, ফল্‌স্-লাগানো পায়জামার যুগ শেষ হয়ে গেল বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে সঙ্গে। এর যে নিদর্শন এখনও অবশিষ্ট, তা রইল মহিলামহলে, এবং সেও নাসীরউদ্দীন হায়দারের কৃপায়। পুরুষমহলে তখন দুই ঘরানার পায়জামা—ঢিলে পায়জামা এবং টান্‌টান্ ঘুটন্না। অবশ্য সুন্নী ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন পুরনো 'শরঈ' পায়জামাই পরতেন। ইংরেজী যুগের প্রথম প্রভাব

[1], [2] টাইট, সংকীর্ণ

এই হল : পায়জামার কাটছাঁট যথাযথই থেকে গেল, পুরুষসমাজ থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিল 'অতলস, গুলবদন, মশরু' বা রঙীন সুতীর পায়জামা। অতঃপর আলীগড় কলেজের সোস্যাল স্কুল থেকে ইংরেজী প্যান্টের নকলে এক পায়জামা আবিষ্কৃত হল—না এতো টাইট যে দেহের সঙ্গে চিপ্‌টে থাকে, না এতো ঢিলে যে পায়া ওপর পর্যন্ত চড়িয়ে নেওয়া যায়। ইংরেজী-শিক্ষিত এবং হিন্দুস্তানের অধিকাংশ শরীফজাদাদের মধ্যে এই পায়জামার ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। একদিকে যখন আধুনিক সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি নিজেদের সব বেশভূষা পরিত্যাগ করে কোট-প্যাণ্ট পরিধান করছে, অন্যদিকে তখন লখনউয়ের এমন কয়েকজন বনেদী লোকও চোখে পড়ে, যারা পুরনো ঢঙের ঢিলে পায়জামাই পরে, যারা স্বকীয় প্রথাকে ত্যাগ করেনি।

॥ 34 ॥

সেকালে, আংগরাখা, চাপকান ইত্যাদির ওপর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'দোশালা' থাকত। শাহী দরবার থেকে খেলাত পাওয়া যেত এই দোশালাই। এর সঙ্গে, শাহী 'রুমাল-ওড়না'-র রেওয়াজও কিছুদিন ছিল। দুটি জিনিসই লখনউয়ে আসে দিল্লী থেকে। এখানে প্রিয়তর হয় 'রুমাল-ওড়না'। শীতে সচরাচর 'শালী' রুমাল ব্যবহৃত হত ; বেশি ঠাণ্ডায় দোশালা। লখনউয়ে দরবার কায়েম হবার পর গরমের জন্যে যখন হাল্‌কা, আরামদায়ক, স্বচ্ছ পোষাকের প্রয়োজন অনুভূত হল, আবিষ্কৃত হল 'বাবরনেট' ও 'লিংকন'-এর রুমাল। 'সফেদপোশ'[1] শরিফের পোষাক তখন : মাথায় 'কালিব'[2]-এর ওপর চড়ানো চিকনের 'চ্যগোশিয়া টোপী', দেহে আঁংগরাখা, নিম্নাংশে

[1] পরিচ্ছন্ন, ধব্‌ধবে শাদা পোষাকের পক্ষপাতী। [2] কাঠের ধাঁচা।

চওড়া 'পাঁয়চা'র পায়জামা, কাঁধের ওপর হালকা চিকন বা জালীর রুমাল। লখনউয়ের শরিফদের এইই ছিল প্রথম ও সর্বসাধারণ বেশভূষা। এই পোষাককেই 'মীর' অনীসের বংশধররা আজও ব্যবহার করেন সৌজন্য-প্রদর্শনের ক্ষেত্রে।

বেশভূষার শেষতম এবং অন্যতম প্রধান পদ: পাদুকা, 'জুতা'। মুসলমানদের আসার আগে হিন্দুস্তানে জুতোর ব্যবহার একেবারেই ছিল না। তার কারণ, ধর্মীয় দৃষ্টিতে হিন্দুদের চামড়ার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। জুতোর বদলে তারা ব্যবহার করত কাঠের খড়ম। প্রাচীন রাজারাও এই পাদুকা ব্যবহার করতেন; আজকাল করেন ঋষি-ফকিররা।

মুসলমানরা সেলাই-করা কাপড়ের সঙ্গে এই চামড়ার জুতোও সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসে।

আরবী মুসলমানদের আদিম জুতো ছিল: চামড়ার একটা তলা, পট্টি বা অন্য কোন বাঁধন দিয়ে পায়ের সঙ্গে আটকে নেওয়া। ইরান ও রোমের চামড়ার মোজা আরবে পৌঁছেছিল জুতোরও আগে। সিরিয়া, ইরাক, তারপর রোমের ছত্রছায়ায় আরব দরবার যখন স্থাপিত হল, তখন চল হল চামড়ার জুতোর। আদ্যিকালের এই জুতো খুবই সাদাসিধে ছিল। এই পরেই মুসলমানরা হিন্দুস্তানে এসেছিল।

ছবিতে দেখা যায়: প্রাচীনকালে দিল্লীর আমীর ও বাদশাহদের পায়ে উঁচু গোড়ালীর জুতো। আর, শেষ পর্বে, দিল্লীর আবিষ্কার 'চড়্যওআঁ জুতা'। প্রথম দিকে এর গড়ন এমন ছিল, যাতে আধা 'পাঞ্জা'[1] এবং গাঁটের নীচে পর্যন্ত পা তার মধ্যে ঢুকে যেত; চওড়া ছুঁচলো ডগা, তাকে বসানো হত পায়ের পাতার দিকে ঝুঁকিয়ে। এই হল প্রথম 'দিল্লীওয়ালা জুতা'। পঞ্চাশ বছর আগেও এর খুব চল ছিল। এর পরে এল 'সলীমশাহী (সেলিমশাহী) জুতা'— সম্ভবত জাহাঁগীরের সময়ে আবিষ্কৃত। এর ছুঁচলো ডগার মুখ

[1] পায়ের পাতা।

থাকত সামনের দিকে ঈষৎ উর্ধ্বমুখী, এবং তার সরু মাথা ওপরদিকে মুড়ে দেওয়া। আবির্ভাবের পর এর ওপর পড়ল 'কলাবতুন'[1]-এর সাচ্চা, দামী, মজবুত কাজ। 'দিল্লীওয়ালা' ও 'সলীমশাহী' (সেলিমশাহী), দুধরণের জুতোতেই জরির এই কাজ থাকত। কিন্তু ব্যবহার বেড়ে গেল সেলিমশাহীর। অচিরেই 'দিল্লীওয়ালা' জুতোর পরমায়ু শেষ হয়ে গেল। সেলিমশাহীর সবচেয়ে বড়ো গুণ হল: আজ যখন ইংরেজী ফ্যাশান আমাদের সমস্ত বেশভূষা, আমাদের সমস্ত কিছু হটিয়ে দিয়েছে, তখনও সেলিমশাহী বেঁচে আছে, জনপ্রিয়তম হয়েই বেঁচে আছে। লখনউয়ের অনেক লোক তো পরেই; হিন্দুস্তানের অধিকাংশ ফ্যাশানপসন্দী লোকও যখন ভারী ভারী পোষাক পরিধান করে, পদতলে শোভা পায় এই জুতো: সেলিমশাহী!

লখনউয়ে, শাহী পর্বে, এক নতুন গড়ণের ছোট ছুঁচলো-ডগাওয়ালা জুতোর আবিষ্কার হয়, যেটি এখানকার ফ্যাশানদুরস্ত লোকেরা প্রথম প্রথম খুবই পছন্দ করত। 'দিল্লীওয়ালা' ও 'সলিমশাহী'র ডগা যেখানে উর্ধ্বমুখী, এখানে তাকে সেলাই করে উল্‌টে অন্দরমুখী করে দেওয়া। শুধু, পাশে একটুখানি তোলা থাকত। এ জুতো বানানো হত লাল 'নরী'[2]-র এবং খুবই হাল্‌কা ও সুন্দর হত। সেকালীন-রুচি এই হাল্‌কাকেও এতো হাল্‌কা করে দিয়েছিল, যে, কোন কোন মুচির তৈরি একজোড়া জুতো ওজনে চার-পাঁচ পয়সার বেশি ভারী হত না! অন্যপক্ষে, জনগণ ও দেহাতীদের জন্যে এই গড়ণেরই মোটা চামড়ার জুতো তৈরি হত; সে-জুতো এতো ভারী, এক এক জোড়ার ওজন এক সের দেড় সেরের কম হত না, এবং তার পরেও সর্ষের তেল খাইয়ে খাইয়ে আরও ভারী করে নেওয়া হত!

এরপর এল এই ছোট ডগার জুতোকে সাজাবার পালা। প্রথমে, শীত-গ্রীষ্ম, শুষ্ক ঋতুর জন্যে 'কাশানী' মখমলের, এবং বর্ষার জন্যে

[1] জরির কাজ। [2] নরম চামড়া।

'কীমুখ্‌ত্‌'-এর জুতো তৈরি হতে লাগল। মোটা আলপাকা 'বানাত'-এর জুতো খুব সরল-সুন্দর-হালকা-উৎকৃষ্ট হত, সন্দেহ নেই। ঘোড়া বা গাধার চামড়াকে সবুজ করে নিয়ে হত 'কীমুখ্‌ত্‌'; তাতে কাঁঠালের কাঁটার মতো দানা বার করা হত। এবং আশ্চর্যের কথা: বর্ষার বৃষ্টিতে যতোই ভিজুক, এর রূপ-রংয়ে এতোটুকু চটা উঠত না। 'কীমুখ্‌ত্‌' তৈরির কায়দা-কৌশল যদিও বাইরে থেকেই এসেছিল, লখনউয়ে এর অনেক কারখানা খুলে গেল, এবং সর্বত্র ভালো ভালো জুতো তৈরি হতে লাগল।

কিছুদিন পরে জুতোর সাজসজ্জায় আরও উন্নতি ঘটল—সল্‌মা-চুম্‌কির কাজ, তাতে সোনালী-রূপোলী তারের ঝুম্‌কো। অপূর্ব তার চমক-দমক আর শোভা! এর পরে যখন ছোট সল্‌মা ও জরি এল, তখন বুটা-কাজকরা 'চড়্যাওআঁ' জুতো তৈরি হতে লাগল। যেহেতু এগুলি দামে সস্তা এবং আজব বাহারীও বটে।

'চড়্যাওআঁ'-র সঙ্গে এখানে 'ঘীত্‌লা জুতা'ও প্রচলিত ছিল। এটি তৈরি হয়েছে পুরনো কালের জুতো থেকে। বড়-বড় আমীর ও উচ্চবর্গের শরিফরাই এটি পরত। বস্তুত, 'ঘীত্‌লা'ই ছিল হিন্দুস্তানের পুরনো কৌমী জুতো। একে দেখা যেত প্রাচীন দরবারের সদস্য এবং অন্য বৃদ্ধদের পদতলে। এবং এরই স্মৃতিচিহ্ন হায়দরাবাদের 'চপ্‌পল' ও অন্যান্য জায়গার দিশি জুতো। ঘীত্‌লারও উন্নতি সাধিত হয়েছিল। অন্যত্র জুতোর ডগা ছোট ছোট; এখানে তাকে হাতীর শুঁড়ের মতো লম্বা করে ও ছড়িয়ে পায়ের পাতার ওপর একটা বড়ো ঘেরের আকারে লেপ্‌টে দেওয়া হল। অওধের বিগত দিনের বাদশাহ-উজীর-আমীর সকলের পায়েই এ জুতো শোভা পেত। 'চড়্যাওআঁ জূতা' এসে এর জায়গা নিতে লাগল। এইভাবে, 'গদর' আসতে আসতে পুরুষদের বেশভূষা থেকে ঘীত্‌লা একেবারে খারিজ হয়ে গেল। রয়ে গেল শুধু, যাদের এটি 'সাধারণ পাদুকা' ছিল সেই, রমণীকুলের শ্রীচরণেষু। তবে ঘীত্‌লা 'জুতী'[1] আজও রয়ে গেছে

---

[1] নাগরা।

তার আপন আসল রূপেই। এবং শীয়া ধর্মগুরু ও বিদ্বানদের জন্যে অদ্যাবধি নির্দিষ্ট এই 'ঘীত্‌লা' নাগরা।

ঘীত্‌লা 'জুতা' ও 'জুতী', এবং এদের ওপর 'কারচোব'[1]-এর কাজ—এগুলিকে আশ্রয় করে লখনউয়ের মুসলমানদের মধ্যে ছুটো বিশেষ পেশা গড়ে উঠল, যার ওপর বহু লোকের জীবিকা নির্ভরশীল। প্রথমত, মুসলমান মুচি—এখানে যাদের এক স্থায়ী জাত ও 'বিরাদরী' (স্বজন-গোষ্ঠী) আছে। ঘীত্‌লা ছাড়া অন্য জুতো তৈরি করাকে এরা স্ব-মর্যাদা-বিরোধী বলে মনে করে। লখনউয়ে এদের অনেক ঘর ছিল—সব সৎ মুসলমান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, এবং নিম্নবর্গের অন্য লোকদের চেয়ে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন এদের অবস্থাও খুব ভালো ছিল। কিন্তু এখন পুরনো রীতি ও বেশ বদলে গেছে। তার ফল হয়েছে : পুরুষের দেখাদেখি রমণীরাও ঘীত্‌লা জুতো পরা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। যে-বাজার একদা উত্তম শ্রেণীর ঘীত্‌লা জুতোয় ভর্তি থাকত, সেখানে আজ কোন দোকানে ওইরকম জুতো যদিবা এক-আধ জোড়া পাওয়া যায়তো সে অনেক পুরনো, ময়লা নোংরা। বলা বাহুল্য, এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম : মুসলমান মুচী-সম্প্রদায় একেবারে শেষ হয়ে গেছে। ঘরের পর ঘর উজাড় হয়ে গেছে। যারা এখনও আছে, এসে দাঁড়িয়েছে বিনষ্টির কিনারায়। তবু, এইসব লোকের দৃঢ়তার প্রশংসা করতে হয়—বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে, তবু-যে 'ঘীত্‌লা' জুতোর বদলে 'স্লীপার' বা 'বুট' তৈরি করবে, কালের প্রবাহের সঙ্গে পা ফেলে আগের চেয়েও অনেক উন্নতি করবে, এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না, পারবেও না কোনদিন।

দ্বিতীয় গোষ্ঠী—শিল্পকারদের। এদের আবির্ভাব 'জুতী' বা নাগরার দৌলতে, এবং জুতোর ঝুটা 'ঔধী' বানানোর সূত্রে। 'ঔধী' হচ্ছে এম্‌ব্রয়ডারীর কাজ-করা নানা প্রকারের ছোট-ছোট চামড়ার টুকরো, যা ছেলেদের ও মেয়েদের জুতোয় লাগানো হয়। এখানকার

---

[1] এম্‌ব্রয়ডারী।

'ঔধী' খুব সুন্দর ও চমকদার হত, এবং এতো উঁচু শ্রেণীর সূক্ষ্ম কাজ থাকত, যা অন্যত্র দুর্লভ। এর চাহিদা এতো বেশি ছিল যে জনপদের একটা বড়ো অংশ শুধু 'ঔধী' তৈরি করেই জীবন যাপন করত।

অতএব, 'ঘীত্লা' জুতোর রেওয়াজ খতম হয়ে যেতে এই দুই দলেরই ক্ষতি হল। রমণীরা এখন 'ঘীত্লা'র বদলে পরে 'স্লীপার'। বিশিষ্ট পরিবারের শরিফ বিবিরা বিশেষ-বিশেষ উপলক্ষে পরিধান করে দামী দামী 'পাম্প্শু'। ধনীগৃহে ঘীত্লা জুতো পরিত্যক্ত হয়ে সে জায়গায় এসেছিল 'টাট বাফী'[1] বুট; কিছুদিন পরেই এল চামড়ার বুট, যা না খুলে পা থেকে বার করে নেওয়া যায়। আর এখন তো, 'পাম্প্শু' সর্বজনীন। যে সমস্ত লোক পুরোপুরি ইংরেজী কেতাদুরস্ত হয়ে গেছে, তাদের বেগমদের পদযুগলে পরিশোভিত নানান ধরণের 'লেডীজ শুজ'।

এই সূত্রে স্ত্রীলোকদের বেশভূষার বর্ণনা দেওয়া উচিত বলে আমার মনে হচ্ছে। সেই সঙ্গেই শেষ হবে বেশ-ভূষা, খাওয়া-পরার আলোচনা।

হিন্দুস্তানে, স্ত্রীলোকদের পুরনো পরিচ্ছদ ছিল: সেলাই-বিহীন একটা লম্বা চাদর—অর্ধেক কোমরে জড়িয়ে বেঁধে নেওয়া হত, অর্ধেক থাকত কাঁধে: আঁচল বা মাথার ওপর: অবগুণ্ঠন। এর সঙ্গে, একটি বক্ষাবরণীও প্রাচীন কাল থেকে হিন্দুদের মধ্যে চলে আসছে—উত্তর ভারতে বলে 'আংগিয়া', দক্ষিণ ভারতে 'চোলী'। শ্রীকৃষ্ণের সময়েও এই পোষাক বিদ্যমান ছিল বলে মনে হয়। পরকালে 'চোলী' ও 'আংগিয়া'র মধ্যে পার্থক্য ঘটে গেছে। তার কারণও আছে। দক্ষিণে, একটা 'ঝুলদার'[2] পট্টী পেছন থেকে সামনে এনে বুকের মাঝখানে বোতাম লাগিয়ে বা গেরো দিয়ে আটকে দেওয়া হয়; এই 'ঝুল' বা থলি দুটির মধ্যে দুই বক্ষ, কিছুটা উঁচু হয়ে, চেপে, টাইট হয়ে থাকে। এই হল দক্ষিণী 'চোলী'। এর একেবারে উলটো

[1] কাজ-করা। [2] থলি-লাগানো।

উত্তর ভারতের 'আংগিয়া'—বুকের মাপের দুটো কাপড়ের 'কটোরা'[1] বানানো হয়; দু-তিন আঙ্গুল পর্যন্ত সেলাই করে পরস্পর জুড়ে দেওয়া হয়; ওপরের কোণে জালীর দুটো ছোট-ছোট আস্তীন লাগিয়ে দেওয়া হয়; তার নীচে দুপাশে দুটো ক'রে 'বন্দ্'[2] লাগানো; এইভাবে তৈরি ক'রে আস্তীনের মধ্যে দুই হাত গলিয়ে দিয়ে এই 'আংগিয়া' পরিধান করা হয়; আস্তীন খুব ছোট, আধা-বাজুর চেয়েও কম হয়; দুই 'কটোরা'য় দুই বক্ষ স্থাপন করে, পিঠের ওপর 'বন্দ্' টেনে নীচে-ওপরে গিঁট দিয়ে দেওয়া হয়। 'চোলী'র তুলনায় 'আংগিয়া' বুককে আসলের চেয়েও বেশি উঁচু ও স্পষ্ট করে দেখায়।

এই ছিল প্রাচীন হিন্দু পরিধেয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এর কী সংশোধন বা উন্নতি হয়েছে, তা আমি জানি না। সাধারণ দৃষ্টিতে, আংগিয়াকে অধিক প্রগত এবং পরবর্তীকালের বলে মনে হয়।

হিন্দুযুগে, এর পরে, স্ত্রীজাতির আর কোন নতুন পোষাক চোখে পড়ে না।

সেলাইকরা কাপড় ও 'কুর্তা-পায়জামা' এনেছে মুসলমানরা। মুসলমান রমণী চওড়া, ঢিলে পা-ওলা পায়জামা পরে ইরান থেকে এখানে এসেছিল। পায়া তখন পায়ের গাঁটের উপর কুঁচি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। অচিরাৎ পায়জামা হয়ে গেল ছোট-মুহুরীর 'ঘুটন্না'—ওপরের ঘের ঢিলে-ঢালা। টাইট করার শখ ক্রমে ক্রমে বেড়ে যেত লাগল। ওপরের ঘেরও কমে গেল। 'পাঁয়চা' বা পায়ের মুহুরী এতো সরু হয়ে গেল, যে, পরিধানের পর কষে সেলাই করে নেওয়া হত, আর খোলবার সময়ে মুহুরীর সেই 'টাঁক'[3] ছিঁড়ে ফেলার দরকার হত। আজও অনেক শহরে এধরণের পায়জামা প্রচলিত।

লখনউয়ে মুসলমান বেগমদের বেশভূষা শুরুতে ছিল: এই সরু মুহুরীর টান্‌টান্ পায়জামা, বুকের ওপর ছোট ও সরু আস্তীনের টান্-টান্ আংগিয়া, পেট আর পিঠ ঢাকার জন্যে এক আজব 'কুর্তী'—

[1] বাটি। [2] ফিতে। [3] টেঁকে-দেওয়া সেলাই।

সামনের দিকে যতোদূর 'আংগিয়ার' সীমা, ততোদূর পর্যন্ত কেটে দেওয়া। এতে না থাকত আস্তীন, না বুকের ওপরের কোন অংশ। কাঁধের ওপর থেকে আসা দুটো লম্বা ফিতের সাহায্যে পেট ও পিঠের ওপর লগ্ন থাকত। তার ওপর বাছাইকরা 'বারীক'[1] দুপট্টা তিন গজ। আগে এদিয়ে মাথাও ঢাকা দেওয়া হত, পরে কাঁধের ওপরেই পড়ে থাকতে লাগল!

হিন্দুস্তানের জলবায়ু এবং স্থানীয় লোকেদের প্রকৃতিগত কোমলতা আংগিয়া, দুপট্টা, সবকিছুকে দিনদিন পাতলা থেকে আরও পাতলা করে দিতে লাগল। 'কাহী' বস্ত্রের আংগিয়া ও ক্রেপের দুপট্টা ফ্যাশানবল আমীরজাদাদের মধ্যে চালু হয়ে গেল। নাসীরউদ্দীন হায়দার বাদশাহর কাল থেকে 'ঘুটন্না'কে বিদায় দেওয়া হল। তার জায়গায় বড়ো-বড়ো ঘেরওয়ালা পাঁয়চার কলীদারা পায়জামা—যার কোমরের কাছে খুব সরু, এবং 'মিয়ানী' খুব টান্‌টান্—জনসমর্থন পেয়ে স্ত্রীদের খাস পোষাক রূপে নির্দিষ্ট হল। পাঁয়্‌চা সামনের দিকে, খুব সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে নেওয়া হত, যাতে চলতে-ফিরতে মাটিতে লুটিয়ে খারাপ না হয়। 'গদর' (সিপাই বিদ্রোহ) এর সমসমকালে বা শাহী শাসনের অন্তিমে মিহি কাপড়ের ও আধা আস্তীনের টাইট 'শলূকা' বা বডিসের চলন ছিল। প্রথম-প্রথম এই 'শলূকা' কুর্তীর জায়গায় আংগিয়ার ওপর পরা হত; পরে আংগিয়ার প্রয়োজনই নাকচ হয়ে গেল। পুনশ্চ, খুব মিহি কাপড় ব্যবহার করার জন্যে এ-পোষাককে মনে হত নগ্ন, বিশেষত বাহু একেবারে উম্মুক্ত থাকত। ফলে, শলূকার জায়গায় ঈষৎ ঢিলে কুর্তীর ব্যবহার হতে লাগল। বর্তমানে, হঠাৎই, কুর্তীর জায়গায় 'জ্যাকেট' ও 'বডিস' পরা শুরু হয়ে গেছে।

এবার আমি শহর এবং সুবার বেশভূষার পারস্পরিক তুলনা ও মিলমিশের কথা বলছি।

[1] মিহি, পাতলা, স্বচ্ছ, নরম

ইদানীং কিছু মুসলমানের এবং খোদ রমণীসমাজের কাছে 'শাড়ী' বেশি সুন্দর বলে মনে হচ্ছে। একারণে লখনউয়ের অর্ধেকের কাছাকাছি রমণী পুরনো বেশভূষা ত্যাগ করে শাড়ী পরতে আরম্ভ করেছে। বলা হচ্ছে, শাড়ীতে নাকি অধিক সরলতা। নিজ সৌন্দর্যকে নিত্য নব নতুন ও তাজা রাখার জন্যে স্ত্রীজাতি বিভিন্ন বস্ত্র পরবে, এবং নতুন-নতুন সাজে আপন-আপন পতিকে আকৃষ্ট করবে—আমি নিশ্চয়ই এর বিরোধী নই। কিন্তু তাই বলে নিজেদের চাল-চলন, বেশভূষা একেবারে ছেড়ে দিতে হবে, নিজেদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে নিঃশেষে নষ্ট করে ফেলতে হবে, এটা আমি কোনমতেই মেনে নিতে পারিনা। শাড়ী হচ্ছে বিনি-সেলাইয়ের কাপড়, এবং মানব সভ্যতার আদি কালের স্মারক। সরলতা অবশ্য খুবই চিত্তগ্রাহী ব্যাপার ; কিন্তু তার অনেক সীমা ও শর্ত আছে। নতুবা, পরিপূর্ণ সরলতা তো নগ্নতাতেই। মানুষের স্বভাব ও রুচি অনুযায়ী গড়ে ওঠে তার পরিধেয় ; আবার, বেশভূষাও মানুষের স্বভাবকে, তার রুচিকে নিয়ন্ত্রিত করে। শাড়ীতে যে কী এমন বিশেষ সৌন্দর্য আছে, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না।

নিজের সুন্দরতমা বিবাহিতা পত্নী থেকে নিবৃত্ত হয়ে অন্য যুবতী নারীর প্রতি প্রবৃত্ত হওয়া পুরুষ-স্বভাবের একটা বৈশিষ্ট্য। ঠিক ওইভাবেই আমাদের নবযুবকরা আপন-আপন বিবির বেশভূষায় ক্লান্ত হয়ে অন্য জাতির স্ত্রৈণ বেশভূষায় মুগ্ধ হয়ে যান। কিন্তু মনে রাখা দরকার—যেভাবে আপনি ওই পোষাকে আকৃষ্ট হয়েছেন, সেইভাবে অন্য জাতির পুরুষও আপনাদের স্ত্রীদের প্রগতিশীল বেশভূষায় মুগ্ধ হতে পারেন। এই-যে আপনাদের দৃষ্টিতে আপনাদের স্ত্রীদের বেশভূষাকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে, এবং তার ফলে হিন্দুস্তানের মুসলমান রমণীদের পক্ষে কোন্‌টা গ্রহণীয় তাই নিয়ে যে সারা দেশ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছেন, এসমস্তের মূল একটিই—কামবাসনা।

এই সমস্যা নিয়ে আমি খুব ভালভাবেই আলোচনা করতে পারতাম, যদি আমার বিশ্বাস হত, যে, এই সমস্যার জন্ম মূলত

স্ত্রীলোকদের নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্য থেকে। আসলে, এ সমস্যার উদ্ভব ওঁদের স্বভাবের অস্থিরতা থেকে—যে অস্থিরতা নবযুবকদের কোট-প্যাণ্ট পরিয়েছে, হ্যাট দিয়ে ওঁদের মাথার শোভা বাড়িয়েছে। একমাত্র দেহের রং ছাড়া ওঁদের নিজের বলতে আর কিছু নেই!

পুরুষদের মতো মেয়েরাও ইংরেজী পোষাক পরিধান করুক—নিছক্ এই আবেগ থেকেই আলোচ্য সমস্যাটি প্রসূত হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আমি খুব ভালো করেই জানি, এবিষয়ে কিছু বলা বা শোনা, লেখা বা পড়া, সবই বেকার, বৃথা। কারণ, ইংরেজী সায়া, 'স্কার্ট' ও 'বনেট' পরিধানের ব্যাপারে যতক্ষণ না কোন ফয়সালা করে দেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের সমাজ-সংস্কারক এবং অনুকরণ-পটু ফ্যাশান-প্রবক্তাদের জ্ঞান হবে না। এ ছাড়া অন্য কোনভাবে, কোনরকম সংস্কারের সংশোধন—তা সে যতো ভালোই হোক—এঁদের সন্তোষ হবে না।

অতএব, যেখানে ফলশ্রুতি এই, সেখানে এই প্রসঙ্গে পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠা কালো করে কোন লাভ নেই।

॥ 35 ॥

লখনউয়ে, পোষাকে-পরিচ্ছদে কাট-ছাঁট এবং কাপড়ের বুনটে দিন দিন উন্নতি হতে থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হওয়ার জন্যে হিন্দুস্তানের নিম্নবর্গের লোকেরা গা খোলাই রেখে দেয়। এর কারণ নিজেদের গরীবী বা দেশবাসীদের নির্ধনতা নয়; আবহাওয়া ও জল-বায়ুই এর কারণ। এই জন্যেই দিল্লীতেও মোটা ও ভারী কাপড়ের বদলে হাল্‌কা ও নরম কাপড় ব্যবহৃত হতে থাকে। এক্ষেত্রে, লখনউ আরও এগিয়ে গিয়েছিল।

সিপাইগিরি ও যুদ্ধের প্রয়োজন তখন অনেক কমে গেছে; বেড়ে

গেছে ভোগবিলাস ও স্ত্রীসঙ্গসুধা। পুরুষদের ওপর স্ত্রৈণ বেশভূষার প্রভাব পড়তে লাগল ; সে প্রভাব সীমা ছাড়িয়ে গেল। যে-ধরণের সাজসজ্জা ও শৃংগার রমণীজনোচিত, পুরুষরাও তার অনুকরণ করতে আরম্ভ করল। বিশেষ ক'রে সেই সময় থেকে, যখন এখানকার শাসকরা নিজেদের 'নবাব' উপাধি ত্যাগ করে 'বাদশাহ' উপাধি গ্রহণ করলেন।

ন্যশাপুরী এবং সালারজংগী বংশধররা সে সময় বৃত্তি ও পেনসন পেতেন। সব বন্ধ করে দেওয়া হল। তখন এক স্ত্রীলোক ছাড়া আর কারও সঙ্গ তাঁদের অদৃষ্টে জুটত না। ফল যা হবার, তাই হল : এদের চাল-চলন, পোষাকে-আশাকে এল 'জনানাপন' (মেয়েলীপনা)। শুধু তাই নয়—কথাবার্তাও মেয়েলী হয়ে গেল। এরাই ছিল শহরের রইস, প্রতিষ্ঠাবান, গণ্যমান্য ব্যক্তি ; জনগণও এদের অনুকরণ করতে লাগল। অন্য শহরের রইসদের বিপরীত চিত্র লখনউয়ের রইস ও তাদের অনুকারক-বৃন্দ : মাথায় সিঁথি, তার ওপর ক্রমশ সরু, লম্বা, কাজকরা টুপি, আকর্ণ কেশ চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে মাথার ওপর দুদিকে 'পট্টী-জমিয়ে দেওয়া',[1] মুখে পান, ঠোঁটে লাক্ষা, দেহে চুস্ত্ আংগরাখা, নীচে গুলবদনের রেশমী টাইট ঘুটন্না, হাতে মেহদী, পায়ে 'টাটবাফী'[2] বুট, শীতে আংগ্রাখার জায়গায় নীল বা হলদে বা সবুজ বা লাল অতলস বা গ্রাণ্টের 'দগলা'[3]।

শীতকালে এখানকার কিছু প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি সাধারণত শালের 'কবা' পরত। তবে, দোশালা এবং 'শালী'-রুমালই সবাই পছন্দ করত। এই কারণে, লখনউবাসীদের কারও কারও ঘর থেকে যে রকম 'শাল' আজও বেরোয়, সেরকম শাল হিন্দুস্তান কি, খোদ কাশ্মীরেও এখন পাওয়া যাবেনা।

এখানে শালের শখ এতো বেড়ে গিয়েছিল, হাজার-হাজার

---

[1] পাতা কাটা। [2] কাজ করা। [3] তুলোভরা গাউন।

শাল-প্রস্তুতকারক, 'রফুগর' (রিপুকর) ও 'শালকর' কাশ্মীরী স্বদেশ ছেড়ে দলে-দলে লখনউয়ে এসে ডেরা বেঁধেছিল। আজ পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল, এদের নাম-নিশান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেউ যদি বেঁচেও থাকে, অন্য কোন পেশা গ্রহণ করেছে।

লখনউয়ে 'মহর্‌রম' একটি অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং 'মাতমদারী' অর্থাৎ শোকের কাল। অতএব, শোকভাব এবং সৌকর্য ও সূক্ষ্মতার দিকে দৃষ্টি রেখে এখানে মহর্‌রমের জন্যে বিশেষ বেশভূষা এবং বিশেষ অলংকার আবিষ্কৃত হয়েছিল। কালো ও নীল মৃত্যু ও শোকের রং বলে গণ্য। সেই সঙ্গে সবুজ রং—যেহেতু, আব্বাসী শাসনকালে কালো রংয়ের মোকাবিলায় ফাতিমা[1]-র রং সবুজ করা হয়েছিল; এবং ইরান ও হিন্দুস্তানের কতিপয় 'ফাতিমী' (ফাতিমার বা তাঁর অনুগতদের সম্প্রদায়) তাঁদের সবুজ পাগড়ীর মাধ্যমে সৈয়দদের এই পুরনো রীতিটি আজও রক্ষা করে আসছেন। মহর্‌রমে লাল রং নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সবুজ, নীল ও কালো, তার সঙ্গে হলদে রংও ওই ঋতুর পক্ষে উপযুক্ত বলে বিবেচিত। ফলত, মহর্‌রমে এখানকার স্ত্রীলোকের বেশ ও সেগুলির রংও ওপরে-লেখা ওইসব রংয়ের সঙ্গে মিলিয়ে বাছাই করা হত। অলংকারও। চুড়ি খুলে ফেলা হত। তার বদলে, কব্‌জীর গয়না সবুজ-কালো 'পহুঁচী', আর কানের জন্য হলদে-কালো রেশমের 'কানের ফুল' আবিষ্কৃত হল। এদের সৌকুমার্য সোনা রূপোর অলংকারের চেয়েও বেশি; রমণীর শৃংগারকে সমৃদ্ধি দান করে এরা।

মহর্‌রম তো খুবই মহত্ত্বপূর্ণ মাস। এছাড়া, সব ঋতুতে, সব যুগে, স্ত্রীলোকদের বেশভূষায় এমন সব আবিষ্কার এখানে প্রতিনিয়ত হত, সারা হিন্দুস্তান অবাক হয়ে দেখত। সত্যি বলতে কি, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের লখনউয়ে স্ত্রীলোকদের পোষাকে কাট-ছাঁট ও

[1] হযরত মুহম্মদ-কন্যা এবং হযরত আলীর পত্নী।

নিত্য-নূতনত্বকে যারা দেখেছে, তারা ভুলে যেত ফ্রান্স ও লণ্ডনের বদলতী ফ্যাশন। এই জন্যে লোকের মুখে-মুখে ফিরত : "লখনউ প্রাচ্যের প্যারিস।" আজ অনেক সরলমনা এবং প্রগতিশীল সমাজ-ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তি এই উপাধি মানতে চায় না। তারা কিন্তু এটা ভেবে দেখে না, যে-দরবারে ও যে-শহরে কোন সংস্কৃতির বিকাশ হয়, সেখানে সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে এই ধরণেরই কোন-না-কোন প্রবচন জন্ম নিতে থাকে। দার্শনিকের দৃষ্টিতে এতাদৃশ প্রবচন হয়তো অর্থহীন; কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গের সম্মেলন এবং সভ্য ব্যক্তিদের আসরে এগুলি খুবই প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

পুরুষদের ওপর মেয়েলী পোষাকের প্রভাব-বিস্তার যদি বস্ত্রের সুকুমারতা এবং প্রগাঢ় বর্ণাঢ্যতা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার হত। কিন্তু এখানে অনেক লোকের এমন হাল হল, যে, মিয়াঁ-বিবির দগলা, দুপট্টা, দুলাই, রজাই ও পায়জামায় কোন ভেদাভেদই রইল না। গয়নাটা আর লেসটাই শুধু মেয়েরাই পরত। ছেলেরা লেস-বর্ডার না দিয়ে শৌখীন রংয়ের নরম রেশমী কাপড় পরত। তবে, গদরের পর, ইংরেজী প্রভাবে এ-রুচি কমে যেতে থাকে। আঙুলে গোনা যায়, এমন কিছু লোক ছাড়া আর কারও মধ্যে এর চিহ্নমাত্র নেই।

পুরুষ-ভৃত্য এবং তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মতো এখানকার নারী-সমাজের বিভিন্ন বর্গের জন্যেও ভিন্ন-ভিন্ন ধরণের বেশভূষা নির্ধারিত ছিল। ইংরেজদের খানসামা, কোচম্যান ও সহিস বিভিন্ন উর্দী পরে। কিন্তু এ উর্দী ওদের আসল পোষাক হয়ে উঠতে পারে নি, যা ঘরেও পরা যায়। লখনউয়ে এর উলটো—এখানকার ভৃত্য ও দাসীদের, অন্দর-বাইরের সমস্ত কর্মচারীর জন্যে যে বিশেষ-বিশেষ পোষাক নির্দিষ্ট হয়েছিল, তা-ই ছিল তাদের আসল পোষাক। যেমন : তাবৎ দেউড়ীর সিপাই-চোবদার-হরকার প্রভৃতির বেশ ছিল প্রত্যেকের জন্যে আলাদা-আলাদা; তেমনি জেনানা-মহলের মহলদার,

'মুগলানী'[1], 'কাহারী'[2], এদের পোষাক এতো ভিন্ন ছিল যে, দূর থেকে দেখেই মানুষ বুঝে যেতো—ও হল মহলদার, এ হচ্ছে 'খোআস'[3], এ 'মুগলানা', আর ও 'কাহারী'। সবচেয়ে সুখের কথা : এদের পোষাকে 'উর্দীর ছাপ' পড়তে পারেনি।

'খিদমতগার' এবং তাদের মতো 'আর্দালী'দের বেশও নিঃসন্দেহে ওইরকমই ছিল, যেমনটি ছিল খোদ মিয়াঁ-বিবির। এর কারণ হল : এই দুটি দল মালিক-মালিকানীর পরিত্যক্ত কাপড় পরিধান করে থাকে।

বেশের পর স্ত্রীজাতির সবচেয়ে প্রিয় বস্তু : অলংকার। রমণীরা নিজেদের অলংকারকে ব্যক্তিগত পুঁজি এবং সম্পত্তি বলে সচরাচর মনে করে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ভারতের অনেক অঞ্চলে ভারী-ভারী কুৎসিত গহনার রেওয়াজ বেড়ে গেছে। তার কারণ, এগুলোর দাম বেশি। হিন্দুস্তানের শহরে-শহরে, অওধের দেহাতে-দেহাতে ভারী গয়নার শখ প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। দিল্লীর অভিজাত বংশের মহিলারা যখন লখনউ এসেছিলেন, তাঁদের পরিধানে ছিল সেইসব 'যেবর'[4], যা সারা হিন্দুস্তানে ও খোদ দিল্লীতে প্রচলিত ছিল। এখানে আসার কয়েকদিন পরেই যখন এখানে উন্নত সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠল, অলংকারকে তখন শুধুই শৃংগারের সাধনমাত্র বলে মনে করা হত। এবং সর্ববিধ গহনাই প্রতিদিন হাল্‌কা, নাজুক ও সুন্দর হয়ে উঠতে লাগল। এমনকি, অন্তিম পর্বের আমীর ও ধনী ব্যক্তিদের ঘরণীদের পরিধেয় দাঁড়িয়েছিল : লেস-ফল্‌স্‌-কারুকাজ-বিহীন সাদাসিধে কাপড়, খুব হাল্‌কা সূক্ষ্ম ও দামী দুটো কি একটা গয়না। এতেই খুশি। গলায়, নাকে বা কানে কোন গয়না পরতো তো সেও খুব হাল্‌কা হত। অর্থাৎ লখনউয়ে যেরকম হাল্‌কা গয়না তৈরি হতে লাগল, এমন আর কোথাও হত না।

---

[1] সেলাই-ফোঁড়াই করে যে নারী। [2] মেহ্‌রী, বাসনমাজা ঝি।
[3] খাস চাকর, মোসাহেব। [4] অলংকার।

নাকে নথ—হিন্দু যুগ থেকেই খুব প্রিয় ও প্রয়োজনীয় অলংকার এবং সোহাগের প্রতীক বলে পরিগণিত। পরস্পর মেলামেশার মাধ্যমে এই বোধ মুসলমানদের মধ্যেও সঞ্জাত হল। এখানকার দেহাতী নারীরা আজও একে ভারী করতে এতো ভালবাসে, যে, চার-পাঁচ তোলা পর্যন্ত এক-একটা নথ তারা পরে! প্রায়ই নাক ফেটে যায়, আবার নাক বিঁধিয়ে নেয়। নাক তো খালি রাখা চলবেনা, নথ চাইই! কিন্তু লখনউয়ের নারীরা নথকে উড়িয়েই দিল; তার জায়গায় পরতে লাগল সোনার কাঠি 'কীল'—যা খুবই সূক্ষ্ম ও সুন্দর অলংকার হিসেবে আপন স্বাক্ষর রাখল। অতিসূক্ষ্মতা-বিলাসী যারা, তারা এই কীলকেও এতো ছোট আর হাল্‌কা করে দিল, যে, নাকের সেরকম পাতলা কীল তৈরি হত একমাত্র লখনউয়েই স্বর্ণকার-মীনাকরদের দোকানে। আর কোন জায়গার কারিগর পারত না।

পঁচিশ-ত্রিশ বছর হল, এদিকে 'বুলাক' বা নাকছাবির রেওয়াজ খুব বেড়ে গেছে। যদিও খুব পছন্দ করার মতো জিনিস এটি নয়, তবু, ছোট্ট গয়না, তার ওপর জনপ্রিয়। ফলত, এতেও এমন উন্নতি সাধিত হয়েছে, যে, 'বুলাক' পরে না এমন স্ত্রীলোক নিতান্তই সংখ্যালঘু।

বর্তমানে, বিভিন্ন শহরের পারস্পরিক মেলামেশার ফলে অলংকার নির্মাণের ও শিল্পনৈপুণ্যের নানাবিধ উন্নতি ও প্রগতি ঘটছে, এবং বিশেষ-বিশেষ অলংকারের জন্যে বিশেষ-বিশেষ শহর প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্বে, যখন রেলপথ হিন্দুস্তানের শহরগুলিকে এমন মৈত্রী ও ঐক্যের সূত্রে বেঁধে দেয়নি, তখন লখনউয়ের চেয়ে ভালো স্বর্ণকার ও কারিগর আর কোথাও ছিলনা। এখন অনেক শহরই এই কারুশিল্পের দক্ষতায় লখনউয়ের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশেষভাবে 'অপরিশোধিত' রূপোর হাল্‌কা গয়না তৈরিতে দিল্লী হিন্দুস্তানের অন্য সব শহরকে ছাড়িয়ে গেছে। তব, এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানকার সুরুচিসম্পন্ন পরিবার

লখনউয়েরই তৈরি অলংকার এবং এখানকার রূপোর বাসন বেশি পছন্দ করে।

লখনউয়ের শিল্প প্রসঙ্গে এ-আলোচনার পুনরাবৃত্তি আমাকে করতে হবে। অতএব এখানে এইটুকুতেই খুশি হওয়া যাক।

॥ 36 ॥

খানা-পীনা, খাওয়া-পরার আলোচনা শেষ করে আমি এখন সেইসব বিষয়ে আসছি, যাদের সম্বন্ধ সোসাইটী এবং পারস্পরিক মেলামেশার সঙ্গে ; এবং স্বকীয় রুচি ও ঔচিত্য অনুসারে পরিবর্তিত করে যাদের আপন করে নিয়েছে লখনউ।

পৃথিবীর সব দেশেই মেলামেশা ও জীবন-যাপনের এক-একটা পদ্ধতি রূপ নেয়। এবং এই রূপবান পদ্ধতির অন্তর্গত চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-শিষ্টাচার, রুচি-বাগ্‌ভঙ্গি বাড়ি-আসবাবপত্রাদির ভূমিকা প্রধান হয়ে থাকে। সমাজের অবশ্য-প্রয়োজনে, বেঁচে থাকার পক্ষে জরুরী এইসব জিনিস প্রত্যেক গোষ্ঠীতে, প্রত্যেক শ্রেণীতে, প্রতিটি শহরে ও নগরে, স্বাভাবিক ভাবেই আবির্ভূত হয়। আজও দুনিয়া ঘুরে দেখুন—সর্বত্র, সমাজের এক-একটি স্বতন্ত্র রূপ ও তার বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়বে। আর, যে জায়গায় কোন বড় দরবার স্থাপিত হয়, এবং শিক্ষার উন্নতি হতে থাকে, সেখানকার সমাজ দেশের একটা বড়ো অংশকে করতলগত করে সেখানকার তাবৎ শহর ও গ্রামের সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

হিন্দুস্তানে তখন দিল্লী ছিল সভ্যতা সংস্কৃতি এবং সামাজিক বিধি বিধানের মূল কেন্দ্র। তার কারণ কয়েক শতক ধরে ওটি ছিল হিন্দুস্তানের শাসন-কেন্দ্র এবং বিদ্বজ্জন-আশ্রয়। সারা হিন্দুস্তান তার অধীন ছিল। যতো শাসক সুবেদার সমাজনেতা ওখানকার

বাতাবরণেই লালিত পালিত হয়েছিল। এদিক থেকে লখনউয়ের না আছে কোন বিশেষত্ব, না পেতে পারে কোন প্রতিষ্ঠা। তবু, এই প্রসঙ্গে লখনউয়ের নাম উচ্চারণের কোন কারণ যদি ঘটে থাকে, তা হল: কালের যোগাযোগে, বিগত শতকেই, দিল্লীর ওই সংস্কৃতি পুরোপুরি লখনউয়ে এসে গিয়েছিল। ওখানকারই আমীর ও শরিফ, পণ্ডিত ও কবি, সংস্কারক ও ধার্মিক, দলেদলে লখনউ চলে এসেছিল। দিল্লীর দরবারে যারাই উজাড় হয়ে যাচ্ছিল, লখনউয়ে এসে জড়ো হতে লাগল। একে-একে যতো প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি সবাই চলে এল এখানে। এখানে এসে খুশিই হয়েছিল। তাই স্বকীয় উন্নত সংস্কৃতিকে আরও বিকশিত করে তুলতে লাগল। এর মধ্যে মজার কথা হল: দিল্লীবাসীদের যে সংস্কৃতি অওধে স্থানান্তরিত ও স্থাপিত হল, তার মধ্যে দিল্লীর লোক ছাড়া আর কোন ব্যক্তি ছিলনা। এমনকি, লখনউয়ের পুরনো বাসিন্দাদেরও এতে কোন অবদান ছিল না।

সুতরাং, লখনউয়ের সংস্কৃতি বাস্তবিক দিল্লীরই সংস্কৃতি, এবং ওখানকারই সমৃদ্ধ সমাজের অন্তিম নিদর্শন।

সেই বিগত শতকে দিল্লীর তৎকালীন সংস্কৃতির দুটো 'স্কুল' হয়ে গিয়েছিল: একটি 'স্কুল' যেটি খাস দিল্লীতেই ছিল; অন্যটি যেটি লখনউয়ে চলে এসেছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই, যে, মুগল দরবার দুর্বল হয়ে পড়ায় এবং ধনৈশ্বর্যের লাঘব ঘটায়, তার পতনের পূর্বগামী শতকেই দিল্লীস্থিত 'দিল্লী স্কুলের' পক্ষে প্রগতির সুযোগ মেলেনি। সে-সুযোগ পেয়েছিল 'লখনউস্থিত দিল্লী-স্কুল'। এই হেতু লখনউ সংস্কৃতি তখন সামনে এগিয়ে চলছিল, এবং দিল্লীর প্রাচীন সংস্কৃতির অগ্রস্মৃতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখানে বলা দরকার যে, এই প্রগতি লখনউ সমাজের বৈশিষ্ট্য। গভীরে গিয়ে দেখলে চোখে পড়ে: দিল্লীতে সংস্কৃতির যে বিকাশ হয়েছিল, তার পশ্চাতে ছিল শাহী দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা। কিন্তু সমাজে ক্রমশ অশিক্ষিত ব্যাপারীদের সংখ্যা বেড়ে গেল; পুরোনো খানদানী

শরিফ লোকেরা হয় অন্য শহরে গিয়ে বাস করতে লাগল কিংবা ঘরে বন্ধ হয়ে গেল। ওই সংস্কৃতিও তাই লুপ্ত হয়ে গেল। ঠিক একইভাবে, অওধের শাহী দরবার ভেঙ্গে যাবার পরে যখন বাইরের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ হয়ে গেল, এবং বনেদী পরিবারগুলি ও তাদের প্রভাব তিরোহিত হয়ে গেল, তখন থেকেই লখনউয়ে প্রস্ফুটিত সংস্কৃতিও দিনে দিনে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু গদরের পর থেকে যে অশালীন সোসাইটী ও যে অশিষ্টাচারের জন্ম লখনউয়ে, এবং এখনও ক্রমশ-বিকশিত, তা আমার আলোচ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য শুধু সেই সংস্কৃতিরই বর্ণনা, যেটি লখনউয়ের শাহী দরবারের ছত্রছায়ায় প্রগত হয়েছিল, এবং এখানকার সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্থানীয় সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এখন আমার আলোচ্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি :

(১) 'মকান' ; (২) 'ফর্নিচর' ; (৩) 'ওযা কিতা' ; (৪) 'অখলাক-আদাত' ; (৫) 'নিশসৃত্-বর্খাসৃত্' ; (৬) 'সাহব-সলামত, মিযাজ-পুর্সী' ; (৭) 'তরয কলাম' ; (৮) 'তরীকা-এ-মযাক' ; (৯) 'শাদী-গমী কী মহফিলেঁ' ; (১০) 'মজলিসেঁ' ; (১১) 'ম্যওলূদ শরীফ কী মহফিলেঁ'।

১। মকান (বাড়ি)

গৃহ প্রসঙ্গে দিল্লী ও লখনউয়ের প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী বাহ্য প্রদর্শন ও জাঁকজমক শুধু শাহী মহল ও প্রাসাদেই সীমিত থাকত। আমীর ও ব্যাপারীরা নিজেদের থাকার জন্যে যে বাড়ি তৈরি করত, তার ভেতরটা যতো বড়োই হোক না কেন, বাইরেটা হত একেবারে সাধারণ বাড়ির মতো। এর মধ্যেকার রহস্যটা ছিল : যে বাড়ির বাইরেটা খুব 'শানদার' বা আড়ম্বরপূর্ণ হত, প্রায়-ক্ষেত্রেই সে-বাড়ি

বাদশাহর পছন্দ হয়ে যেত, এবং যে-বেচারী বাড়িটি তৈরি করাত, তার আর সেখানে বসবাস অদৃষ্টে জুটত না। এছাড়া, আরও একটা ব্যাপারও ছিল : প্রজাদের মধ্যে কারও বাড়ির শাহী ঠাটবাট প্রদর্শন বিদ্রোহ বলে গণ্য হত, এবং বাড়ির মালিকের পক্ষে সুখে-শান্তিতে জীবন-নির্বাহ করা অসম্ভব হয়ে উঠত।

এইজন্যেই দিল্লীতে 'মকবরা' (সমাধিভবন) ছাড়া এমন একটা বাড়িও আপনার চোখে পড়বেনা, যেটি খুব বিশাল, এবং যা উচ্চকোটির কোন সামন্ত অথবা ধনী ব্যাপারী নির্মাণ করেছে। লখনউয়েও গোড়ার দিকে এই অবস্থা ছিল। নবাব আসফউদ্দৌলা ও নবাব সাদত আলী খাঁর সময়ে ধনী ফরাসী ব্যবসায়ী মঁশিয়ে মার্টিন খানত্বয়েক 'আলীশান' (প্রাসাদোপম) 'ইমারত' (বাড়ি) বানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নির্মাণের আসল উদ্দেশ্যই ছিল—শাসক দেখে পছন্দ করবেন, এবং তাঁকে বেচে দেওয়া যাবে! শুধু, নবাব সাদত আলী খাঁর কঞ্জুষীর জন্যে এ-ইমারত স্টেটের অধিকারে আসতে পারে নি। এখানেই এখন 'লা মার্টিনিয়ার কলেজ'। এবং এটি হল সেই বাড়ি, লোকে আজকাল যাকে বলে 'মারকীন সাহব কী কোঠী'।

পরবর্তীকালে এখানকার এক উজীর র‍্যাওশনউদ্দৌলা বসবাসের জন্যে একটা চমৎকার ইমারত তৈরি করিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরিণাম : সরকারী হুকুমে বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হল। রাজত্বের পতনকালে এটি শাহী ইমারত হিসেবেই গণ্য হয়। সরকারী সম্পত্তি হওয়ার জন্যে, ইংরেজী পর্বে, ইমারতটি গভর্নমেণ্টের অধিকারে চলে আসে, র‍্যাওশনউদ্দৌলার ওয়ারিসদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় নি। তবু আজও এটি 'র‍্যাওশনউদ্দৌলা কী কোঠী' নামেই পরিচিত। এখানে এখন ডেপুটী কমিশনার বাহাদুর এবং তাঁর সহকারীদের এজলাস বসে। তবু এর নামান্তর হয়নি।

য়োরোপে কুঠীর মতো যেসব বাড়ি আছে, এখানকার প্রজাদের বাড়িগুলির গড়ন তা থেকে একেবারে আলাদা। য়োরোপে বাড়ির

ভেতরে 'সহন'[1]-এর কোন প্রয়োজন হয় না। তার কারণ, ওখানকার নারীরা পর্দানশীনা নয়; পুরুষদের মতো তারাও বাইরে বেরিয়ে মুক্ত পরিবেশের হাওয়া খেতে পারে। এখানে তার বিপরীত। তাই বাড়ির ভেতরে উঠোনের প্রয়োজন, যাতে নারীরা অন্তঃপুরেই খোলা হাওয়ার আনন্দ পেতে পারে।

এই বিশেষ প্রয়োজনটি, এবং জীবন-যাপনের অন্যান্য আবশ্যকতা এখানকার বাড়ির গঠন-ভঙ্গিকে এক বিশেষ রূপ দিয়েছে: মাঝখানে উঠোন; তাকে ঘিরে ইমারত; ইমারতের একটা মুখ হয় সদর; অন্যদিকে ইঁট-চুণের থামের ওপর কম-সে-কম তিন, কখনওবা তারও বেশি 'মেহরাবদার'[2] অন্দর-দরজা। এই 'মেহরাব'[3] সাধারণত শাহজাঁহানী মেহরাবের মতোই, অর্থাৎ ধনুক-আকার মেহরাব জুড়ে-জুড়ে বড়ো মেহরাব। সদরে প্রায়ই এমনি মেহরাবের দুটো-তিনটা 'হল' থাকে। কখনও-কখনও দরজা লাগিয়ে পেছনের হলকে একটা বড়ো কামরায় রূপান্তরিত করা হয়; কখনওবা এর মেঝে প্রায় কোমর পর্যন্ত উঁচু-করে 'চবুতরা' বা চাতাল বানিয়ে দেওয়া হয়।

এই বড়ো হলগুলির দু'পাশে পরপর কামরা বা ঘর। হলের ছাদ এতো উঁচু হয় যে, দুপাশেই, এর মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত, দু'থাকের অর্থাৎ দোতলা ঘর হতে পারে।

উঠোনের দুপাশে দৈর্ঘ্য অনুযায়ী, দালান, কামরা কুঠরী তৈরি করা হয়; সেখানে বাবুর্চীখানা, পায়খানা, মুদীখানা,[4] সিঁড়ি, কুয়ো, এবং চাকরানীদের থাকার জায়গা। দরকার হলে, এবং জায়গা থাকলে, সদরদালানের সামনে, অন্যদিকে, ওইরকমই আর-একটা বড় দালান তৈরি করা হয়, যেমন থাকে সদরের দিকে। দরজা সচরাচর পাশের দিকে, অর্থাৎ যেদিকে বাবুর্চীখানা ও চাকরদের থাকার ঘর, সেই দিকেই হয়। এর সামনে, অন্দরের দিকে, একপাশে, একমানুষের চেয়ে একটু উঁচু একটা দেওয়াল দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়—দরজা থেকে অন্দরকে আড়াল করার জন্যে।

---

[1] প্রাঙ্গন, উঠোন, শান। [2] খিলানযুক্ত। [3] খিলান। [4] ভাঁড়ার।

গরীব ও সাধারণ শ্রেণীর লোকেদের বাড়িতে পাকা খিলেনের বদলে ওইরকম কাঠের তিনটে দরজা বসিয়ে দালান বানানো হয়। সদরে, কখনও তার সামনের দিকে, দালান, দরদালান থাকে। এই ধরণের বাড়ির সম্পূর্ণ রূপটা হল ঃ চার দিকে তিনটে দরজা ও দালান, তার দুপাশে এক-দরজার কুঠরী, যেগুলি বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। এবং এরই একটাতে বাইরে যাবার দরজা।

এ-ই ছিল এখানকার বাড়ির একটা সাধারণ নক্‌শা। কিন্তু সবসময়ে একেই যে যথাযথ অনুসরণ করা হত, তা নয়। প্রায়শই বাড়ির নীচের তলায়, এবং হেথা-হোথা, এমন কৌশলে ও সুন্দর করে এক-দরজা-ওয়ালা কামরা ও কুঠরী বার করে নেওয়া হত, যে, দেখে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়—এতো অল্প জায়গায় এতো বিশাল বাড়ি তৈরি হল কি ক'রে!

বাস্তুকলার ইতিহাসে চোখ বোলালে দেখতে পাবেন, প্রথম-প্রথম নীচু-নীচু বাড়ি তৈরি হত। তার পরের বাড়িগুলি উঁচু ও মজবুত হতে লাগল, কিন্তু সাদাসিধে। শেষে এল সাজসজ্জার জন্যে নক্‌শা, এনগ্রেভিংয়ের আবিষ্কার, এবং অদ্ভুত-অদ্ভুত কায়দায় রং-ভরানো। তবু, এইসব কৃতিত্বের পরেও, আজও বড়ো-বড়ো চওড়া ভিতের দেওয়াল, এবং তাতে বড়ো-বড়ো হল ও 'দীওয়ানখানা' (বৈঠক খানা) বানিয়ে দেওয়া হয়।

হিন্দুস্তানী ইমারতে সর্বশেষ কৃতিত্ব ছিল ঃ দর্জিদের মতো কাটছাঁট করে অল্প জায়গার মধ্যে অনেক বড়ো বাড়ি তৈরি করা। এই দক্ষতার সূত্রপাত দিল্লীতে, ওখানেই শ্রীবৃদ্ধি, ওখান থেকেই ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। তবে অন্য স্থানের তুলনায় এর সর্বাধিক সমৃদ্ধি হয়েছে লখনউয়ে।

আজকালকার বড়ো-বড়ো সুদক্ষ ইঞ্জিনীয়ররা বড়ো-বড়ো ইমারত তৈরি করছে। প্রদর্শনীর যোগ্য অত্যন্ত সুন্দর ও 'শানদার' চেহারা বানিয়ে দিচ্ছে বাড়ির। কিন্তু একটুকরো ছোট্ট জমির ওপর একটা বিশাল ইমারত তৈরি করে দাঁড় করানো—এ শুধু পুরনো কারি-

গরদের পক্ষেই সম্ভব। তারই মধ্যে এতো দালান, কামরা, কুঠরী, 'সহনচী' (ছোট উঠোন) বার করে বাস্তুকলার এমন চমৎকৃতি দেখাতে পারে যে, দর্শকের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। অন্তঃপুরের অন্তরাল-প্রাচীরও এতো পাতলা, নাজুক, সেইসঙ্গে মজবুত হয়, মনে হয় ইঁট-চুনের দেওয়াল নয়, কাঠের স্ক্রীনই বুঝিবা!

কিন্তু এও শেষ হতে চলেছে, গৃহ-নির্মাণের এই দক্ষতা। আজকাল এর কোন কদর নেই। পুরনো কারিগররাও সব মরে গেছে। যে-দু-একজন আছে, তারা অনাদৃত অবহেলিত।

প্রাচীনকাল থেকে, হিন্দু-মুসলমানের বাড়ির গঠনে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। হিন্দুরা বাড়ির উঠোন খুব ছোট ও সংকীর্ণ রাখে; আলো-হাওয়া আসবে কিনা, এ-খেয়াল না রেখে বাড়ি বাড়িয়েই যেতে থাকে। মুসলমানরা কিন্তু খোলামেলা বাড়িই চায়। আলো-হাওয়ার ঘাটতি না হয়, এমনভাবেই তারা বাড়ি বাড়াতে থাকে। মুসলমানদের এতাদৃশ রুচি সত্ত্বেও পুরনো কারিগররা এদের 'হাওয়াদার'[1] বাড়িতেও এতো ঘর তুলে দেয়, দেখে বিস্মিত হতে হয়।

এছাড়াও সেকালের দক্ষ মিস্ত্রীরা দরজা, ঘরের খিলেন, দালান এবং ঘরের দেওয়ালের ওপর বিভিন্ন রংয়ের এমন সব সুন্দর নক্‌শা করত, আজকাল তা কদাচিৎ সম্ভব। এখন চিত্রকলার অনেক প্রগতি হয়েছে। তখন দরজায় ও দেয়ালে রাজমিস্ত্রীরা যে নক্‌শার কাজ করত, তা লুপ্ত হয়ে গেছে। আধুনিক যুগের মানুষ সাদাসিধে ভাব পছন্দ করে; সেকারণে, যেটুকু আছে, তাও বিলোপের পথে। এখনও এখানে কয়েকজন এমন ওস্তাদ 'রাজ'[2] আছে, যাদের মত নক্‌শার কাজ বোধহয় কোন শহরের রাজমিস্ত্রীই করতে পারবে না। শুধু লতা-পাতার নক্‌শা নয়, এরা ছাদ ও দেওয়ালের ওপর অনেক উঁচু-ধরণের ছবিও আঁকতে পারে।

এবং শুধু রাজমিস্ত্রী নয়, সে সময়কার 'বঢ়ঈ' (সূত্রধার) রাও সমান

---

[1] আলো-বাতাস যুক্ত। [2] মিস্ত্রী।

পারদর্শী ছিল। এরা হয়তো উন্নত ধরণের টেবিল, চেয়ার, আলমারী বা রেলের গাড়ী বানাতে পারত না। কিন্তু থাম, খিলেন এবং দরজার চৌকাঠ-বাজুর ওপর এমন সুন্দর নকৃশা খোদাই করে দিত, আজ তেমনটি রচনা করা খুবই কঠিন।

॥ 37. ॥

২। ফর্নিচর (আসবাবপত্র)

সংস্কৃতির দ্বিতীয় উপকরণ 'আসবাবপত্র', যা দিয়ে বাড়ি সাজানো হয়।

একালের মতো সেকালে টেবিল-চেয়ার ছিল না। যা ছিল, সবই খাস হিন্দুস্তানী এবং ইসলামী রুচিসম্মত। বাড়ি-বাড়ি থাকত কাঠের চৌকি বা 'তকৃতা', 'পলংগ' (পালঙ্ক), চৌকির ওপর পাতবার জন্যে সুন্দর নাজুক 'পলংগড়ী' (খাট)। নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের জন্যে দড়ির পালংগ, আমীরদের ঘরে ফিতের তথা 'নেওয়াড়ের' পালংগ।

ছিমৃছাম লোকেদের ঘরের চেহারা হত: ঝাঁট দেওয়া, দেয়ালে কলিফেরানো, ছাদের নীচে চকৃচকে শাদা কার্নিশ বার করা, তার চারদিকে কুঁচি দেওয়া ঝালর। দালানে-কামরায়-উঠোনে কাঠের চৌকি, তার ওপর 'দরী' (শতরঞ্জি) পাতা, দরীর ওপর ধব্ধবে শাদা চাদর সযত্নে টান্ ক'রে বিছানো, কোথাও এতোটুকু খাঁজ নেই। চার কোণে শ্বেত পাথরের গম্বুজ-উপম 'মীরফর্শ' ফরাশের চার কোণকে চেপে রেখেছে, যাতে হাওয়ায় চাদর না ওড়ে, না কুঁচকে যায়। মাথার ওপরে ঝকৃঝকে 'ফর্শী'[1] পাখা।

'ফর্শী-পাখা', টানা পাখার চলন হয়েছে পরে। নইলে, বাড়ির শোভা আগে ছিল—হাতপাখা। গৃহস্বামীর পদমর্যাদা ও সামাজিক শ্রেণী অনুসারে সূক্ষ্ম কাজ ও সুন্দর ডিজাইনে এগুলি তৈরি হত।

---

[1] f।শেষ ধরণের মোটা কাপড়ে তৈরি।

(এর কথা আমি পরে কোন সুবিধেমতো জায়গায় বলব)। 'সদর মোকাম'[1] যেদিকে, সেখানে, ঘরের ভেতরে বা বাইরে, চৌকির ও মেঝের ওপর নেওয়াড়ের পরিষ্কার ও সুদৃশ্য পালংগ পাতা থাকত। পালংগ-এর ওপর গরমের সময় দরী, শীতে তোষক, তার ওপর পরিষ্কার চাঁদনী (চাদর) বিছানো থাকত। শাহী মহল অথবা ওই স্তরের অন্তঃপুরে পালংকের চাদরের চারদিকে কুঁচি দেওয়া ঝালর টেঁকে দেওয়া হত ; সেটা ঝুলে থাকত মেঝের কাছাকাছি। এতে একটা আলাদা রূপ খুলে যেত পালঙ্কের। রেশমের রঙীন সুতো দিয়ে বিছানার চার কোণ বাঁধা থাকত তার চার পায়ার সঙ্গে—শোবার বা পাশ ফেরার সময়ে বিছানা যাতে স্বস্থানচ্যুত হয়ে কুঁচকে না যায়।

পালংকের মাথার দিকে চওড়াই বরাবর চৌকো, পাতলা-পাতলা, নরম 'তকিয়া'। তাকিয়া সচরাচর লাল 'টুল' কাপড়ের হত। তার ওপর 'তনুযেব' (সূক্ষ্ম মসলিন) বা পাতলা 'নয়নসুখ' কাপড়ের শাদা 'গিলাফ' (খোল), যার মধ্যে দিয়ে টুলের লাল তার ঝলক দেখাত। রাখা হত পরোটার পরতের মতো ওপর-ওপর। তার ওপরে, এদিকে-ওদিকে, ওই কাপড়েরই দুটো ছোট-ছোট 'গলতকিয়া'—পাশ ফিরে শোবার সময়ে গালের নীচে চেপে রাখার জন্যে। করতলের চেয়ে বড়ো নয়। বিছানার দু'পাশে, ধারের দিকে, দুটো গোল 'তকীনিয়া'—পাশ ফেরার সময়ে জানুর তলায় রাখলে আরামদায়ক। পায়ের দিকে, ঋতু অনুসারে, 'দুলাঈ', 'রজাঈ' বা 'লিহাফ' (লেপ)। দিনের বেলা শয়নের প্রয়োজন না থাকলে পালংগের ওপর একটি সুবিস্তৃত 'পলংগপোশ' (বেড-কভার) পাতা থাকত।

চৌকির ওপর পালংক। পালংকের সামনে, মাঝবরাবর, মেঝেয় বসবার জন্যে মসনদের আকারে 'কালীন' (গালিচা) পাতা থাকত। কালীনের ওপর পালংগের সঙ্গে মিলিয়ে 'গাও' (বড়ো তাকিয়া)। গাও-এর ওপর প্রাত্যহিক ব্যবহারের শাদা 'গিলাফ' বা খোল থাকত। উৎসবে-ব্যসনে দামী রেশমী ও সূক্ষ্ম কাজ করা গিলাফ পরানো হত।

---

1. ড্রয়িং রুম।

পালংক যদি চৌকির ওপর না থাকত, তাহলে তার যেকোন একদিকে, সুবিধেমতো জায়গায়, মসনদ, তাকিয়া এবং তার ওপর 'গদী' থাকত।

দেয়ালে কখনও-কখনও 'তসবীর' থাকত। তবে, ছবির চল এখন যেমন, তখন তা ছিলনা। তসবীরের জায়গায় থাকত সুন্দর নকশাকরা 'কিত্আ' (হাতেলেখা সুভাষিতা বলী); ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে লাগানো হত। সে সময়কার রইসদের এই 'কিত্আ'র এতো শখ ছিল, শুধু ওই লিখেই ও প্রস্তুত করেই লিপিকর খুশনবীসদের জীবিকা নির্বাহ হত। বস্তুত, এই শখের খাতিরেই এমন সব নামী ও দক্ষ 'খুশনবীস' সেকালে আবির্ভূত হয়েছিল, যারা শুধু 'কিত্আ'ই লিখত, 'কিতাবত' (প্রেসের জন্যে কপি তৈরি)-কে আত্ম-অবমাননার এবং সাধারণ সাগরেদদের কাজ বলে মনে করত।

উঠোন, দেউড়ী ও দরজার বাইরে বৈঠকের জন্যে তক্তা বা চৌকি ছাড়া মোড়াও থাকত। আজও কোথাও কোথাও মোড়া দেখা যায়; তবে, সেদিন শরিফদের ঘরে-ঘরে থাকত। এগুলো তৈরি হত কাঠি ও দড়ি দিয়ে। যে-বাড়িতে এর প্রতি একটু বেশি নজর দেওয়া হত, সেখানে এই মোড়ার ওপর ছাগলের লোমওয়ালা শুক্নো ছাল ছড়িয়ে দেওয়া হত; মজ্বুতীর জন্যে ওই সলোম চামড়া ধারে ধারে মুড়ে দেওয়া হত। তখনকার কালে এই মোড়া খুব কাজের জিনিস ছিল।

আমীরদের বাড়ি ছিল দ্বিধাবিভক্ত: জেনানামহল ও পুরুষমহল। জনসাধারণ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক স্রেফ্ একটা বাড়িতেই জীবন কাটিয়ে দিত। এখন সকলেই চেষ্টা করছেন, প্রতি বাড়িতে সদর-দরজার পাশেই যেন বাইরের-ঘর থাকে। সেকালে এসব চিন্তা ছিল না। দেউড়ীতে, সেখানে জায়গা না থাকলে, দরজার বাইরে এই মোড়া পেতে লোকে দোস্তদের সঙ্গে মিলিত হত। কেউ খারাপ ভাবত না।

সৌন্দর্য ও অলংকরণের জন্যে, ঘর ও দালানের ভেতরে বেশির ভাগ তাকেই কাগজের 'গুলদস্তা' (পুষ্পস্তবক) রেখে দেওয়া হত।

দালানের মেহরাবের (খিলেনের) জন্যে পর্দা অবশ্য-প্রয়োজনীয় ছিল। আজকাল যেমন কাঠি, মাদুর, চট ইত্যাদির পর্দার চলন, তখন এসব ছিলনা ; বরং এই ধরণের পর্দাকে অপকৃষ্টই মনে করা হত। তার জায়গায় তুলো বা জাজিমের পর্দা তৈরি করানো হত। এগুলো বাঁধাই থাকত ; প্রয়োজনবিধায় খুলে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। জেনানা-মহলের বহির্মুখী দরজায়ও এই ধরণের পর্দা থাকত, পাশে প্রায়ই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত কোন চাকরাণী বা কাহারনীকে।

৩। ওযা কিতা (সাজসজ্জা)

বেশভূষা প্রসঙ্গে এর কথা বলা হয়েছে। এই সুযোগে আরও কয়েকটি কথা যোগ করা যেতে পারে।

সেসব দিনে, শরিফরা ঘরে অথবা বাইরে পুরো পোষাক পরা খুব দরকার বলে মনে করত না। পরিধানে থাকত শুধু একটা 'গর্কী' অর্থাৎ একটা ছোট-মতো লুংগী ; বাদবাকি, মাথা থেকে পা পর্যন্ত নগ্ন —কেউ খারাপ মনে করত না। এই 'গর্কী' হত জাংগিয়ার মতো ; অঙ্গবিশেষ ঢাকা থাকত ; উরুও অনাবৃত। আজকাল আমাদের এখানকার শরিফরা নিজেদের ঘরে—সে অন্দরই হোক আর বাহির—বেনিয়ান, কুর্তা ও পায়জামা পরে থাকা বাধ্যতামুলক বলে মনে করে। কিন্তু যে যুগের বর্ণনা আমি করছি, সে সময়ে, ঘরের মধ্যে এতো কাপড়চোপড় পরে থাকা তৎকালীন আচরণবিধির বিরোধী ছিল। তখন এমন অনেক লোক ছিল, যারা বাড়ি থেকে বেরোবার সময়েই শুধু আংগ্রাখা ও পায়জামা পরে নিত এবং এইভাবে এক জোড়ায় এক মাস চালিয়ে নিত। পোষাকের অবস্থা এমন থাকত, দেখে মনে হত, আজই ধুয়ে এসেছে। ধোপার বাড়ি থেকে আসা আংগ্রাখা পরবার সময় হাতা, বর্ডার ও ধারগুলি গিলে করে নেওয়া হত ; তার চিহ্ন মাসাধিককাল ওইরকমই থেকে যেত। এটা সবাই করত।

হ্যাঁ, মেয়েদের পোষাকের কোন তফাৎ নিঃসন্দেহে থাকত না।

কোথাও নিমন্ত্রণে গেলে যে-যে কাপড় পরত, ঘরেও সেইরকম। তবে বাইরে যাবার পোষাক ভারী ও দামী হত, ঘরে পরার জন্যে আটপৌরে নিমন্ত্রণ-বাড়িতে যেতে হলে পুরুষ ও নারী পরিষ্কার, ভারী ও উৎকৃষ্ট পোষাক পরে যেত। এবং ভালো-ভালো কাপড়চোপড় পরে যাওয়ার জন্যে পুরুষ ও মহিলাদের আসর অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও শোভামণ্ডিত হয়ে উঠত।

॥ 38 ॥

প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত প্রথা : পুরুষের মাথায় চুল, ছাঁটা গোঁফ, গোল লম্বা দাড়ি। হযরত মুহম্মদের আদেশানুসারে ধর্মনিষ্ঠ, বিদ্যানিষ্ঠ, সংযমনিষ্ঠ, ব্যক্তিগণ দাড়ি রেখে দিতেন, গোঁফ ছাঁটতেন, কখনওবা বাড়াবাড়ি করে একেবারে চেঁচেও ফেলতেন। আমীর ও শরিফদের মধ্যে চলন ছিল : নীচে গলার পাশে এবং ওপরে গালে দাড়ির জন্যে সীমা নির্ধারিত করে নেওয়া হত ; বাড়ন্ত চুল কেটে ফেলে, দাড়ি গোল করে পাকিয়ে একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য দেওয়া হত।

সর্বপ্রথম দাড়ি কামিয়েছিলেন শাহনশাহ আকবর। তারপর জাহাঁগীর—তাঁর মুখেও দাড়ি ছিল না। আকবর ও জাহাঁগীরের দরবারীদের ওপর এর যে প্রভাবই পড়ুক, মুসলমান আমীরদের সাধারণ প্রথা তা-ই ছিল, যা প্রথমাবধি চলে এসেছে।

লখনউয়ে দরবার স্থাপিত হবার পর দাড়ি কমতে লাগল ; এবং কমতে-কমতে প্রায়-লোকের মুখের ওপর থেকে দাড়ি গায়েব হয়ে গেল। এর কারণ বোধহয়, একই ধর্মমতাবলম্বী হওয়ার জন্যে এখানকার দরবারীদের ওপর ইরানীদের প্রভাব পড়েছিল। ইসলামের আবির্ভাবের সময় থেকে দাড়ির যে মহত্ত্ব চলে আসছিল, সফাবী বংশের বাদশাহদের আমল থেকে ইরানের বাদশাহ ও আমীরদের

মধ্যে দাড়ির সে মাহাত্ম্য আর ছিল না। যদ্যপি মুসলমানদের মধ্যে দাড়ি কামিয়ে দেওয়া হত শাস্তি দমনের বা অপমান করার জন্যে, তবু ইরানে দাড়ি না রাখাটাই আমীরী স্টাইলে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। লখনউয়ের ন্যশাপুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা নবাব বুরহান-উল-মুল্‌ক্‌-এর মুখের ওপর লম্বা দাড়ি ছিল। দাড়ি কামান শুজাউদ্দৌলা। তারপর থেকেই এখানকার তামাম আমীর ও বাদশাহ মুণ্ডিতশ্মশ্রু। অব্যবহিতভাবেই, শীয়াদের মধ্যে থেকে দাড়ির রেওয়াজই উঠে গেল। পরবর্তীকালে অনেক সুন্নীও দাড়ি ছাঁটতে বা একেবারে মুণ্ড করতে লাগল।

দাড়ি মুড়িয়ে ফেলার শখ থেকে বহুবিধ ফ্যাশানের জন্ম হল। কেউ কানের নীচে ছোট-ছোট জুল্‌ফী রাখল, কেউ চাপদাড়ি, কেউবা ইয়া বড়ো-বড়ো গালপাট্টা। লখনউয়ের আশপাশের কস্‌বার অধিবাসীরা এবং শহরের কিছু সুন্নীরও ফ্যাশানে দাঁড়িয়েছিল রাজপুত ও হিন্দী পাঠানদের ঘরানার দাড়ি: চিবুকের ওপর সিঁথি কেটে, দ্বিধাবিভক্ত দাড়ির দুদিকের চুল দুই কানে চড়িয়ে দেওয়া। এই ফ্যাশানের দাড়িকে তৈরি করার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাড়িতে কাপড় বেঁধে রাখা হত। আবার গোঁফ আঁচড়ে ওই চড়িয়ে-দেওয়া দাড়ির সঙ্গে বেঁধে ঊর্ধ্বমুখী করে রাখা হত। এই ফ্যাশান এখানকার এবং গোটা হিন্দুস্তানের সিপাইগিরী ও বাহাদুরীর প্রতীক বলে বিবেচিত হত।

হযরত মুহম্মদের সময়ে মাথায় বড়ো-বড়ো চুল রাখা একটা দস্তুর ছিল। সে-চুল কাটা হত বা মুণ্ডিত হত একেবারে হজের সময়ে।

ইসলাম-আবির্ভাবের কিছুদিন পরে আরবেই মস্তক-মুণ্ডণের প্রথা প্রচলিত হয়। ইরানেরও ওই একই প্রথা বলে মনে হয়। মুসলমানরা যখন প্রথম হিন্দুস্তানে এল, সে সময় তাদের ছিল মুণ্ডিত শির, তার ওপর পাগড়ী। এটাই ছিল তখনকার চলন। তখন হিন্দুদের মধ্যে মাথার চুল রাখার রেওয়াজ ছিল। এখানকার মুসলমানদের এটা পছন্দ হয়ে গেল। ওই যুগের শেষে দিল্লীর শরিফ ও আমীরদের আকর্ণ-

বিস্তৃত দীর্ঘ কেশ স্টাইল হয়ে দাঁড়াল। বিদ্বান, ধর্মপরায়ণ, শেখ ও সুফীরা এসবের বাইরে ছিলেন। আর ছিল ফ্যাশনতুরস্তরা—তারা নিত্য-নতুন কেতাব-কায়দার জন্ম দিত।

এই পোষাকে-আশাকে, ফ্যাশনে-ব্যসনে দিল্লীর শরিফ ব্যক্তিরা এলেন লখনউ। এখানে এসে নাজুক মেজাজ আরও নাজুক হয়ে গেল, বেড়ে গেল নিজেকে সাজাবার শখ। তারা অতি সুচারুরূপে চিরুণী দিয়ে মাথার চুল আঁচড়ে মেয়েদের মতো পাতা কাটতে লাগল, এবং এমন এক সাজসজ্জার আশ্রয় নিল, যার ফলস্বরূপ, নবযুবা ছেলেদের মধ্যে নারীসুলভ মনোহারিতা ফুটে উঠল। কিছুদিন পরে, ইংরেজের কাছে শিখে মেয়েরা যখন মাথা খুলে চুল ওলটানো শুরু করে দিল, সে-ফ্যাশানও কিছু-কিছু পুরুষ তখন আত্মসাৎ করে নিয়েছিল।

সিপাহী-বিদ্রোহের পর যখন ইংরেজী চাল-চলন গৃহীত হতে লাগল, হিন্দুস্তানের অন্যান্য অংশের লোকদের মতো এখানেও চুল কেটে একেবারে ইংরেজী ফ্যাশানের করে ফেলা হল। মুখের ওপর দাড়ি যতোটুকু বাকি ছিল, সেও বিদায় গ্রহণ করল।

লখনউ-রমণীদের কেশরঞ্জন, দিল্লীতে যেমন ছিল, বোধহয় সেই-রকমই। শাহী পরিবারের বধূ, এবং 'বনাও-সিংগার'[1] প্রসাধনসমৃদ্ধা নারীদের বিনুনী-করা 'চোটী'-তে বড়ো-বড়ো রঙীন দুপট্টার 'মুবাফ্' (ফিতে) বেঁধে, পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে, মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত এনে, পাকিয়ে, আটকে দেওয়া হত। এর চেয়েও বেশি সাজতে হলে, এর ওপর, চওড়া 'লচ্কা'[2] লেপ্টে দেওয়া হত। মনে হত : মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা বড়ো ভারী মোটা রূপোর বিনুনীই বুঝি বা ! মাথায় (অর্ধবৃত্তাকার) 'মেহরাবদার' কবরী। তার মাঝখানে কয়েকটি অলকা-তিলকা, আশেপাশে সোনালী বা রূপালী চূর্ণ, এবং তারকা-

[1] পেশাদার রমণী-কৃত শৃংগার। [2] সোনা বা রূপোর পাত লাগানো লেস।

খচিত নক্‌শার ডিজ্ঞাইন। মেয়েদের হাতে-পায়ে মেহদী তো লাগাতেই হত। তাদের সঙ্গে অনেক রংগীনমেজাজ মরদও মেহদী লাগাতে আরম্ভ করে দিল। তাই দেখে, বহিরাগতরা লখনউয়ের পুরুষদের মেয়েলী ব'লে মনে করত, এবং সেইনতো নামও সব রাখত।

৪। অখলাক-আদাত (শিষ্টাচার-স্বভাব)

সংস্কৃতির চতুর্থ উপকরণ : শিষ্টাচার ও স্বভাব। এ বিষয়ে লখনউ-বাসীরা খ্যাতি অর্জন করেছে। এখানে একে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই এর বর্ণনা অত্যাবশ্যক। বাস্তবিক, লখনউয়ে এশীয় সভ্যতার অনেক বিকাশ হয়েছে ; এবং এখানকার লোকেরা সংস্কৃতির যেসব রীতিনীতি পালন করেছে, অন্য শহরের লোক তা করে নি।

সভ্যতা বা সংস্কৃতি সেই ঔপচারিকতার নাম, যার দ্বারা রাষ্ট্র কৌলীন্য অর্জন করে। আজকাল প্রায়ই লোকেদের বলতে শুনি : মেলা-মেশার ক্ষেত্রে এইধরণের বা ওইধরণের সাংস্কৃতিক ঔপচারিকতা আসলে বেকার প্রদর্শনী ও অর্থহীন। এটা ওদের ভুল ধারণা। তাহলে তো খাওয়া-পরা-থাকার তাবৎ বিধি-ব্যবস্থাই এক নিরর্থক আড়ম্বর ; তাহলে তো পশুর মতো জীবন ত্যাগ করে মনুষ্য-জীবনে উত্তরণের সমস্ত ব্যাপারটাই ব্যর্থতার নামান্তর বলা যেতে পারে। আসল কথা হল, যেসব লোক মানবিক সংস্কৃতিসম্পন্ন নয়, এবং সভ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশার যোগ্যতা যাদের নেই, তারাই এই ধরণের যুক্তি তৈরি ক'রে আপত্তি জানাতে থাকে ; বলে : শহুরে বা সভ্য লোকদের এইসব লোকদেখানো ব্যাপার আমার আসে না ! অথচ, ভালো করে ভেবে দেখলে, মনুষ্যত্বটাই একটা বিরাট প্রদর্শনী ! ভালো খাওয়া, ভালো পরা, ভালো-ভালো জীবন-সামগ্রী বা সব কাজে পরিচ্ছন্নতা—সবই লোক-দেখানো।

শিষ্টাচারের প্রথম সিদ্ধান্ত : পরস্পরের সান্নিধ্যে, সুখ দুঃখের সবরকম কথাবার্তায়, অন্যকে নিজের চেয়েও বেশি প্রাধান্য দেওয়া,

নিজেকে তার পেছনে, নীচের স্তরে রাখা ; কারও সম্মানে উঠে দাঁড়ানো, তাঁর জন্যে ভালো জায়গাটি খালি করে দেওয়া ও সেইখানে তাঁকে বসানো, তাঁর সামনে হাঁটু মুড়ে বসা, মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শোনা, নম্রস্বরে জবাব দেওয়া—এসবই হল অপরকে নিজের চেয়ে বাড়িয়ে শ্রেষ্ঠতার মান্যতা-দান। স্বর্ণযুগে, লখনউয়ের শরিফদের মধ্যে এর যতো রেওয়াজ ছিল, তেমন আর কোথাও না।

এসব তো পরস্পর মেলামেশার রীতি তথা সামাজিকতার সঙ্গে যুক্ত। এই আচারই যখন শিষ্টাচার ও স্বভাবের অন্তরঙ্গ হয়ে যায়, তখন মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় ত্যাগ ও আত্মদানের ভাব। তখন তার সার্বিক লক্ষ্য : বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবহারে ও আচরণে ভালবাসা ও সহানুভূতির অভিব্যক্তি। শাহী শাসনকালে লখনউবাসীদের মধ্যে এ জিনিস পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল। এর ফল হয়েছিল : এখানে, বেশ ভারী সংখ্যাতেই, এমন সব লোক ছিল, বাইরে থেকে তাদের জীবিকার কোন সাধন ছিলনা, ভরণ-পোষণ করত বন্ধুরা ; কিন্তু এমন গোপনে করত, কেউ জানতেই পারত না। এবং জীবিকার উপায়-উৎস গুপ্ত থাকার জন্যে এরা ভূষিত বেশ ও আমীরী ঠাট-বাটের সঙ্গে বড়ো-বড়ো আমীরদের আসরে যেত, কারও সামনেই মাথা নীচু হত না। লখনউ যখন এই ধরণের লোকে ভর্তি, সিংহাসন গেল উলটে, এবং এদের এই বিচিত্র জীবিকাও সমাপ্ত হয়ে গেল।

আমীরদের ত্যাগ ও পরমার্থের এই মহিমা এখানকার মানবিকতা-বোধের এই মানদণ্ডই প্রস্তুত করে দিয়েছিল। অন্যের সঙ্গে ব্যবহারে এমন শিষ্টতা, আতিথ্য-সৎকারে এমন উদারতা প্রকাশ, যাতে কৃতজ্ঞতাবোধের অবকাশই থাকত না। দুনিয়ার তামাম বড়ো-বড়ো শহরে বড়ো-বড়ো ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তি আছে, প্রয়োজনকালে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তারা যে একটা পয়সাও বিনা স্বার্থে খরচ করছে না, তাদের আচার-ব্যবহারে তার স্পষ্ট প্রকাশই ঘটে। এর বিপ্রতীপ চিত্র লখনউয়ে—'দোস্তপরওঅরী'

(বন্ধুপ্রীতি) ও আভিজাত্যের সঙ্গে উদার ব্যবহারের এমন একটা সমন্বয় এখানে, যার ফলে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কোন পার্থক্য কারও নজরে পড়বে না।

সন্দেহ নেই, রাজ্যপতনের পর বড়ো-বড়ো আমীর সব গরীব হয়ে গিয়েছিল। গুপ্ত জীবিকার সাহায্যে যারা জীবন কাটাত, তারা উপবাস করতে লাগল। কিন্তু স্বার্থত্যাগ ও দানশীলতার পরিচয় দেবার ক্ষমতা তখন আমীরদের আর ছিলনা। অপরিবর্তিত রয়ে গেল শুধু শিষ্টাচার ও তার প্রকাশ, যা তাদের প্রকৃতিতে অন্তর্নিহিত হয়ে গিয়েছিল। অবস্থা-গতিকে দাঁড়াল : মুখে বড়ো-বড়ো আতিথ্য সৎকারের ভরসা দিত ; কিন্তু বাড়িতে অতিথি হলে তখন বোঝা যেত, ব্যাপার অন্যরকম। একেই অধিকাংশ ব্যক্তি মিথ্যা ও ব্যর্থ শিষ্টাচার বলে বুঝে রেখেছে। কিন্তু এ আড়ম্বর নয়, প্রদর্শনীও নয়, এ হল সাহসের ব্যাপার। যে সাহস এদের সামর্থ্যে নেই। এসব লোকের কথার প্রতিবাদ করবেন না ; এদের অবস্থার জন্যে করুণা করুন।

তবে একথাও অস্বীকার করা যায়না, যে, ঐশ্বর্যের দিনে, শহরাঞ্চলের বেশির ভাগ লোক আমীর, শরিফ ও দোস্তদের গুপ্ত সাহায্যের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকত বলে পরিশ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা ও সময়ের মূল্য সম্পর্কে বোধ লখনউবাসীদের মধ্যে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল ; এবং জীবন-যাপনের যে পদ্ধতি এরা গ্রহণ করেছিল, তা এদের জাতীয় প্রগতির পথ থেকে দূরেই সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ভোগবিলাসের আনন্দই ছিল একমেব, তাছাড়া আর কিছুই জানত না এরা। দুর্ভাবনা ও জীবিকার চিন্তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ফলে এরা কবুতর-বাজী, বটেরবাজী, 'চ্যসর'[1] 'গনৃজিফা'[2] 'শতরঞ্জ'[3] ইত্যাদি ব্যসনেই মেতে রইল এবং আয়ের বেশির ভাগটাই খরচ করতে লাগল এইসব কাজে। 'কালকের চিন্তা' শব্দ গোটা জনপদের কাছে অপরিচিত ছিল। এমন কোন আমীর ছিল না, যার এইসব বাজে কাজের

[1] চার রঙের ঘুঁটি দিয়ে খেলা। [2] তাস। [3] দাবা।

কোন একটারও শখ ছিল না, যে আরও অনেককে এই শখে ভিড়িয়ে নেয় নি।

ব্যভিচার ও গণিকাগমন থেকে দুনিয়ার কোন শহরই মুক্ত নয়। বিশেষ ক'রে য়োরোপের কদাচার ও কদর্য ব্যভিচার, খোদা না করুন, আমাদের শহরে যেন আবির্ভূত না হয়। কিন্তু শুজাউদ্দৌলার সময়ে লখনউয়ে গণিকাদের সঙ্গে সম্বন্ধ-স্থাপনের যে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, দিনদিন তা বেড়ে গেছে। স্বকীয় শখের পরিপূর্তি ও বৈভব প্রদর্শনের জন্যে রক্ষিতা রাখতেই হবে—এটা একটা আমীরী আচরণই হয়ে গিয়েছিল। হকীম মেহদীর মতো যোগ্য, হুঁশিয়ার ও শিষ্ট ব্যক্তি, যিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ পেয়েছিলেন, তাঁরও উন্নতির মূলে ছিল পিয়াজু নামে এক বারবণিতা—যে নিজের কাছে অন্যের জমা-রাখা টাকা দিয়ে তাঁকে একটি সুবার নিজামতী পাইয়ে দিয়েছিল। এই উচ্ছৃঙ্খলতার একটা ছোট অথচ সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত লখনউয়ের একটি খ্যাত প্রবচন : "জব তক ইনসান কো রণ্ডিয়োঁ কী সোহবত ন নসীব হো, আদমী নহী বনতা"—'বেশ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অদৃষ্টে যতদিন না হচ্ছে, ততদিন কোন ব্যক্তিই পুরোপুরি মানুষ হতে পারে না।' এর ফলে লোকেদের নৈতিক অধঃপতন ঘটল। আমাদের সময়েও লখউয়ে এমন কয়েকজন গণিকা ছিল, যাদের ঘরে প্রকাশ্যে ও নিঃসংকোচে যাওয়া এবং তাদের সঙ্গে বসবাস করা খারাপ মনে করা হত না। এই প্রথা এদের অভ্যাসকে অনেকখানিই বিকৃত করে দিয়েছিল, এবং পরিণামে আচরণের একটা ধারা গড়ে দিয়েছিল।

এখন অবশিষ্ট রইল স্ত্রীজাতির স্বভাব ও শিষ্টাচার।

এই প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য : যেসব লোক ব্যভিচারে আসক্ত, তাদের স্ত্রীরা সচ্চরিত্রা হতে পারে না। তবু, এও অপ্রতিবাদ্য, যে, লখনউয়ের পুরুষদের আচরণ যতোটা খারাপ ছিল, স্ত্রীলোকদের ততোটা ছিল না। সুশীলতা এবং আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে সাদরসম্মানে মেলামেশা—পুরুষদের মধ্যে যেমন, স্ত্রীলোকদের মধ্যেও তেমনি ছিল।

কোন এক সময়ে চর্‌খা-কাটা বড় ঘরের মেয়েদের অভিজাত বিনোদন বলে মনে করা হত। সুতোর কল এসে চর্‌খা-কাটাকে একেবারে অকেজো ও নিষ্ফলা করে দিয়েছে। তবে, তারও আগে শৌখীনতা ও আমীরী মেয়েদের একাজ ছাড়িয়ে দিয়েছিল। তার বদলে, সেলাই-ফোঁড়াই, এমব্রয়ডারী, ঘরদোর পরিষ্কার রাখার ব্যবস্থা করা, দাসী, আর্দালী, বয়-বাবুর্চীদের দিয়ে কাজ করানো, এবং সাজগোজ করার শখ স্ত্রীলোকদের মধ্যে বেশি ছিল। ঘরের কাজ, স্বামী, বাচ্চাদের কাপড়চোপড়ের যত্ন ইত্যাদি থেকে ফুর্‌সত মিলত না বলেই, যে-ব্যভিচারে পুরুষ ফেঁসে গেছে, তাতে এরা ফেঁসে যায়নি। সে সময় পুরুষ ঘরে বসে খেলা করত, এবং ঘর-বার, এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজ শুধু মেয়েদের দমের ওপরেই চলত।

কিন্তু আমীরদের মহলে সমস্ত কাজ যখন দাসী, বাঁদী, আর্দালী ও ধাইদের হাতে চলে গেল, তখন উঁচু ঘরের বেগমদের সামনে ‘মুজরা’ করার জন্যে ডোমনীদের ডাক পড়ল। শহরে তখন ডোমনী-দের অসংখ্য দল। যে মহলে ডোমনীরা স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হত না, সেখানে ডোমনীরা ঘন-ঘন আসা-যাওয়া করত, প্রায় প্রতিদিনই তবলা সারেংগী নিয়ে দেউড়ীতে অপেক্ষা করত। আমি যত্তোদূর জানি—ডোমনীদের রুচি অত্যন্ত অশ্লীল, ভাঁড়ামীতে ভর্তি ; এদের সান্নিধ্যের ফল কখনও ভালো হয় না। ফলত, গণিকারা যেমন ছিল পুরুষদের নীতিবিগর্হিত আচরণের উৎস, তেমনি স্ত্রীলোকদের আচরণ-বিকৃতির কেন্দ্র ছিল ডোমনীরা।

উচ্চবংশের রমণীরা এই ডোমনীদের সঙ্গ থেকে দূরে ছিল, তাই এদের ইত্যাকার কু-প্রভাব থেকে বেঁচে গিয়েছিল ; এবং উন্নত আচার-ব্যবহারের আদর্শ হয়ে ছিল। লখনউ রমণীদের চরিত্রধর্ম : স্বামীর জন্যে নিজের যথাসর্বস্ব বলি দেবার প্রস্তুতি। নিজের মর্যাদাকে স্বামীর মর্যাদারই এক অংশ বলে এরা মনে করে। অন্য শহরের স্ত্রীলোকরা ঘর-গৃহস্থালীর কাজে অনেক পারদর্শিনী। কিন্তু তাদের

মতো, স্বামীর কাছ থেকে লুকিয়ে নিজে কিছু টাকা জমাব, স্বামীর অসুখেও স্ব-ধন খরচে সংকোচ করব—এ-বুদ্ধি লখনউ-রমণীদের মনে কখনও জন্মায়নি। লখনউয়ের রমণীরা ওখানকার স্ত্রীলোকদের মতো পটীয়সী নয়, ঘর-গৃহস্থালীর কাজে ওদের সামনে দাঁড়াতেই পারবে না। বেহিসাবী খরচ করে, লোভও আছে। কিন্তু পতিকে সঙ্গদান, এবং তার জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করার গুণে—সকলের আগে।

॥ 39 ॥

৫। নিশস্‌ত্‌-বরখাস্‌ত্‌ (সৌজন্য)

সৌজন্য তথা সভা-সমাবেশে ওঠা-বসার রীত্‌-কানুন সংস্কৃতির পঞ্চম অঙ্গ।

সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতিমাত্রেরই সৌজন্যের কতকগুলো বিশেষ নিয়ম বর্তমান থাকে। তা থেকেই ওই জাতির সভ্যতা ও তার প্রগতির স্তর যাচাই করা যায়। আপনি খ্রীস্টানদের সুসংস্কৃত নগরী প্যারিস, লণ্ডন ও বার্লিনে কিংবা মুসলমানদের সুসভ্য নগর তেহরান কি শীরাজ-এ যান, এবং ওখানকার সভ্য ব্যক্তিদের সম্মেলনে যোগ দিন, দেখতে পাবেন: শিষ্টাচারের নিয়মাবলী কতো কড়াকড়ি ভাবে ওখানে পালিত হয়। আপনি হিন্দুস্তানের বড়ো-বড়ো বাণিজ্য-নগরীতে যান, ওখানকার ধনী ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন—শিষ্টাচার-বিধির কোন সন্ধানই পাবেন না। কিন্তু যে শহরে কোন বড় দরবার ছিল বা এখনও আছে—যেমন, হায়দরাবাদ-দাক্ষিণাত্য, ভূপাল, রামপুর ইত্যাদি—প্রতিষ্ঠাশীল দেশী দরবার স্থাপিত হওয়ার জন্যে অভিজাত ও লোকসমাজ, সকলের মধ্যে, ছোট-বড় বাছবিচারের নিয়ম একই রকম। বাণিজ্য-নগরীতে এর উল্‌টা:

'তমীযদারী'[১] আদাব[২] ও ছোট-বড়র সম্বন্ধের বাছবিচারের নাম-গন্ধ পর্যন্ত নেই।

দিল্লীর দরবার ছিল সবচেয়ে বড়, এবং একশো বছরেরও বেশি স্থায়ী। অতএব, সেকালে অন্য জায়গার তুলনায়, দিল্লীর আচারতন্ত্র অনেক সমৃদ্ধ ছিল। ক্রমশ ব্যাপারীরা ওখানকার সমাজ ছেয়ে ফেলেছে; সংস্কৃতির গোটা ভবিষ্যৎ মিশে গেছে ধুলোয়। আমীরী, রইসী, 'হুকুমত' থেকে শালীনতার বুনিয়াদ তৈরি হয়। শাসনতন্ত্র, রাজপাট বলে দেয়—ছোটর বড়র সঙ্গে, বড়র ছোটর সঙ্গে কীভাবে মেলামেশা করা উচিত, এবং সমকক্ষদের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার কর্তব্য। আমীরদের এই আচার-ব্যবহার সম্বন্ধীয় কষ্টস্বীকারের সঙ্গে বণিকদের শত্রুতা আছে। লেন-দেন ও স্বার্থপরতার ওপর ভিত্তি করেই ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে ওঠে। ফলত, আত্মত্যাগকে, অর্থাৎ নিজের সময়, নিজের টাকা, নিজের দৌলত অন্য কাউকে অকারণে উৎসর্গ করাকে এরা বলে মূর্খতা। অন্যদিকে, এর বিপরীতে, রইস তথা সামন্তদের বৈশিষ্ট্যই হল, স্বীয় পক্ষের লোককে অথবা যোগ্য ব্যক্তিকে নিঃস্বার্থ-ভাবে সুযোগ-সুবিধাদি দান। এর অবশ্যম্ভাবী ফল এই ঘটে: যেখানে বাণিজ্যের উন্নতি হতে থাকে, এবং সামন্ত ও অভিজাতবর্গের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে দাবিয়ে রাখতে থাকে বণিক-সংস্কৃতি, সেখানে কোনরকম নৈতিকতাই বেঁচে থাকতে পারে না। এই কারণেই দিল্লীর প্রাচীন গরিমামণ্ডিত দরবারের সমস্ত গৌরব ও মহিমা ম্লান হয়ে গেছে; থেকে গেছে সেইটুকুই, যা তার ঐতিহাসিক খ্যাতির অনুকূল ছিল।

পুঁজিপতির দল যখন দিল্লীর সংস্কৃতিকে হত্যা করল, তখন সেই সংস্কৃতি আপন প্রাচীন জন্মভূমি থেকে পালিয়ে লখনউয়ের কনিষ্ঠ দরবারের শরণ নিল। ছোট দরবার; কিন্তু তার সীমায় প্রবেশের পর কারও নজরেই পড়ত না: এর চেয়ে বড় আর কোন দরবার আছে! তাই, এখানেই বসে, স্বাধীনভাবে, দিল্লীর শরিফ ব্যক্তিরা

---

[১] শীলতা। [২] শিষ্টাচার।

স্বকীয় সৌজন্যের নিয়মাবলী পালন করতে লাগলেন। কিছু দিনের মধ্যেই সারা হিন্দুস্তানে সভ্যতা ও শিষ্টতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল অদ্বিতীয় লখনউ। অন্যান্য সমস্ত শহরের লোকেরা লখনউবাসীদের অনুসরণ করতে লাগল। কোন্ লোককে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে স্বাগত করতে হবে, কার জন্যে উঠে দাঁড়ানো দরকার, কার জন্যে অর্ধেক ওঠা, আর কোন্ ব্যক্তিকে স্বস্থানে বসে-বসেই "আইয়ে, তশরীফ লাইয়ে"[১] বলাই যথেষ্ট—এইসব বিধিবিধানের সৃষ্টি ঐচ্ছিকতা ও বিবেকের ওপর নির্ভরশীল। এবং এই জাতীয় বিবেকসম্পন্ন যতো সভ্য ও শিষ্ট ব্যক্তি লখনউয়ে বিদ্যমান, আর কোথাও হয়তো তা নেই।

এখানে সমকক্ষ কেউ এলে উঠে দাঁড়িয়ে এরা তার অভ্যর্থনা করবে, তার জন্যে সবচেয়ে ভালো জায়গা খালি করে দেবে, এবং যতক্ষণ না সে বসবে, নিজে বসবে না। যখন বসবে, শিষ্ট শালীনতার সঙ্গে, সভ্যভব্যভারে ; মুখে প্রফুল্লভাব আনবে, যাতে তার খারাপ কিছু মনে না হয়। সে যখন কোন জিনিস দেবে, সাদরে গ্রহণ করবে। খেয়াল রাখতে হবে, গৃহস্থের কোন আচরণ যেন তার অপ্রিয় না হয়। তার সঙ্গে বসে থাকার সময় অন্য কোন জরুরী কাজের দিকে মন দিতে হলে, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে তবে ওই কাজ করবে। কোথাও উঠে যাবার দরকার হলে, তার কাছ থেকে 'ইজাযত'[২] নিয়ে তবে যাবে। তার সঙ্গে যদি যেতে হয়, পথে তার পশ্চাতে থাকবে, তাকে আগে যেতে দেবে। শিষ্টাচারের নিয়মানুসারে সেও আগ্রহ করে বলবে: "পহলে আপ তশরীফ লে চলেঁ।"[৩] কিন্তু এপক্ষ থেকে বারবার বলতে হবে: "জনাব আগে তশরীফ লে চলেঁ ; ম্যঁয় কিস কাবিল হূঁ।"[৪] যখন সে কিছুতেই মেনে নেবে না, এবং বাধ্য করবে, তখন 'শুক্রিয়া'[৫] জ্ঞাপন করতে করতে ঝুঁকে সেলাম করবে এবং সামনে পা বাড়াবে—তাও এমনভাবে, তার দিকে যেন পিঠ না থাকে।

[১] 'আসুন আসুন'। [২] অনুমতি। [৩] 'প্রথমে আপনি চলুন।' [৪] 'মহাশয়, আপনি আগে চলুন ; আমার যোগ্যতা কী।' [৫] ধন্যবাদ।

প্রায়-লোকই এই ধরণের শিষ্টাচার নিয়ে মজা করে। আর, সেই লোকোক্তি তো প্রসিদ্ধ : "লখনউয়ের লোকেরা 'পহলে আপ, পহলে আপ' বলতে থাকে, ওদিকে ট্রেণ ছেড়ে দেয়, দুজনে পড়ে থাকে স্টেশনে।" একথা অনস্বীকার্য, যে, সব জিনিসেরই সীমাকে ছাড়িয়ে যাওয়া অশোভন ও ক্ষতিকর। কিন্তু তা থেকে এটা প্রমাণিত হয়না, যে, সভ্যতার নিয়ম-পালন লখনউবাসীদের শিষ্টাচারের এমন একটা অঙ্গ হয়ে গেছে যে তার ব্যবহারে-প্রকাশে যেটা লোকসানের দিক, সে বিষয়ে তাদের দৃষ্টি নেই। যে-ব্যক্তির মধ্যে শিষ্টতা ও সভ্যতার অভাব, তার আপত্তি থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু যে-ব্যক্তি শিষ্ট ও সভ্য, সে এগুলিকে, দোষ সত্ত্বেও, শিষ্টাচারের গুণ বলেই মনে করবে।

এখন তো অন্য সব শহরের মতো এখানেও টেবিল-চেয়ার ও ইংরেজী ফার্নিচারের রেওয়াজ হয়ে গেছে। আগে কিন্তু ফরাশের ওপরেই সবাই বসত। ফরাশের মূল্য ও কারুকাজ কতোটা হবে, তা নির্ভর করত প্রত্যেকের আর্থিক ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদার ওপর। গৃহে যদি কোন সমবয়স্ক অথচ অপরিচিত, অথবা কোন পরিচিত বয়স্ক বা সম্মানিত ব্যক্তির আগমন হত, তাঁকে বসানো হত 'গাও' বা বড়ো তাকিয়ার সামনে ; এবং উপস্থিত সবাই গোল হয়ে—সংখ্যা-অনুযায়ী ছোট বা বড় বৃত্ত রচনা করে—শিষ্টতার সঙ্গে হাঁটু মুড়ে বসে যেত। তিনি যার সঙ্গে কথা বলতেন, সে করজোড়ে অতি বিনম্রভাবে উত্তর দিত। তাঁর সামনে বেশি কথা বলা বা তাঁর কণ্ঠস্বরের চেয়ে নিজ স্বরকে উঁচুতে তোলা আচরণগত অপরাধ বলে গণ্য হত।

সবাই যদি সমকক্ষ, পরস্পর বন্ধু এবং সমরুচিসম্পন্ন হত, তাহলে বৈঠকে থাকত 'বেতকল্লুফী' (অন্তরঙ্গতা)। বয়সে ও সামাজিক মর্যাদায় সবাই সমান, 'তকল্লুফ' 'প্রথাগত সৌজন্য' গরহাজির, তবু পারস্পরিক সমাদর অব্যাহত। খেয়াল রাখতে হত : কারও দিকে যেন পিঠ না থাকে ; এমন কোন কথা যেন না ওঠে যাতে কারও অপমান হয় ; কারও ইজ্জত কম এমন যেন মনে না হয়। চাকর বা

খিদমতগাররা অতিথিদের পাশে বা যে-ফরাশে বন্ধুরা উপবিষ্ট, তার ওপর বসতে পারত না। হুকুম তামিলের জন্যে তারা সভ্যভব্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, অথবা দৃষ্টির আড়ালে কাছাকাছি এমন জায়গায় থাকত, যেখানে ডাক পৌঁছয়। চাকরবাকরদের সবসময়ে দাঁড়িয়ে থাকা এবং বেশি কথা বলা অসভ্যতা বলে মনে করা হত।

চাকর পানদান অথবা হুঁকো নিয়ে এসে রাখলে 'মেযবান' (গৃহস্বামী) নিজের হাতে বন্ধুদের সামনে বাড়িয়ে দিত ; বন্ধুরাও উঠে 'তসলীম' (নমস্কার) অন্তে গ্রহণ করত। অন্তরঙ্গ মাইফেলে, দরকার না হলে, ছোটদের আসা নিষেধ ছিল। যদি প্রয়োজন-বশত কখনও আসত, তাহলে খুব শিষ্টতার সঙ্গে অবনত হয়ে পিতৃবন্ধুদের 'আদাব' জানাত। সে আসতেই বড়দের এই 'সহবত' (সংগতি) 'বেতকল্লুফ' অন্তরঙ্গতার রং বদলে শিষ্ট ও শালীন হয়ে যেত। বয়ঃকনিষ্ঠরা যেমন বড়দের প্রতি শিষ্টতা প্রদর্শন করত, বড়রাও তেমনি ছোটদের কথা মনে রেখে সংযত হয়ে যেত।

প্রত্যহ দেখাসাক্ষাৎ যেসব বন্ধুর সঙ্গে, তাদের করমর্দন বা আলিঙ্গনের রেওয়াজ। 'হাত মেলানো' প্রথাটি সীমাবদ্ধ ছিল নেতা বা প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের হস্ত-চুম্বনে। আর, আলিঙ্গন বিহিত ছিল সেইসব বন্ধুর সঙ্গে, যারা বাইরে থেকে ঘুরে এসেছে বা যাদের সঙ্গে অনেকদিন পরে সাক্ষাৎ হয়েছে।

অন্তঃপুরে সমাগত পুরুষ স্ত্রীলোকদের সমাদর জানাত। কিন্তু অসম্ভব ছিল উভয় পক্ষের অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা। অবশ্য, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রথাগত শিষ্টাচারের কোন প্রশ্নই ছিলনা। তবে, ঘরের বয়স্কা রমণীদের সামনে তারাও 'বেতকল্লুফ' বা 'বদল্লুফ' (অশিষ্ট) কোনমতেই হত না। দেহাতের শরিফদের মধ্যে রেওয়াজ ছিল : নতুন বধূ যতদিন না চারটি-পাঁচটি ছেলে-মেয়ের মা হত, ঘরের অন্যান্য মহিলাদের সামনে, স্বামীর সঙ্গে 'পর্দা' করত, অর্থাৎ মুখ ঢেকে থাকত বা আড়াল রেখে চলত। কোন আত্মীয় বা আত্মীয়া স্বামীকে স্ত্রীর কাছে বা স্ত্রীকে স্বামীর কাছে যেতে দেখবে—এমন হতেই পারত না।

শহরের শরিফদের মধ্যে এতোটা কড়াকড়ি ছিলনা। শহুরে পরিবারে পতি-পত্নী গোড়া থেকেই একই দস্তরখানের ওপর খানা খেত। তবে, দাসী-বাঁদীদের সামনে নিজেদের মধ্যে অন্তরঙ্গতার প্রকাশ অশোভন বলে বিবেচিত হত।

নিজেদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ হলে মহিলামহলে 'বেতকল্লুফ'টা কিছু বেশিই হত। তবে, বড়ো-বড়ো আমীর-ঘরণীদের কথা স্বতন্ত্র। অতিথি-স্ত্রীলোক এলে, একটা উপযুক্ত সীমা পর্যন্ত 'তকল্লুফ' থাকত, তার সঙ্গে থাকত একাত্মকতা ও নিষ্ঠার অভিব্যক্তি।

॥ 40 ॥

সৌজন্য-শালীনতা প্রসঙ্গেই কথাটা আসে।

পরস্পর মেলা-মেশা ও সংগতি লাভের জন্যে য়োরোপ বা আরব বা ইরানে যেমন 'ক্লাব' ও 'সোসাইটি'র প্রচলন আছে, হিন্দুস্তানে তেমন ছিলনা। য়োরোপে সর্বত্র এমন 'ক্লাব' বা 'সোসাইটী' আছে, যেখানে গিয়ে লোকেরা বন্ধুবান্ধব ও সমরুচির লোকেদের সঙ্গে মিলিত হয়, এবং তাদের সান্নিধ্য সুখ লাভ করে। আরবী, ইরানী ও তুর্কীদের মধ্যে 'চায়খানা' ও 'কফিখানা' মেলামেশার ও ভাব-বিনিময়ের কেন্দ্র হয়ে গেছে। দু'চারজন ইংরেজ একত্রিত হলেই 'ক্লাব' গড়ে এবং অবকাশ সময়ে সেখানে গিয়ে সংবাদপত্র পড়ে ও বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়। দু'চারজন ইরানী বা আরবী একত্রিত হলেই 'চায়খানা' বা 'কফিখানা' খুলে যায়। যখনই যাবেন, দেখবেন, কোন-না-কোন একটা দল সেখানে উপস্থিত আছেই—চা খাচ্ছে, হুঁকো খাচ্ছে, খানা খাচ্ছে, এবং একসঙ্গে বসে 'গপ্প মারছে'।

এর উল্টোদিকে, হিন্দুস্তানে এধরণের 'ক্লাব' বা 'চায়খানার' রেওয়াজ কখনও ছিলনা, আজও নেই। ইংরেজ সরকার চেষ্টা

করেছেন এই রুচি তৈরি করে দিতে, অনেক খরচ করে শহরের জায়গায় জায়গায় চায়ের দোকান খুলিয়েছেন; কিন্তু সফল হতে পারেন নি। আজ থেকে ত্রিশ কি পঁয়ত্রিশ বছর আগে, মীর মহম্মদ হুসেন সাহেব (ডাইরেকটর: কৃষি ও বাণিজ্য) নিজাম-হায়দরাবাদ যাবার আগে গভর্নমেণ্টের সহায়তায় লখনউয়ের চকে একটা চাখানা খুলিয়েছিলেন। ভালো ফারনিচার, সব রকম পেয় তৈরির ব্যবস্থা; পানীয় ছাড়া আর কিছু না; কিন্তু কেউ গা-ই করল না! শেষে, অনেক লোকসান দিয়ে মীর সাহেবকে দোকানটি বন্ধ করে দিতে হল।

সব মহল্লায়, জানপদের তাবৎ এলাকায় এখানকার পুরনো প্রথা: কোন একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে লোকেদের আসার ও মেলামেশার আয়োজন করত। বন্ধুদের খাতিরের জন্যে নিজের খরচায় হুঁকো-পান ইত্যাদি জরুরী জিনিসের ব্যবস্থা করত। বন্ধুরা প্রতিদিন যথাসময়ে আসত। বৈঠক চলত অনেকক্ষণ। চুট্‌কি শোনানো হত, নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-ইয়ার্কি চলত। যতক্ষণ বৈঠক, পান-তামাকও ততক্ষণ। বন্ধুত্বের স্তর অনুযায়ী মাইফেলের রং যেত বদলে। সমবেত হৃদয়গুলি যদি কাব্য-পিপাসু হয়, তাহলে কবিতা ও অন্যান্য সাহিত্য বিষয়ে চর্চা হত। যদি বিদ্বানদের মণ্ডলী হয়, তবে শাস্ত্রালোচনা হত। সুসংস্কৃত সামন্ত বা আমীরদের বৈঠক হলে ঐশ্বর্য, বেশভূষা, খানা-পিনা, বিভিন্ন দ্রব্যের ব্যবহার, বিভিন্ন রুচির অনুকূলতা, এইসব প্রসঙ্গ উঠত; তাতে থাকত পরিচ্ছন্ন ভব্যতা ও পরিশীলিত শিষ্টাচার। আর, যদি রঙ্গীন-স্বভাব কামাচারীদের মাইফেল বসত সেখানে আসত বাজারের সুন্দরীরা, তাঁরা ছলা-কলা দেখাত। লক্ষণীয়: এখানকার পুরুষদের কোন গোষ্ঠী বা সম্মেলনে, য়োরোপের মতো ভদ্র ও সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকেরা যোগ দিতে পারত না। এই বন্ধুমণ্ডলীতে কোন নারী যদি আপনার চোখে পড়ে, তাহলে জেনে রাখবেন, সে নিশ্চয়ই কোন বারবধূ। য়োরোপে, সভা-সমাবেশে ভদ্র ও শিষ্টা মহিলারা যোগ দেন বলে ওখানকার সমাজ থেকে বারবনিতাদের মান ও মর্যাদা একেবারে নেমে গেছে। কোন

অভিজাতবংশীয়ের বাড়ি তারা আজ আর ঢুকতে পারেনা। 'ক্লাবে', 'সোসাইটীতে'ও প্রবেশ নিষেধ। এর বিপ্রতীপ চিত্র আপনি দেখতে পাবেন, কিছু পরিমাণে গোটা হিন্দুস্তানেই, এবং বিশেষ ক'রে লখনউয়ে। এখানে বারবধূদের মর্যাদা এতোখানি ছিল, যে, সভ্য সুসংস্কৃত সামন্তদের সঙ্গে একত্রে তারা আসরে গিয়ে বসত। রুচিটা এতো বেড়ে গিয়েছিল, যে, কিছু প্রতিষ্ঠাসম্পন্না গণিকাও স্বগৃহে এইরকম সম্মেলনের আয়োজন করত, এবং ভদ্র-শিষ্ট ব্যক্তিদেরও সেখানে যেতে কোন লজ্জা সংকোচ হত না। লখনউয়ের চৌধুরাইন বী হায়দার জান এবং ওই স্তরের গণিকাদের বাড়ি ছিল প্রথম শ্রেণীর 'ক্লাব', যেখানে শরিফরা আসত-যেত, যেখানে বিবি-সাহিবার তরফ থেকে হুঁকো-পান দিয়ে খুব খাতির করা হত। ইংরেজী রুচি একে এমনভাবে সংশোধন করে দিয়েছে,—যদিও এরুচি থেকেও নানান রকম নতুন-নতুন অশিষ্টতার জন্ম হচ্ছে, তবু—গণিকালয়ে খোলাখুলি বসে তাদের সংগতি-সুখ-লাভ ব্যাপারটি অধুনা কিছুটা অভব্যজনক বলে মনে করা হচ্ছে।

বরাবরই লখনউয়ের 'ক্লাব' বলতে আমীর ও সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাড়ি। 'সাঝেঁ কী হাণ্ডী' (পিক্‌নিক্) অর্থাৎ সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে, নিজের-নিজের পয়সায় হুঁকো-পান খাবে, বা একসঙ্গে বসে খানা-পিনা করবে—এ পদ্ধতি এখানে খুবই অভদ্র বলে বিবেচিত—সেকালে, একালেও। 'চাঁদার ডিনার' এখানকার সমাজের পক্ষে লজ্জাজনক ও ভদ্রতাবিরোধী ছিল। এখানে যাবতীয় নিমন্ত্রণের আয়োজন—হোক্ সে কোন খুশির ব্যাপার অথবা শুধুই বন্ধুদের অতিথি সৎকার—যেকোন একজন ব্যক্তির পক্ষ থেকেই করা হত। আর-কারও সামর্থ্য থাকলে সেও নিজের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ করত। কিন্তু, 'আমার খাবার জন্যে পাঁচ টাকা নিয়ে আপনার নিমন্ত্রণে আমাকেও শরীক করে নিন'—এটা কিছুতেই করতে পারত না।

দিল্লীর বণিকদের মধ্যে 'পাতা পড়া'-র রেওয়াজ আছে। অর্থাৎ

অনেক ব্যাপারী মিলে চাঁদা জমা করে, এবং সেই টাকা দিয়ে কারও ঘরে অথবা বাইরের কোন মনোরঞ্জন-স্থলে খাওয়া-দাওয়া বা নাচ-গানের আসর বসায়। আমার বিশ্বাস, মুগল শাসনের পতনের পরেই ওখানকার পুঁজিপতিরা এই প্রথাটি আবিষ্কার করেছে। দিল্লীর শরিফদের মধ্যে এর চল কোনদিনই ছিল না। তা যদি থাকত, তাহলে লখনউয়েও এটা চালু হয়ে যেত। যে-লখনউ সভ্যতায় ও সুরুচিতে দিল্লীরই 'শাগির্দ' (সাগরেদ)।

৬। সাহব-সলামত—মিযাজপুর্সী (অভিবাদন ও কুশল-প্রশ্ন)

সংস্কৃতির অন্য সমস্ত অঙ্গের তুলনায় সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান হল ষষ্ঠটি : অভিবাদন ও মঙ্গল-কুশল প্রশ্ন। ইসলামের প্রাচীন ধর্মীয় ও সাদা-সিধে অভিবাদন : 'আস্‌সলাম আল্যায়ক'; আর অনেক লোক থাকলে 'আস্‌সলাম আল্যায়কুম'। এই সেলামের পর এর সঙ্গে আরও যোগ করা হত—সকালে কারও সঙ্গে দেখা হলে 'সুবহকুম আল্লা বিলখ্যার' অর্থাৎ আল্লাহ তোমার সকালটি ভালোয় ভালোয় কাটিয়ে দিন; আর, সন্ধ্যেবেলা মিলিত হলে 'মস্‌সাকুম আল্লা বিলখ্যার' বলত। এই সেলাম ও 'মিযাজপুর্সী' (কুশল-প্রশ্ন) ছিল আরবদের। এই শিক্ষা প্রসারিত হতে-হতে পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত চলে গেছে এবং পুর্বে চলে এসেছে হিন্দুস্তান পর্যন্ত। য়োরোপে অভিবাদনের এই রীতিই ইংরেজ প্রভৃতি শিখেছিল; পুর্বদেশে শিখেছিল ইরানী, তুরানী ও হিন্দুস্তানীরা। যে মূল-অভিবাদন ইসলামের বিশেষত্ব ছিল, য়োরোপে তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, থেকে গেছে পরবর্তী প্রার্থনা দুটি : 'সুবহকুম আল্লা বিলখ্যার' এবং 'মস্‌সাকুম আল্লা বিলখ্যার'। এদেরই তর্জমা 'গুড্ মর্‌নিং' ও 'গুড্ ইভনিং' ইংরেজদের মুখ থেকে আমরা আজ শুনতে পাই। ফরাসী ভাষায় বলা হয় 'বন্ মাতিনে', 'বঁ জুর' ও 'বঁ সোয়ার' অর্থাৎ 'শুভ হোক তোমার সকাল-দিন-সন্ধ্যা'। কোন সন্দেহ নেই, এই সব পাশ্চাত্ত্য

জাতি অভিবাদনের এই পাঠ পেয়েছে স্পেন-বিজেতা আরবদের কাছ থেকে।

'আস্‌সলাম আল্যায়কুম' শব্দদ্বয় ব্যক্তি ও সমষ্টির সাম্যকে ব্যক্ত করে। ইরানে ও হিন্দুস্তানে পূর্বপুরুষদের পূজা প্রচলিত ছিল এবং প্রাচ্যবাসীদের জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। ফলে, অহংকারী ও হামবড়া ধনবানদের কাছে সাদামাটা 'আস্‌সলাম আল্যায়কুম' খুব নিষ্প্রভ এবং স্বমর্যাদার অনুপযুক্ত মনে হয়েছিল। বিশেষ ক'রে, এখানে যখন শাহানশাহী দরবার স্থাপিত হল, বাদশাহরা নিজেরা আদর-সম্মান পাবার জন্যে গোটা ইসলামী শিষ্টাচারকে হত্যা করলেন। বন্দা যেমন খুদার সামনে দাঁড়িয়ে 'রুকূ' ও 'সজ্‌দা' করে (নমাজ পড়ার সময় প্রার্থনার জন্যে অবনত) ঠিক সেইভাবে বাদশাহর সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর সম্মানে অবনত হওয়ার হুকুম জারী হল দরবারীদের ওপর। শাহী দরবারের অনুকরণে আমীর ও ধনিকরাও 'আস্‌সলাম আল্যায়কুম'-এর পরিবর্তে অন্যান্য সম্মানসূচক শব্দ সেলামের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিলেন। যথা : 'তসলীম', 'কোর্‌নিশ', 'আদাব', 'বন্দেগী'। আত্মশ্লাঘী ও ঈশ্বর-বিমুখ মুসলমান আমীরদের চেষ্টায় এইসব শব্দ এখন আমাদের অভিবাদনের অন্তর্গত হয়ে গেছে। আরবে "আস্‌সলাম আল্যায়কুম" বলার সময় মুখের প্রফুল্লতা ছাড়া আর কোন প্রত্যঙ্গের হাব-ভাব প্রকাশ করা হত না। সেলামের পর, হাতে হাত মেলানো, হাত ঝাঁকানো হত, আর সেই সঙ্গে 'সুবহকুম আল্লা বিলখ্যার' বা 'মস্‌সাকুম আল্লা বিলখ্যার' বলা হত। এই আরবী প্রথারই স্মৃতি য়োরোপীয় অভিবাদনে—মাথা অল্প হেলিয়ে 'গুড্‌ মর্নিং' ইত্যাদি বলা এবং হাতে হাত মিলিয়ে ঝাঁকানো। এর বিপরীতে, হিন্দুস্তানের সেলাম এখন : ওপরে বর্ণিত শব্দগুলি বলার সঙ্গে-সঙ্গে মাথায় হাত রাখা এবং সামনে ঝুঁকে যাওয়া।

শুধু এইই নয়। বাদশাহ ও আমীরদের দরবারে সেলামের সংখ্যাও নির্ধারিত ছিল—কোথাও সাত সেলাম করতে হত, কোথাও তিন।

বন্ধু ও বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্যে একটা সেলামই যথেষ্ট ছিল। লখনউয়ে শিষ্টাচার ও সৌজন্যের প্রতি বেশি নজর দেওয়া হত। তাই বড়দের উদ্দেশ্যে ছোটদের, উচ্চবিত্তদের প্রতি মধ্যবিত্তদের সেলাম ছিল: ওপরের শব্দাবলীর যেকোন একটি বলে সেই সঙ্গে ডান হাত বুক অথবা মুখের সামনে পর্যন্ত উঠিয়ে বারকয়েক হেলানো বা কাঁপানো। আজ্ঞাকারিতা প্রকাশের দিক থেকে এটি ছোটদের পক্ষে খুব উপযোগী অভিবাদন। হাতকে কয়েকবার কাঁপানো একাধিক অভিবাদনের ইশারা। সম্ভবত এই অজুহাতেই অনেক লোক 'তসলীম' ও 'কোরনিশ'-এর বহুবচন ব্যবহার করে বলে: 'তসলীমাত' ও 'কোর্‌নিশাত'। এগুলি অভিবাদন গণনা বা সংখ্যার দ্যোতক।

এখন আমি উপরিলিখিত অভিবাদন-বাচক শব্দগুলির অর্থ ও তাদের উদ্ভব ও বিকাশের আলাদা-আলাদা বর্ণনা করছি।

আরবীতে 'তসলীম'-এর অর্থ; 'অভিবাদন করা'। প্রচলিত 'আস্‌সলাম আল্যায়কুম' পরিত্যাগ করে তার ক্রিয়াপদরূপে প্রয়োগ সুশ্রাব্য নয়। কিন্তু এখানকার সোসাইটীর ধারণা, সেলাম করার বদলে 'মঁয় সলাম কর রহাঁ হূঁ'—'আমি সেলাম করছি' বললে বোধহয় আদরের ভাব বেশি হয়। 'কোরনিশ' তুর্কী ভাষার শব্দ, এখানে নিয়ে এসেছিল তুর্কী বিজেতারাই। এর অর্থ: 'অভিবাদনের জন্যে অবনত হওয়া'। অর্থাৎ এর মধ্যেও নীচু হয়ে মাটি ছোঁওয়া ও চরণ স্পর্শ করার ভাব আছে। 'আদাব' হচ্ছে 'আদব'-এর বহুবচন। সেলামের সময় এর প্রয়োগের উদ্দেশ্য হল: 'আদর-সম্মানের যতো-রকম আচার বা রীতি আছে, সবই জানাচ্ছি'। অভিবাদনের এই সমস্ত সমানার্থক শব্দের মধ্যে সবচেয়ে হেয় ও নাস্তিকতাসূচক হল 'বন্দেগী'। বন্দেগী-র অর্থ 'পূজা করা'। অভিবাদনের মধ্যে এর ব্যবহারের একটিই অর্থ: 'আপনাকে পূজা করছি।' মুসলমানদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিতে একথা খুদা ছাড়া আর কাউকেই বলা যায় না।

এইসব হিন্দুস্তানী অভিবাদনের বিপরীত আরবে যে 'আস্‌সলাম আল্যায়কুম' বলা হয়, তার শাব্দিক অর্থ হচ্ছে: 'তুম পর সলামতী';

আরও সোজা করে বললে 'তুম সলামত রহো'—'আপনি সুরক্ষিত থাকুন'। অর্থাৎ, অভিবাদন বা 'সলাম' (সেলাম করা) বাস্তবিকপক্ষে সম্মুখবর্তী ব্যক্তির 'সলামতী' তথা সুরক্ষার জন্যে প্রার্থনা। এর সঙ্গে ইসলাম যেটুকু যুক্ত করেছে, তা হল: 'সলাম' হচ্ছে খুদার 'পইয়াম'—বাণী, সংবাদ, যা খুদার 'রসুল' (হযরত মুহম্মদ) পৌঁছে দিয়েছেন মুসলমানদের কাছে। এবং 'কেয়ামত' (শেষ দিন) পর্যন্ত খুদার এই 'পইয়াম' প্রত্যেক মুসলমান পৌঁছে দিতে থাকবে অন্য মুসলমানের কাছে। 'আস্‌সলাম আল্যায়কুম'-এ 'সলামের' ওপর যে 'আলিফ' (অ) ও 'লাম' (ল) লগ্ন হয়ে আছে, তার স্পষ্ট দ্যোতনা হল: 'সেই 'সলাম' যা হযরত মুহম্মদের বাণী, তোমার কাছে যেন পৌঁছয়'।

ইসলামের আসল সেলামের এই অর্থ এবং অভিপ্রায় উপলব্ধি করে যেকোন ব্যক্তি অনুভব করতে পারেন: জাতীয় ঐক্য চেতনা উদ্বোধনের এবং ইসলামের সমস্ত অনুগামীদের মধ্যে জাতীয়তা ও একতার ভাব উজ্জীবনের সাধনা—এই সেলাম। দুঃখের বিষয়, মুসলমানরা একে পরিত্যাগ করেছে। এবং আমাদের নিষ্ফলা দম্ভ আমাদের এই ধারণাই জাগিয়ে দিতে থাকে: কোন মুসলমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে 'আস্‌সলাম আল্যায়কুম' বলা নাকি নিজেকেই অপমান করা! এটা আরও দুঃখের এই জন্যে, যে, বিশ্ববাসীর জন্যে ইসলাম নিয়ে এসেছে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী। শুধু মুসলমান নয়, অন্য ধর্মমতাবলম্বীদের সঙ্গেও উদারতা ও প্রসন্নচিত্ততার সঙ্গে ব্যবহার করার শিক্ষাও দিয়েছে ইসলাম। পুনশ্চ, এই 'সলামতী' তো একটিমাত্র এবং সীমিত নয়, যে, বক্তা বলে দিল 'আস্‌সলাম আল্যায়কুম', 'তুমি সুরক্ষিত থাকো', আর শেষ হয়ে গেল। উত্তরদাতাও ওইভাবে, খুশি হয়ে, অতি বিনম্রতার সঙ্গে জবাব দেয়: 'আল্যায়কুম আস্‌সলাম' অর্থাৎ 'অ্যার্ তুম পর ভী সলামতী হো', 'তুমিও সুরক্ষিত থাকো'। আমার ধারণা, দুনিয়ায় আর কোন নরগোষ্ঠী বা ধর্মমতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে এতো উত্তম প্রথা নেই, যতো আছে ইসলাম ধর্মে।

আমীর ও রইসদের সমাজে 'আদাব' ও 'তসলীম'-এর প্রচলন আছে। প্রায়ই লোক 'বন্দেগী' বলে। তবে, এর প্রয়োগ নারী-সমাজেই বেশি।

লখনউয়ে পুরাতন শিষ্ট ও বিনম্র অভিবাদন ছিল : ছোট বড়কে, গরীব আমীরকে অবনত হয়ে 'তসলীম' বা 'আদাব' বলবে। উত্তরে, বয়স্ক ব্যক্তি কনিষ্ঠকে জানাবে : 'জীতে রহো', 'বড়ে হো', 'সাহব ইকবাল হো' ('সৌভাগ্যশালী হও')। গরীবদের উদ্দেশ্যে আমীররা, নত হবে না, শুধু হাত ওঠাবে, সেইসঙ্গে একাধিকবার বলবে ; 'তসলীম অ্যর্ আদাব', কিংবা 'বন্দেগী'। সমকক্ষদের উত্তর দানের প্রথা ছিল—পথ চলতে, 'সাহব-সলামত', পরিচিত জন হলে, ওইভাবে ঝুঁকে 'তসলীম' বা 'আদাব' বলবে। কিন্তু সভায় বসে থাকলে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং উত্তর হবে বিনত।

সেলামের পর একের উক্তি : 'মিযাজ শরীফ' বা 'মিযাজে অকদস' বা 'মিযাজে-আলী' বা 'মিযাজে-মুবারক' বা 'মিযাজে মুঅল্লা'[1]। অন্যজনের করজোড় প্রত্যুক্তি ; 'দুআ করতা হূঁ'[2]। মোটামুটিভাবে, সারা হিন্দুস্তানের শিষ্ট ব্যক্তিদের অভিবাদনাদির এই রীতি। তবে, লখনউয়ে এবং আরও কয়েকটি শহরে যেখানে হিন্দুস্তানী রাজপটা এবং কোন দরবার বিদ্যমান, সে সব জায়গায় এই প্রথা-রীতির দিকে বেশি দৃষ্টি রাখা হয়। এর থেকে কম হলে অশালীনতা বলে গণ্য করা হয়।

লখনউয়ের পুরনো দরবার আজ অবসিত। সেইসঙ্গে অপসৃত সংশ্লিষ্ট শিষ্টাচারও। কিছুদিন থেকে, বিশেষ ক'রে লখনউয়ের সাধারণ মানুষ, কারিগর ও নিম্নবর্গের লোকেদের মধ্যে 'আস্সলাম আল্যায়কুম' বলার রেওয়াজ বেড়ে গেছে। খুদা করুন, আমীররাও যেন এর অনুসরণ করে, আর বড়-ছোট, উঁচু-নীচুর ভেদ যেন চিরকালের মতো উঠে যায়।

---

[1] 'মিযাজ' অর্থাৎ শরীর ও মনের মঙ্গলকামনা। [2] দুআ—প্রার্থনা আশীর্বাদ, শুভকামনা ইত্যাদি।

॥ 41 ॥

7 তরয-কলাম (আলাপন-সম্ভাষণ)

বার্তালাপ ও সম্ভাষণের রীতি সাংস্কৃতিক বিধানের সপ্তম উপকরণ। দুনিয়ার প্রত্যেক ব্যক্তির শিষ্টতা ও সাহিত্যিক যোগ্যতার প্রথম পরিচয় তার ব্যবহৃত শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায়। বিশ্বের তাবৎ প্রতাপশালী জাতি তাই সবকিছুর আগে স্বীয় ভাষার সংস্কার করে এবং তার বিকাশ ঘটায়।

সভ্যতার দাবি—'জবান', ভাষায়-কথায় যেন খারাপ ও অশ্লীল শব্দ না আসে। সম্বোধিত ব্যক্তির অপ্রিয়, এমন শব্দ ও ভাবনা যেন তার সামনে মুখ থেকে না উচ্চারিত হয়। যদি কখনও অপ্রিয় কথা বলার প্রয়োজন আসে, এমন শব্দ আর এমন ভঙ্গি দিয়ে বলা উচিত, সম্মুখবর্তী ব্যক্তির যেন খারাপ না লাগে। আর, নিতান্তই যদি খারাপ লাগে তো খারাপ লাগাটা যেন যথাসম্ভব কম হয়। তার মধ্যে থেকে কিছু রসও যেন সে পেতে পারে। এ ক্ষেত্রে লখনউয়ের সুসংস্কৃত নাগরিকবৃন্দ যে-কৃতিত্ব অর্জন করেছে, হিন্দুস্তানের আর-কোন শহরবাসীর মধ্যে তা দেখা যায়না। এটা ঠিক, যে, বর্তমান শিক্ষা ও সভ্যতা সম্ভাষণের মধ্যে সর্বত্রই, অনেক কিছু ভালো এনে দিয়েছে। তবে, ইংরেজী প্রভাব থেকে যদি আলাদা করে দেখেন, দেখতে পাবেন: এই সভ্যতা ও বিনম্রতা লখনউবাসীর ভাষাতেই পাওয়া যায়।

বাইরের লোক স্বীকার করে: তারা লখনউয়ের লোকেদের সামনে কথা বলতে সংকোচ বোধ করে, যা কিছু শিষ্টতা শিখেছে, সব ভুলে যায়। তারপরেই যখন নিজেদের আড্ডায় বসে, তখন এই বলে নিজেদের অক্ষমতার বদনাম ঢাকতে চায়, যে: 'আমি সরলভাবে সোজাসুজি কথা বলি; লখনউওয়ালাদের মতো অমন অ্যায়সা—ত্যায়সা আমার আসে না।' সত্যি কথা বলতে কি, এই বাহানা

ওই বদনামকে খণ্ডন নয়, মণ্ডনই করে। আমি ইরানীদের দেখেছি; হিন্দুস্তানীরা তাদের সামনে কথা বলতে ভুলে যায়। ইংল্যণ্ডে দেখেছি: ফরাসীদের সামনে ইংরেজদের মুখ থেকে একটা শব্দও বেরোতে চায় না। আরবদেরও বাচালতা শক্তি একদিন এমন ছিল তাদের সামনে বিদেশীরা মুখ খুলতে পারত না। ফলে, আরবদের ধারণাই হয়ে গিয়েছিল: 'খুদা কেবল আমাদেরই মুখে ভাষা দিয়েছেন, আমাদের সামনে তামাম দুনিয়া তাই বোবা।' এই ধারণার ফল: আরবী ছাড়া দুনিয়ার আর-সমস্ত লোককে ওরা বলত 'অজম' যার শাব্দিক অর্থ "বোবা"! হিন্দুস্তানের তাবৎ শহরের লোকেদের পাশে ঠিক এই অবস্থাই হয়েছে লখনউ-বাসীদের—প্রবাহময়ী ভাষা ও বিনোদ-বৃত্তির জন্যে আসরে তারা সবাইকে দাবিয়ে আধিপত্য বিস্তার করে, এবং নিজের সামনে আর কাউকেই মুখ খুলতে দেয়না।

ভাষাগত শিষ্টতা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম প্রশ্ন হল: সম্বোধিত ব্যক্তিকে কোন্ সর্বনাম দিয়ে ডাকা যায়? অন্য সমস্ত ভাষায় সম্বোধিত ব্যক্তির জন্যে আছে দুটো সর্বনাম—একটি একবচনের, বহুবচনের অন্যটি। আর, সম্বোধিত ব্যক্তি যদি সম্মানিত কেউ হন, তাঁর জন্যে সব ভাষাতেই একবচনের বদলে বহুবচনের সর্বনাম প্রযুক্ত হয়। ফারসীতে একবচনে সম্বোধিতের সর্বনাম 'তূ', বহুবচনের 'শুমা'। আরবীতে একবচনে ,ক' ও 'অন্ত' এবং বহুবচনে 'কুম' ও 'অন্তুম'। ইংরেজীতে 'ইয়ু' সর্বনাম দিয়ে সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করা যায়। এই সমস্ত ভাষার বিপরীত উর্দূতে; সেখানে সম্বোধিতের জন্যে একবচনের সর্বনাম 'তূ', কিন্তু বহুবচনের দুটি সর্বনাম: 'তুম' ও 'আপ'। এবং এই তিনটি সর্বনামের জন্যে সম্বোধিত ব্যক্তির পদ ও মর্যাদা নির্দিষ্ট করা আছে। খুব নীচু স্তরের লোককে 'তু' বলতে হয়। নিম্নবর্গের লোকদের মধ্যে যারা একটু ভালো তাদের এবং বয়ঃকনিষ্ঠদের বলা হয় 'তুম'। সমকক্ষ, বিদ্বান, বা উচ্চতর বর্গের জন্যে 'আপ'। প্রতিষ্ঠাবান লোকেরা কখনও-কখনও বন্ধু, সমকক্ষ

ও সমবয়স্কদেরও অন্তরঙ্গভাবে 'তুম' বলে সম্বোধন করে। কিন্তু যাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা নেই, তাদের 'তুম' বলা, উর্দুতে, বিশেষভাবে লখনউবাসীদের মধ্যে নৈতিক অপরাধ।

উর্দু ভাষায় এবং খাস লখনউবাসীদের মধ্যে সম্বোধিত ব্যক্তির নানান শ্রেণী যেমন আছে, তার চেয়েও বেশি আছে সম্বোধন-বাচক শব্দরূপ, যা শরিফ ও সম্মানিত ব্যক্তিদের জন্যে ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। যেমন: 'জনাব', 'জনাবে-আলা', 'জনাবে-আলী', 'হযরত', 'হযরত-আলা', হুযূর 'হুযূরে-আলা', 'হুযূরে আলী', 'কিব্‌লা', 'কিব্‌লা-ও-কাবা', 'সরকার', এবং এই জাতের আরও কিছু শব্দ উর্দুতে আছে যা সম্বোধিত ব্যক্তির পদমর্যাদা অনুসারে প্রযুক্ত হয়। এইসব শব্দই লখনউবাসীদের জিহ্বায় আরূঢ়; এবং এদের ব্যবহার এরা যেমন জানে, অন্য শহরের লোক তেমন জানে না।

অতএব, দাবি করতে পারি, যে, সম্বোধনের জন্যে এতো আদর সূচক শব্দ বিশ্বসংসারের আর কোন ভাষায় নেই। সেসব দিন চলে গেছে, যখন হিন্দুস্তানের সমস্ত ভাষার মধ্যে উর্দু ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ। আর এখন, উর্দু সাহিত্যের সাগরেদী থেকে মুক্ত হয়ে ভাষাগুলি আপন-আপন সাবালকত্বের ঢাক পিট্‌ছে! বাংলা, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, সিন্‌ধী, মারাঠী, কন্নড়, তেলেগু, ইত্যাদি সকলেই স্ব-স্ব সাহিত্যিক প্রগতি ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে। তবু, ওইসব ভারতীয় ভাষা, এবং সেই সঙ্গে আরবী, ফারসী, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষাকেও আমি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি: তাঁরা যখন উর্দু অপেক্ষা অধিকতর সাহিত্যিক সমৃদ্ধির দাবি জানাচ্ছেন, তখন সম্বোধনের জন্যে উর্দুতে যতো শব্দ আছে, নিজের-নিজের কোষ থেকে ততোগুলি বার করুন। ফলত, একথা সত্য যে, অল্পবয়স ও সীমিত প্রয়োগক্ষেত্র সত্ত্বেও শিষ্টতা, সরসতা ও শিষ্টাচার-বিধির দিক থেকে স্বল্প দিনেই উর্দু যে প্রগতি করেছে, বিশ্বের আর কোন ভাষায় তা নেই। বাস্তব তথ্য হল— উর্দু কোনও দেশ, কোনও রাজ্য, কোনও শ্রেণী বা কোনও

ধর্মবিশেষের ভাষা ছিল না ; শাহী দরবার থেকে শুরু করে হিন্দুস্তানের প্রতিটি শহরের সভ্য ও সুসংস্কৃত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠাবান লোক, কবি, সাহিত্যিক এবং ভাষা ও সাহিত্য-প্রেমিকদের ভাষা হয়ে গিয়েছিল ঃ উর্দু। সুতরাং, এর গোড়াপত্তনই হয়েছে সভ্যতা ও শিষ্টতার হাতে এবং শেষ পর্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন ও সাহিত্য প্রেমীদের ভাষাই থেকে গেছে। ফল হয়েছে এই—উর্দু ভাষাভাষীদের 'মেজরিটি' কোন সুবাতেই নেই। তবে, সব জায়গাতেই সভ্য ও সংস্কৃতিবান লোক এই ভাষাতেই কথা বলে—এটা স্মরণীয়। এর জন্যই হয়েছিল হিন্দুস্তানে উচ্চকোটির ও বিশ্বসংসারে বহুতর শিষ্ট সমাজ সৃষ্টি করার জন্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ইংরেজ আমলে পশ্চিমী সভ্যতা সে-স্থান অধিকার করায় এবং স্বাভাবিক পরম্পরাবশত, হিন্দুস্তানীদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। মুসলমান অহংকার ক'রে বলে, 'এ আমার ভাষা ; আর হিন্দুদের ধারণা, এই ভাষায় আমরা মুসলমানদের মোকাবিলা করতে পারব না।' এই ব'লে ওটা দিয়ে মুসলমানদেরই মাথায় মেরেছে এবং রুচিতে আলাদা হয়ে গেছে। এতে লোকসান হয়েছে উর্দুর ; এবং সে-লোকসানের বহর প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও, একথা অনস্বীকার্য ঃ এই ভাষার যে সাহিত্যগুণ, যে রসমাধুর্য আছে, তা না আছে নবজাতা হিন্দীতে, না হিন্দুস্তানের অন্য কোন ভাষায়।

ইংরেজ হোক, কিংবা আরব, আফগান বা ইরানীই হোক, যখন উর্দু বলে, সম্বোধিত ব্যক্তির জন্যে 'তুম' ছাড়া আর কোন শব্দের কথা খেয়ালে রাখে না। তার কারণ ঃ 'তুম'-এর চেয়ে শিষ্ট ও প্রগতি কোন শব্দ ওদের ভাষায় নেই।

সম্বোধনের জন্যে ইংরেজীতে আরও কিছু শব্দ আছে। যেমন, 'ইওর অনার' 'ইওর এক্‌সেলেন্সী', 'ইওর হাইনেস', 'ইওর ম্যাজেস্‌টি' ইত্যাদি। কিন্তু এসবই ওপরতলার সম্রাট ও সামন্তদের জন্যে নির্দিষ্ট। এরা ছাড়া অন্য কারও ক্ষেত্রে এদের প্রয়োগ করা যায় না। এই শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্যে উর্দুতে অবশ্যই শব্দ

আছে। যেমন, 'জাঁহাপনাহ', 'সাহেবে-আলম', মুর্শিদজাদা', 'নবাবসাহেব', 'নবাবজাদা', 'সাহেবজাদা', এগুলি হল ওপরতলার লোকদের সম্বোধন, যার সঙ্গে 'জনাব' বা 'হুজুর' শব্দ জুড়ে নিয়ে গোটা সম্বোধন। এ-ধরণের নির্দিষ্ট সম্বোধন বোধহয় সব ভাষাতেই আছে। কিন্তু সর্বশ্রেণীর মাননীয় ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তির জন্যে পূর্ব-বর্ণিত যতো আদরসূচক শব্দ উর্দুতে প্রযুক্ত হয়, অন্য ভাষায় তা নজরে পড়ে না।

'মিযাজ' (মেজাজ বা দেহ-মনের কুশল) জিজ্ঞাসার জন্যে সব ভাষাতেই কিছু মামুলী শব্দ আছে। উর্দুতে, আদর-সম্মান প্রদর্শনের জন্যে 'মিযাজে-আলী', 'মিযাজে-মুবারক', 'মিযাজে-অকদস', 'মিযাজে-মুকদ্দস', 'মিযাজে-মুঅল্লা' ইত্যাদি বলে মান্য ব্যক্তিকে কুশল-প্রশ্ন করতে হয়। উর্দুর প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সব জায়গায়, সব শহরে এইসব শব্দ ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু এগুলির ব্যবহারে লখনউয়ের ভদ্রজনগণ যে পারদর্শিতা অর্জন করেছে, তা অন্য কোন জায়গার লোকদের পক্ষে সম্ভব নয়।

লখনউয়ের অভিজাত শ্রেণীর লোকদের সবিশেষ লক্ষ্য: 'শীন-কাফ'[1] ঠিক থাকবে ; আরবী হরফ উচ্চারিত হবে যথাসম্ভব তাদের নিজ-নিজ উচ্চারণ-স্থান থেকে ; ফারসী শব্দে কারক-চিহ্নের ব্যবহার হবে স্পষ্ট ও নির্ভুল। বিদ্বানদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে ফারসী ও আরবী শব্দ বেশি প্রযুক্ত হবে এবং সঠিক উচ্চারণ করতে হবে। 'হকীমদের' (চিকিৎসকদের সঙ্গে কথোপকথনে আরবীর 'তিব'[2] সম্বন্ধীয় শব্দ প্রয়োগ করিতে হবে। সাধারণ লোক ও মুর্খ চাকরদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে আরবী শব্দ এড়িয়ে যেতে হবে। স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বার্তালাপে তাদের বাগ্‌বিধি, বাগ্‌ধারা ও বোলচাল ব্যবহার করতে হবে।

যখন ছোটরা বড়দের সঙ্গে, নীচের তলার লোক ওপরতলার লোকেদের সঙ্গে, অশিক্ষিত শিক্ষিতদের সঙ্গে কথা বলবে, তখন

[1] দুটি বর্ণ। ফলত, সমস্ত বর্ণমালার উচ্চারণ। [2] চিকিৎসা।

খেয়াল রাখতে হবে : প্রতিটি শব্দেও বাক্যে আদর-সম্মান যেন ওতঃপ্রোত থাকে। শাব্দিক ধ্বনি হবে মৃদু ও নীচু ; তবে এতোটা নীচু নয়, যাতে অস্পষ্ট হয়ে যায়। এইভাবে বড়রাও যখন ছোটদের সঙ্গে, ওপরতলার লোক নীচের তলার লোকেদের সঙ্গে, বিদ্বান জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলবে, তখন তাদের উচ্চারণ বাগ্‌ভঙ্গি, শব্দে-শব্দে যেন স্নেহ ও বাৎসল্যের ভাব নিহিত থাকে।

এই সমস্ত বিষয়ে খর দৃষ্টি এবং পূর্বোল্লিখিত আদরবাচক শব্দ ও সর্বনামের প্রয়োগ-নৈপুণ্যে লখনউবাসীদের ভাষা এমন শিষ্ট, প্রাঞ্জল প্রবাহময়ী হয়ে উঠেছে, যে, এখানকার সাধারণ লোক ও অন্য শহরের অধিকাংশ কবি ও সাহিত্যিকদের চেয়ে অনেক ভালো উর্দু বলতে পারে। এবং এর মাধ্যমে যে শিষ্টতা ও সংস্কৃতি অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে, অন্য কোন জায়গার শিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যেও তার প্রকাশ সম্ভব নয়।

তবু দুঃখের কথা—লখনউ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন এখানে বাইরের লোক এসে এমন ভয়ংকর রকম অশিষ্টতা শুরু করে দিয়েছে, যে, এখানকার সভ্য ও শিষ্ট ব্যক্তিরা বাধ্য হয়ে এক কোণে বসে আছেন। আইনের স্বাধীনতা অশিক্ষিত জনগণকে এতো ভয়হীন ও সভ্যতাহীন করে দিয়েছে, শিষ্টাচার সম্বন্ধীয় সমস্ত ভালো জিনিস 'খাক' হয়ে ধুলোয় মিলে যাচ্ছে। আর কয়েকদিন পরে এর কোন অস্তিত্বই বোধহয় আর থাকবেনা॥

॥ 42 ॥

৮। তরীকা-এ-মযাক (হাস্য-রীতি)

সভ্যতার অষ্টম উপকরণ : হাস্য—হাসি, মজা, বিনোদন ও তাদের রীতিপদ্ধতি।

আরবের একটি প্রাচীন প্রবচন তথা হযরত মুহম্মদ সাহেবের হদীস 'আহারে লবণের যে স্থান, কথাবার্তায় সেই স্থান বিনোদের।' সত্য এই উক্তি। হাস্যরস ও বিনোদ-প্রীতি ছাড়া কথাবার্তায় মজা আসে না, মাইফেলে মন বসে না। তবে, এই বিনোদপ্রিয়তায় অসাবধানতা ঝগড়া-ফ্যাসাদের কারণ হয়ে ওঠে। বিনোদ বা হাস্য-পরিহাসের কথা হতে-হতে প্রায়ই তলোয়ার ঝলসে উঠেছে এবং পুরনো প্রাণের বন্ধু মুহূর্তে শত্রু হয়ে গেছে। বিবেচনা করে দেখলে বোঝা যায়, এই পরিণতির জন্যে দায়ী হাস্য-পরিহাস নয়, দায়ী অসাবধানতা ও তজ্জনিত মর্যাদার সীমা লংঘন।

যে-ভাষা যতো বিকশিত হতে থাকে, সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে তার হাস্য-পরিহাস, ব্যঙ্গ-বিনোদ। যে-রীতিতে কথায়-বার্তায় হাসি-ঠাট্টা ফুটে ওঠে, তাকে মর্যাদার সীমায় রাখা খুবই মুশকিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এরকম অসংখ্য রীতি আছে। অভিজ্ঞ ভাষাবিদ তা থেকে নিজের কাজ গুছিয়ে নেন। সেসবের বিস্তারিত আলোচনা করতে হলে একটা গোটা বইয়ের দরকার। আপাতত, এইটুকুই বক্তব্য যে হাস্যরসে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়, তারা অনেকার্থ-বাচক এবং তার কিছু অর্থ ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গসূচক। এরকম শব্দও সর্বদা প্রযুক্ত হয় না। অনেক সময় মানুষ ও বস্তুর সঙ্গে এমন জিনিসের উপমা দেওয়া হয়, যা অনুচিত হলেও উপমান-উপমেয় সমান। আবার, এই উপমাকে এমনভাবে প্রকাশ করা হয়, যাতে তুলনার বদলে অলংকারেরই আনন্দ জাত হয়। ঠিক এইভাবে, নিজেই নিজেকে বা অপরকে যতোটা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেখানো, যা বাস্তব থেকে বহুদূরবর্তী। এর জন্যে দক্ষতার প্রয়োজন। সুদক্ষ ব্যক্তি তীক্ষ্ণতর ব্যঙ্গের পর ব্যঙ্গ করে যায়, অপ্রিয়তম উপমার পর উপমা দিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু তবু কারও হৃদয় আবিল হয় না, ক্রোধ প্রকাশের অবসর কোথাও মেলেনা। এর অন্যরকম হলে, অর্থাৎ কোন অদক্ষ ব্যক্তি এই কাজ করতে গেলে লোক ক্ষেপে যায়, শত্রুতার সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে লখনউ জনসাধারণের যে

পারদর্শিতা তা অন্য জায়গার বড়ো-বড়ো লোকদের মধ্যেও দেখা যায় না।

সুপণ্ডিত, দার্শনিক, সাহিত্যে পি. এইচ. ডি., বাঙ্গালী পণ্ডিত ডঃ অঘোরনাথ খুব ভালো উর্দু জানতেন। উর্দু ভাষা প্রসঙ্গে তাঁর আপত্তি উপস্থিত করে আমাকে বললেন : 'সাহেব এ-ভাষার ভালোটা কোথায়' একবার এক সভায় আমি বলেছিলুম "হম আজকল দূধ পিয়া করতে হ্যঁয়"। শুনেই সব লোক হেসে উঠল।

আমি বললাম : উর্দুর ভালোটা এইখানেই। যেহেতু আপনি এখনও এ ভাষায় কাঁচা ; তাই নিজের ত্রুটি না দেখে, ভাষার দোষ দেখছেন। সব ভাষাতেই দ্ব্যর্থক শব্দ আছে। ভাষাবিদের কাজ হচ্ছে, বিরূপ সমালোচনার সমস্ত দিক বাঁচিয়ে শব্দকে প্রয়োগ করা ইংরেজীতে 'কন্‌সীভ' শব্দের অর্থ 'বিচার করা'-ও হয়, আবার 'গর্ভধারণ করা'-ও হয়। এক স্বনামখ্যাত লর্ড পার্লামেণ্টে তিনবার বললেন "আই কন্‌সীভ" তার পরের শব্দ ভাবছেন, এমন সময়ে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল : "জনাব তো তিনবার 'আই কন্‌সীভ' বললেন, হলনা তো কিছুই।" অর্থাৎ তিনি তিনবার গর্ভধারণ করলেন, কিছুই জন্মাল না। সবাই হৈ হৈ করে হেসে উঠল। লর্ড সাহেব তো লজ্জায় মারা যান আর কি! এইরকম, উর্দুতেও হাজার-হাজার শব্দ আছে, যাদের অনেক দিক, নানান অর্থ। বক্তার যদি এদের প্রয়োগের যোগ্যতা না থাকে, তাহলে কথায়-কথায় হাসি উঠবেই।

ওপরের ওই বাক্যটি হল : 'দূধ পীনা'। হিন্দুস্তানে 'দুধ পান' করা দুগ্ধপোষ্য শিশুদের কাজ। কোন বয়স্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা, 'ইয়েহ দূধ পীতে হ্যয়', ইনি দুধ পান করেন—দোষের তো বটেই, তাছাড়াও বাক্যটি 'ইনি এখনও অবুঝ ও মূর্খ' এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এই অর্থ থেকে বাঁচবার জন্যে লখনউওয়ালারা কখনও বলবে না 'ম্যঁয় দূধ পীতা হূঁ'। বরং, বাক্যটিকে এই ত্রুটিপূর্ণ দিশা থেকে বাঁচিয়ে অন্যভাবে বক্তব্য রাখবে। বলবে : "ম্যঁয় আজকল দূধকো

ইস্তেমাল করতা হূঁ” (আজকাল আমি দুধ ব্যবহার করছি); “আজকল মেরা খানা দূধ হ্যয়” (আজকাল দুধ আমার খাদ্য); “দূধ চাওঅল খাতা হূঁ” (দুধ চাল খাই)। লখনউবাসীদের এই সাবধানতা দেখে আগ্রায় এক যোগ্য ও ভাষাপ্রাজ্ঞ কবি ধোঁকায় পড়েছিলেন : ‘লখনউয়ের ভাষায় দুধ-খাওয়া আছে। দুধ-পান-করা নেই! লখনউয়ের এক সাহেবের সঙ্গে তাঁর এবিষয়ে মতভেদ হয়। আমার ওপর হুকুম হল সমাধান-নির্দেশের। আমি বললাম : “দুধ ‘পান করার’ দ্রব্য, তার সঙ্গে ‘খাওয়া’ শব্দ কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে? তবে হ্যাঁ, অপবাদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে লখনউয়ের লোক নিজের জন্যে দুধ খাওয়া শব্দ ব্যবহার করবেই।”

শুধু এই একটা ‘মুহাবিরা’ (বাক্য) নয়, উর্দুতে সংখ্যাহীন শব্দের বিভিন্ন অর্থ ও অর্থদ্যোতক বাক্য থাকার জন্যে নিন্দার দিশা সঞ্জাত হয়েছে। এই দিশা থেকে আত্মরক্ষা করাই ভাষাবিদের কাজ। আর কেউ যদি কোন প্রসঙ্গে মজা করার জন্যে ব্যবহার করে তো তার কর্তব্য বুঝেসুঝে জবাব দেওয়া। নইলে, ভাষাটি সে জানেনা বলেই ধরে নিতে হবে।

লখনউবাসীদের মধ্যে হাসিতামাশা ও বিনোদপ্রিয়তা খুব বেশি। সংখ্যাহীন প্রকারে নিজেদের কথার মধ্যে হাসির ছিটে তারা ছড়িয়ে দেবেই। এই কলায় যে যতো প্রধান, সাহিত্য গোষ্ঠীতে সে ততো উজ্জ্বল, ততো প্রতিষ্ঠিত। একথা আমি বলছিনা, যে, অন্য স্থানের লোক এ বিষয়ে অদক্ষ; বরং বেশিই দক্ষ। সারা হিন্দুস্তানে উর্দু ভাষা এখন এমন উন্নতি করছে, তার ফলে উন্নতশ্রেণীর হাস্যরস সৃষ্টি হয়ে চলেছে এবং কাব্য বোধের ও সমালোচনার শক্তিও বেড়ে যাচ্ছে। এই উৎকর্ষতা লখনউবাসীদের স্বভাবের অঙ্গ হয়ে গেছে। কথার সরসতা-সম্পাদন এবং ‘চুট্‌কুলা’ (চুট্‌কি) ছাড়ার যতো সুন্দর রুচি এদের মধ্যে দেখা যায়, অন্যত্র তা অদৃশ্য।

৯। শাদী-গমী কী মহফিলেঁ
(বিবাহ ও মৃত্যু বিষয়ক কৃত্যানুষ্ঠান)

সংস্কৃতির নবম উপকরণ : বিবাহ ও মৃত্যু সংশ্লিষ্ট সভাদি অনুষ্ঠান।

মুসলমানদের ছিল বৈভব ও শাসন-ক্ষমতা। তারই ফল—মুসলমান রমণীদের ক্রমবর্ধমান বাসনা, অন্য স্থানের চেয়ে এখানে যা বেশি পরিমাণেই ছিল। জন্ম থেকে আরম্ভ করে বিবাহ পর্যন্ত ছেলেদের জীবনটা নানান খুশির সুফলা একটি উৎসব যেন। জন্মের পর 'ছঠী' (ষষ্ঠী), 'চিল্লা' (৪০তম দিনের অনুষ্ঠান), 'নহান' (স্নান), 'আকীকা' (মুণ্ডণ), 'খীর-চাটাঈ', 'দূধ-বঢ়াঈ 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' (হাতে খড়ি) 'খত্‌না' (সুন্নত), এবং শেষে সর্বোত্তম—'নিকাহ'। সবই নিজেদের মধ্যে আনন্দ-বিনোদনের অবকাশ। প্রায়শই ছোটদের 'সালগিরহ' (জন্মদিন) পালিত হয়। তাছাড়া, 'আরোগ্য স্নান' বা বিশেষ কোন অভীষ্ট পূরণের জন্যেও সমারোহ হয়।

এইসব সমারোহে আত্মীয়-স্বজন, পরিচিতা প্রতিবেশিনীরা এসে জমায়েৎ হয়। 'যনানী-মিহফিল' (জেনানা-মাইফেল/মহিলামহলের আসর) বসে। কাঠের চৌকির ওপর, অতিথি বেশি হলে, মেঝেতেই 'দরী'-'চাঁদনী-'র পরিষ্কার 'ফরাশ বিছানো হয়। ধনীগৃহে আর-একটু বেশি—চাদরের ওপর, তিনদিকে কিংবা কেবল মাঝখানে একটা বড়ো, দামী গাল্‌চে পাতা হয় ; আলো জ্বালানো হয় ; উত্তপ্ত হয় মৃদংগ ; সামনে ব'সে ডোমনীরা 'মুজ্‌রা' করে। নাচুনী-ডোমনী পায়ে ঘুংঘুর বেঁধে নাচে, নানা হাব ভাব প্রদর্শন করে। 'মুজরা'-র অবকাশে, কখনও-কখনও রসিকা ডোমনী ভাড়ামী করে। হাসিঠাট্টা, হৈচৈ সারাক্ষণ। 'মুজরা'র ডোমনীরা প্রায়ই সীমা লংঘন করে, নির্লজ্জতা উছ্‌লে ওঠে। তবু, স্ত্রীলোকদের মধ্যে পরস্পর বড়-ছোট, শিষ্টাচার অব্যাহত থাকে।

প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই অসংখ্য আচার-বিচার আনুষঙ্গিক আছে ; সেগুলি মেনে চলতে হয়। ফলত, এইসব উৎসব-অনুষ্ঠান,

আঙ্গিক-রেওয়াজের তদারক করে সাধারণত বৃদ্ধারাই। তাদের সাহায্য করে ডোমনীরা। এই উপলক্ষে তারা পায়ও অনেককিছু।

অধিকাংশ 'রসূম্' (অনুষ্ঠান)-এ রাত্রি-জাগরণ বিধেয়। হিন্দুস্তানী রমণীদের বিশ্বাস-অনুসারে এই জাগর রাতি নিবেদিত 'ল্যজ অল্লাহ্'[1] নামে। এতে, ডোমনীরা যে গান গায়, সেটি হল: 'অল্লা মিয়াঁ কী সলামতী'[2]। সারা রাত কেটে যায়—উপাসনা নয়—গান-বাজনায়-আনন্দে-হুল্লোড়ে। ভোর হতেই সবাই চায় মসজিদে 'অল্লা মিয়াঁর তাক ভরানো'—মসজিদের তাকে আলো-ফুল-বাতাসা দেবার জন্যে। বিশেষভাবে দেয় অর্ঘ্য: 'গুলগুলা'[3] ও 'খুদাঈ রহম' [4]।

গ্রামেও এইসব অনুষ্ঠান এইভাবে হয়। তবে, ওখানে অব্যবস্থা খুব; ফলে, অসভ্যতাও হয়। শহরের উৎসব-অনুষ্ঠানে শিষ্টতা, সুব্যবস্থা, সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার॥

43

বিবাহের যে-উৎসবের উল্লেখ আমি আগে করেছি, এবং পরে জেনানা-মাইফেলের যে-ছবি দিয়েছি, তার পূর্ণতর বিবরণ এবার উপস্থিত করছি।

প্রসবের পরে মা ও শিশুকে প্রথমবার স্নান করানোর যে অনুষ্ঠান, তার নাম 'ছঠী'। প্রসূতিকে গরম জলে স্নান করানো 'তিব্বী ইলাজ' (চিকিৎসাশাস্ত্রসম্মত)। এই স্নান হয় আনন্দের মধ্যে দিয়ে, তাই এর মহিমা। এবং যেহেতু প্রসবের ছদিন পরে প্রথম স্নান, তাই এর নাম 'ছঠী'। প্রসূতিকে যত্নসহকারে স্নান করানো হয়, তারপর শিশুকে। তারপর সমাগত নারীদের সকলে একে-একে স্নান করে। যার যেমন আর্থিক ক্ষমতা, সেইমতো প্রসূতি ও শিশুর জন্যে নতুন

---

[1] 'ল্যজ এক বিশেষ ধরণের মিষ্টান্ন। [2] ঈশ্বর স্তুতি। [3] তালের বড়ার মত আটার বড়া। [4] মেওয়া, কেওড়া, চাল ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুত বস্তু।

জোড় তৈরি করা হয়। অন্য নারীরাও কাপড় বদলায়। এই স্নান উপলক্ষে নানান ধরণের 'রসূম্' (আচার) প্রতিপালিত হয়। শহরে, গ্রামে, বিভিন্ন পরিবারে এই আচার প্রায় একই রকম, কিছুটা আলাদা, নতুনও।

বধূর মা বা অন্য কোন আত্মীয়াদের পক্ষ থেকে, এই সময় প্রস্তুতি ও শিশুকে 'জোড়' (বস্ত্রাদি), 'ত্যক' (হার), হাঁসলী, কংকণ, বাচ্চার উপযুক্ত খেলনা, ঝুনঝুনি, চুষিকাঠি, সেই সঙ্গে মুর্গী, এবং খুদা জানেন, আর কী-কী জিনিস খুব ধুমধাম, বাজনাবাদ্যি ও শোভাযাত্রা সহকারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অন্তঃপুরে নাচ-গান হতে থাকে। এতো সামর্থ্য না থাকলে ঘরের মেয়েরাই ঢোল বাজিয়ে গান বাজনা করে।

এর পরে আরও দুটো স্নান : 'বীসওআঁ' ও 'চিল্লা' (কুড়ি ও চল্লিশ দিনের দিন)। খুদা যদি কৃপা করে থাকেন, দুই স্নানেই খুব ধুমধাম হয় নতুবা, বাসওআঁ-স্নান হয় মামুলী আনন্দের মধ্যে দিয়ে ; চিল্লা-স্নানে একটু উৎসব হয়।

'আকীকা' মুসলমানদের বিশুদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান-এর সূত্রপাত ইসরাইলদের সময় থেকে এবং পয়গম্বর ইব্রাহীমের মাধ্যমে চলে আসছে। জন্মের অষ্টম দিনে নবজাতককে জেরুশালেমের প্রসিদ্ধ অক্সা-মসজিদে নিসে গিয়ে মস্তক মুণ্ডণ করিয়ে দিত, 'কুরবানী' (কোরবানী) করত। বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নেতা প্রার্থনা করতেন শিশুর সৌভাগ্য। এই রীতিই 'রসূমে-ইব্রাহীমী' ও 'সুন্নতে-মুহম্মদী'-রূপে মুসলমানদের মধ্যে আজও প্রচলিত। তবে, আটদিনের দিন যে-আকীকা হত, তা এখন উঠে গেছে। এটা প্রায়শই শিশুর এক বছর বয়েসের মধ্যেই হয়। শিশুকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয় ; তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের উপস্থিতিতে নাপিত তার মাথা ন্যাড়া করে দেয়। যে-মুহূর্তে শিশুর মাথায় অস্তর ছোঁয়ানো হয়—ছেলে হলে, দুটো ; মেয়ে হলে, একটা—পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। মুণ্ডণের পর মাথায় চন্দন দেওয়া

হয়। আত্মীয়-বন্ধুরা নিজ-নিজ ক্ষমতা মতো শিশুকে দেয় 'মুহ দিখাঈ' (মুখ-দেখা-র জন্যে দেয় সামগ্রী)। কোর্‌বানীর 'গোশ্‌ত্‌' আত্মীয়, বন্ধু ও গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ঘরে বসে খুশীর আসর। অন্যান্য উৎসবে যে-ধরণের মহফিল হয়, এখানেও সেইরকম হয়।

খীর-চাটাঈ

শিশুর বয়স তখন চার কি পাঁচ মাস। দুধ ছাড়া অন্য জিনিস খেতে দেবার সময়। প্রথম যেদিন খাওয়ানো হয়, সেদিনের উৎসবের নাম: 'খীর চাটাঈ'। যেহেতু, অধিকাংশ বাড়িতেই 'খীর (পায়েস) দিয়েই প্রথম খাওয়ানো আরম্ভ হয়, তাই এই নাম। এই 'খীর' তৈরি হয় অনেক যত্নে ও বিশেষ পদ্ধতিতে। শিশুকে নতুন কাপড় পরানো হয়। আত্মীয়াদের উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়; তাদের সামনে সেই 'খীর' বাচ্চার মুখে দেওয়া হয়। আত্মীয়ারা শিশুর দীর্ঘজীবন কামনা করে তার হাতে টাকা দেয়। অন্যান্য উৎসবের মতো এতেও বসে খুশীর 'মহফিল' (আসর)।

দুধ-বঢ়াঈ

বাচ্চাকে দুধ ছাড়াবার সময়ে এই উৎসব হয়। এতে, সাধারণতঃ খেজুর রান্না করা হয়। কেননা, শিশু যদি দুধের জন্যে জেদ ধরে, তাহলে হাতে খেজুর দিয়ে ঘুম পাড়াবার ব্যবস্থা। শুধু শিশুকে নয়, যে-যে বাড়ীতে 'হিস্‌সাদার' (শরীক) আছে, সেখানেও পাঠাতে হয়। সেইমতো হিসেব করে রান্না করতে হয়।

দুধ ছাড়াবার সাধারণ পদ্ধতি হল: মা বা আর কেউ যদি বুকের দুধ খাওয়ায়, তার দুই স্তনে 'এলওআ'[1] বা অন্য কোন কটু জিনিস

[1] কটুকষায় দ্রব্য; এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই এর ব্যবহার হয়।

জলে মিশিয়ে লাগানো হয়। কটুত্বের জন্যে ঘাবড়ে গিয়ে বাচ্চা দুধ ছেড়ে দেয়। আবার যখন দুধ খাবার জন্যে জিদ ধরে, ভোলালেও ভোলেনা, তখন আবার ওর পুনরাবৃত্তি করতে হয়। দু-একবারের পর দুধে বিতৃষ্ণা এসে যায়।

শিশু যখন দুবছরের, 'দুধ-বঢ়াই' অনুষ্ঠান হয়। 'ইনফিয়া' সম্প্রদায়ে মধ্যে দুধ ছাড়ানো হয় আড়াই বছরে। কারণ, আড়াই বছরের পরেই দুধ ছাড়ানো বাধ্যতামূলক। অনেকে এর আগেই ছাড়িয়ে দেয়। অনেকে আবার তিন-চার বছর বয়স পর্যন্ত দুধ খাওয়াতে থাকে। কিন্তু এ-প্রথা 'শরীয়ত'-বিরোধী, তাই সচরাচর ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয়। ঈশ্বর যাকে ক্ষমতা দিয়েছেন, তার ঘরে এই উৎসবেও ঘটা হয়, নাচ-গানের আসর সরগরম হয়ে ওঠে।

বিস্‌মিল্লাহ্

শিশুকে প্রথম পাঠ দেওয়া হয় যেদিন, সেইদিনের অনুষ্ঠান 'বিস্‌মিল্লাহ'। প্রচলিত আনুষ্ঠানিক রীতি অনুসারে এই উৎসব পালিত হয়। শিশুর বয়স যখন চার বছর, চার মাস, চার দিন। এই চার সংখ্যা উৎসবটিকে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছে, যে, চার বছর, চার মাস, চার দিনের সঙ্গে চার ঘণ্টা, চার মিনিটও যুক্ত করা হয়েছে।

শিশুকে নাইয়ে-ধুইয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে, বরের বেশে সাজিয়ে দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়ে কোন মৌলভী সাহেব বা পরিবারেরই কোন বয়স্ক ব্যক্তি শিশুকে পড়াতে বসান। 'আলিফ-বে'[1]-র বই রাখা হয় সামনে। তারপর 'বিসমিল্লাহ্' বলে উচ্চারিত হয় আরবী প্রার্থনা বাক্যঃ "রব্ব্যা ইয়সর ওঅলা তআস্‌সির-ওঅতম্‌মিম

[1] বর্ণমালার প্রথম দুই অক্ষর; আলিফ-বে'-র বই, অর্থাৎ অ-আ-ক-খর বই।

বিলখ্যার"—এর অর্থ: 'খুদাবন্দ, সহজ্ করো, সুগম করো, মঙ্গল হোক আদি-অন্ত।' তারপর 'আলিফ-বে' বলিয়ে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। বড়রা, আত্মীয়রা, স্ব-স্ব সামর্থ্য অনুযায়ী শিশুকে উপহার দেয়। শিক্ষা আরম্ভ হয়।

খত্না

এটিও 'সুন্নতে ইব্রাহীমী'[1] এবং 'আলে-ইব্রাহীম'[2]-এর প্রাচীন ও আবশ্যকীয় অনুষ্ঠান। হিন্দুস্তানে এ-অনুষ্ঠান কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যে হয়, এবং মনে করা হয়; এটির সম্পাদনের পরেই ছেলে "মুসলমান" হয়ে যায়। তাই এই অনুষ্ঠানের সাধারণ নামই "মুসলমানী" হয়ে গেছে। এতে, ছেলের নিম্ন-মুণ্ডের চামড়া কেটে নেওয়া হয়। ডাক্তারী সিদ্ধান্ত অনুসারেও এই কর্তনে অনেক অসুখ ও কষ্ট থেকে বাঁচা যায়; তাই এটি লাভজনক। এটি এক ধরণের অপারেশন, আমাদের পুরনো সার্জন—সাধারণত 'নাঈ' (নাপিত)—অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ও উত্তমভাবে সম্পন্ন করে। তার জন্যে তাকে ভালো পারিশ্রমিক ও পুরস্কার দেওয়া হয়। এই উৎসবে আত্মীয়-বন্ধুরা আসে। পুরুষরা বসে বাইরে, মেয়েরা অন্দরে। 'খত্না' সমাপ্ত হতেই মিষ্টান্ন বিতরিত হয়। যার সামর্থ্য আছে, পাতা পেড়ে খাওয়ায়। ক্ষত শুকিয়ে যাবার পর ছেলে 'আরোগ্য-স্নান' করে। সেদিনও আনন্দানুষ্ঠান হয়। অধিকাংশ খানদানী বংশে এবং কোন 'মানত' পূরণ হয়েছে যাদের তাদের ঘরে এইদিন ছেলেকে বরবেশে সাজিয়ে ঘোড়ার ওপর বসানো হয়। তারপর খুব ধুমধাম ও জৌলুষের সঙ্গে শোভাযাত্রা যায় কোন 'দরগা'-য়, মিষ্টি ও ফুলের চাদর 'চড়ানো' হয়। ছেলে আবার ওইভাবেই ঘরে ফিরে আসে। আনন্দ-উৎসব খুশির মেলা বসে যায়।

---

[1] হযরত ইব্রাহীম দ্বারা কৃত-কার্যাবলী ও প্রদর্শিত মার্গ। [2] হযরত ইব্রাহীমের সন্তান।

এই অনুষ্ঠানের কাল সর্বত্র এক নয়। অনেকে 'ছঠী' বা 'চিল্লা'-র সময়েই ছেলের 'খত্‌না' করিয়ে দেয়। তবে, সাধারণ রীতি-রেওয়াজ অনুসারে শিশু ছয় কি সাত বছরের হলেই তার 'খত্‌না' করিয়ে দেওয়া হয়।

'রোজা-খোলা'-রও[১] একটা অনুষ্ঠান আছে। ছেলে বা মেয়ে যখন নয় কি দশ বছরে পা দেয়, এবং ওদের দিয়ে প্রথম 'রোজা-খোলানো' হয় তখন এই অনুষ্ঠান হয়। কতিপয় 'রোজাদার'-কে[২] বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কয়েক পদের এবং যথেষ্ঠ পরিমাণে 'আফতারী'[৪] প্রস্তুত করা হয়। ছেলে সকলের সঙ্গে ব'সে 'আফতার' করে। মেয়ে হলে অন্দরে অভ্যাগতা 'রোজাদার'—মহিলাদের সঙ্গে বসে 'রোজা খোলে'। এতে গান-বাজনা কম হয়। তবে, শৌখীন ও 'রঙীনমেজাজ' লোকেদের কাছে নাচ-গানের মাইফেল সাজানোর জন্য এই উপলক্ষ্যই যথেষ্ট।.

এই জাতীয় অনুষ্ঠানাদি 'আরোগ্য-স্নান' উৎসবে, এবং কোন মনস্কামনা পূর্ণ হলে সেই উপলক্ষেও হয়। এই প্রসঙ্গে নানাবিধ আচার আছে; সেগুলি যথারীতি পালিত হয়। এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের মতো উৎসবাদিও হয়।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে বড়ো উৎসব: 'নিকাহ বা 'শাদী' তথা বিবাহ।

বিবাহ একটি অতি-প্রয়োজনীয় সামাজিক অনুষ্ঠান। এর যথাযোগ্য মর্যাদা অনেকে দিতে পারেনা, এবং সেকারণে অসংখ্য পরিবার 'বরবাদ', শেষ হয়ে যাচ্ছে। কারণ: আনন্দের আবেগে ও প্রেমিকাকে কণ্ঠলগ্না করার উৎকণ্ঠায় নিজের অবস্থা ও সামর্থ্যের কথা কারও মনে থাকে না। মনে পড়ে না স্ব-কর্মফল। পরিণামে, ধার ক'রে, সম্পত্তি বেচে, বন্ধু ও কুটুম্বদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে, যেথান

---

[১] রমজান মাসে উপবাস: 'রোজা-রাখা'। সারাদিন উপবাস, সন্ধ্যায় উপবাস-ভঙ্গ। তার নাম 'রোজা-খোলা'। [২] যারা রোজা রাখে। [৪] রোজা-খোলার জন্যে প্রস্তুত বিশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী।

থেকে যা পাওয়া যায় সংগ্রহ করে নিজের মান-মর্যাদা রক্ষা করা হয়। তারপর বিয়ে শেষ হতেই প্রায়-ঘরেরই অবস্থা দাঁড়ায়: দারিদ্র্য, উপবাস।

বিবাহ মানবজীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর সবিস্তার বর্ণনা অবশ্যকরণীয়।

বিয়ের সম্বন্ধ হয় সচরাচর 'মাশ্‌শাতা' (প্রসাধিকা)-র মাধ্যমে। হিন্দুস্তানের সব বড়-বড় শহরে, বিশেষ ক'রে যেখানে যেখানে প্রাচীন সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছিল সেই সব জায়গায়, নারীদের একটি বিশেষ পেশা, 'বনাও সিংগার' (প্রসাধন)। শব্দকোষে ও কবিদের রচনায় যে অর্থ আছে, তা হল: 'মাশ্‌শাতা হচ্ছে সেই নারী, যারা অভিজাত কুলরমণীদের চুল আঁচড়ে-বেধে দেয়, কাপড়-গয়না পরিয়ে দেয়, এবং শৃংগার অর্থাৎ সাজিয়ে দেয়। কিন্তু, সমাজে 'মাশ্‌শাতা' তাদেরই বলে, যারা বিয়ের খবর নিয়ে যায়, সম্বন্ধ করে, এবং বিয়ে দেওয়ায়। সম্ভবত, এই পেশা ওইসব নারীরাই আরম্ভ করেছিল, যারা সুন্দরীদের শৃংগার সাধন করে। এ-থেকেই শেষে 'শাদী ঠাহরানেওয়ালী' (ঘটকী) নারীদের নাম 'মাশ্‌শাতা' হয়ে গেছে। এরা অত্যন্ত সুচতুরা ও ছলনাময়ী। কোন ছেলের খবর নিয়ে যে ঘরে যায়, তাদের কাছে ছেলের বৈভব, শিক্ষা, আজ্ঞাকারিতা, শিষ্টতা ও সৌন্দর্যের বেহদ প্রশংসা করে। এইভাবে যখন কোন মেয়ের খবর ছেলেদের ঘরে নিয়ে যায়, মেয়ের সৌন্দর্য, আচার-আচরণ, গুণাবলীর এমন ব্যাখ্যান করে, মনে হয়: যে-মেয়ের বিবরণ দিচ্ছে, সে মানবী নয়, কোন পরী কি শাহজাদীই হবে বা!

'মাশ্‌শাতা' খবর আনবার পর পুরুষরাই খোঁজ খবর নেয়। কিন্তু সম্বন্ধ করার অধিকার বেশির ভাগই দুই ঘরের মহিলাদের। দেখেশুনে, সন্তুষ্ট হয়ে, তারা পুরুষদের স্বীকৃতি আদায় করে। এবং 'রিশ্‌তা' ('সম্বন্ধ') স্থাপিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে, দুই পরিবারে শিশু জন্মাতেই, দুই মাতা, যদি ইচ্ছা হয়, সম্বন্ধ করে রাখে। তার জন্যে 'মাশ্‌শাতার' কোন প্রয়োজন হয় না। বিয়ের আগে 'সম্বন্ধ

করা'-র সঙ্গে যুক্ত যে-অনুষ্ঠান, তারও অবকাশ থাকে না। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গেই 'মাংগ্‌নী' (বাগ্‌দান) হয়ে যায়। বর অনায়াসেই পেয়ে যায় বধূকে কানাকড়ির বিনিময়ে।

নতুন ঘরে যখন খবর যায়, প্রায়ই ছেলেকে 'বর-দেখানো'-র নাম ক'রে তার আত্মীয়-বন্ধুসহ মেয়েদের বাড়ি ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং এমন জায়গায় বসানো হয়, যাতে মেয়েরাও উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে বরকে দেখতে পায়। ঘরের পুরুষরা সবাই এসে অভ্যর্থনা ও সাধ্যমতো খাতির করে। এইভাবে, ছেলের মা-বোনরাও একটা নির্দিষ্ট দিনে মেয়েদের বাড়ি যায় এবং মিষ্টি খাওয়ানো বা অন্য কোন অছিলায় মেয়েকে দেখে নেয়। তাকে সাধারণত আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়; তাই এই ছল। কোন-কোন অভিজাত পরিবারে বরকে এভাবে ডাকিয়ে পাঠানো বা কনে-দেখার রেওয়াজ নেই। পাত্রীপক্ষ, অবস্থাদির খোঁজখবর করে। একইভাবে মেয়ে পক্ষেরও খবর নেওয়া হয়।

ইত্যাকার পদ্ধতিতে রূপ মুখশ্রী, অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা এবং তদতিরিক্ত বংশগত গুণাবলী ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকে পাত্রপক্ষের মেয়েও কন্যাপক্ষের ছেলে যখন পছন্দ হয়ে যায়, তখন হয় 'মাংগ্‌নী' অনুষ্ঠান। বরের পক্ষ থেকে মিষ্টি, ফুলের গয়না এবং সোনার একটি আংটি যায় মেয়ের বাড়ির। অনেক ঘরে বরের আত্মীয়ারা গিয়ে এসব পরিয়ে দেয়।

'মাংগনী-অনুষ্ঠান' হয়ে যাবার পর ধরে নেওয়া হয়ঃ কথা পাকা হয়ে গেছে। এই সময় থেকে নিয়ম হচ্ছেঃ দুপক্ষের বাড়িতে কোন উৎসব হলে শ্বশুর বাড়িতে বিশেষ তত্ত্ব পাঠানো হয়। ছেলের বা মেয়ের জন্য যে-ভাগ যায়, তা বড়ো হয় এবং খুব সাজিয়ে দেওয়া হয়। এর মধ্যে যদি মহর্‌রম এসে যায়, দুপক্ষেরই তরফ থেকে এলাচ, চিকন ডালা, সোনা-রূপোর তারের 'গোটা (ফল্‌স্) সূক্ষ্ম ও ভারী কাজ করা রেশমী 'বটুয়া' খুব সুন্দর করে সাজিয়ে পরস্পরের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বিবাহের কয়েকদিন আগে 'দুলহন' (কনে)কে 'মঁাঝায় বসানো' হয়। পরানো হয়, 'মঁাঝা'র হলদে 'জোড়া' (বস্ত্রাদি) সেদিন থেকে প্রত্যহ কন্যার অঙ্গপ্রসাধন অবশ্য-করণীয়, এবং জরুরী প্রয়োজন না হলে পর্দার বাইরে আসা নিষেধ। 'মঁাঝায় বসা' যেদিন, সেদিনকার উৎসব : দুলহানের ব্যবহৃত অঙ্গরাগ, ব্যবহৃত মেহঁদী, মিছরির খণ্ড, সেই সঙ্গে নানারকম গোলাকার খাদ্যবস্তু বাজনাবাদ্য ক'রে শোভাযাত্রাসহকারে 'দুল্হা' বা বরের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়। বরের জন্যে যেসব খাদ্যবস্তু, সেগুলি আলাদা থালায় রাখা হয়। এই সঙ্গে, বরের জন্যে 'মঁাঝা'র হলদে ভারী জোড়া (বস্ত্রাদি) নকৃশা ও রংকরা একটা চৌকি, ঘটি-বাটিও থাকে। ঘটি-বাটী দড়ি দিয়ে চৌকির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। শোভাযাত্রার ক্রমও থাকে : বাজনা ও শোভাযাত্রার পর সবার আগে চৌকি, তারপর বরের জন্যে তত্ত্ব নতুন থালায়, তার পরে থালায়-থালায় নানান ধরণের পিণ্ড। কনের ছোট বোন ও ডোমনীরা ডুলি-পালকীতে চেপে যায়। এরা বরের বাড়ি পৌঁছে একটা পিণ্ড ও মিছরীকে সাত টুকরো করে দুলহাকে লোভ দেখিয়ে-দেখিয়ে খাওয়ায়।

অনুমান হয় : এটি বিশুদ্ধ হিন্দুস্তানী উৎসব। এর সঙ্গে আরব বা ইরানের কোন সম্বন্ধ নেই। এবং 'মঁাঝা' ও তার সঙ্গে কংকণের প্রচলন ভারত ছাড়া আর কোথাও নেই।

'মঁাঝার' দশ-বারো দিনেরও বেশি পরে ঠিক একইরকম জঁাকজমক ও জুলুসের সঙ্গে দুলহার ঘর থেকে দুলহনের ঘরে যায় 'সাঁচক'। সাঁচক তুর্কী ভাষার শব্দ, আচারটিও তুর্কীদের। মনে হয় : তুর্কী ও মুগলরা একে সঙ্গে করে ভারতে এনেছিল। এদিন বরের ঘর থেকে কনের জন্যে খুব কাজকরা ও ভারী জোড়া ও অলংকারাদি ('চড়াও এ কা জোড়া') যায়। কন্যার জন্যে সোনার চওড়া তারের 'সেহরা' মুখ ঢাকা হয় যা দিয়ে), রূপোর 'ছললা' (অংগুঠী), সোনার আংটি, আরও দু-একটা জিনিস থাকে। সেই সঙ্গে সেই অলংকার, যা পরিধান করে 'বিদা' হবে,

কন্যা বিদায় নেবে। আর, ফুলের গয়না। জোড়ের সঙ্গে চিনির 'সুকল্'[1] ও চিনির 'কূর্স'[2] এবং মেওয়া যায়। বিশেষ ক'রে সাঁচকের জন্যে রঙীন ও নক্‌শাকাটা ঘড়া তৈরি করানো হয়। বাঁশ ও কাগজের রংকরা তক্তায় চারটে করে ঘড়া লাগিয়ে 'চৌ-ঘড়া' বানানো হয়। আমীর ও ধনবানদের ক্ষমতা অনুযায়ী 'চৌঘড়ার' সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকে, প্রায়ই একশো, দুশো পর্যন্ত হয়। এগুলির ভেতরে থাকে কয়েকটা 'সুকল্' এবং একপো কি আধসের চিনি। আর কিছু থাকে না। এদের মুখে দড়ি দিয়ে লাল কাপড় বেঁধে দেওয়া হয়। জুলুসে, ওইসব ঘড়ার আগে যায় রূপোর একটা মট্‌কী, তাতে থাকে দই ভর্তি। এর মুখও দড়ি দিয়ে লাল কাপড়ে বাঁধা থাকে, আর গলায় বাঁধা থাকে দু-একটা মাছ—'মুবারক শকুন' (শুভ লক্ষণ-চিহ্ন) হিসেবে। এসব জিনিস বরের ঘরে পৌঁছলে আত্মীয়দের মধ্যে বেঁটে দেওয়া হয়।

॥ 44 ॥

সাঁচকের দ্বিতীয় দিন রাত্রে দুলহনের ঘর থেকে শোভাযাত্রা করে, আলো দিয়ে, যায় "মেহেঁদী"। এটা আসলে আরবী অনুষ্ঠান। এতে, কন্যাপক্ষের তরফ থেকে দুলহার জন্যে যায় 'জোড়া', যা পরে বর আসবে বিয়ের ছাঁদে। এই জোড়ায় সচরাচর থাকে : প্রাচীন মুঘল দরবারে প্রচলিত ডিজাইনের 'খেলাত' শামলা, 'জীগা', 'সরপেচ' (শিরোভূষণ) ও তাতে সংগ অলংকার কল্‌গা'। অদৃষ্টে থাকলে, তার সঙ্গে মোতির মালাও দেওয়া হয়। এছাড়া, রেশমী পায়জামা, জুতো ইত্যাদি সাধারণ জিনিসও থাকে। একটা রূপোর আংটিও প্রায়ই থাকে। এই জোড়ার সঙ্গে দুলহার মাখবার জন্যে পিষে তৈরি করা মেহঁদীও পাঠানো হয়। অনেকগুলো থালায়

[1] এক ধরণের ক্ষীর। [2] 'টিকিয়া' বা গোল চ্যাপ্‌টা মিষ্টি।

মেহঁদী ছড়িয়ে রাখা হয়। এবং তাতে লাল ও সবুজ বাতি সাজিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এইরকম অনেকগুলি আলোকিত মেহঁদীর থালা থাকায় 'মেহঁদীর জুলুস'-এ এক স্বতন্ত্র শোভা ও রূপ ফুটে ওঠে। মেহদীর এই র‍্যাওশন থালার সঙ্গে পঞ্চাশ থেকে একশোটা থালায় থাকে তালখেজুর কেটে তৈরি করা 'মলীদা'। পরিমাণ নির্ভর করে সামর্থ্যের ওপর। এইসময় দুলহার জন্যে জোড়ার সঙ্গে সোনার 'সেহরা'ও যায়।

মেহঁদীর দ্বিতীয় দিন দুলহার তরফ থেকে 'বরাত' যায়। প্রাচীন কালে এই 'বরাত' (বরযাত্রী) যেত 'পহর রাত রহে' অর্থাৎ রাত তিনটেয়। এখন সময়ের হেরফের প্রায়ই হয়। রাতের শেষ প্রহরের বদলে 'পহর দিন চঢ়ে' অর্থাৎ সকাল নটা-দশটায় বরাত যায়। এই বিলম্বিত যাত্রার সূচনা অওধের শেষ বাদশাহ ওয়াজিদ আলী শাহর সময় থেকে হয়েছে। নেহাৎই ঘটনাচক্রে, তাঁর 'বরাত' বেরোতে দেরি হয়ে যায়, সকাল হয়ে আসে। এতে লোকেদেরও অনেক সুবিধা, আলোর খরচও বাঁচানো যায়। তাই এই সময়টাই চালু হয়ে গেল। এখন সবক্ষেত্রেই 'বরাত' যায় সকালে, দুপুরে 'নিকাহ' (বিবাহ) হয়ে যায়।

বরাতে, যতোদূর সম্ভব, শোভাযাত্রার রূপটি সম্পূর্ণতা পায়। প্রচলিত তিন বাজনা অর্থাৎ পুরনো ঢোল-তাশা-ঝাঁঝ, রোশন-চৌকী এবং ব্যাণ্ড পার্টি তো থাকেই। এর চেয়ে বেশি-কিছু করতে হলে, ঘোড়ার পিঠে যায় নহবৎ-নাকাড়া, ঝাণ্ডা, বর্শাধারী, হাতী, উট, ঘোড়া। তার চেয়েও বেশি ক্ষমতা থাকলে এইসব বাজনার দল বাড়িয়ে দেওয়া হয়। 'মেহঁদীর' সঙ্গে আসা 'জোড়া' প'রে, 'সেহরা' বেঁধে বর ঘোড়ায় চেপে, উচ্চবর্গের আমীরের ব্যাপার হলে হাতীতে চড়ে, শোভাযাত্রা ও বাজনার পেছনে ধীরে ধীরে ও জাঁকজমকের সঙ্গে রওনা হয়। এই দুলহাকে বলে 'ন্যওশা' অর্থাৎ নয়া 'বাদশাহ'। সত্যিই, দুলহাকে একদিনের জন্যে বাদশাহ বানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু একটা কথা—দুলহাকে যদি বাদশাহই বানানো হয়, তবে তার

মাথায় শামলা কেন? তাজ পরায় না কেন? এ থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে, যে, হিন্দুস্তানে মুসলমান আড়া (বাঁকা) তাজ পরত না, সকলের মাথায় থাকত 'কলগীদার' শামলা। ইংরেজরা গাজীউদ্দীন হায়দারের সময় থেকে অওধের বাদশাহদের মাথায় তাজ পরিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু দেশী সমাজ তাকে স্বীকার করেনি। তারা আপন বাদশাহের বেশভূষা সেই পুরনোই রেখে দিল, এবং সেই নমুনারই বাদশাহ বানিয়ে দেয় ঘরের বাদশাহ 'খ্যওশা'-দের। দুলহার পেছনে ডোলী পালকিতে যায় দুলহার মা, না হলে অন্য আত্মীয়েরা, এবং ডোমনীরা। যাত্রাকালে, ঘরে যেসব আচার-টোটকাদি হয়, তারা যেমন সংখ্যায় অনেক, তেমনি অবগুনে ভরা। সুতরাং অনুল্লেখ্য।

এই শোভাযাত্রা সহকারে 'বরাত' যখন দুলহনের ঘরে উপনীত হয়, তখনই দুলহনকে স্নান করানো হয়। সেই স্নাতক-জল বাইরে এনে দুলহার বাহন ঘোড়া বা হাতীর পায়ের নীচে ঢেলে দেওয়া হয়। এই স্নান দুলহন করে সাতদিনের বাসী ঠাণ্ডা জলে, যাকে বলা হয় 'কলস কা পানী'। শীতের সময়ে এই জলে স্নান, বেচারী দুলহনের পক্ষে সে স্নান মরণ সমান। চৌকীর ওপর পান বিছিয়ে স্নান করানো হয়, এবং এই পান যায় একুশপানের বিঁড়েতে, এবং শ্বশুরবাড়ীতে সর্বপ্রথম খাওয়ানো হয়।

এরপর দুলহা বাহন থেকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। ওখানে সুতো বাঁধা হয় এবং নানান ধরনের আচার অনুষ্ঠিত হয়। দল ও পরিবার বিশেষ এগুলো আলাদা-আলাদা আজব ও অর্থহীন। এগুলি হয় সেই সময়ে, যখন দুলহন স্নান করে উঠেছে, কিন্তু তখনও কাপড় পরেনি, শুধু একটা চাদর জড়ানো। সেই অবস্থায় তার হাতে মিছরি রেখে দুলহাকে খাওয়ানো হয়। এবং শ্যালিকা উৎসাহিনী নারী ও ডোমনীরা নানান ছল করে দুলহার সব কাজ ও প্রয়াসকে ভণ্ডুল করে দিতে থাকে।

'শাদী'র এই প্রথম ও কঠিন পর্ব অতিক্রম করে দুলহা আসে

বাইরে, প্রাঙ্গণে, যেখানে খুশীর 'মহফিল' (আসর) জমে উঠেছে। আত্মীয়-বন্ধুরা ভালো-ভালো কাপড়চোপড় পরে পরিষ্কার দরী, চাদর ও গালচের ওপর সারি দিয়ে বসে। সামনে নর্তকীরা দাঁড়িয়ে মুজরা করছে। সভার ঠিক মাঝখানে, উঁচুতে, দুলহার জন্যে সুন্দর মসনদ তাকিয়া। সমবয়স্ক ছেলেরা দুলহাকে নিয়ে এসে তার ওপর বসিয়ে দেয়, এবং দুপাশে নিজেরাও বসে যায়—যাতে দুলহা মন খুলে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে।

প্রতিপদে, আচরণে, 'শর্মীলাপন' (লজ্জার ভাব) প্রকাশ করা দুলহার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। না পারে সে কোন বেহিসেবী কথা বলতে, না কেউ শুনতে পায় তার কণ্ঠস্বর, না পারে কারও সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে। মুখের ওপর 'সেহরা'। সোনার 'সেহরার' ওপর ফুলের 'সেহরা' বাঁধা। অনেকক্ষণ ধরে পরিশ্রম ও প্রয়াস না করে তার মুখ-দর্শন করবে, এমন ক্ষমতা কারও নেই। খুশীর মহফিলে বসার সময়, (প্রায়শ 'নিকাহ' হয়ে যাবার পরই) 'সেহরা' খুলে নিয়ে শামলা পরানো হয়, যাতে মুখ দেখা যায়। কিন্তু তখনও তাকে একহাতে মুখে রুমাল ঢাকা দিয়ে রাখতে হয়, যাতে তার লাজুক-ভাব প্রকাশ পায়। মুখের ওপর এখন আর 'সেহরা' নেই, মুখ খোলা; কিন্তু রুমালের জন্যে পুনশ্চ পরিশ্রম ও চেষ্টা করতে হয় মুখদর্শন-কামীদের। অর্থাৎ, সহজে সফল হবার কোন উপায় এখনও নেই।

দুলহাকে এইভাবে বাইরে বসিয়ে রাখার কিছুক্ষণ পরে 'নিকাহ'-র আয়োজন করা হয়। শীয়াদের বিয়ে যদি হয়, তাহলে দুজন ধর্মাচার্য আসেন—একজন, ছেলের 'নায়েব-উকিল', অন্যজন মেয়ের 'নায়েব-উকিল' হয়ে। কন্যাপক্ষের 'নায়েব-উকিল' পর্দার কাছে যান, এবং সাক্ষী রেখে ও শপথ ক'রে মেয়ের 'শরঈ মুখ্‌তারী'[1]-র অধিকার লাভ করেন। তারপর দুজনে দুলহার সামনে বসে বর-কন্যার পক্ষ থেকে 'কিরঅত'[2] এবং যথাযথ উচ্চারণসহ সম্পন্ন করেন 'ঈজাব-ও

[1] -ইসলামী কানুন-সম্মত প্রতিনিধিত্ব। [2] শুদ্ধ উচ্চারণে কুরান-পাঠ।

কুবুল-কে-সীগা'[1]। বিবাহ যদি হয় সুন্নীদের, তাহলে কোন মাননীয় মৌলভী সাহেব এসে 'নিকাহ পড়ান'। গ্রামাঞ্চলে 'নিকাহ পড়ান' স্থানীয় কর্ম-নিরত কাজী সাহেব। তার পদ্ধতি হল: কন্যার আত্মীয়-দের মধ্যে যে-কেউ-একজন তার 'উকিল' ও 'মুখ্‌তার' হয়ে আসেন, এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে বলেন: "অমুক কন্যা এই দুই সাক্ষীর সামনে আমাকে তার উকিল নিযুক্ত করেছে, এবং তার পক্ষ থেকে এই বিবাহ কার্য পরিচালনার অধিকার দিয়েছে।" সাক্ষ্যে সন্তুষ্ট হয়ে মৌলভী বা কাজী সাহেব ওই উকিলের কাছ থেকে 'মেহের'[2]-এর পরিমাণ জেনে নিয়ে বরকে পড়ান 'শহাদত কলমা'[3]। যে-যে বিষয়ে 'ইমান' (ন্যায়ধর্ম) মুসলমানদের পক্ষে অবশ্য-পালনীয়, সেইসব বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করানো হয় আরবীতে। তারপর তিনবার উচ্চারিত হয়: "এই পরিমাণ মেহের-এর ওপর অমুক কন্যার সঙ্গে তোমার নিকাহ করিয়ে দিলাম।" দুলহাকে দিয়ে শপথ করানো হয়: "ম্যঁয়্‌নে কবূল কিয়া"—"আমি স্বীকার করে নিলাম।" অতঃপর একটি 'দুআ' (দুয়া, প্রার্থনা) পাঠ করে সমবেত লোকেদের উদ্দেশ্যে বলা হয়: "মুবারক"। প্রত্যুত্তরে "মুবারক-সলামত" (শুভ ও কল্যাণ কামনা) ধ্বনি উত্থিত হয় সমাগতদের সামষ্টিক কণ্ঠে। সামনেই থালায় থাকে মিষ্টান্ন 'নুক্‌ল্‌' ও 'ছুহারা'; উপস্থিত লোকেদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

মৌলভী সাহেব বা ধর্মগুরু এলে 'মহফিলের' গান বন্ধ হয়ে যায়। 'নিকাহর' পরে মৌলভী সাহেব চলে যেতেই নাচ-গানের আসর আবার গরম হয়ে যায়। বরকে আবার অন্দরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। মহিলামহলে স্ত্রী আচার ও শর্ত পূরণের এই সময়। তাকে নিয়ে নানান রকম মজা করা হয় এই সুযোগে—এসবও আচারের অন্তর্গত। ফলে, দুলহা বেচারী অচিরেই কাহিল হয়ে ওঠে। এই

[1] বর-কন্যার পরস্পর স্বীকৃতি। [2] যে-পরিমাণ অর্থ বর কন্যাকে দেবে বলে নির্দিষ্ট হয়—যদি বিচ্ছেদ ঘটে। [3] যে-কল্‌মায় খোদার স্রষ্টা এবং রসুলের পয়গম্বর হওয়ার সাক্ষ্য বিধৃত আছে।

সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে শালীরা ও ডোমনীরা। বাস্তবিক, নবযুবক কুমারের কাছে বিবাহ এক রহস্যময় ব্যাপার, যাতে এমন এমন সব সমস্যা হাজির হয়। যার কল্পনাও সে করতে পারে না। ছুলহনকে ওড়না জড়িয়ে এক অচল পুঁটলির মতো তার সামনে এনে রাখা হয়। তখনও তাকে 'রূখ্সতী বিদা'-র (বধূ-বিদায়ের) জোড়া পরানো হয় না। নিয়ে আসার সময় চেষ্টা করা হয়, প্রথম বারেই কনের একটি পদাঘাত যেন গিয়ে পড়ে বরের ওপর। তারপর 'টোনা গাওয়া' হয়—'জাছুমন্ত্রের গান'। ছুলহার কাছ থেকে স্ত্রীর গোলামী, সবচেয়ে নিকৃষ্ট গোলামী, এবং খুদা জানেন, আরও কী-কী সব সেবা কবুল ও শপথ করিয়ে নেওয়া হয়। অতঃপর 'আরসী মুসহক" : ছুলহা-ছুলহনের জন্যে 'রহল'[1]-এ রক্ষিত-কুরান শরীফ; তার ওপর আয়না। সেই আয়নায় ছুলহাকে ছুলহনের প্রথম 'জলওআ' (বধূ-দর্শন করানো হয়)। তার আগে ছুলহাকে 'সুরা-এ-ইখলাস'[2] পড়ে নিতে হয়। 'বধূ-দর্শন' কালে বধূটি চোখ বন্ধ করে রাখে। বরকে দিয়ে সেই চোখ খোলানোর জন্য নারীরা নানাভাবে চেষ্টা করে ও করায়, এবং সেই সূত্রে তাকে দিয়ে তাবৎ গোলামীর প্রতিজ্ঞা কবুল করিয়ে নেয়। অনেক খোশামোদ ও চেষ্টাচরিত্রের পর কন্যা আঁখি তুলে এক নজর দেখে, পরমুহূর্তে আবার মুদিতনয়না। এরই পর অনুষ্ঠান শেষ।

এইবার ছুলহনকে কাপড় পরানো হবে, গয়না পরানো হবে, সাজানো হবে, শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্যে তৈরি করে দিতে হবে। তাই ছুলহাকে পাঠানো হয় বাইরে। ডোমনীরা গান ধরে 'বাবুল': বিদায়ের হৃদয় বিদারক গীত। আনন্দিত গৃহ মুহূর্তে রূপান্তরিত হয় শোকস্থলীতে। আবরণে-আভরণে অলংকরণে প্রস্তুত কন্যা। মাতৃ গৃহের সব আত্মীয়, বন্ধু ও সমাগতজন—যে যা পারে, টাকা-পয়সা-গয়না উপহার দেয়। কাঁদতে কাঁদতে ছুলহনকে 'বিদা' করে—বিদায় দেয় কন্যাকে।

[1] - কাঠের পুস্তকাধার। [2] কুরান শরীফের একটি অধ্যায় বিশেষ।

এই অবকাশে বিয়ের দানসামগ্রী 'দহেজ' বার করা হয়। তার তালিকা এনে রাখা হয় বরপক্ষের সামনে। তারা তালিকা অনুযায়ী মিলিয়ে নেয় সব জিনিস : অলংকার, কাপড়চোপড়, বাসনপত্র, পালংগ্, চৌকী, এবং আর যা কিছু দেবার মতো জিনিস। ওদিকে, কন্যাও বিদায় গ্রহণের জন্মে সম্পূর্ণ প্রস্তুত—পরিধানে তখন আর কোন ভারী কাজ করা পোষাক নয়—একটা লাল 'টুলের' ওপর 'তনুযেবের' কুর্তা, সাদা রেশমের পায়জামা, তাতেও সাদাসিধে ভাব, 'গোট' পর্যন্ত লাগানো হয় না, নাড়ার 'ইজারবন্ধ' শুধু।

ছুলহনকে যখন সাজিয়ে দেওয়া, কাপড় পরানো হতে থাকে, ডোমনীরা গান ধরে 'বাবুল'—মাকে ছেড়ে যাওয়ার বিজয়া-গীতি ; অত্যন্ত করুণ ও মর্মভেদী সে গান। শোকের, বেদনার একটা থমথমে-ভাব জমাট বেঁধে ওঠে। দুঃখ, সন্তাপ ছড়িয়ে পড়ে হৃদয়ে-হৃদয়ে। আত্মীয়রা, পরিবারের বন্ধুরা, অভ্যাগতজন দুঃখভরা সজল বাক্যে বিদায় দেয় কন্যাকে। কন্যা কাঁদে ব্যাকুল হয়ে। পাল্‌কি এসে লাগে দেউড়ীতে বরকে আবার অন্দরে ডেকে পাঠানো হয়—'তুমি নিজে এসে বউ নিয়ে যাও'। বর আসে ; বোরুদ্যমানা কনেকে কোলে তুলে নেয়, বসিয়ে দেয় পাল্‌কিতে।

বিদায়ের আগে অন্তঃপুরে অনুষ্ঠানের আব একটি পদ বাকি : সেলাম-করাঈ' ছুলহা প্রণাম করে বয়স্কা মহিলাদের ; তারা নিজ নিজ সাধ্য মতো উপহার-সামগ্রী দেয়। সেই সময়ে বাইরে শরবত পান করানো হয়। এই শরবতের গেলাস ও ক্যানেস্তারা শুধু এই উপলক্ষেই আনা হয়। পান কেউ করে না। বরং শরবতের থালায় সবাই টাকা রাখে। এইভাবে অন্দরে-বাইরে 'সেলাম-করাঈ' ও 'শরবত-পিলাই'য়ে যা কিছু জমা হয়, বরকে দিয়ে দেওয়া হয়।

এবার প্রত্যাবর্তন। 'বরাত' (বরযাত্রীদল) যাত্রা করে ছুলহার

ঘরের দিকে—সেই ধুমধাম, সেই জাঁকজমক। বরের ঘোড়ার আগে আসে, বধুর পাল্‌কি। তার ওপর খুব সুন্দর রঙীন পর্দা দু'পাশে পর্দা ধরে চলে কাহারনীরা। আশে-পাশে দুলহার চাকর ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভীড়। দুলহার পরে সংগিনী রমণীদের পাল্‌কি।

এই জুলুসের প্রধান জিনিস ঃ 'দহেজ'-এর সামগ্রী। এগুলি থাকে শোভাযাত্রা ও বাজনার পেছনে, কন্যার পাল্‌কির আগে। একটা ক্রম থাকে—এক-এক বাহকের হাতে এক-একটি চ্যাঙ্গাড়ী, তাতে তামার পাত্র একটি ক'রে। কাঁচ ও চীনে মাটির পাত্র। তারপর সিন্দুক ইত্যাদি যাতে দুলহনের 'জোড়া' থাকে। পালংগ তার ওপর রেশমী গদী, লেপ, তাকিয়া, চাদরাদি—রেশমী দড়ি দিয়ে সব বিছানা পালংগের পায়ার সঙ্গে বাঁধা; দড়ির দুই মাথায় বিশেষ আকারের রূপোর ঝুম্‌কো লট্‌কানো। মেয়েকে গৃহস্থালীর সব জিনিস দেওয়া হয় ঃ আয়না, চিরুণী, শৃংগার-দ্রব্য তেল, আতর। ক্ষমতা থাকলে, রূপোর পানদান, লোটা, বাটি, এবং আরও কিছু জিনিস দেওয়া হয়। এগুলি থাকে বাজনা ও শোভাযাত্রা এবং দুলহা-দুলহনের মাঝখানে। সবার পেছনে ডোলীতে থাকে খাবার পাত্র। এতে থাকে কন্যাপক্ষ থেকে দুলহাকে দেওয়া খাবার, যার নাম 'বহোড়ে কা খানা'।

ইত্যাকার জমক-দমকের সঙ্গে বরাত এসে পৌঁছয় বরের ঘরে। খুশীর বাজনা বাজে। ডোমনীরা আগেই পৌঁছে গিয়ে বিবাহ গীতি 'বনড়ে' গায়। চারদিক থেকে 'মুবারক-সলামত' (শুভাকাংক্ষা) জানানো হতে থাকে। তারই মধ্যে দুলহনকে নামিয়ে নেওয়া হয়। কোন-কোন পরিবারে বরই কোলে করে কনেকে নামিয়ে আনে। কোন-কোন ঘরে মেয়ের মা-বোন এসে নামায়। ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়, এবং তার আঁচলের ওপর দুলহাকে দিয়ে পড়ানো হয় 'নমাজে শুক্রানা' (খুদার অনুগ্রহ ব্যক্ত করার জন্যে পাঠ্য নমাজ)। কনের পা ধুইয়ে দেওয়া হয়; সেই জল বাড়ির চার কোনে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর 'মুঁহ-দিখাই', 'মুখ-দেখা' ঃ আত্মীয়-আত্মীয়ারা টাকা বা গয়না দেয়, এবং আবরণ উঠিয়ে কন্যার মুখ-সৌন্দর্য দর্শন করে।

নতুন বাড়িতে নতুন বধূর প্রথম রাত—অনেক বাঁধাবাঁধির রাত, অনেক লজ্জার। না পারে কারও সঙ্গে কথা কইতে, না পারে কিছু বলতে, না পারে কাউকে দুচোখ ভরে দেখতে। সঙ্গিনী ছাড়া আর কারও কাছে মুখ খুলতে পারে না। এই কষ্টের হাত থেকেই যেন বাঁচাবার জন্যে, ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ভাই বা অন্য কোন আত্মীয় 'চৌথী'-র (বিবাহের চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠান) জন্যে আসে, এবং সম্ভব হলে, মেয়েকে সকালেই সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এবারেও বধূ যায় সগৌরবে; তবে জুলুস-বাজনা থাকে না। দুলহনের সঙ্গে দুলহাও যায়, সঙ্গে যায় সাত রকম তরকারী ও সাত ধরনের মিঠাই।

দিন কাটিয়ে, সেই রাতেই, মেয়ে ঘরে 'চৌথী' খেলা হয়। দুলহার বরবেশ খুলে নিয়ে পরানো হয় 'চঢ়াও এ কা জোড়া'—তাবৎ জোড়ার মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি জাঁকজমকপূর্ণ এবং কারুমণ্ডিত। জোড়া পরিয়ে তারপর খুব সাজানো হয়। দুলহার বাড়ি থেকে তার বোন ও আত্মীয়রাও এসে যায়। ভিড় জমলে লড়াই। দুলহা-দুলহন মিষ্টি দিয়ে, এবং বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ সব্‌জি-তরকারি ও ফুলের ছড়ি দিয়ে পরস্পর লড়াই করে। মিষ্টি ও শাক-সব্‌জী মারে ছুঁড়ে, ফুলের ছড়ি মারে হাতে। এই খুশীর লড়াই কখনও-কখনও খুব জোরদারও হয়, অল্পস্বল্প আঘাতও পায় কেউ কেউ।

'চৌথী'র দুচারদিন পরে পুনশ্চ দুলহনের পতিগৃহে যাত্রা। তখন যে অনুষ্ঠান, তার নাম 'চার চালে'। 'চাল' আর 'চলন' থেকে এই 'চালে' শব্দ এসেছে। নববধূকে 'সুসরাল' নিমন্ত্রণ করা হয়। কিন্তু এ-নিমন্ত্রণ শ্বশুর বাড়িতে নয়, শ্বশুরকুলে—মাসী-পিসী-মামী, একের পর এক স্বগৃহে নিমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনার বিশেষ ব্যবস্থা করে। স্বামীর সঙ্গে বউ যায়। এক রাত ও এক দিন দুলহা-দুলহন সেখানে অতিথি হয়ে থাকে। বিদায় দান কালে 'জোড়া', 'সেল্মাম-করাঈ', গয়না ইত্যাদি যার যেমন সাধ্য, দেয়।

এই ছিল লখনউবাসীদের শাদী। এর আরও অনেক অনুষ্ঠান

আছে। কিন্তু সেসব বাদ দিয়ে এর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলগুদায, এর পাঠকদের সামনে হাজির করা গেল।

দেহাতীদের বিয়ের রীতি-নীতি একমাত্র 'নিকাহ' ছাড়া আর সব বিষয়ে বদলে গেছে। ওখানেও 'মাঁঝা' হয়। তবে ছুলহার জন্যে 'মাঁঝা'র হলদে 'জোড়া' নিয়ে আসে তার বোন ও আত্মীয়েরা। ছুলহনের ঘর থেকে বাজনা বাজিয়ে ধুমধামের সঙ্গে 'মাঁঝা' আসে না। ছুলহার ওখান থেকে 'সাঁচক' আসে না, ছুলহনের ঘর থেকেও 'মেহঁদী' যায় না। সমস্ত অনুষ্ঠান বরাতের দিনই পালিত হয়, অন্যভাবে। বরাত যখন ছুলহনের বাড়ি পৌঁছয়, একটু দূরে থাকতেই থেমে পড়ে। সেখান থেকে, সাঁচকের বদলে, যায়: ছুলহনের জোড়া, আরও কয়েকটি জোড়া, সোহাগের জরুরী দ্রব্য-সম্ভার কিছু চিনি, কিছু সেদ্ধ চাল—এইসব থালায় সাজিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে কনের বাড়ির দরজায় পৌঁছে দেওয়া হয়। একে বলে 'বরী'। এর সঙ্গে যায় বরের আত্মীয়-বন্ধুরা। সমস্ত জিনিস তারা কন্যাপক্ষের সকলের সামনে খুলে দেখিয়ে তাদের হাতে সমর্পণ করে; তারপর ফিরে আসে শরবত খেয়ে।

অল্প পরেই, এইভাবে কন্যার পক্ষ থেকে আসে 'বরী'—বরের 'জোড়া' থাকে তার মধ্যে। মেহঁদীর পরিবর্তে এই 'বরী'। এতে থাকে জামা, নীমা, পাগড়ী, 'সেহরা', জুতো, ফুলসাজ, ইত্যাদি। খাবারও থাকে। এইবার বরাত যায় কনের দরজায়, এবং বিবাহ-আসরের নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসে। সারা রাত নাচগানের আসর গরম থাকে। অবশ্য যখন কাজী সাহেব এসে নিকাহ পড়ান, তখন বন্ধ থাকে। শহরে বিবাহের যে রীতির বর্ণনা করেছি, এখানেও তাই। নিকাহের পরে কন্যাপক্ষ 'বরাত'কে খাওয়ায়। শহরের বিয়েতে একমাত্র বিদায়কালেই বরযাত্রীদের খাওয়ানো হয়, যাকে বলে 'বহোড়ে কা খানা'। এছাড়া, খাওয়ানো বাধ্যতামূলক নয়। তাই বরকে খাইয়ে-দাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দেহাতীদের মধ্যে এই একটা বিরাট দায়িত্ব—বরযাত্রীদের খাওয়াতেই হয়।

আয়োজনে যদি একটু ক্রুটি হয়, 'বিরাদরী' অর্থাৎ সমাজে মাথা কাটা যায়।

এই 'খানা' হয় পুরো 'তোরা' : পুলাও, 'যর্দা'[1] কোরমা, খামীরী রুটি, শীরমাল তো থাকেই। ছোট-বড় বাছবিচার না করে সকলকেই পুরো 'তোরা' দেওয়া হয়। খেতে বসে, বরযাত্রীরা নির্লজ্জভাবে অসভ্যতা করে। নিজেদের ঘোড়া-বলদের জন্যেও প্রয়োজনের চেয়েও বেশি খাদ্য আদায় করে। তবু, কন্যাপক্ষের মুখ থেকে একটা কথাও বার করা চলবে না। কোন জিনিস দিতে আপত্তি করা চলবে না। করলেই, মর্যাদা মিশে যাবে ধুলোয়, সব ক্রিয়া-কর্ম বরবাদ।

এর পর বিদায় ও প্রত্যাবর্তন—মোটামুটি শহরে যেমন হয়, তেমনিই। হ্যাঁ, আর একটা রেওয়াজ আছে : দেহাতে 'বরাতের সঙ্গে মেয়েরা যায় না, এবং শ্বশুরালয়ে তুলহনকেও খুব বাঁধাবাঁধির মধ্যে রাখা হয় না। কারণ, 'চৌথী'তে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত সে-বেচারীকে যেভাবে রাখা যায়, সেইভাবেই থাকে—খায় না, পান করে না, প্রস্রাব-পায়খানা যায় না, কথা বলে না, মুখের ওপর থেকে হাত তোলে না, চোখ খোলে না। যদি বলে, যদি খোলে, যদি তোলে, তার অর্থ : বেশরম বেহায়াপনা। অতএব, শ্বশুরবাড়িতে যাতে প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনই অনুভূত না হয়, তুদিন আগে থেকে তার খানা-পীনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তার চেয়েও বেশি কষ্টের ব্যাপার—দেহাতে মেয়েদের প্রায়ই অন্য গ্রামে বিয়ে হয়। অর্থাৎ, আসা-যাওয়ার সময়ে তু-তিন জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে রাখতে হয়। এই অবস্থায় বেচারী কন্যাকে কী কষ্টটাই না পেতে হয়।

দেহাতে 'সাঁচক' ও 'মেহঁদী' পরিত্যক্ত, এবং বরযাত্রীদের খাওয়ানো বাধ্যতামূলক। তার কারণও আছে। এখানে অধিকাংশ 'বরাত'ই এক বসতি থেকে দূরের একটা বসতিতে যায় ; অতএব, এখান থেকে একদিন একটা 'জুলুস' যাবে, ওখান থেকে দ্বিতীয় দিন আর একটা 'জুলুস' আসবে, আবার তৃতীয় দিন 'বরাত' যাবে—এটা অসম্ভবই।

---

[1] চীনের তৈরী একপ্রকার মিষ্টি।

ঠিক এইভাবেই, বরপক্ষ যদিও বরযাত্রীদের খাইয়ে-দাইয়েই নিয়ে যায়, কন্যাপক্ষের বাড়ি পৌঁছতে-পৌঁছতেই গোটা 'বরাতী' হয়ে ওঠে "ভুখে বংগালী"। এবং দুর্ভিক্ষপীড়িতদের মতো আচরণ করতে থাকে।

॥ 46 ॥

প্রয়োজনের ক্রম-অনুসারে আমি 'খুশী কী রসুম্'—আনন্দানুষ্ঠানের বর্ণনা করেছি। এখন করা দরকার 'গমী কী মহফিল'—শোক-অনুষ্ঠানের পরিচয় দান। এ-বিষয়ে সারা হিন্দুস্তানে একই রীতি অনুসৃত হয়। এবং আমি যতোদূর দেখেছি, এক্ষেত্রে লখনউয়ের কোন আলাদা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েনি।

বাড়িতে কারও মৃত্যু হলে হয় 'গমী'[1]। মৃত্যুর দিন আত্মীয়-বন্ধুদের খবর দিতে হয়। নিতান্ত অপরাগ না হলে সকলেই আসে। মহিলারা আসে ডোলী বা অন্য সওয়ারে; তার ভাড়া নিজেরাই দেয়। শাদী-উৎসব এবং সাধারণ আসা-যাওয়ারও 'মেহমান'দের[2] ভাড়া 'মেজবান'ই[3] দিয়ে দেয়। কিন্তু 'গমী কা ঘর', মৃত্যু আশ্রয় করেছে যে গৃহে, সেখানে এ নিয়ম অচল।

সকলে এসে গেলে 'মুর্দা' (শবদেহ) কে স্নান করানো হয়। শীয়াদের নিয়মঃ স্নানের জন্যে 'জানাজা'[4] প্রথমে 'গুসলখানা'য় (কলঘরে) নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে স্নান করাবার লোক থাকে: স্নানান্তে শবকে পরানো হয় 'কফন'। সুন্নীদের বাড়ি শবকে ঘরেই স্নান করানো হয়; এবং সেকাজ করে আত্মীয়-বন্ধুরাই। সাধারণতঃ এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ পুরুষ বা মহিলাদের ডেকে পাঠানো হয়। কোথাও বা 'শরীয়ত' প্রাজ্ঞ কোন মৌলভী সাহেব অথবা অন্য কোন

[1] মৃত্যু ও তন্নিষ্ঠ শোক, আচার, আনুষ্ঠানাদি। [2] অতিথি। [3] গৃহস্বামী
[4] মৃতদেহ।

শিক্ষিত বিজ্ঞ বৃদ্ধ ব্যক্তি বলে দেন কিভাবে স্নান করানো দরকার। শবদেহের এইভাবে স্নান করানো 'সুন্নত'-বিধিসম্মত।

স্নানের পর পরানো হয় 'কফ্‌ন্‌; তার মধ্যে থাকে কুর্তার মতো 'কফনী', ইহার ওপর থেকে দুটো চাদর দিয়ে জড়ানো; মাথা ও পায়ের কাছে এবং কোমরে কাপড়ের টুকরো ছিঁড়ে বেঁধে দেওয়া হয়, যাতে খুলে না যায়।

শীয়াদের মৃতদেহ একটা বাক্সে রেখে, তার ওপর দোশালা দিয়ে ঢেকে শামিয়ানার ছায়ায়-ছায়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে যে কোন একজন 'সূরা-এ-রহমান'[1]-এর কয়েকটি 'আয়ত' শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে পড়তে যায়। এই বাক্স যারা ওঠায়, তাদের বলে 'শুহদ'; মুর্দা ওঠানোই যাদের দীর্ঘদিনের পেশা। কিন্তু এদের আচরণ খুবই অশিষ্ট ও অসভ্য। তাই শীয়ারা নিজেরাই জনাজা ওঠানো ভালো বলে মনে করে। এর জন্যে শহরে অনেক কমিটি হয়েছে। তার উৎসাহী ও ধর্মনিষ্ঠ সভ্যরা খোঁজে থাকেন; কেউ মারা গেলে তার দেহের দায়িত্ব নেন এঁরা, এবং ধর্মীয় বিধান ও সাবধানতার সঙ্গে শব ওঠানোর ব্যবস্থা করেন।

সুন্নীরা 'ম্যইয়ত' (মৃতদেহ)কে একটা হালকা চারপাইয়ে শুইয়ে চাদর ঢেকে নিয়ে যায়। নারীর মৃতদেহ হলে, চ্যাঁচাড়ি ধনুকের মতো বেঁকিয়ে ও দুই মাথা চারপাইয়ে আটকিয়ে ওপর থেকে চাদর ঢেকে দেওয়া হয়। একে বলে 'গওভারা' (দোলনা) তৈরি করা। এটা এসেছে পর্দার পরিবর্ত হিসেবে। সুন্নীদের আত্মীয়-বন্ধুরাই জনানা কাঁধের ওপর উঠিয়ে আস্তে-আস্তে কল্‌মা পড়তে-পড়তে নিয়ে যেতে থাকে, জনাজার নমাজও পড়া হয়।

'কবর' খোঁড়া হয়—মানুষের বুক পর্য্যন্ত উঁচু একটা চওড়া গর্ত। তার ভেতরে দুদিকে খানিকটা কোমর পর্য্যন্ত উঁচু আর একটা ছোট গর্ত করা হয়। তারপর কবর পরিষ্কার করে নিয়ে মুর্দাকে তার মধ্যে খুব সাবধানে নামিয়ে দেওয়া হয়—যাতে হাত থেকে না পড়ে যায় বা

[1] কুরানের একটি অধ্যায় যাতে খুদার 'রহম' ব, করুণা ভিক্ষা করা হয়।

কোথাও আঘাত না লাগে। কবরে মৃতদেহের মাথার দিক থাকে উত্তরমুখো ; মৃতের মুখ টুকরো ঢিল ইত্যাদির ঠেকা দিয়ে 'কিব্‌লা'র (পূর্ব)দিকে ফিরিয়ে রাখা হয়। তারপর বাঁধন খুলে দেওয়া হয়, এবং মুখের আবরণ খুলে আত্মীয়দের শেষবারের মতো দেখতে দেওয়া হয়। এইসময়ে শীয়ারা পড়ে 'তিলকীন' (সদুপদেশ) : কোন সংযমী সদাচারী বৃদ্ধ কবরে নেমে মৃতদেহের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেয় এবং একটি আরবী 'ইবারত' (লেখন) পড়তে থাকে। এতদ্বারা মৃতকে সম্বোধন করে বলা হয় : ওখানে 'নকীর‍্যান'[1] এসে প্রশ্ন করলে তুমি এই-এই জবাব দেবে। তারপর ভেতরের গর্তে তক্তা বসানো হয়, কোন ফাঁক বা গর্ত থাকলে মাটির ঢেলা দিয়ে সমান করে নেওয়া হয়। যাতে ওপরের মাটি ভেতরে না যেতে পারে। কবরে 'কফ্‌ন্‌'-এই থাকে কর্পূরাদি সুগন্ধ ; অনেকে কেওড়ার বোতলও ঢেলে দেয়। তারপর মাটি ঢেলে গর্ত ভরিয়ে দেওয়া হয়। সবশেষে, কবরের ওপরের রূপ দান করা হয়।

এই মাটি-দেওয়া ব্যাপারটি জরুরী ও পবিত্র কর্তব্য। উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রত্যেকে হাতে মাটি নিয়ে তিনবার কবরে অর্পণ করে, এবং কুরানের তিনটি 'আয়াত' পাঠ করে। তার অনুবাদ : "আমি তোমাকে এই থেকে (মাটি থেকে) জন্ম দিয়েছি ; আমি তোমাকে আবার এখানেই পৌঁছিয়ে দিলাম, এবং আমি আবার ভবিষ্যতে ('কেয়ামত'-এর দিন) তোমাকে এখান থেকে বার করে দাঁড় করিয়ে দেব।"

কবর যখন তৈরি হয়ে যায়, তার ওপর চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়— যে-চাদর ছিল জনাজা আবৃত ক'রে। ফুলের চাদরও বিছিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর 'ফাতিহা' পাঠ ক'রে এবং মৃতের মুক্তি প্রার্থনা করে লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে।

যে-ঘরে মৃত্যুর আবির্ভাব হয়েছে, সে-ঘরে সেদিন উনুন জ্বলে না।

---

[1] মুনকীর ও নকীর—দুই ফেরিশ্‌তা ; এরা কবরে মৃতের সঙ্গে সওআল-জবাব করে।

জনাজা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই আত্মীয়দের কাছ থেকে রান্নাকরা খাবার আসে। 'দফন' (কবর) অন্তে ফিরে এসে লোকেরা সেই খাবার খায়। অন্যান্য অতিথিরাও আহার করে। তিন দিন এইরকম হয়—ঘরে রান্না হয় না। এই প্রথার সূচনা ইসলামের গোড়া-পত্তন, খোদ হযরত মুহম্মদ থেকে। হযরত জাফরে-ত্যাইয়ারের শহীদত্বের সংবাদ শুনে এবং তাঁর ঘরের লোকদের আকুল ক্রন্দন দেখে তিনি নিজের খাবার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। একে ভিত্তি করে লোকে আচারের যে ইমারত বানিয়ে নিয়েছে, তা খুবই লজ্জার ও অর্থহীন। কেউ মারা গেলে ঘরে যতো খাবার তৈরি থাকে, সব বরবাদ হয়, ঘড়া-মট্‌কার জল ফেলে দিতে হয়। এর কারণ হিসেবে মেয়েরা ছোটদের শোনায়—'ফেরিশ্‌তা যে ছুরিতে প্রাণ নেয়, সেটা ধুয়ে নেয় খাদ্যে-পানীয়ে!'

মৃত্যুর তৃতীয় দিনে, শুভ হলে চতুর্থ দিনে, পালিত হয় যে সংস্কার, তার নাম 'সোম'। লোকেরা এসে সমবেদনা জানাবে, সান্ত্বনা দেবে। এইজন্যে এই দিনটি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তা থেকেই এই সংস্কারের সূত্রপাত। সমাগত ব্যক্তিরা এসে চুপচাপ বসে রয়েছে—এটা ভালো দেখায় না। এই খেয়াল থেকেই তৈরি হল প্রথা : লোকেরা আসে, ব'সে কুরান 'মজীদ' (পবিত্র) পাঠ করে, এবং দু-একখণ্ড প'ড়ে সেই পাঠের 'সওআব' (পুণ্যফল) মৃতের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করে। দিনে-দিনে 'মাতমপুরসী' (সমবেদনা জানানো)র বোধ চলে যেতে থাকে। যেটুকু রইল, তা হল—ওইদিন কতো লোক এল, এবং মৃতের উদ্দেশ্যে কতো কুরান দেওয়া হল। 'মহফিল' শেষ হবার আগেই অনেক লোক কুরানের কয়েকটি 'রূকু'[1] এবং শেষের ছোট ছোট 'সূরত'[2] পড়ে 'ফাতিহা'র জন্যে হাত ওঠায়। এর সঙ্গে একটা নতুন ও অর্থহীন প্রথা প্রবেশ করেছে—ঘষা চন্দন, কিছু ফুল, এবং একটা পেয়ালায় তেল এনে উপস্থিত লোকেদের সামনে রাখা হয়; প্রত্যেকে একটি ক'রে

[1] নমাজের সময় হাঁটুতে হাত রেখে নত হওয়া [2] কুরানের আয়াতের একটি পরিচ্ছেদ অথবা কুরানের কোন অধ্যায়।

ফুল তেলে ভেজায়, এবং সেই ফুল ও চন্দন নিয়ে গিয়ে মৃতের কবরের ওপর ছড়িয়ে দেয়।

ওইদিন সন্ধ্যাবেলা হয় 'বড় ফাতিহা'। ঘরে রান্না হয় এই প্রথম। দরিদ্রগৃহে সমদরদীদের এই সহায়তা কমে গেছে। মৃতের ঘরে খাবার এখন কম লোকই পাঠায়। এবং গরীবদের ঘরে এরও আগে রান্না করতেই হয়। তবে প্রচলিত প্রথা হল: তিনদিন অর্থাৎ 'সোম'-এর আগে বাইরে-থেকে-আসা খাবারই খেয়ে থাকতে হয়।

'সোম' এবং মৃত্যুর চল্লিশ দিন পরে অনুষ্ঠেয় সংস্কার 'চেহলুম'-এর 'ফাতিহা'য় লোকেরা জাঁকজমক করে। আসলে শুধু এটুকুই করণীয়: দরিদ্র ও অনাহারীদের যথাসাধ্য খাওয়াতে হবে, এবং তার পুণ্যফল পৌঁছে দিতে হবে মৃতের কাছে। হিন্দুস্তানের হিন্দুদের মধ্যে মৃত্যুর ত্রয়োদশ দিনের সংস্কার 'ত্রয়োদশী' ও বাৎসরিক শ্রাদ্ধ 'বরসী' 'বছুরকী' হতে দেখে মুসলমানদের প্রাণেও ইচ্ছা জাগল—আমরাও ওইরকম ঘটা করে কাজ করি। এই শখেরই ফল: 'তীজা', 'দসওআঁ', 'বীসওআঁ', 'চেহলুম' ও 'দেসা' (বছুরকী) ইত্যাদি অন্ত্যেষ্টি-সংস্কারের সৃষ্টি। বলে তো, পুণ্য হয়! আসলে, লোক-দেখানো, নাম-কেনা, আত্মীয়-বন্ধুদের খাওয়ানোর ঘটা! পরিণামে, জনসমাজে এই বিশ্বাস দানা বাঁধল: আমাদের এইসব ফাতিহায় যাকিছু দেওয়া হয়, খুদার নির্দেশে, সে-সবই যেমন-কে-তেমন মৃতের কাছে পৌঁছে যায়। এই বিশ্বাস থেকে এমন ব্যাপারও দাঁড়াল, মৃত ব্যক্তিকেও 'ফাতিহা'য় নিমন্ত্রণ করা হতে লাগল! সে যে-সব খাবার পছন্দ করত, সেগুলি বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়। অথচ, দান-খয়রাতের নিয়ম হচ্ছে: যে-গরীবকে খাওয়ানো হবে, তারই পছন্দমতো খাদ্য তৈরী করা—তাকে খুশী করলে তবেই পুণ্যফল বেশি হবে।

এসব নয়। এখন 'ফাতিহায়' যা হয়, তা হল: চার-পাঁচজোড়া থালা এনে একটি পবিত্র, পরিচ্ছন্ন নির্দিষ্ট স্থানে ক্রম-অনুসারে রেখে দেওয়া হয়। এই স্থানটিকে বলে 'মকাম'। মাটির পেয়ালা করে

জলও নিয়ে এসে রাখা হয়। খেতে-খেতে মৃত ব্যক্তির জলপানেরও প্রয়োজন হতে পারে! তাছাড়া, তার জন্যে দামী কাপড়, ওড়না, বিছানা, নতুন কলাইকরা তামার পাত্র, লোটা, বাটি, পাতিল, 'জানমাজ' (নমাজ পড়ার ফরাশ) এসবও খাদ্যের পাশে-পাশে রেখে দেওয়া হয়। সব যখন প্রস্তুত, একজন মুল্লা এসে 'ফাতিহা করেন' অর্থাৎ কুরান থেকে কয়েকটি বিশেষ আয়াত এবং ছোট-ছোট সুরত পড়েন ও 'দুআ' (প্রার্থনা) করেন: "খুদাবন্দ, এইসব জিনিসের 'সওআব' (পুণ্যফল) যেন অমুক ব্যক্তির কাছে পৌঁছয়।" এইভাবে, লোকও মনে করে: এইসব জিনিস মৃতের কাছে পৌঁছে গেছে। তখন সব খাদ্য ও জিনিসপত্র কোন দরিদ্র বা ধর্মপরায়ণ মুসলমানের ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়।

এইসব প্রথার মাধ্যমে স্বর্গতজনকে তৃপ্ত করার বাসনা মনের মধ্যে এমন গভীরভাবে গেঁথে গেছে, কোন-কোন নিম্নবর্গের মূর্খ নারীরা ফাতিহার ওইসব সামগ্রীর পাশে নিজেই সেজেগুজে বসে যায়। মৃত স্বামী যখন ওইসব খাদ্য ও বস্ত্রাদি পেয়ে আনন্দলাভ করে, তখন নিজের স্ত্রীর সৌন্দর্য-সুখ থেকেই বা কেন বঞ্চিত হবে!

'ফাতিহা'র প্রয়োজনে ফাতিহায় খাদ্য বেশি করে রাঁধতে হয়। সামর্থ্যানুযায়ী আত্মীয়-দোস্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। ধোপা-নাপিত-মেথরদের ঘরেও পাঠানো হয়। 'ফাতিহা' জাঁকজমকপূর্ণ সংস্কার হয়ে ওঠার ফলে এরাও নিজেদের অধিকার কায়েম করে নিয়েছে।

'সোম-এর ফাতিহা' প্রসঙ্গেই এইসব রীত্-কর্মের কথা এসে গেল। আসলে, এসব বেশি ভালো হয় 'চেহলুম'-এ। 'চেহলুম' হবার কথা—মৃত্যুর চল্লিশ দিন পরে। কার্যক্ষেত্রে দু-চারদিন আগেই হয়। 'দশম ও বিংশতি দিনের ফাতিহা'ও বিশেষভাবে পালিত হয়। এছাড়া, প্রতি বৃহস্পতিবার পরিবারের বৃদ্ধদের 'ফাতিহা'র জন্যে নির্দিষ্ট করা আছে। তবু, 'সোম ও চেহলুম-এর ফাতিহাই' সাধারণত অসাধারণ রূপে হয়।

মৃত্যু-সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যগুলির বিবরণী আমি দিলাম। এখন রইল : মহফিলে আচার-আচরণের বিধি-বিধান। অন্যান্য উৎসব-অনুষ্ঠানের মহফিল প্রসঙ্গে যেসব কথা বলেছি, এখানেও সেইরকমই। 'খুশী' ও 'গমী', আনন্দ ও শোকের অনুষ্ঠানগুলি নৈতিক ও সামাজিক আধারের ওপর প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত। ধর্মক্ষেত্রে যেসব মহফিলের রেওয়াজ আছে, তাদের কথা অতঃপর বলছি ॥

॥ 47 ॥

১০। মজলিসেঁ (মজলিশ)

১১। মওলুদ শরীফ কী মহফিলে (মিলাদ-শরীফের মহফিল)

শিষ্টাচারের দশম বিষয় : ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের অন্তর্গত 'মাতমদারী কী মজলিস' (শোক-সমারোহ) এবং 'মওলুদ শরীফ' কী মহফিল' (মিলাদ-শরীফের মহফিল)।

শীয়াদের মধ্যে 'মজলিস' (মজলিশ) এর খুব চল্, সুন্নীদের মধ্যে 'মিলাদ শরীফ'-এর। তবে উভয় অনুষ্ঠানেই দুই সম্প্রদায় পারস্পরিক অংশ গ্রহণ করে। আবার এমনও হয়, কিছু শীয়া 'মিলাদ শরীফ' এবং কিছু সুন্নী 'মাতমের মজলিশ' করে। লখনউ-সমাজের ওপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছে মজলিশ। এটি তার একটি বৈশিষ্ট্যও বটে। 'মিলাদ-শরীফ' মহফিলের তেমন কোন স্থানীয় বিশেষত্ব নেই। এর আয়োজনাদি সারা হিন্দুস্তানে যেভাবে হয়, এখানেও তাই। তবে সন্দেহ নেই, কোন-কোন আমীরের ঘরে, 'মিলাদ'-এও কখনও-কখনও সেই সংস্কৃতি ও মানবিকতা চোখে পড়ে, শীয়াদের শিষ্টতার জন্যে যা মজলিশেই সুলভ।

[1] হযরত মহম্মদের জন্মবৃত্তান্ত

'মাতম কী মজলিস' (শোক-সভা) সংখ্যায় অনেক। কেউ যদি ইচ্ছা করে এবং একটু খোঁজ খবর রাখে, তাহলে কোন মেহনত-মজতুরী না করেই, স্রেফ মজলিশে শরীক হয়েই সারা বছর পেট চালিয়ে নিতে পারে এবং ধর্মনিষ্ঠ ও দানশীল শীয়াদের উদারতা ও দানশীলতার ওপর বেঁচে থাকতে পারে। এই 'মজলিস'-এর দৌলতেই এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর 'যাকির'[1] আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁরা আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে 'সৈয়দ উশ্ শুহদা অল্যাইহিস্‌সলাম'[2]-এর দুঃখভোগের বর্ণনা করে শ্রোতাদের কাঁদান। সর্বপ্রথমে 'উলেমা' ও 'মুজতহিদ'-দের কথকতা, তারপর 'হাদীসখোআঁ'[3]—যাঁরা 'হাদীস' শুনিয়ে এমন দরদী ও মর্মস্পর্শী কণ্ঠে ইমামের বিশেষত্ব এবং 'আলে-রসূল'[4]-এর বিপত্তি বর্ণনা করেন, যে কঠিন শ্রোতৃহৃদয়ও ক্রন্দনপর ও অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। এঁদেরই শ্রেণীভুক্ত 'বাকিআখোআঁ'[5]—যাঁরা হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের জীবনের ঘটনাবলী এমন শব্দ ও অলংকার দিয়ে শোনান, প্রাণ চায়, শুনি আর কাঁদি। বাস্তবিক, 'বাকিআখোআনী' (আখ্যান বর্ণনা) এসে আসল 'দাস্তান-গোঈ' (গল্প-কাহিনী)কে ম্লান করে দিয়েছে। তারপর আছে 'মর্সিয়া-খোআঁ'[6] এবং 'তহত-উল-লফয-খোআঁ'[7]—যাঁরা মর্সিয়া শোনান কবিতার ঢঙে। পাঠরীতি নিরলংকৃত; কিন্তু আঁখি-ভ্রু-হাত-পায়ের হাব-ভাবে ঘটনার এমন সত্য ও পূর্ণ চিত্র এঁকে তোলেন, শ্রোতারা কান্না থেকে অবকাশ যদি পায়, প্রশংসা না করে থাকতে পারে না। এই 'মর্সিয়া-খোআনী' (মর্সিয়া পাঠ) থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন মীর 'অনীস' ও মীর্জা 'দবীর'-এর মতো উচ্চ-কোটির কবি। প্রচলিত প্রবচন ছিল: "বিগ্‌ড়া শাইর মর্সিয়াগো"—'যারা কবি হতে পারে না, তারাই হয় মর্সিয়ার কথক'। কিন্তু লখনউ-য়ের দক্ষ মর্সিয়া-কথকরা সারা হিন্দুস্তানকে মানতে বাধ্য করেছেন যে

[1] হযরত ইমাম হাসান ও হোসেনের শহীদত্বের বর্ণনাকারী। [2] হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন। [3] 'হাদীস'-পাঠক। [4] হযরত মুহম্মদের সন্তান (ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন)। [5] আখ্যান-বর্ণনাকারী [6] মর্সিয়া-পাঠক। [7] গদ্যের মতো করে কবিতা পড়েন যাঁরা।

কাব্য-কবিতার জগতে অন্যান্য কাব্যাঙ্গের তুলনায় 'মর্সিয়াগোঈ'[1]-এর প্রতিষ্ঠা অনেক বেশি। এবং এই জনসমাদরের ফলেই আবির্ভূত সংখ্যাহীন মর্সিয়া-কথক ও মর্সিয়া-পাঠক মহর্‌রমের ও শোকের অন্যান্য দিনে লখনউ থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েন হিন্দুস্তানের দূর-দূরান্তের নগর-নগরীতে এবং সেখানকার আসরে আপন নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখে ফিরে আসেন।

'মর্সিয়া-খোআঁ'র পর আছেন 'সোয-খোআঁ'। এঁরা 'মর্সিয়া' ও 'ন্যওহা'[2] গান গেয়ে শোনান। সাধারণত, এঁদের দলে থাকেন তিনজন করে; দুজন সুর দেন, তাঁদের বলে 'বাযু', তৃতীয়জন মাঝখানে বসে 'সোয' শোনান। সংগীতের নিয়ম-পালনে এঁরা নিষ্ঠাবান, রাগ-রাগিণীর অভিপ্রকাশে সাতিশয় দক্ষ; অনেক সময় পেশাদার গায়কদের চেয়েও অধিকতর নিপুণতা প্রদর্শন করেন। লখনউয়ে এমন সব নিপুণ 'সোয-খোআঁ' আছেন, যাঁদের সামনে বড়-বড় ওস্তাদ গায়করাও মুখ খুলতে সাহস পায় না। বস্তুত, কবিতার রাজ্যে 'মর্সিয়া'-কথনের যে স্থান, সংগীত রাজ্যে সেই স্থান 'সোয'-গীতির।

'মাতমী মজলিস'—শোক-সমারোহের সূত্রেই এইসব কাব্য-সংগীত-কলার জন্ম, এবং লখনউয়েই জন্ম। এরা সকলেই উর্দূ সাহিত্যের প্রগতিতে সহায়তা দিয়েছে, এবং প্রস্ফুটিত করেছে একটি বিশিষ্ট তত্ত্বকে। তত্ত্বটি: যথা-ইচ্ছা ভাবনাকে ব্যক্ত করো; যেমন-ইচ্ছে রূপ দাও তাদের।

এই কলার নিয়মিত চর্চা করত গ্রীকরা। ভাষণকে ফলদায়িনী করার জন্যে তারা সন্ধান করত—কোন্ কোন্ শব্দ, কোন্ কোন্ হাবভাব, কেমন স্বর ও ধ্বনি দিয়ে মানবচিত্তে সুখ বা দুঃখ, করুণা বা কঠোর ভাব জাগানো যেতে পারে। গ্রীকদের পরে আর কোন জাতি এই কলার দিকে মনোযোগ দেয়নি। সম্প্রতি য়োরোপের বক্তাগণ এই কলাকে পুনরুজ্জীবিত করছেন। অথচ লখনউয়ে শুধু

[1] মর্সিয়া-কথন। [2] শোকগীতি। [3] সোয-কথক।

'যাকিরী' তথা শোক-বর্ণনার দৌলতেই এই কলার এমন বিকাশ ঘটে গিয়েছিল, য়োরোপীয়রাও বোধহয় ততোটা করে উঠতে পারে নি।

'মজলিস' শেষ হবার সময় শরবত পান করানো বা মিঠাই ও খাবার বিতরণ অবশ্যকর্তব্য হয়। সভ্য ও ধনী ব্যক্তিরা এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর প্রথা প্রবর্তিত করেছে—মজলিশে যাদের আমন্ত্রণ করা হয়, তাদের কাছে নিমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে তাদের প্রাপ্য অংশও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মজলিশ থেকে ফেরার সময় হাতে পুঁটলি বা ছাঁদা ঝুলিয়ে নিয়ে পথ চলা অনেক শিষ্ট ও সংগতিপন্ন লোকের কাছে অশিষ্টতা ও অভদ্রতা মনে হত। জনসাধারণ ও বাজারের লোকেরা একে খারাপ মনে করে না, কিন্তু সভ্যভব্যদের খারাপই লাগত। সঙ্গে চাকর না থাকলে অনেকে তাই বাধ্য হয়ে মজলিশেই কোন বন্ধু বা দরিদ্র ব্যক্তিকে নিজের ভাগ দিয়ে দিত।

মজলিশে বসার রীতি হল: দালান বা ঘরের একদিকে একটা কাঠের উঁচু বেদী, যাকে বলে 'মিম্‌বর'; তার সাত-আটটা সিঁড়ি। তার চারদিকে বসে লোকেরা, দেওয়াল ঘেঁষে, ফরাশের ওপর। লোক বেশি হলে মাঝের জায়গাও ভরে যায়। এইভাবে অনেক লোক জমা হলে যাকির সাহেব এসে বসেন 'মিম্‌বরে'। তিনি প্রথমে হাত তুলে বলেন 'ফাতিহা'। সঙ্গে সঙ্গে সব লোক হাত উঠিয়ে মনে মনে 'সূরাহ্‌-ফাতিহা' পড়ে নেয়। তিনি যদি হাদীসখোআঁ অথবা বাকি-আখোআঁ হন তো বই খুলে বর্ণনা শুরু করে দেন। আর, যদি মর্সিয়া-খোআঁ হন তো মর্সিয়ার পাতা হাতে নিয়ে মর্সিয়া শোনাতে থাকেন। 'মুজতহিদ' এবং হাদীসখোআঁদের কথকতা লোকে চুপ ক'রে সভ্যভব্য হয়ে শোনে, কান্নার জায়গায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মর্সিয়া শোনার সময় যেসব পদ শুনে কান্না আসে, তদতিরিক্ত অন্য সময় প্রশংসাধ্বনি ওঠে শ্রোতাদের তরফ থেকে।

সোযখোআঁ 'মিম্‌বরে' বসেন না। লোকেদের মধ্যেই একদিকে বসে শোকগীতি 'ন্যওহা' ও মর্সিয়া শোনান এবং প্রায়ই প্রশংসা পান।

অধিকাংশ মজলিশে বিভিন্ন 'যাকির' একের পর এক পাঠ করতে ওঠেন। 'হাদীসখোআনীর' পর 'মর্সিয়াখোআনী', তারপর হয় 'সোযখোআনী'। যেহেতু 'সোযখোআনী', আসলে গান, তাই শুধু লখনউ নয়; এর রেওয়াজ গোটা হিন্দুস্তানেই অনেক বেশি। কিন্তু ধর্মাচার্য শাস্ত্রজ্ঞ ও ধর্মনিষ্ঠ বৃদ্ধদের মজলিশে 'সোযখোআনী' হয় না। এখানে ধর্মালোচনাই মুখ্য। বিশেষ করে এখানকার গফরানমআবের ইমামবাড়ায় মহর্‌রমের নবম দিনে যে-মজলিশ হয়, তার একটা বিশেষ চরিত্র আছে। এতে যোগদানের বাসনায় লোক আসে দূর-দূর থেকে। এতে, বর্ণনাকালে শ্রোতাদের সামনে উট নিয়ে আসা হয় —তার ওপর থাকে হাওদা, তার ওপর কালো কাপড়। কারবালার ময়দানে 'অহলে-ব্যাত'[১]-এর বিধ্বস্ত নষ্ট কাফিলা কী অত্যাচার ও হত্যার শিকার হয়ে সিরিয়ার দিকে চলে যাচ্ছে, সেই দৃশ্য 'মোমিন' (ধর্মনিষ্ঠ)দের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দর্শকের ওপর এই করুণ দৃশ্যের এমন প্রভাব পড়ে যে, হাজার-হাজার লোকের মধ্যে কয়েকজন তো মূর্ছাই যায়; অনেক কষ্টে তাদের তুলে ঘরে পৌঁছে দিতে হয়।

মুজতহিদদের মারফত মজলিশের এই-যে নাটকীয় রূপ, পরিণামে তা ধর্মনিষ্ঠ আমীরদের হাতে নতুনতর হয়ে উঠতে লাগল। কয়েকজন তো এতোদূর অগ্রসর হলেন যে, মজলিশকে একেবারে 'ড্রামা' বানিয়ে দিলেন। বস্তুত, মৌলভী মেহঁদী হুসেন সাহেবের বাড়ির মজলিশে জায়গায়-জায়গায় থিয়েটারের কায়দায় কারবালার ঘটনাবলীর করুণ দৃশ্য উপস্থাপিত হত, দর্শকের কান্না আসত তাই দেখে। এর চেয়েও বেশি হত তাঁর বাড়ির জেনানা-মজলিশে—শহরের বহু রমণী একত্রিত হত; এবং যাকিরের 'হাদীসখোআনীর' বদলে স্টেজের ওপর কারবালার দৃশ্য জীবন্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মাধ্যমে দেখানো হত।

[১] হযরত ইমাম হাসান ও হোসেন

যতোদূর আমি জানি : আলিম (বিদ্বান) ও মুজতহিদরা 'বিদআত'[1] পছন্দ করেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে এবিষয়ে আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। এ ছাড়া মহর্‌রমের দশম দিবসে গফরানমআবেরই ইমাম-বাড়ায় 'শামে গরীবাঁ'[2] নামে আর-একটা মজলিশ হয়—ওইদিন তাজিয়া ইত্যাদি 'দফনের' পর শীয়া হযরতরা ইমামবাড়ায় জমায়েৎ হন। দিনভ'র কড়া রোদ, শোক এবং 'মর্সিয়াখোআনী'র প্রভাবে লোকেদের সব অদ্ভুত অবস্থা : চুল উস্‌কো-খুস্‌কো, মুখ, কাপড়, সব ধুলোয় ধুসরিত। এই অবস্থায় সকলে সমবেত। ঠিক ওইভাবেই এক মুজতহিদ সাহেব বেদীর ওপর ওঠে কারবালার ঘটনার ওপর বিস্তৃত আলোকপাত করেন। ঘটনাবর্ণনায় সর্বাধিক জোর দেওয়া হয় দৃশ্যচিত্রণের ওপর ; তা এমন করুণ, দুঃখদ এবং অমোঘ হয়, যে, হঠাৎ কান্না এসে যায়। শ্রোতাদের মধ্যে এমন কেউ থাকে না, যার ঠোঁট কেঁপে-কেঁপে ওঠে না, চোখে আসে না জল ভ'রে।

এই মজলিশের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য : এতে না ফরাশ বিছানো হয়, না থাকে আলোকসজ্জা। ফলে, আবহাওয়া খুব গম্ভীর ও করুণ হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিতে এই মজলিশ সত্যিই 'শাম-এ-গরীবাঁ'।

আসল কথা হল : লখনউ-সমাজে শীয়া-মজলিশের প্রভাব খুব স্পষ্ট এবং সেই সেতুপথেই শিষ্টাচার ও সংস্কৃতির অত্যধিক উন্নতি ঘটেছে। 'মর্সিয়া'-প্রীতি কবিতা ও সংগীতকে শুধু জীবন্তই করে নি, উভয়ের প্রতি সত্য ও সুস্থ রুচিরও জন্ম দিয়েছে—পুরুষদের মধ্যে থেকে পর্দানশীন মহিলা পর্যন্ত, সর্বত্র। আমার ধারণা, এই ধরণের ব্যাপার একমাত্র য়োরোপ—নাচ-গান যেখানে মেয়েদের শিক্ষার একটি অঙ্গ—ছাড়া এশিয়ার আর-কোন শহরেই নেই।

'মজলিস' ছাড়া আর এক ধরণের সভা শীয়াদের হয় ; তাকে বলে 'সোহবত'। শুরু ঈদের দিন থেকে, এবং চলে কিছুদিন। 'মাতমের

[1] ইসলাম ধর্মের সেইসব প্রথা যা মুহম্মদের স্বীকৃতি পায় নি, কিংবা তখন ছিল না, অথবা পরে সৃষ্ট। [2] পরদেশী সন্ধ্যা।

মজলিস' হয় 'অহলে-ব্যাত'[1]-এর দুঃখদহনে রোদনের ও অশ্রুপাতের জন্যে ; আর, 'সোহবত'-এর লক্ষ্য : নাটকীয় ঢঙ্গে 'অহলে-ব্যাতের' দুশমনদের অপমান করা, তাদের যথেচ্ছ গালি দেওয়া। শীয়াদের চোখে 'অহলে-ব্যাতের' সবচেয়ে বড়ো দুশমন উম্মুলমোমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা এবং হযরত ওমর ফারুক। এ কারণে এই দুই মানী নামের অপমান ও অনাদর করা, এবং তাঁদের কুশপুত্তলিকা তৈরি করে সঘৃণায় জ্বালানো—এইই এই 'সোহবতের' আসল উদ্দেশ্য হয়ে গেছে। সুন্নীরা এতে যেতে পারে না; নিজেদের নেতাদের অপমান তাদের পক্ষে সহনাতীত। তবে, শোনা যায়, এসব মহফিল খুবই অসংস্কৃত, অশ্লীল ও লজ্জাজনক হয়; এবং এদের পতন এতোদূর, যে, সভ্য শীয়ারাও হার্দিক পীড়া অনুভব না করে এখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে না। এই 'সোহবত'ও শীয়াদের রুচিকে প্রভাবিত করেছে, এবং তার ফলে, ছোট-ছোট কথায় শীয়া-সুন্নীতে লড়াই বেধে যায়।

শীয়াদের এই 'মজলিস' ও 'সোহবত'। সুন্নীদের আছে 'মীলাদ শরীফের মহফিল'। এর আয়োজনাদি—মজলিশে যেমন হয়, তেমনই। তফাৎ হচ্ছে : সুন্নীদের ওখানে 'মিম্বর' (কাঠের বেদী) হয় না। একটা ভাল জায়গা দেখে চৌকি পাতা হয়, তার ওপর কাচা পরিষ্কার ফরাশ বিছিয়ে দেওয়া হয়। তার ওপর বসেন 'ওআইয',[2] 'মওলূদখোআঁ'[3] সাহেব শোনান 'মওলূদ'[4]। প্রথমে প্রথা ছিল : কোন মৌলভী সাহেব হযরত মুহম্মদের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন; সেই সময় সব লোক উঠে দাঁড়ায়। 'মওলূদখোআঁ' পবিত্র জন্ম-স্মরণিকায় খুশী জানাতে কোন কবিতা পড়েন। গোলাবপাশ থেকে কেওড়ার জল ছিটানো হয় লোকদের ওপর। কোন ধর্ম-উপদেশক না পাওয়া গেলে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি মৌলভী গুলাম এহমদ শহীদের 'মওলূদ শরীফ' পড়ে শুনিয়ে দেন। কিন্তু

---

[1] ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন। [2] ধর্ম-উপদেশ। [3] হযরত মুহম্মদের জীবনবৃত্তান্ত-কথক। [4] হযরত মুহম্মদের জীবনী।

'মওলুদখোআনী'র এই চরিত্র-রূপ জনগণের কাছে খুব সন্তোষজনক মনে হয়নি। অতএব, সোযখোআঁদের দেখাদেখি আবির্ভূত হন 'মওলুদখোআঁ'—তাঁর সঙ্গের দুজন সুর মেলায়, আর তিনি মাঝখানে বসে গানের ভঙ্গিতে জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন ; মাঝে মাঝে কবিতা-পাঠ ও 'কসীদা'[1] গান ; দুই 'বাযূ' বা সঙ্গীও তখন গলা মেলান তাঁর সঙ্গে। 'সোযখোআঁ' সংগীতকে জীবন্ত করে দিয়েছে। 'মওলুদখোআঁ', সত্যি বলতে কি, গানের গলা টিপে ধরতে কোন কসুর বাকি রাখেনি।

'মওলুদখোআনী' বিষয়ে লখনউয়ের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। কারণ, এই রীতি ও ঢঙের 'মওলুদখোআনী' সারা হিন্দুস্তানের সুন্নীদের মধ্যেই বিদ্যমান। আর, এই অবস্থা সুন্নী-সুফী রীতিসম্মত 'সোহবতে'ও, এবং সর্বত্রই, একই রকম। মুসলমানদের হিন্দুস্তানে আসার সময় থেকেই মজলিশের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া কাওয়ালদের একটা দল আবির্ভূত হয়েছে, সুর ও সঙ্গীতজ্ঞতার দিক থেকে যাদের ঢুলী ও সাধারণ গায়কদের চেয়েও নিম্নতর মানের বলে মনে করা হয়। অবশ্য, 'সোযখোআনী' একশো বছরের মধ্যেই সংগীত জগতে অধিকার বিস্তার করেছে এবং তার যথাবশ্যক পরিবর্তন-পরিবর্ধনও করে চলেছে।

এছাড়া, স্থানীয় সংগীতকলা আর কোন দিক থেকে বিশেষ লাভবান হয়নি ॥

॥ 48 ॥

'মজলিস' ও 'মহফিল'এর কথা বললাম। এখন দেওয়া দরকার এইসব অনুষ্ঠান আসরের জন্যে আবশ্যকীয় বস্তুসামগ্রীর সবিস্তার বর্ণনা। যেহেতু, এগুলি হল সেইসব জিনিস, যা দিয়ে সমাজ ও তার আচার-ব্যবহারকে বোঝা যায়।

[1] কথকতার সদৃশ

সভ্য-সমাজে আমন্ত্রিত অভ্যাগতদের জন্যে, এক নয়, অনেক বস্তু থাকে। সে-সম্পর্কে, অবকাশ এলেই, আমি বলব। আজকাল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রী হচ্ছে: 'হুক্কা' (হুঁকো), 'খাসদান' (পানদানী), 'লুটিয়া' (লোটা), ও 'উগালদান' (পিক-দানী)। এগুলো এতো দরকারে লাগে যে রইসদের সঙ্গে এক বা একাধিক চাকর থাকে; সে বা তারা এগুলোকে সব সময়ে হাতের কাছে প্রস্তুত রেখে দেয়—কখন কোন্‌টা প্রয়োজনে লাগে!

কিছুদিন আগে পর্যন্ত উচ্চবর্গের ধনিকদের সঙ্গে হাতে হুঁকো নিয়ে একটা চাকর থাকত। এখন এ-প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। হুঁকো আসলে দিল্লীর আবিষ্কার, এবং ওখানেই শাহী 'ভিণ্ডীখানা'[1]য় বিভিন্ন প্রকারের হুঁকো তৈরি হত। হুঁকোর জগতে লখনউয়ের অবদান: 'পেচওআন' (নল), 'চিলম' (কল্‌কে) ইত্যাদির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার-প্রকারের সংস্কার। দিল্লীর হুঁকো ছিল বাজে ও কুরূপা। লখনউয়ে এসে হল অধিকতর কাজের এবং রূপবতী। তামা, পেতল, দস্তা এবং 'ফুল'[2]-এর হুঁকো তো ছিলই, মাটির হুঁকোও এমন সুন্দর তৈরি হত, সূক্ষ্মতা ও সুকুমারতার এমন আশ্চর্য নিদর্শন, লোকেরা তাকেও ভালবেসে ফেলল। দামী-দামী হুঁকোর চেয়েও এর বেশি কদর ছিল যে-কারণে, তা হল এর নাজুক হাল্‌কা রূপসৌন্দর্য এবং সোঁদা গন্ধ।

হুঁকোর আকার-সংস্কারের পর আশ্চর্য আশ্চর্য সব ঔৎকর্ষ্য দান করা হল তামাকে। গুড় বা চিনির রসে তামাক মিশিয়ে কুটে নেওয়া—বোধহয় দিল্লীরই আবিষ্কার। এই পদ্ধতিতে তামাকের উন্নতিবিধানে দুনিয়ার তাবৎ দেশ ও জাতির তুলনায় হিন্দুস্তান আজও শ্রেষ্ঠ। তামাক একটি সর্বজনীন সেব্য পদার্থ। চুরুট, সিগারেট ও পাইপের তামাকের সংস্কারে য়োরোপ অনেক চেষ্টা করেছে ও করছে এবং নানাবিধ সৌকর্যও তাতে দান করেছে। কিন্তু চিনির রস ও গুড় মিলিয়ে যে তামাকের কটুত্ব ও তজ্জনিত গলক্ষতের

[1] হুঁকো-তামাকের ব্যবস্থা যেখানে থাকে। [2] একরকম ধাতু।

সম্ভাবনা যে নষ্ট করে দেওয়া যায়, এবং তার ধোঁয়ায় যে এক ধরণের স্থায়ী আনন্দ সৃষ্টি করা যায়—এ-রহস্য ওদের ধারণাতেই নেই। লখনউ এর পরেও এগিয়েছে—'খামীরা'[1] মিলিয়ে এবং 'খুশ্‌বু' দিয়ে তামাকের মতো বিরক্তিকর ও 'বদ্‌বু' জিনিসকেও সে এতো উৎকৃষ্ট ও সুরভিত করে তুলেছে, ছিলিমে ভরে রাখতেই সারা ঘর গন্ধে ম-ম করে ; যে হুঁকো খায় না, তারও ইচ্ছে হয়—দু-একটা টান দিয়ে নি ! হিন্দুস্তানের কয়েকটি জায়গায় তামাক ভালো হয়, এবং সেই-সেই শহরের নামে তারা বিখ্যাতও। কিন্তু এ-প্রসিদ্ধি কোন মানবিক প্রচেষ্টার ফসল নয়। চেষ্টা ও তদবীর হয়েছে বরং লখনউয়ে, এবং তার ফলে যে উত্তম তামাকের সৃষ্টি হয়েছে, তা অন্য কোন শহরে সুলভ দ্রষ্টব্য নয়। শহরের অনেক লোক খামীর পছন্দ করে না, বরং অভিযোগই করে, যে, এথেকে নাকি 'নযলা'[2] হয়। কিন্তু এই অপছন্দ ও অভিযোগের একটিই কারণ—অনভ্যাস। ইংরেজদের যেমন কোর্‌মা পছন্দ হয় না, বা হজমও করতে পারে না —এও সেইরকম।

তামাকের সঙ্গে-সঙ্গে হুঁকোর অন্যান্য সামগ্রীরও উন্নতি সাধিত হয়েছে। কল্‌কে হয়েছে আগের চেয়ে নাজুক, সুকুমার, সুন্দর। হুঁকোর নল ও ফর্শীর নলের মাঝখানে স্বস্তিক-আকারের যে অংশ অর্থাৎ 'চেম্‌বর', তার সঙ্গে সুন্দর-দেখতে তেহারা রূপোর শিকলি লাগানো হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে নানা ধরণের 'মুঁহনাল' ; 'ফ্‌ল' ধাতুর সুকুমার, হৃদয়গ্রাহী হুঁকো। বস্তুত, এখানকার সমাজ হুঁকোকে সাজিয়েছে, রংচঙে করেছে, দান করেছে বধুবেশ।

হুঁকোর পরে নয়, বরং তার চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয় দ্রব্য : 'খাসদান'—যাকে দরকার হয় বারবার, এবং বাইরে যাতায়াতের সময় খিদমতগারদের কাছে থাকে। 'খাসদান'—যাতে 'গিল্যরী' (খিলি) তৈরি করে পান রাখা হয়। পান হিন্দুস্তানের অতি পুরাতন বাসিন্দা ; হিন্দুযুগ থেকেই এর প্রাধান্য চলে আসছে। প্রাচীনকালে,

---

[1] এক ধরণের তামাক। [2] গলায় কফ জমা।

রাজা-বাদশাহরা যখন কোন বড়ো অভিযানে যেতেন, বা কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিতেন, তখন পানের 'বীড়া' সাজিয়ে সামনে রাখতেন, এবং বলতেন: 'কে একে ওঠাবে?' এর অর্থ: 'এই অভিযানে কে যাবে?' বা, 'এই দায়িত্বের কাজ কে সম্পন্ন করবে?' শাসন-অধিকারী, সরদার অথবা দরবারে উপস্থিত লোকেদের মধ্যে যে কেউ একজন এই 'বীড়া' উঠিয়ে নিত। তদ্বারা সে এই কথা দিত: 'এই কাজ আমি হাতে নিচ্ছি বা এই অভিযানে আমি যাব।' এ প্রথা এখন আর নেই; কিন্তু উক্তিটি এখনও ঘোরে মুখে মুখে: 'অমুক লোক এই কাজের বীড়া উঠিয়েছে', অর্থাৎ সে এর দায়িত্ব নিয়েছে।

ইবনে বতুতা তাঁর ভ্রমণ-লিপিতে উল্লেখ করেছেন: প্রাচীন রাজসভায় ইনামের (পুরস্কারের) সঙ্গে পানও দেওয়া হত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পান ভারতের ঐতিহাসিক বস্তু। সুতরাং তখন থেকে পরবর্তীকাল পর্যন্ত পান ও পান-পাত্রের ক্রমশ উন্নতি ঘটবে, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু পান যখন দিল্লীতে ছিল, তখনও পর্যন্ত এর প্রগতির কোন লক্ষণ আমাদের চোখে পড়ে না। এতে মসলা মেশানোর যে প্রক্রিয়া আগে থেকে চলে এসেছে, তাইই ছিল। সে সবেরও কোন বিবর্তন হয়নি। এই মসলার মধ্যে চুণ, সুপারী, এলাচ ও কত্থা (খয়ের) প্রাচীন কালেই ছিল। লখনউ আসার আগে তামাকও ছিল এই মসলা—সংসারের অন্তর্গত। তারপর কেটে গেছে কতো শত শতক, এসেছে-গেছে কতো রাজ-রাজত্ব-দরবার; ইতিমধ্যে এর কী বা কতোটা উন্নতি হয়েছে, একেবারে জানা যায় না।

লখনউয়ে পানের প্রচলন দিল্লীর চেয়েও অনেক বেশি হয়েছিল। তার জন্যে বিশেষ ধরণের বাসনপত্রও আবিষ্কৃত হয়েছিল। এবং এদের প্রত্যেকের উন্নতি বিহিত হয়েছিল স্ব-স্ব স্বাতন্ত্র্যে।

প্রথম সংস্কার স্বয়ং পানের অর্থাৎ তার পাতার। মহুয়ে ইত্যাদির মতো হিন্দুস্তানের কয়েকটি শহরের পান, প্রাকৃতিক কারণেই, খুব

ভালোজাতের হয়। লখনউয়ের আশেপাশেও প্রচুর পান হয়, কিন্তু তাদের বিশেষ কোন গুণ নেই। তবে, এখানকার প্রগতিশীল ধনীদের প্রযত্নে পানওয়ালারা উৎপন্ন-দ্রব্যশিল্প পর্যায়ে পান-ব্যবসায়কে উন্নত করেছে এবং এমন এক স্তরে পৌঁছে দিয়েছে তাকে, এখনকার পান অন্য সব জায়গার চেয়েও এগিয়ে গেছে। এরা পানকে কয়েক মাস ধরে মাটিতে পুঁতে রেখে দেয়—যতদিন না তার কাঁচাটে ভাব দূর হয়ে যায়, সবুজত্ব একেবারে চলে যায়, শিরা নরম ও নাজুক হয়, রং শাদা হয়ে পক্কতা আসে। কাঁচা পানে যে এক-ধরনের ঝাঁঝ থাকে, তাও চলে যায়, এবং এমন নরম-নাজুক-সুস্বাদু হয়ে ওঠে, যা অন্যত্র দুর্লভ। এইভাবে তৈরি পানকে বলে 'বেগমী'। লখনউয়ের 'বেগমী-পান' দূর-দূরান্তে যায় এবং অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে পাণিগৃহীত হয়।

পানের পাতার পর—চুণ। সর্বত্র, সব শহরেই, মামুলী চুণ ব্যবহৃত হয়—ছেঁকে সাফ্ করাও নয়—যদিও চুণ খুব ঝাঁঝালো এবং ঝাল। নতুন তাজা চুণে বা পরিমাণ বেশি হলে মুখ পুড়ে যায়। এই দোষ কাটাবার জন্যে এখানে একটা বিশেষ প্রক্রিয়া করা হয়—খুব ছেঁকে নিয়ে ও সাফ্ করে এতে একটু মালাই এবং তাজা দইয়ের জল, তাও ছেঁকে, মেশানো হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে লখনউয়ের সূক্ষ্মমেজাজী লোকেদের পানদানীতে এমন উত্তম ও নিরীহ চুণ থাকে, যা অন্যত্র পাওয়া যায় না।

পানের মসলার দ্বিতীয় দ্রব্য ঃ কত্থা বা খয়ের এমনিতেই খুব কটু কষায় ও বিস্বাদ। চুণকে হালকা করা এবং রাঙিয়ে তোলার জন্যেই পানে তার ব্যবহার। কিন্তু এর 'বখটাপন' (কষায়ভাব) খুবই বিরক্তিকর। অবশ্য অভ্যাসে তাও সহ্য হয়ে যায়। তবু অনস্বীকার্য : বস্তুটির স্বাদ বড়ই বিশ্রী। তাই ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিয়ে জলে সেদ্ধ করতে হয় যখন উথলে উঠে লাল শরবতের মতো হয়ে যায় তখন কাপড় দিয়ে ছেকে জলে রেখে জমিয়ে নেওয়া হয়—খয়ের তৈরির এই তদবীর তো সব জায়গাতেই মোটামুটি এইরকমই হয়। এখানে

ততোধিক—একটা থালায় বা চাটুতে ছাই ভর্তি করে তার ওপর একটা কাপড় ঢাকা দেওয়া হয় ; আর সেই কাপড়ের ওপর ওই জমে-যাওয়া খয়েরকে মেলে দেওয়া হয় রুটির মতো, এবং তার ওপর বারবার জলের ছিটে দিতে হয় ; জল করে কি, খয়েরের লালিমাকে—কষায়-ভাব আসলে থাকে যাতে—সঙ্গে নিয়ে ছাইয়ের মধ্যে গিয়ে জমা হয়। এইভাবে পরিষ্কার করতে করতে খয়েরের সেইটুকুই থাকে, যা সুস্বাদু ধোয়া কাপড়ের মতো শাদা ও উত্তম। তারপর কেওড়ার জল দিয়ে বা কেওড়ার ফুলে রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এখন অন্য কিছু-কিছু জায়গায় এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। আদিতে এর আবিষ্কার লখনউয়ে। ফলত, এখানে যেভাবে একাজ করা হয়, অন্যত্র তা সম্ভব নয়। এখন অনেক ব্যবসায়ী এই ধরনের খয়ের লখনউয়ে তৈরি করিয়ে বিক্রী করছে। এক্ষেত্রে আমাদের 'মেহরবান' কাজী মুহম্মদ ইউনুস সাহেব—যিনি লখনউয়ের মহমুদ নগরে থাকেন—অনেক খ্যাতিলাভ করেছেন। তবে, সৌকুমার্য-প্রিয় আমীরদের বাড়ি যে শাদা, উৎকৃষ্ট ও সাফ্ 'কত্থা' ঘরেই তৈরি করে নেওয়া হয়, বাজারের খয়ের, তা সে যত্তোই ভালো হোক, তার সৌকর্যের কাছে পৌঁছতেই পারবে না। পুণা ইত্যাদি দক্ষিণী শহরে নতুন ধরনে তৈরি শুক্‌নো খয়ের বাজারে পাওয়া যায়, যা শুক্‌নোই পানে দেওয়া হয়। ওখানকার লোকেরা খুব পছন্দও করে। আমি চেষ্টা করেও এর ভালোত্বটা কোথায়, বুঝতে পারি নি। কির্‌কিরে তো দেখলেই বোঝা যায় ; "অ-প্রস্তুত" আসল খয়েরের চেয়েও বেশি কষায় !

পানের মশলার তৃতীয় বস্তু 'ডলী' (সুপারী)—'সরোত' (জাঁতি) দিয়ে কেটে ছোট ছোট টুক্‌রো ক'রে পানে দেওয়া হয়। সুপারী কাটা একটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু লখনউয়ে সুপারী কাটাও একটা হস্তশিল্প হয়ে গেছে। অনেক স্ত্রীলোক বাজরার দানার মতো মিহি করে সুপারী কাটে, সব দানা সমান ও একরকম হয় ; গুঁড়োও বেশি বেরোয় না এবং সুপারীর কোন অংশ ফেলাও যায় না।

এখাচে কোনরকম সংস্কারের অবকাশ এখনও পর্যন্ত অনুভূত হয়নি।

তার কারণ, যেমনটি আসে, ঠিক সেইভাবেই ব্যবহৃত হয়। তবু শিল্প চাতুর্য একেও ছাড়ে নি। বিশেষ বিশেষ উৎসবে ও বিশিষ্ট সময়ে একে মুড়ে দেওয়া হয় রূপোর পাতে। যখন পানদান বা 'থালী'তে রেখে দেওয়া হয়, মনে হয় চক্‌মকে রৌপ্যখণ্ড রাখা রয়েছে।

এর পর তামাক। সারা দুনিয়ায় ধূম্ররূপে তামাকের ব্যবহার যেভাবে হয়, সেইভাবে গোটা তামাক খাওয়ার চলও বেড়ে যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ডে অনেক ইংরেজকে তামাকের শুকনো পাতা হাতে ডলে তার 'ফাঁক নিতে'[1] দেখেছি। এ-রেওয়াজ হিন্দুস্তানেও চলে আসছে অনেক দিন ধরে। সুন্দর রঙের জন্যে দিল্লীতে এর নাম 'জর্দা'। প্রথম প্রথম পাতা 'তৈরি' বা সাফ্ করা হত না; আদিম অবস্থাতেই পানে ভরে দিয়ে খাওয়া হত। সেই সঙ্গে, প্রাচীন কালেই অনেক ঘরে এমন ব্যবস্থাও ছিল—তামাক পাতা, তার ডাঁটাগুলো সেদ্ধ করে, কাঠিন্যভাব কমিয়ে, সেই আরকে সুগন্ধি মশলা মিশিয়ে স্ব-রুচি অনুসারে তামাকের কড়াভাব কমানো বা বাড়ানো হত, এবং কোমলতা ও সুন্দর স্বাদের সঙ্গে সুবাসিতও করা হত। তবে, এ-প্রক্রিয়া বিশেষ বিশেষ ঘরে ও বংশেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোক তৈরি-না-করা তামাক-পাতাই খেত, এবং সব পানদানেই বিরাজ করত এটি। বছর কুড়ি হল, মুনশী সৈয়দ এহমদ হুসেন সাহেব নিজের মাথা থেকে এক বিশেষ ধরনে তৈরি তামাক আবিষ্কার ও দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করেছেন—এর চেহারা বারুদের মতো। এটা এতো জনপ্রিয় হয়েছে যে কয়েক বছরের মধ্যেই কাঁচা তামাকপাতা খাওয়ার রেওয়াজ অনেক জায়গা থেকে উঠে গেছে।

[1] হাতের চেটোর তামাক মুখের মধ্যে ছুঁড়ে দেওয়া

তামাক-পাতার উন্নতিবিধানের কৃতিত্ব প্রাপ্য আমাদের আদরণীয় মিত্র মুনশী সৈয়দ এহমেদ হুসেন সাহেবের। তারও আগে, আর একটি সফল প্রচেষ্টা হয়েছিল। সেটি হচ্ছে—তামাকের পাতা ও ডাঁটাকে খুব ভালোভাবে সেদ্ধ ক'রে তার রস বার করে নেওয়া হয়; তারপর রান্না করতে-করতে এত গাঢ় হয়ে যায়, যে, তাজা আফিমের মতো দেখতে হয়ে যায়। তারপর তাতে কেওড়া, 'মুশ্‌ক্‌' (মৃগনাভি) এবং যথাযোগ্য সুগন্ধ মিলিয়ে এমন স্বাদু ও সুবাসিত করে তোলা হয়, যে, পানের সঙ্গে সেই 'কিওয়াম'[1] রতি-ভর খেয়ে নিন, তামাকের স্বাদের সঙ্গে সুগন্ধ দিন-ভর মুখের মধ্যে পাবেন। সৌকুমার্য-প্রিয়তা আরও অগ্রসৃত হয়েছে—কিমামের ছোট-ছোট গুলি তৈরি করা হয়, প্রতি গুলি এক-একবারের খাওয়ার মাত্রা; গুলির গায়ে সোনালী-রূপোলী পাত জড়িয়ে এমন সুন্দর ও আকর্ষণীয় রূপ দেওয়া হয়, মনে হয় যেন মোতি! এই কিমাম ও তার গুলি তৈরি করতেন মুফ্‌তী-গঞ্জের এক বেগম সাহিবা—'লাজবাব' (যার জবাব ছিল না)! লখনউবাসীরা তাঁর হাতের তৈরি গুলি ছাড়া অন্য কোন কারখানার গুলি পছন্দই করত না। তাঁরই সমকালে আসগর আলী মুহম্মদ আলীর কারখানা এই দুই বস্তু প্রস্তুত ক'রে সারা হিন্দুস্তানে একে পরিচিত করে দেয়। এর কয়েকদিন পরে বেগম সাহিবার দেহান্ত হয়। অতঃপর আরও অনেকে এবং অনেক কারখানা এই জিনিস ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে তৈরি করতে আরম্ভ করে; কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই আসগর আলীর কারখানাকে হারিয়ে দিতে পারেনি।

কিমাম ও তার গুলির দোষ ছিল একটা—এর সুগন্ধ দীর্ঘস্থায়ী, কিন্তু তামাকের স্বাদ ও কড়াভাব প্রথম পিক্‌ ফেলার সঙ্গেই বিদায় নিত। এই দোষ অপনোদনের জন্যে মুনশী সৈয়দ এহমেদ হুসেন

[1] তামাকের রস, কিমাম

সাহেব এই নতুন তৈরি ও সুগন্ধি পাতা আবিষ্কার করেছেন, যাতে পানের সঙ্গে এর কড়াভাব ও সুগন্ধ শেষ পর্যন্ত থাকে। এই ঔৎকর্ষ্য দানের ফলে দুনিয়ার মুখ অকস্মাৎ ওইদিকে ঘুরে গেল। কিমাম ও তার গুলি এখনও তৈরি হয়। কিন্তু এর প্রচলন কমে গেছে। এই অবস্থা যদি চলে তো আশা আছে, আর কিছুদিনের মধ্যেই একেবারে উঠে যাবে।

পানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কিছু কিছু জিনিস লখনউ আবিষ্কার করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ : 'ইলায়চী'। একটা এলাচ খেয়ে নিন, মুখ পানের চেয়েও লাল হয়ে যাবে। এটি তৈরি করতে পানের মশলাই কাজে লাগানো হয়, এবং রং মিলিয়ে এলাচের খোসার মধ্যে ভরে দেওয়া হয়। তাতে রং হয় চোখা। তবু, এটি পানের পরিবর্ত হতে পারে না। এবং এভাবে তৈরি এলাচে কারও পান খাওয়ার শখও মিটতে পারে না। আর এক ধরনের এলাচ তৈরি করা হয়েছিল, যার মধ্যে 'মিস্‌সী' ভরে দেওয়া হয়। 'মিস্‌সী' (মিসি) ডলতে হয় অনেকক্ষণ। স্ত্রীলোকেরা এর একটা এলাচ পানে ভরে খেয়ে নিলে সঙ্গে-সঙ্গে মিসি লেগে যায়, দাঁতের ফাঁকে-ফাঁকে খুব গাঢ় নীল দাগ জমে বসে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এদের আবিষ্কার, দুজাতের কোন এলাচই তা সিদ্ধ করতে পারেনি। অর্থাৎ, 'লাল এলাচ' পানের বদলী হতে পারে না ; এবং 'কালো এলাচে' ভালো সুগন্ধি মিসির সুবাসও ঠিক পাওয়া যায় না। লোকেদের পছন্দ হল না। ফলত, মজা ও ইয়ার্কি করা ছাড়া সভ্য-সমাজের কোন জরুরী কাজেও এদের লাগানো যায় না।

এই সূত্রে 'চিকনী ডলী'র কথাও বলে দেওয়া উচিত। এটি পানের অভিন্ন অঙ্গ যদি নাও হয়, তবে ঘনিষ্ঠ সাথী অবশ্যই। কিছু লোক এমনি-সুপারীর বদলে 'চিকনী' সুপারী পানে দিয়ে খায় ; কেউ-কেউ পানের সঙ্গে না খেয়ে শুধুই মুখে রাখে। এলাচের সঙ্গে খেলে খুবই মজা পাওয়া যায়। বিশেষ করে, হিন্দু বন্ধুরা মুসলমানদের হাতের পানের খিলি খায় না, তাই তাদের প্রতি আতিথ্য সৎকার হয় শুধু

'চিকনী' সুপারী ও এলাচ দিয়ে। এদিক থেকে এটি সমাজের এক অতিপ্রয়োজনীয় দ্রব্য হয়ে গেছে।

'চিকনী' সুপারীও আসলে পানেই দেওয়া হয়। তফাৎ শুধু—এটি বিশেষভাবে তৈরি করা হয় এবং সংস্কৃত। এ জিনিস লখনউ বা দিল্লী বা হায়দরাবাদ বা অন্য কোন উন্নত শহরে তৈরি হয় না; যেখানে জন্মায়, সেখান থেকেই তৈরি হয়ে আসে।' কথিত আছে, আসল সুপারীকে দুধে ফেলে, সেদ্ধ এবং রান্না করে নেওয়া হয়। যেভাবেই তৈরি হোক, এই প্রক্রিয়ায় ওতে একটা চ্যাট্চেটে ভাব হয়, শুষ্কতা চলে গিয়ে চেক্‌নাই আসে এবং বেশি সুপারী খেলে গলায় কখনও-কখনও যে-ফ্যাঁদা পড়ে, চিকনী সুপারীতে তা একেবারেই হয় না। সত্যি বলতে কি, মামুলী সুপারির তুলনায় চিকনী সুপারীতে অনেক সুকুমারতা ও স্বাদ।

যতোদূর আমি জানি, চিকনী সুপারীর রেওয়াজ হায়দরাবাদ, দিল্লী ও অন্য শহরে লখনউয়ের চেয়েও বেশি। অতএব, এর রুচিসম্মত প্রস্তুতি ও সংস্কার ওইসব স্থানেরই শৌখীনদের কাজ ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এদিকে কোন শহরই মনোযোগ দেয় নি। চিকনী সুপারীর শাঁস খুব স্বাদু ও নাজুক হয়; যে-দিক খোসায় লেগে থাকে, কিছুটা কষায় হয়। বিশেষ করে নীচের দিকটা খুবই খারাপ হয়। এই খারাপ অংশ বাদ দেওয়ার এবং এর অবগুণ নষ্ট করার জন্যে লখনউয়ে কাট-ছাঁট করে কয়েক ধরনের সাধারণ চিকনী সুপারী তৈরি হতে লাগল। প্রথমেই উল্লেখ্য 'দোরুখী': ওপর-নীচের বেশির ভাগ অংশ এবং ধারের কিছু এদিক-ওদিক কেটে সুন্দর ও সু-বর্ণের বাটির মতো—যার মধ্যে 'চিকনী ডলী'র শ্রেষ্ঠ অংশ, তার সেই কোমল-নরম শাঁসটুকু থেকে যায়। দ্বিতীয় ধরনের চিকনী সুপারী হল 'একরুখী': চতুর্দিকের অংশে কাট-ছাঁট, এবং ওপর-নীচে দুই খারাপ অংশের একদিকের বেশিটা ছেড়ে দেওয়া হয়। তৃতীয় ধরনের চিকণী সুপারীর শাঁসকে একটা সুন্দর আটকোণা ট্রে বানিয়ে দেওয়া হয়। এই কাট-ছাঁটাইয়ের ফলে যে গুঁড়ো বেরোয়, তা আলাদা বেচে দেওয়া হয়।

এইভাবে লখনউয়ে চিকনী সুপারীর পাঁচ শ্রেণী তৈরি হয়েছে। তাদেরও আবার দু-তিন উপজাতি। 'দোরূখী' ও 'একরূখী' উভয়ের স্বাদে ও কোমলতায় অনেক পার্থক্য, তাই দামেও আসমান-জমিন তফাৎ। চিকনী সুপারী লখনউবাসীদের খুব-যে শখের জিনিস, তা নয়; তবু এর উন্নতিবিধানের জন্যে এতো কিছু করা হয়েছে, যা অন্য কোন জায়গায় হয়নি।

পানের মশলার কথা এই পর্যন্ত। এই সূত্রে এবার পান-পাত্রের কথা বলা যাক।

তার মধ্যে, সবচেয়ে প্রধান হল পান রাখার জায়গা। পানের খিলিতে বিদ্যুৎশক্তির মতো ও প্রেয়সীর মতো একটা আকর্ষণ থাকে; ইচ্ছে করলে, পানদানকে তার ব্যাটারী বলতে পারেন। প্রাচীন-কালে, বিশেষ করে দিল্লীতে ছিল ছোট ঝুড়ির মতো 'পিটারী'—গোল, চতুষ্কোণ, অষ্টকোণ, নানান আকারের হত। সম্ভবত, দিল্লী থেকেই হায়দরাবাদে 'পিটারী'র মতো পানদান গিয়েছিল, যার নকল টিনের বা কাঁচের চতুষ্কোণ পানদান। হায়দরাবাদে বিবাহে এই পানদানেরই মধ্যে চুণ-খয়ের-সুপারী-চিকনী সুপারী-এলাচ-লবংগ-পান ইত্যাদি রেখে, অতিথিদের মধ্যে ঢালাও ভাবে বিতরণ করা হয়। সুতরাং 'পিটারী'ই ছিল সেকালের পানদান; আর এই 'পিটারী'কে সঙ্গে নিয়েই দেড়শো-দুশো বছর আগে মহিলারা এসেছিলেন দিল্লী থেকে লখনউ। যতদিন দিল্লীর অনুকরণ চলছিল, 'পিটারী' ছিল। যেদিন থেকে লখনউয়ের লোকেরা নিজেদের চাল-চলন-ভাষায় স্ব-রুচি অনুসারে কাটছাঁট শুরু করে দিল, সেদিন থেকে পানদানের নক্শাও বদলে যেতে লাগল।

প্রথমে হল: শুধু পান রাখার জন্যে তামার কলাইকরা গোল 'পিটারী'; তারপর তার জন্যে উঁচু গোল ঢাকা। কিছু দিনের মধ্যেই চেহারা দাঁড়াল চওড়া রূপোর কলসের মতো; মাথার ওপর ধরবার জন্যে একটা লম্বামতো কড়া লাগিয়ে দেওয়া হল। কড়ার দুই মাথা আংটায় পরিয়ে দেওয়া হল। ফলে, ওপর দিকে সোজা

হয়ে না থেকে ওরা পড়ে থাকে এদিক-ওদিক। এই পানদানের ভেতরে ছোট ঘটের মতো ছুটো্‌করে 'কুল্‌হী' থাকে চুন ও খয়েরের জন্যে। এই 'কুল্‌হী' বা ঘটের সঙ্গে ওই মাপের তিনটে ডিবে—তার কোনো কোনোটাতে কাটা সুপারী রাখা হয়। ডিবে তিনটে ও 'কুলহী' ছুটো গোল হয়ে পাশাপাশি জমে থাকে। মাঝখানে যে জায়গা খালি থাকে, সেখানে একটা ছোট ডিবে রাখা হয়; তাতে থাকে এলাচ বা লবংগ। ডিবের ঢাকা টাইট থাকে, যাতে নিজে নিজে খুলে না যায়, বরং একটু জোরই লাগে খুলতে গেলে। কিন্তু 'কুল্‌হী'র ঢাকা হয় ছোট থালার মতো, মুখের ওপর বসিয়ে-রাখা। চুণ-খয়েরের এই 'কুল্‌হী'তে চুণ ও খয়ের লাগাবার চামচে থাকে—তাদের মাথায় কখনও ময়ূর লাগানো থাকে, কখনওবা এম্‌নিই। এই ডিবে-কুল্‌হীর ওপর পানদানের মাপসই একটা বড়ো থালা, তাতে পান রাখা হয় কাপড়ে জড়িয়ে। প্রাচীন কালে, পানের মতো ঢাকা-দেওয়া আর এক ধরনের পাত্র হত, তাতে পান রাখা হত। একে বলা হত 'নাগরদান'। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেল—এ পাত্র খুব কাজের নয়, প্রয়োজনও সাধন করেনা—এইজন্যে, যে বন্ধ করে দিলে এতে হাওয়া ঢুকত না, আর পান খারাপ হয়ে যেত। যদিও পুরনো পানদানের মধ্যে কিছু কিছু 'নাগরদান' আজও চোখে পড়ে, এর চল্‌ একেবারে উঠে গেছে। অচিরেই একেবারে অদর্শন হয়ে যাবে।

অল্প দিনেই পানদান মেয়েদের সিন্দুক, ভাঁড়ার ও ক্যাশ-বাক্‌সের কাজ দিতে লাগল। একে যে হিন্দুস্তানের রমণীদের 'ভানুমতী কা পিটারা' (ভানুমতীর ঝাঁপি) বলা হত, একথা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। একারণে, এর আকার বাড়তে-বাড়তে, এক-একটা দশ সের, বিশ সেরের পানদান তৈরি হতে লাগল। কোথাও অতিথি হয়ে গেলে সঙ্গে যেত পানদান। এটা ছিল অপরিহার্য অঙ্গ, ব্যক্তির সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতীক; পানদানের আকার দিয়ে তার পরিমাপ হত। যতো বড়ো পানদান, বেগম সাহেবার মর্যাদা ততো বেশি। পরিণামে

দাঁড়াল : ডুলি-পাল্‌কির মধ্যে সমস্ত জায়গা পানদানই নিয়ে নিত, আর অনেক কষ্টেস্মৃষ্টে, চেপেচুপে, গুঁড়ি-সুঁড়ি মেরে বসবার জায়গা মিলত স্বয়ং বেগমসাহেবার ! পানদানের আকার বাড়তে লাগল দিনদিন, সেইসঙ্গে তার ওজনও। হঠাৎ রুচি বদলে গেল। চলন হল ছোট জিনিসের। নতুন ধরনের ছোট-ছোট গম্বুজ-সদৃশ 'কলশদার' পানদান তৈরি হতে লাগল। একে প্রথমে বলা হত 'আরামদান' ; এখন সবাই বলে 'হুস্‌ন্‌দান'। পানদানে যে-যে জিনিস থাকে, এতেও তাই ; বাইরের চেহারাটা কলশ-সহ সুন্দর গম্বুজের মতো ; এবং ওই কলশ বা শিখর ধরে ওঠানো হয়। 'হুস্‌ন্‌দান' জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। লখনউয়ে তো বটেই, অন্য শহরেও এর চাহিদা বেড়ে গেছে। লখনউয়ে এর ব্যবহার প্রথম প্রথম করত পুরুষরা, যারা লোক-দেখানো প্রদর্শনী পছন্দ করত না। পরে সাধারণ্যে চালু হয়ে গেল। পুরনো ঢঙের পানদান একেবারে লোপ পেয়ে যায় নি ; তবে 'হুস্‌ন্‌দানের'ই রেওয়াজ বেশি। পানদান আছে কোন-কোন ঘরে ; বড়ো নয়, ছোট। আজকাল মোরাদাবাদে লখনউয়ী 'হুসন্‌দান' তৈরি হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো খুব ছড়ানো, লখনউয়ের মতো অতো সুন্দর নয়। এখানকার হুস্‌ন্‌দানের উপযোগী-আকারটাই হচ্ছে একটা বৈশিষ্ট্য ; ঠিক এইরকম আকারদান অন্য জায়গার কারিগরের পক্ষে সম্ভব নয়।

পানদানের পর 'খাসদান'। মহফিলে বা বন্ধুদের আসরে 'খাসদানে' পানের 'গিল্যরী' (খিলি) রেখে পরিবেশন করা হয়। দিল্লীতে একাজ দেয় একটা খোলা থালা—একদিকে কাটা সুপারী রাখা, অন্যদিকে আধা-আধি পান-চুণ-খয়ের লাগিয়ে ও মুড়ে রাখা হয়। ওখানে আজও এইরকম রেওয়াজ আছে। তাথেকে মনে হয়, আগেও অতিথিদের সামনে পান-আনার এটাই প্রথা ছিল। লখনউয়ে কিন্তু খিলি হত কম-সে-কম দুটো পানের। প্রথমে হত অবিকল পানিফলের মতো দেখতে। আজকাল পানের খিলি হয় ভাঁজকরা 'বীড়া'—বোতলে লাগাবার কাগজের ছিপির মতো দেখতে অনেকটা।

খিলিকে আটকে রাখার জন্যে 'কীল' লাগানো হয়। প্রথমে লাগানো হত লবংগ। পরে এল জঞ্জীরের একটা 'লচ্ছা'[1]। 'লচ্ছা'র চেহারাটা এইরকম : রূপোর একটা ছোট ডিবে বা 'ইত্র্দান' (আতরদান) ; আতরদানের চারদিকে অনেকগুলো করে শিকলি, তাতে 'কীল' লাগানো। পুরো 'লচ্ছাটা' রেখে দেওয়া হয় পানের খাসদানে। কিন্তু খুব-একটা কাজের নয়, তার ওপর ঝামেলাও। খিলিতে তখন লোহার 'কীল' লাগানোর ব্যবস্থা হল। তবে, এখনকার পদ্ধতিটাই সবচেয়ে ভালো—খিলির ওপর পানেরই একটা 'গিলাফ' (খাপ) চড়িয়ে দেওয়া। এতে পান খুলে যায় না।

বলা বাহুল্য পানের খিলির জন্যে শুধু থালাই যথেষ্ট ছিলনা। সুতরাং, থালার ওপর এল গম্বুজ বা 'কলশদার' ঢাকা। এই ঢাকা খাসদানের চেহারাকেও করে দিল ছোট 'হুস্ন্দানের' মতো।

50

পানের খিলি রাখার জন্যে 'খাসদানে' বহুতর উন্নতি সাধিত হয়েছিল, এবং তাকে আকর্ষণীয় ও সুন্দর করার জন্যে কোন চেষ্টাই বাকী রাখা হয় নি। তবু, দেখা গেল—গ্রীষ্ম ঋতুতে তামার কলাই করা 'খাসদান' গরম হয়ে যাচ্ছে এবং ওতে রাখার ফলে সযত্নে সাজা খিলি শুকিয়ে যাচ্ছে এবং এতো গরম হয়ে যাচ্ছে যে, পান খাওয়ার মজা চলে গিয়ে কষ্টই হচ্ছে, মুখ যাচ্ছে শুকিয়ে। তখন ওই ঋতুর জন্যে মাটির কোরা হাঁড়ি তৈরি করা হল—এতে পান ঠাণ্ডা ও টাট্কা থাকে, একটা সোঁদাভাবও এসে যায় ; ফলে খাওয়ার আনন্দ যায় বেড়ে। এই 'কাগ্জী' হাঁড়ি লখনউয়ে এতো হাল্কা, সুদর্শন ও পাতলা ছিমছাম হয়, যা অন্য কোন স্থানে হয় না। জলে ভিজিয়ে নিয়ে ওতে

---

[1] কাপড়ের বা পশমের বা ধাতুর ঝুম্কো।

পান রেখে সামনে আনা হয় যখন, পান তো খাওয়া যাবে পরে, রূপ দেখেই দুচোখ তাজা হয়ে যায়।

আমীরী সৌজন্যের দিক থেকে পানকে বারবার ভেজানোটা খুবই অস্বস্তিকর। অথচ, জলে 'তর্' না হওয়া পর্যন্ত ওতে মজাও আসে না। তাই, ওর ওপরে কাপড় মুড়ে দেওয়া হয়, যাতে কাপড়ই ওকে 'তর্' রাখে। কিন্তু মামুলী শাদা কাপড় তাড়াতাড়ি ময়লা হয়ে যায়, খিলির জন্যে জায়গায়-জায়গায় লাল দাগ পড়ে যায়। তাই শাদার বদলে ওর ওপর লাল 'টুল' বস্ত্র মুড়ে দেওয়া হয়। তাড়াতাড়ি ময়লা হয় না, পানের দাগে কুশ্রীও হয় না। অধিকতর সাজসজ্জার জন্যে হাঁড়িতে, 'টুলের' ওপর পাতলা রূপোলী ফিতে অর্ধবৃত্তাকারে সেলাই করে দেওয়া হয়। ইত্যাকার শৃংগার-সাধনে মাটির হাঁড়ি ধরে বধূর বেশ।

তামার 'খাসদান' অবগুণ্ঠিত থাকে। 'পানদান', 'হুস্‌ন্‌দান'ও 'গিলাফ'-এ ঢাকা থাকে। ব্যবহারকর্তার শ্রেণী ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই 'গিলাফ' বা ঢাকার ওপর কাজ থাকে। অর্থাৎ, শুধু প্রয়োজন-সাধন নয়, অলংকরণও সমান অভীষ্ট।

এইভাবে, বর্ডার বা লেস-লাগানো লাল 'টুল' কাপড় দিয়ে 'সুরাহী' (সুরাই)র মুখও মুড়ে দেওয়া হয়। তাতে, সুরাইয়ের জল খুব ঠাণ্ডা থাকে। এবং তার সেই রূপ দেখেই চিত্ত পিপাসিত, যদিও তৃষ্ণা তখনও অদর্শন।

পান যারা খায়, তাদের প্রায়ই পিক্ ফেলার প্রয়োজন হয়। তার জন্যে বারবার ওঠা একটা ঝামেলা। তার ওপর, যে-ঘরে সুন্দর ক'রে ফরাশ পাতা, সেখানে পিক্-ফেলার বিশেষ জায়গাটি দূরে কোথাও করতে হয়, এবং উঠে যেতে হয়। আর, জায়গা যদি ঘরের মধ্যেই থাকেও, পিকের ছোপে ঘরদোর নোংরা হয়ে যায়। তাই, পানেরই জন্যে আর একটা পাত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যাতে পিক্ ফেলা যায়। এই পাত্রই 'উগালদান' (পিক্‌দানী)। এটি কোন নতুন জিনিস নয়, এবং এই প্রসঙ্গে লখনউয়ের কোন বিশেষত্বও নেই।

সম্ভবত, দিল্লীতেই এর প্রথম আবিষ্কার ; সেখান থেকে লখনউ আসে। এর চেহারা তখন ছিল : তলাটা গোল, ওপরটা লাট্টুর মতো, পদ্মকাটা মুখ। 'উগালদান' তামা, পেতল বা দস্তার হয়। সকলেই তৈরি করে। বদিরে, এর ওপর থাকে ওখানকার অতুলনীয় বিদরীর কাজ'। লখনউয়ে হয় তামার ওপর নক্শার কাজ। মোরাদাবাদেও হয় ; তাতে, ওখানকার সূক্ষ্ম কাজ থাকে। লখনউয়ে এই ধরনের মাটির 'উগালদান'ও তৈরি হয়।

কিন্তু, এরূপ আকৃতির 'উগালদান'-এর অসুবিধেও অনেক। নীচের দিকটা হাল্কা, এবং ওপরের অংশ ছড়িয়ে থাকার জন্যে ওজনে ভারী হয়। অসাবধানে প্রায়ই উল্‌টে যায়, ফরাশ নষ্ট করে দেয়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্যে জয়পুর, হায়দরাবাদ এবং তার পরে মোরাদাবাদে অন্য এক ধরনের 'উগালদান' তৈরি হতে লাগল। এও বোধ হয় দিল্লীরই আবিষ্কার। এর আকৃতি 'মাদারী'দের[1] ডুগডুগির মতো। লখনউয়ে এই ধরনের 'উগালদান' ব্যবহৃত হতে থাকে। অবশ্য, পুরনো 'উগালদান' একেবারে বাতিল হয়ে যায়নি, এখনও তৈরি হয় বেশ ভালো পরিমাণেই। তবু, অনেক ঘরে নতুন 'উগালদান'ও লক্ষ্যগোচর হয়। লখনউয়ে 'উগালদানে'র ব্যবহার হিন্দুস্তানের সব শহরের চেয়েও বেশি ; কিন্তু এর আবিষ্কার তো বটেই, এর উন্নতিবিধানেও এই শহরের কোন অবদান নেই।

আজকাল এক নতুন ধরনের ইংরেজী 'উগালদান' পাওয়া যায়—বসানো এবং ছড়ানো, 'চীনী'[২] ও 'তামচীনী'র[৩]। চুরুট খাবার সময় এতে 'থুক' ফেলা হয়। পানের পিক্ ফেলার পক্ষে খুব সুবিধের নয়।

আমীর ও ধনী ব্যক্তিদের সঙ্গে 'খাসদান' ছাড়া থাকে জলের 'লুটিয়া' (লোটা)। এটিও খিদমতগারের খিদমতে থাকে। সচরাচর তামারই লোটা হয়—নক্শাকরা এবং সাদাসিধে, দুরকমই। যেসব লোককে খোদা সামর্থ্য দিয়েছেন এবং আমীরী ও ধনাঢ্যতা দিয়েছে

---

[1] যারা সাপ, বাঁদর, ভালুক খেলায়। [২] পোর্‌সিলেন। [৩] এনামেল।

শরীয়তের বন্ধন থেকে মুক্তি, তারা সঙ্গে রাখে রূপোর লোটা।

'লোটা' হিন্দুযুগের সমবয়সী—পেটের চেয়েও মুখ ছোট এবং নল নেই। সফরকালে প্রায়ই কুয়ো থেকে জল ভরার প্রয়োজন হয়, তাই মুসাফিরদের সঙ্গে লোটা, তৎসহ দড়ি থাকেই। দেহাতের হিন্দু ও নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে আজও এর চল আছে। মুসলমানরা লোটার ঠোঁট বানিয়ে নিল, যাতে জল ঢালতে সুবিধে হয়।

জানিনা, দিল্লীর আমীরদের মধ্যেও এ-রেওয়াজ ছিল কিনা। তবে যাদের সঙ্গে খিদমতগার থাকত, তাদের সঙ্গে লোটাও থাকত—জল পান, কুল্‌কুচো করা এবং অন্যান্য জরুরী প্রয়োজনে কাজে লাগত। লোটার যে চেহারা আজকাল দেখা যায় এবং যার সৌন্দর্যবিধানে লখনউয়ের অবদান অত্যধিক তার কথা আমি বলব তাম্র-পাত্র প্রসঙ্গে।

গ্রীষ্মকালে, রঙীন কাপড়ে মোড়া ঝালরদার পাখাও থাকত চাকরদের কাছে। পরবর্তীকালে ছাতারও দরকার হয়ে পড়ল—রোদে মালিকের মাথায় ছাতা ধরে থাকত ছত্র-ধারী চাকর।

ঘরোয়া প্রয়োজনে হাত ধোবার জন্যে, হিন্দুস্তানের ধনীগৃহের পুরনো সামগ্রী: 'সিলফচী' ও 'আফতাবা'[1]—খোদা জানেন কবে থেকে, দিল্লীতে প্রচলিত ছিল এবং সেই পুরাতনী রূপ নিয়েই লখনউয়ে পদার্পণ করেছিল। এখানে 'সিলফচী' তেমনিই থেকে গেল; তার জায়গায় বেশি চল হল 'তসলী'[2]-র। তবু 'তসলী' হল না 'সিলফচী'র বিকল্প। 'সিলফচী' হচ্ছে একটা ভুঁড়িদার পাত্র, কার্নিস বা চারধার 'উথলা'[3] থালার আকারের, তবে খুব বিস্তৃত, মুখ একটু ছোট, তার ওপর একটা জালের পর্দা, তা দিয়ে জল পড়ে হাত ধোবার সময়। জালী পর্দাটা যখন খুশি তুলে নিয়ে পাত্রটিকে ভালভাবে সাফ করা যায়। পুনশ্চ, এই জালীর ওপর কিছু ঘাসও রেখে দেওয়া হয়; ফলে জল পড়ে কিন্তু ছিটে পড়ে না। এর সুবিধেটা

[1] হ্যাণ্ডেলওয়ালা লোটা। [2] ছোট প্যানের মত। [3] অগভীর থালা।

এবং সুকুমারতাও হচ্ছে এই যে, ময়লা জল যা দেখতে খুবই খারাপ, চোখের আড়ালে থাকে ; মেজাজ যার সূক্ষ্ম তারও মনোকষ্ট হয় না। কিন্তু অন্যদিকে 'আফতাবা'র জায়গায় চালু হয়ে গেল সাধারণ 'লোটা'। আসলে 'আফতাবা'ই ছিল পুরনো দিনের লোটা এবং লখনউয়ের লোক একেই সুরুচি-মাফিক পরিবর্তন করে বর্তমান-লোটার সুডৌল রূপ দান করেছে। পুরনো লোটা, যাকে বলা হত 'আফতাবা' তার চেহারা ছিল : তামার তৈরি একটা ছুঁচলো পাত্র, যার পেট ও গলার মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না, নিচের তলায় যতোটা ঘের হত, ওপরের দিকে ক্রমশ সরু হতে-হতে শেষে সেটাই হয়ে দাঁড়াত গলা। মুখ তৈরি করা হত ধার মুড়ে। একদিকে লাগানো হত বক্রমুখ-নল। এই ধরনের লোটা হায়দরাবাদে আজও পাওয়া যায়, যা তার প্রাচীনতার এবং আমাদের প্রথম লোটার প্রামাণিক নিদর্শন। মিশর ও সিরিয়ার মাটির জলপাত্র বা ইংরেজদের বাড়িতে মুখ ধোবার টেবিলে চীনেমাটির যে 'জাগ' থাকে, এর গড়ন তার মতো। এথেকে অনুমান হয়, মুসলমানরা আরব ও ইরান থেকে একে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। কিছুদিন পরে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে এর প্রথম পরিবর্তন হল ; পেট গোল হল, গর্দান থেকে আলাদা হয়ে গেল এবং প্রাধান্য পেল। তবু আদি রূপের কাছাকাছি হওয়ার জন্যে লম্বাটে-ভাব থেকে গেল—উচ্চতার অনুপাতে লম্বাই-চওড়াই-এ সামঞ্জস্য ছিল না। পেটের গোলও তখনও পর্যন্ত বর্তুলাকার হয় নি, ডিমের মতো ছিল। পুরনো উর্দু 'মসনবী' ও গল্প-কাহিনীতে এই আকৃতির 'আফতাবা'রই বর্ণনা আছে। লখনউয়ে হল কি, অণ্ডাকার পেট হয়ে গেল বলের মতো ; উচ্চতা যতোটা. সেই অনুপাতে ঘের ও ছড়ানে-ভাবও বেড়ে গেল ; কণ্ঠে নামল সুন্দর এক ঢল্‌ ; নল নীচের দিকে চওড়া, ডগার কাছে সরু বাঁকানো এবং সুন্দর দেখতে। এটি হল লখনউয়ের বর্তমান লোটা, যার চেয়ে সুডৌল ও সুদর্শন লোটা হিন্দুস্তানের কোন শহরে তৈরি হয় না। নানা জায়গার শৌখীনরা ফরমাইশ ক'রে-ক'রে লখনউ থেকে নিয়ে যায়। লোটায় যে ঔৎকর্ষ্য

দেওয়া হল, ছোট 'লুটিয়া' থেকে বড় 'লোটা' পর্যন্ত সবের মধ্যেই তা লক্ষ্যগোচর হয়।

[বস্তুত এই জাতীয় পরিবর্তন তামার যাবতীয় পাত্রেই আনা হয়েছে। সে সবের কথা আমি পরে বলব। এখানে বলার সুযোগ নেই।]

'বেসনদান' হচ্ছে নল-বিহীন লোটা, যাতে 'বেসন' বা ব্যাসন থাকে। খাওয়ার পর পাত্রে যে তেল-তেল-ভাব থাকে, তাকে ছাড়ানোর জন্যে এই পাত্র থেকে ব্যাসন নিয়ে বাসন মাজা হয়। তারপর জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়। অল্প কিছু লোক আছে, 'বেসন-দানে' ব্যাসনের জায়গায় রাখে 'উবটন' বা খল। তারা বলে, বেসন হচ্ছে খাবার জিনিস, হাত ধুয়ে একে নষ্ট করাটা ঠিক নয়, উচিতও নয়। তবে এর রেওয়াজ এখন অনেক কমে গেছে। কারণ, বিয়ে ছাড়া অন্য সময় 'উবটন' তৈরি হয় না; তদুপরি 'খলে' হাতে ঝাঁঝালো গন্ধ হয়।

॥ 51 ॥

সমাজে বাস করতে হলে যেসব দ্রব্যসামগ্রী ও শিষ্ট আচার অত্যাবশ্যক, তাদের বর্ণনা আমি করেছি। অতঃপর যে-বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার বলে আমার মনে হচ্ছে, তা হল ঃ এখানকার শরিফদের বাইরে আসা-যাওয়ার রীতি ও কায়দা-কানুন।

হিন্দুস্তানের অন্যান্য শহরের মতো এখানেও ইংরেজীয়ানা এমন শিকড় গেড়ে বসেছে যে এশিয়ার অন্তিম সংস্কৃতি এদেশে যে বিশেষ রূপ ধারণ করেছিল, তা তিরোহিত হয়ে গেছে। অতএব, এই সুযোগে আমি সেইসব জিনিসের উল্লেখ করব, যা লুপ্ত হয়ে গেছে বা যাবার পথে। এই উদ্দেশ্যে আমাদের যেতে হবে আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগেকার কালের বৃত্তসীমায়। সেইখান থেকে সেই

সময়ের ছবি পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি—যে ছবি আজ আর দৃষ্টির সম্মুখে নেই।

আজকাল যেমন ভালো-ভালো মোটরগাড়ি, লম্বা-চওড়া ফিটন, ল্যাণ্ডো, এইসব হয়েছে, কিংবা আজ যেভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম-কানুনের দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে, সেকালে সেসব কিছুই ছিল না। তার কারণ হল : তখনকার দিনে এখনকার মতো বড়-বড় লম্বা-চওড়া সড়ক ছিল না। ছিল ছোট-ছোট পথ, যার ওপর দিয়ে সবসময়ে চলাচল করত : হাতী-ঘোড়া-উট—'হওআদার'-'বূচা'-'পীনস'-'মিয়ান-সুখপাল'-'ডোলী'-'রথ'-'বহল', এবং ভিড়, লোকের ভিড়। তার মধ্যে দিয়ে 'হটো-বাঁচো' করতে করতে হাঁটা-চলা। সে ভীড়েভর্তি বাজারই হোক অথবা হোক সে 'মনপসন্দ্' ভ্রমণ-স্থলী, সর্বত্রই একই অবস্থা।

উট লাগত সেনাবাহিনীর কাজে, সংবাদ আদান-প্রদানে এবং ভার বহনে। বাকী সব যানবাহন ছিল শরিফ ও রইসদের আর্থিক সামর্থ্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী। উচ্চবর্গের শাহজাদা, নবাব এবং সমশ্রেণীর আমীররা বেরোতেন 'হওআদার' ও 'বূচা'য় চড়ে।

'হওআদার' টমটমের মতো দেখতে একটা খোলা ডুলি, যার পেছনে চামড়ার হুড্ লোহার স্প্রিংয়ের সাহায্যে খোলা বা বন্ধ করা যেত। ঠাণ্ডার সময়ে যখন হুড ফেলে দেওয়া হত, তখনও চারদিক খোলা থাকত। সামনে পেছনে পালকির মতো ডাণ্ডা লাগানো থাকত। চারজন করে কাহার কাঁধে উঠিয়ে নিয়ে যেত। তাতে চড়ে সওয়ার খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে বাজারে ঘুরত, জিনিসপত্রের খোঁজ করত, দেখত, পরিচিত ব্যক্তিদের সেলাম, অভিবাদন করত। গড়ন দেখে মনে হয়, 'হওআদার' ইংরেজদের আবিষ্কার। হিন্দুস্থানে ওরা এটিকে তৈরি করেছে স্বরুচির সৃষ্টি এবং নতুনত্ব প্রদর্শনের প্রবণতাবশত। পরিচ্ছন্ন সুদর্শন ও সুকুমার। এখানকার রইসদেরও মনের মতো। কিন্তু এখন এর রেওয়াজ একেবারে উঠে গেছে। দু-একজন পুরনো রইসের বাড়ি এখনও দেখতে পাওয়া যায় গোটাকয়েক। তবে, নিয়মিত যান

হিসেবে আর ব্যবহৃত হয় না ; ধনী হিন্দুদের বরযাত্রায় কখনও কখনও নজরে পড়ে বটে।

এর চেয়েও প্রতিষ্ঠিত ও 'শানদার' সওয়ারী 'বুচা'। এর গড়ন আজকালকার বলদটানা গাড়ির মতো—চাকার বদলে পায়া, সামনে পেছনে পালকির মতো দুটো করে ডাণ্ডা। কম করেও আটজন, কখনও কখনও ষোলজন কাহার উঠিয়ে নিয়ে যেত। কাহাররা আরও অনেক সওয়ারী ওঠাত ; তার মধ্যে এটি ছিল সবচেয়ে ভারী। এতে, আমীররাও হয়তো কখনও-সখনও চড়ত। আমি শুধু কলকাতায় ওয়াজিদ আলী শাহকে এতে সওয়ার হতে দেখেছি। তাছাড়া আর কোথাও, আর-কারও কাছে এ-সওয়ারী দেখিনি। এতে চড়েই বাদশাহ তাঁর বাগান, মহল এবং কুঠীতে যাতায়াত করতেন। পাশে পাশে খিদমতগারদের দল, সরকারী কর্মচারী, দরবারের মোসাহেব প্রভৃতি প্রায়-শোভাযাত্রা করে পায়ে পায়ে হাঁটত। এটাও নিশ্চয়ই ইংরেজদের আবিষ্কার—তৎকালীন ইংরেজী গাড়ীর অনুকরণে কাহারদের বহনযোগ্য করে নেওয়া।

তৎকালীন স্ত্রীলোকদের 'ইজ্জতদার' সওয়ারী 'সুখপাল' বিশুদ্ধ হিন্দুস্তানী যান এবং স্থানীয় রুচির অনুকূলও। একটা লম্বা-চওড়া খাটিয়া তার ওপর লাল গম্বুজের মতো বানানো, তার ওপর সোনা-রূপোর 'কলশ' (শিখর) লাগানো ; চার পাশে পর্দা। দেখতে, অনেকটা লাল গম্বুজের মতো ডুলী—সামনে পেছনে একটা-একটা বা দুটো-দুটো করে ডাণ্ডা লাগানো ; কাহাররা নিয়ে যেত। এ সওয়ারী নির্দিষ্ট ছিল শাহী মহলের মহিলা এবং উচ্চকোটির বেগমদের জন্যে।

এই আকৃতিরই 'রথ'—চাকা লাগানো এবং বলদ বাহিত। দেহাতের তালুকদার ও বনেদী জমিদার বাড়ী এবং দেশীয় রাজ্যে আজও রথ চলমান। তবে, ক্রমেই এর ব্যবহার উঠে যাচ্ছে, এবং এটি অকেজো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেকালে শাহী বেগমদের জন্যে অনেক রথ ছিল। নবাব আসফ উদ্দৌলার শাসনকালে শুজাউদ্দৌলার বিবি বহুবেগম সাহিবা যখন ফয়জাবাদে তাঁর বৈধব্য জীবন অতিবাহিত করছিলেন

রাজ্ঞীর মহিমা নিয়ে, তখন একা তাঁর সরকারেই আট-ন শো রথ ছিল। এবং প্রাচীনকালে দিল্লার বাদশাহ যখন রাজ্যের দূর-দূর প্রান্তে সফরে যেতেন, তাঁর বেগমরা এই রথে চড়েই তাঁদের সঙ্গে যেতেন।

বলদের গাড়ী 'বহল'—দুচাকার ওপর একটা খাটিয়া, তার ওপরে চারটে লাঠি দাঁড় করিয়ে তাতে একটা 'ছতরী' (হুড) লাগিয়ে দেওয়া, তারও ওপরে ঢাকার জন্যে 'গিলাফ' (আবরণী) চড়ানো। এটি ছিল দেহাতী ও শহুরে মধ্যবিত্ত পুরুষ ও রমণীদের যান। গ্রামে এখনও 'বহল' অনেক আছে। কিন্তু প্রয়োজন দিন-কে-দিন হ্রাস পাচ্ছে। একটা সময় আসবে, যখন এ-যানও অগস্ত্যযাত্রা করবে।

এছাড়া আর যেসব 'সওয়ারী' বা যানবাহন তাদের তো সবাই জানে, চেনে। তাদের আকার-আকৃতি বর্ণনার কোন দরকার নেই।

এইসব যান শহরের সমস্ত রাস্তায়, গলিঘুঁজিতে সর্বদা যাতাযাত করত। অধিকাংশ লোক যেত 'পীনস' বা পাল্‌কিতে। শিক্ষিত ব্যক্তি, চিকিৎসক, আমীর প্রভৃতি অবস্থাপন্ন লোক, খোদা যাদের ছপ্পর ফুঁড়ে দিয়েছেন, চারটে করে কাহার রাখত ; তারা ঘরের কাজেও লাগত। যেসব লোক স্টাইল দেখাতে চাইত, বা যেসব লোক সৈন্যদের মতো গ্ল্যামার দেখাতে চাইত—সেকালীন শহরে এদের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিলনা—তারা বেরোত ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে। রূপোর অলংকার, জরি-বুটির কাজ চতুষ্পদী অশ্বকে করে তুলত তুলহ্‌ন-উপমা। উচ্চকোটির পদস্থ ব্যক্তিরা যাতায়াত করত হাতীর পিঠে। হাতী যদিচ বিশাল ও উঁচু, তবু অলিতে-গলিতেও নিঃসংকোচে পদচালনা করত। হাতীর পিঠের ওপরে অল্প-কাজকরা 'ঝুলা',[1] তার ওপর খোলা হাওদা অথবা বুরুজের মতো ছায়াদার হাওদা বাঁধা হত।

রমণী-বাহন 'পীনস' ও 'সুখপাল' 'পাল্‌কি-ডুলী' বেরোত রমণীয় ভঙ্গিতে। 'পীনসের' ওপর থাকত লাল ছিট্ কাপড়, তাতে কখনওবা

[1] বিছানো কাপড়।

'গোটা-লচ্কা', (ফিতে, পাত) লাগানো। কাহাররা পরত লাল বনাতের চোগা; মাথায় লাল কানাত্ওয়ালা পাগড়ী; তার চুড়ে রূপোর মাছ সংলগ্ন। মাছ হিন্দুস্তানের শুভ প্রতীক-চিহ্ন বলে গণ্য। বিদায় গ্রহণ কালে বা কোন বড়ো কাজে যাবার সময়ে আজও মেয়েদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়: 'ওয়্হী মছ্লী'। এটা বোধহয় জ্যোতিষ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। কোথাও যাত্রাকালে মাছ যাতে সবসময়ে চোখের সামনে থাকে, রূপোর মাছ তৈরি করে কাহারদের পাগড়ীতে আট্কে দেওয়া হয় এবং থাকে আগে। মনে হয়, এটা জ্যোতিষীদেরই একটা বড়োরকম ধাপ্পাবাজী।

জেনানা পালকীর সঙ্গে সঙ্গে এক কাহারনী 'ছিট্কা'র কোণ ধরে দৌড়ত। এদের বেশভূষায় বিশেষত্ব ছিল—'লহংগ' বা জামায় এতো চওড়া গোট থাকত, জামার অর্ধেকেরও বেশি শুধু গোটেরই হত। তা থেকেই এদের চেনা যেত।

এইসব সওয়ারীর মধ্যে শহরে এখনও অবশিষ্ট আছে 'পীনস' বা পাল্কী। কোন রইসকে ঘোড়া বা হাতীর ওপরেও দেখা যায় কখনও কখনও।

এখন দ্রষ্টব্য: বাইরে যাবার সময় শরিফ লোকেরা দেখতে কেমন হত। বেশভূষার বর্ণনা আমি আগেই করেছি। তবু, পুরো ছবিটা দেখবার জন্যে কিঞ্চিৎ পুনরুল্লেখ প্রয়োজন।

সওয়ারী প্রসঙ্গে আমি যা-কিছু বলেছি তাতে লখনউয়ের কোন অবদান নেই। কারণ, একমাত্র 'বূচা' ও 'হওআদার' ছাড়া আর সবই এসেছে দিল্লী থেকে। বস্তুত, এগুলি ছিল দিল্লীরই জৌলুস। তার শেষ ঝলক দেখা গেছে লখনউয়ে, বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই। তারপর গায়েব হয়ে গেছে। কিন্তু বেশ-ভূষণে লখনউ দিল্লী থেকে স্বতন্ত্র। এখন ঘরে কুর্তা বা কামীজ খুলে বসে থাকা অসভ্যতা বলে মনে করা হয়। কিন্তু সেকালে ঘরোয়া পোষাক ছিল, সত্যি বলতে কি, 'গর্কী' (ল্যাংগোটী)। এখানকার দরবার ছিল শীয়া। সব জিনিসই ঢালাই হত শীয়া মতের ছাঁচে। ইমামদের ধর্মশাস্ত্র অনুসারে

উরু খুলে রাখায় কোন দোষ নেই—ঠিক যেরকম 'হানৃফী' সম্প্রদায়ের ধর্মে নাভি থেকে আরম্ভ করে হাঁটু পর্যন্ত শরীরের যে অংশ, তা ঢেকে রাখা অবশ্যকর্তব্য। এরই ভিত্তিতে দিল্লীতে সবাই লুংগী পরত তহমতের মতো, যাতে হাঁটুর নীচে পর্যন্ত শরীর ঢাকা থাকত। স্থানীয় সভ্যতায় এর প্রয়োজন রইল না। এখানকার লুংগী হয়ে গেল স্রেফ্ পাতলামতো একটা 'গর্কী' বা জাঙ্গিয়া—যাতে নাভি থেকে জংঘা পর্যন্ত দেহ ঢাকা পড়ত, বাকিটা থাকত অনাবৃত। সভ্য-শিষ্ট হয়ে বাইরে বেরোনো দরকার, এ-বোধ লোকেদের ক্রমশ বেড়েই গিয়েছিল। কিন্তু ঘরে এক ওই 'গর্কী' ছাড়া দেহে আর একটা সুতোও নাস্তি। এবং এই প্রায়-নগ্ন অবস্থায় ঘরে কারও সঙ্গে দেখা কারাটাও অদৌ খারাপ মনে করা হত না। সকলেই এতে অভ্যস্ত ছিল। আবার, এইসব লোকই যখন বাইরে বেরোত, তার জেল্লাই ছিল আলাদা: চ্যাগোশিয়া টুপি, ধব্ধবে শাদা আংগ্রাখা—দেখে মনে হত, ধোপা-বাড়ি থেকে সেইমাত্র এসেছে এবং তখন-তখনই হাতা ও ধারগুলি গিলে করা হয়েছে—'গুলবদন' বা 'নয়নসুখের' তৈরি ঢিলে পায়জামা, কাঁধের ওপর তেকোণা রুমাল (ওড়না), হাতে ছোট্ট 'দস্তী' রুমাল ও ছড়ি, পায়ে লখনউয়ে তৈরি হাল্কা মখমলের ছোট ডগাওলা জুতো: এই হল শরিফদের বাইরের পোষাক।

বাইরের পোষাক সম্পর্কে অনেকের এমন খুঁতখুঁতে ভাবও ছিল, যে, কাপড়চোপড় যেন ময়লা বলে মনে না হয়। মাসের পর মাস ধুতে দেওয়া হয়নি; অথচ, দেখে মনে হয়—ধোপার বাড়ি থেকে এখনই কেচে এসেছে! আসলে হত কী—বেলা তখন অপরাহ্ন; সাহেব বেরোলেন ঘর থেকে; আস্তে আস্তে, আশপাশের সবকিছু থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে, নিজের ছায়া দেখেও ভড়্কে যেতে-যেতে; চকে বেড়ালেন কিছুক্ষণ; সন্ধ্যা যখন রাত ছুঁই-ছুঁই, ফিরে এলেন। ঘরে ফিরেই প্রথম কাজ—একটা 'কালিব' (স্তূপ)-এর ওপর টুপি রাখলেন, কাপড় দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন; আংগ্রাখা, পায়জামা এবং 'ওড়নার রুমাল' খুব সাবধানে পাট করে 'দস্তী' রুমালে বেঁধে

খুঁটির ওপর ঘড়ির মতো ঝুলিয়ে রাখলেন ; তারপর, কোমরে 'গর্কী' বেঁধে কোন পুরনো চপ্পল বা জুতো পরে বসে রইলেন। এইভাবে গুছিয়ে রাখার জন্যে দামী ও 'পশমীনার' কাপড় চার-পাঁচ থাক পর্যন্ত এমন যত্নে থাকত, না হত ময়লা, না ছিঁড়ে যেত, না কাটত পোকায়। সবসময়ে নতুন হয়েই থাকত। বিবাহ উৎসবে বড় বড় আসরে, মাইফেলে এমন 'শাহানা লিবাস' (বিয়ের সাজ) পরে লোক যেত, যারা তার অবস্থা ও সামর্থ্যের খবর রাখত, তারা আশ্চর্য হয়ে যেত।

উঁচু ঘরের আমীর, বিশেষ করে শাহজাদা, বিদ্বান ও বৈদ্য, এঁরা বেরোতেন সওয়ারী চড়ে। সঙ্গে থাকত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। কিন্তু শরিফরা বেরোত পদব্রজে। আজকালকার মতোই তাকে খারাপ বলে মনে করা হত না। তাবৎ বর্গ ও শ্রেণীর লোক পায়ে হেঁটে বাইরে বেড়াত—মনে হত, সকলেই সম স্তরের ; পদচারণারত বড়-বড় রইস ও মানী-গুণী লোকেদের সঙ্গে সমানতালে মেলামেশা করত সবাই। তাতে কেউ খারাপ মনে করত না।

॥ 52 ॥

গুণগ্রাহিতা এবং প্রয়োজনীয়তা-বশত লখনউ সমাজ কী-কী জিনিসের উন্নতি-বিধান করেছে এবং কোন্ কোন্ শিল্পকলার বিকাশ হয়েছে এখানে, এবার আমি সংক্ষেপে সেসব কথা বলতে চাই। এই প্রসঙ্গে অনেক জিনিসের উল্লেখ আসবে। আমি শুরু করছি মৃৎপাত্র দিয়ে।

পৃথিবীর প্রথম আবিষ্কার: মাটির পাত্র। বিভিন্ন দেশের মাটি খুঁড়ে প্রাচীন কালের পাথর আবিষ্কৃত হয়েছে। সে সব থেকে প্রমাণিত হয়: ভাঁটিতে মাটি পুড়িয়ে মৃৎপাত্র প্রস্তুত করার পদ্ধতি বিবর্তনের সেই গোড়ার যুগেই মানুষ জেনে গিয়েছিল এবং সম্ভবত ইতিহাসের পাষাণ-যুগেই, খনিজ পদার্থ আবিষ্কারের আগেই, বাসন তৈরি ও তাতে রান্না করাও তারা শিখে গিয়েছিল। মিশরে

ফারাওদের সময়ের মৃৎপাত্র, এবং বাবিলনের আহার ও পান-পাত্রের সঙ্গে অনেক পাকা ইঁট পাওয়া গেছে। ফারাওদের সময়ে মিশরের ধনী ব্যক্তিরা যে 'তাবুত'[1]-এ মৃতদেহকে মমী বানিয়ে রাখত, সেগুলো হত মাটির। শুধু তাই নয়, ঠিকরে ও ঘুঁটি দিয়ে অনেক দিন পর্যন্ত কাগজের কাজ চালিয়েছিল আমাদের এই প্রাচীন পৃথিবী।

পুরাকালীন হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের মধ্যেও এই শিল্প এসে গিয়েছিল। আদিম কালে আবিষ্কৃত বাসনপত্র থেকে বোঝা যায়, এই কলাতেও এখানকার লোক অন্য স্থানের তুলনায় কম উন্নত ছিল না। বিশেষত, মূর্তিপূজার ফলে হিন্দুদের মধ্যে মাটির মূর্তিশিল্পের পত্তন হয়েছিল, এবং দিনদিন তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে চলেছিল। এখানে কুমোরদের একটা জাতই আবির্ভূত হয়েছে, যাদের বংশগত ও পৈত্রিক পেশা হচ্ছে, মাটির বাসন ও খেলনা বানিয়ে পোড়ানো।

দিল্লীতে, ইসলামী পর্বে আবির্ভূত 'কাসগর'রা ছিল মুসলমান। এরাও বাসনের সঙ্গে খেলনা বানাত। এবং কুমোরদের চেয়েও প্রগতিশীল ছিল। ইসলাম ধর্মে মূর্তি-গড়া নিষিদ্ধ; তবু এই কাজই কাসগরদের জীবিকার উৎস। তাই, তারা কয়েক শ্রেণীর খেলনা তৈরি করতে ও বেচতে বাধ্য হয়। সভ্যতায়, শিষ্টতায় এবং আপন শিল্পের কলানৈপুণ্যে মুসলমান 'কাসগর' কুমোরদের চেয়েও প্রাগ্রসর।

মুসলমান আমীররা এই কাসগরদেরও সঙ্গে করে দিল্লী থেকে লখনউ নিয়ে আসে, এবং আমীরদের শৌখীনতার দৌলতে এদের শিল্প-উদ্যোগ এখানেও সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। কুমোর ও কাসগর দুদলই নিজেদের কাজে এমন বুদ্ধিচাতুর্য ও কৌশল দেখাতে আরম্ভ করেছে, যা দেখান চিত্রকর তাঁর চিত্র-লেখায়, কবি দেখান তাঁর কবিতা রচনায়।

সৌভাগ্যবশত লখনউয়ের মাটি এই শিল্পের পক্ষে খুব উপযোগী

---

[1] সমাধি

বলে প্রমাণিত হয়েছে। ফলে, কারিগরদের সুযোগ ঘটেছে স্বকীয় কুশলতা প্রদর্শনের। অতুলনীয় সব বাসন ও খেলনা তৈরি হয়েছে ও হচ্ছে—এমন হাল্কা, সূক্ষ্ম, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন কাজকরা বাসন অন্যত্র তৈরি হয় না। অমরদেহের মাটিও এই কাজের খুব উপযোগী। ওখানেও তাই এই শিল্পের ক্রম-বিকাশ হচ্ছে। ওখানকার কারিগরদের তৈরি বাসন ও পুষ্পাধার এবং লখনউয়ের বাসনপত্রের গড়ণে পার্থক্য আছে। এবং প্রায়-লোকই জানে: সূক্ষ্ম সৌকুমার্য যাদের পছন্দ, তাদের কাছে লখনউ-কারিগরের কাজ অনেক ভালো।

সাধারণ জিনিসের মধ্যে লখনউয়ের ঘড়া ও বদ্‌না সারা হিন্দুস্তানের ঘড়া ও বদ্‌নার চেয়ে হাল্কা ও সুদর্শনা। ঘড়ার গোলাই পূর্ণবৃত্তাকার। তামার লোটার সঙ্গে বদ্‌নার চেহারার খুব মিল আছে। মাটির পাত্র এখানকার চেয়েও ভালো হয়তো অন্যত্রও হয়। তবে মৃৎপাত্রে আহারের প্রথা একেবারে উঠে গেছে; কুমোররাও এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু যেসব বাসনে এখানকার কাসগররা দক্ষতা দেখিয়েছে, সেগুলি হল: সুরাহী, ঝাঁঝরী, হুঁকো, আবখোরা, এবং সবশেষে 'খীর কী হাণ্ডিয়া'।

'আবখোরা' হচ্ছে জলপান-পাত্র। কাঁচ ও এনামেলের সুন্দর হাল্কা গেলাস এবং মোরাদাবাদ ইত্যাদি স্থানের গেলাস ও বাটি বেশি প্রচলিত। কিন্তু গ্রীষ্মকাল হিন্দুস্তানের এমন এক ঋতু যখন মাটির 'আবখোরা' ছাড়া অন্য কোন পাত্রে জলপানে মজা পাওয়া যায় না। এতে জল ঠাণ্ডা থাকে; এবং সেই শীতলতা বিশুষ্ক হাত ও ঠোঁটের ওপর এমন এক আনন্দ সঞ্চারিত করে দেয়, যা অন্য কোন পাত্রেই হয় না। তদুপরি মাটির কোরা 'আবখোরায়' এমন এক সুগন্ধ জন্মায়, যা হৃদ-য়দাহকে নির্বাপিত করে। এই শখ থেকে আবিষ্কৃত হয় মাটির 'ইত্র' (আতর)। এইজন্যেই 'আবখোরা' আজ বহাল তবিয়তে বিদ্যমান, এবং নানাবিধ সৌকর্য প্রাপ্ত। 'কাগ্‌জী' আবখোরা এতো নাজুক, পাতলা, হাল্কা এবং এতো মোলায়েম হয়, যে কাঁচের গেলাসের নাজুক গুণকেও সে হারিয়ে দিয়েছে। এরও ওপরে নক্‌শা

করা হয় এবং বালির স্তর চড়িয়ে দেওয়া হয় ; জল তাতে বেশি ঠাণ্ডা থাকে। এরই মতো এর জোড়া একরকম 'থালী'ও তৈরি হয়েছে। শেষদিকের 'আবখোরার' গড়ন এমন সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, দর্শনমাত্রেই মন হয়ে যায় খুশী-খুশী। মানুষের কারিগরী গলিত ধাতুর ব্যবহারে যে নৈপুণ্য দেখিয়েছে, মাটি দিয়েও যে তা দেখানো যায়, একথা মেনে নিতে বাধ্য হয় মহাকাল।

জল রাখার ও শীতল করার পাত্র প্রথমত 'আবখোরা'। তারপরে 'সুরাহী'। 'সুরাহী' (সুরাই, কুঁজো) পুরাতনী ; প্রাচীন ইরানে ও মিশরে এর ব্যবহার ছিল। তবে ভালো মাটি এবং কারিগরদের পরিচ্ছন্ন রুচির জন্যে লখনউয়ের 'সুরাহী'ই উত্তম, 'কাগ্‌জী' (কোরা) ও হাল্কা এবং এমন রূপবতী। যে এই দ্বিবিধ গুণেই সে যেমন অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী তেমনি তার মুখে এমন এক বংকিম ঢল, যার ফলে লখনউয়ী সুরাহীর মতো এমন মুখশ্রীও অন্যত্র দুর্লভ-দর্শনা। 'ঝাঁঝরী'ও অমনি নাজুক ও হাল্কা। উদর তার সুরাহীরই সদৃশ ; ওপরে লম্বা গর্দানের বদলে একটা 'মুঁহগ্‌র' লাগানো। কার্যকারিতা ও সৌন্দর্যের দিক থেকে সুরাহীর চেয়ে এটি কম যায় না।

ধোঁয়া যাতে শীতল হয়ে আসে, তাই ঠাণ্ডা হওয়া হুঁকোরও খুব দরকার। এখানকার মাটির 'কাগ্‌জী'-হুঁকো এতো সুন্দর ও সুকুমার, যার তুলনা পাওয়া ভার। একেবারে নতুন বা প্রথমবার ব্যবহৃত আন্‌কোরা হুঁকো থেকে ঠাণ্ডা ও মিহি ধোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা-মাটির এমন এক সুন্দর মিষ্টি গন্ধ বেরোতে থাকে, শাহী জমানার বড় বড় সব রইসদের এছাড়া অন্য কোন হুঁকোয় মজাই আসত না। একে আরও সুন্দর-সুকুমার করেছেন আজীমউল্লাহ খান ; আজ পর্যন্ত মাটির যতোরকম হুঁকো বেরিয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো, হাল্‌কা ও প্রিয়তম 'আজীমউল্লাহ খানী হুক্‌কা'—যা তিনি নিজের নামে বাজারে ছেড়েছেন।

আমি একবার লণ্ডনের রাজকবি লর্ড টেনিসন প্রসঙ্গে শুনেছিলাম : মাটির সাধারণ পাইপ তিনি খুব ভালবাসতেন এবং তাঁর কবি-হৃদয়

ছিল এই কাঁচা-কোরা পাইপের রসিক। সামনের একটা টুক্‌রি ভর্তি করে কাঁচা, অব্যবহৃত পাইপ রাখতেন। একটা পাইপ নিয়ে তাতে তামাক ভরতেন, খেতেন, কয়েক মিনিট পরে ভেঙ্গে অন্য একটা টুক্‌রিতে ফেলে দিতেন। পরের বার যখন প্রয়োজন হত, আর একটা নতুন পাইপ নিতেন, কয়েকটা টান দিয়ে তাকেও ভেঙ্গে ফেলে দিতেন। এইভাবে দিনভর ব'সে পাইপ ভরা, খাওয়া এবং ভাঙ্গা চলত। আমার বিশ্বাস, লর্ড টেনিসন যদি 'আজীমউল্লাহ খানী হুক্‌কা' পেতেন, তাহলে মাটির পাইপকে তিনি ভুলেই যেতেন। এর ধোঁয়ায় যে শীতলতা-উৎকর্ষতা-সুকুমারতা, মাটির পাইপে তার সন্ধান কোনদিন মিলবে না।

রান্নার হাঁড়ি তো হয় সব জায়গাতেই। কিন্তু লখনউয়ের হাঁড়ি তামার পাতিলের যেরকম হুবহু নকল, এমন আর কোথাও বোধহয় হয় না। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'গুলাবী হাণ্ডী'। শরীফদের মধ্যে ক্ষীর ইত্যাদি বণ্টনের জন্যে এটি তৈরি হয়। 'আবখোরা' ও 'সুরাহী'র মতো এও কাগ্‌জী ও খুব সুন্দর হয়। নাজুক-মেজাজ অনেক আমীর এতে পানের খিলিও রাখে। গরমের দিনে 'খাসদান' তেতে ওঠে। তাতে পানও খুব গরম হয়ে যায়। কিন্তু এই হাঁড়ীতে তারাই আবার অতিশীতলা ; সেই সঙ্গে একটা সোঁদা গন্ধও, যা খুবই আনন্দদায়িকা।

বাসনপত্রের চেয়েও কুমোররা বেশি দক্ষতা দেখিয়েছে খেলনা ও মাটির মূর্তিতে। মূর্তি-পূজার কারণে মূর্তিকলা বহু পুরাতন। মিশরী, ইরানী, বাবুলী[1], ইউনানী[2] এবং রোমীয়—যে যার নিজের নিজের যুগে সকলেই এই কলায় কৃতিত্ব দেখিয়েছে। যার নিদর্শন য়োরোপের বিখ্যাত জাদুঘরে আজও দ্রষ্টব্য। বিশেষত পাথরের মূর্তি কাটায়, এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অনুপাত সৃষ্টিতে গ্রীকরা এমন নৈপুণ্য দেখিয়েছে, যে আজকের যুগও, প্রচুর উন্নতি সত্ত্বেও, ওদের কৌশলে বিস্মিত হয়। ওদের তৈরি মূর্তি আধুনিক মূর্তিকার ও চিত্রকরদের

---

[1] বাবিলনের অধিবাসী। [2] গ্রীক।

কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু মাটির খেলনায় যে কারিগরী এখানকার অশিক্ষিত, মূর্খ কুমোররা দেখাচ্ছে, গ্রীকদের কৃতিত্বের চেয়ে তা একটুও কম নয়। এরা মানুষকে দেখে তার শরীর যতোটা, ততোটা বড়োই পুরো মূর্তি তৈরি করে দেয় এবং ছোট-ছোট মূর্তির মধ্যে দিয়ে সব শ্রেণীর ও নানান ধরনের লোকেদের এমন প্রতিমূর্তি তৈরি করে দেয়, যা একেবারে আসলের মতো। এই কলাকৃতি থেকে এদের মধুর কল্পনা ও শৈল্পিক ক্ষমতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। দেওয়ালীতে হিন্দুরা অনেক খেলনা কেনে ও বিতরণ করে। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্যে, প্রতি বছর এই মরশুমে এখানকার কুমোররা স্বকীয় শিল্পে নতুন নতুন আবিষ্কার এবং সূক্ষ্ম কল্পনা প্রকাশের সুযোগ পায়।

এইসব কুমোর মূর্তির যেসব বিভিন্ন গ্রুপ্ ও সেট তৈরি করেছে, তা বাস্তবিকই দর্শনীয়। ইংরেজী ব্যাণ্ড, গণিকা ও ভাঁড়েদের দল, পুরনো নবাবদের মাইফেল, আমীরদের দরবার, এবং শিল্পীদের গোষ্ঠী বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। একবার এক প্রদর্শনীর জন্যে এখানকার এক কুমোর একটি হিন্দুস্তানী গ্রাম তৈরি করেছিল ; তাতে জনপদ, তার ভেতরে দোকান ও বাড়ি, তার মাঝখান দিয়ে বিভিন্ন প্রকার লোকের আনাগোনা, বলদ-গাড়ির চলা ; পাশের মাঠে কৃষকদের হল চালনা, নালার মাধ্যমে ক্ষেত্রে জল-সেচন দেখানো হয়েছিল। নালার মধ্যে জলের প্রবাহ, তার ওপর ছোট ছোট ঢেউ ওঠা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। বিশেষভাবে যেটা দেখানো হয়েছিল— লাঙ্গলে-জোতা বলদ খুবই দুর্বল, পাঁজরা পর্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়ে। এই রকম আর একটা আমি দেখেছিলাম, যার বিষয় ছিল ঃ শাহী জমানার লখনউ। তাতে, ওই সময়ের জনপদ, গলি ও সেতু দেখানো হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের কথা, এইসব 'দস্তকার' (কারুশিল্পী) আবেগের তাড়ণায় আবির্ভূত হয়, দু'চারদিন চোখের সামনে থাকে, তারপর উধাও হয়ে যায়। এমন কোন স্থানও নেই যেখানে এইসব শিল্পের নমুনা সংরক্ষিত করে রাখা যায়। লণ্ডনে

'ম্যাডাম তুসোজ্ এক্জিবিশন' নামে মোমের মূর্তির একটা 'অজায়বঘর' (জাহ্ঘর) আছে, যেখানে এযুগের মহৎ ব্যক্তিদের বিবিধ 'আদমকদ'[1] তসবীর[2] আছে। এগুলিতে শিল্পী আপন দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। কয়েকটা মূর্তি এমন, বহুবার যে গিয়েছে, সেও কোন-না-কোন মূর্তি দেখে ধোঁকা খেয়ে যায়। মাটির মূর্তির এইরকম একটি সংগ্রহালয় যদি এখানেও স্থাপন করা যায়, এবং সেখানে কুমোরদের সমস্ত কাজ একত্রিত করা যায়, তাহলে, আমার ধারণা, এই শিল্পের বিকাশের পক্ষে তা হিতকর তো হবেই, লাভজনকও হবে। এখানে প্রবেশের জন্যে টিকিটের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এবং আমি মনে করি—বাইরের কোন পর্যটক এটা না দেখে যাবেনা। কিন্তু দোষ তো আমাদেরই—এবিষয়ে স্বয়ং আমাদেরই কোন শখ বা আকর্ষণ নেই, এবং সব কাজেই আমরা গভর্নমেণ্টের ওপর নির্ভর করে থাকতে চাই। যদি কোন ধনী আমীরের, ভোগবিলাসের পরিবর্তে, এই বিষয়ে শখ জাগে, তাহলে তাঁর কতো খ্যাতি এবং দেশের কতোটা সেবা হতে পারে, সেসব বলাই বৃথা।

জাহ্ঘরগুলিতে এই ধরণের খেলনা অনেক সংগৃহীত আছে। কিন্তু খুবই সীমিত। এবং লখনউয়ের এই শিল্প এতো উন্নত নয়, যে, অন্যান্য দুর্লভ ও বিস্ময়কারী বস্তুসামগ্রীর সঙ্গে এইসব খেলনারও কিছু রাখা যায়। আসলে এখানে যা হওয়া উচিত, তা হল : এইসব মাটির মূর্তি ও খেলনার নিয়মিত প্রদর্শনী ॥

[1] মানুষসমান। [2] ছবি, মূর্তি : এখানে মূর্তি।